অরিগনের যাত্রাপথে

ফ্র্যান্সিস পার্কম্যান

অনুবাদক : অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

বসুধারা প্রকাশনী

৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৭১

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি.এ.,
৪২, বিধান সরণী,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীবিশ্বনাথ দাশ

প্রচ্ছদ-মুদ্রাকর : কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়,
ক্যাশ প্রেস,
৩৩-বি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা ৬

মূল্য টা. ৫·০০

THE OREGON TRAIL **by FRANCIS PARKMAN**
(Originally published by Garden City Books, Garden City, N. Y.)

অরিগনের যাত্রাপথে

প্রথম অধ্যায়

সীমান্ত

গতবছর, ১৮৪৬, বসন্তঋতুতে সেণ্ট লুইস নগরীর সর্বত্র জেগেছিল নতুন প্রাণের সাড়া। শুধু যে দেশের সব জায়গা থেকে এসে দেশান্তর-যাত্রীরা অরিগন আর ক্যালিফর্নিয়া অভিমুখে যাত্রা করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তা নয়, বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীও সাণ্টা ফে যাবার জন্য তাঁদের মালের গাডি (ওয়াগন) এবং সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে রাখছিলেন। হোটেলগুলো হয়ে উঠেছিল লোকে ভর্তি ; বিভিন্ন যাত্রী-দলের অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদির চাহিদা মেটাবার জন্য বন্দুক আর জিন তৈরির কারিগরদের সারাক্ষণ কাজে নিযুক্ত থাকতে হচ্ছিল। স্টীমবোটগুলো তাদের জেটি ছেড়ে মিজুরি নদীর উজান বেয়ে বহু যাত্রী নিয়ে এগিয়ে চলেছিল সীমান্তের দিকে।

এদেরই একটিতে—এই স্টীমবোটটির নাম 'র‍্যাডনর', এটি পরে জলমগ্ন গাছের ডালের খোঁচায় তলা ফেঁসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল—গত ২৮শে এপ্রিল আমার বন্ধু-আত্মীয় কুইন্‌সি অ্যাডাম্‌স্ শ এবং আমি সেণ্ট লুইস ছেড়ে রকি পর্বতমালা অভিমুখে রওনা হলাম। এ যাত্রার উদ্দেশ্য—কৌতূহল মেটানো, আর আনন্দ পাওয়া। একবার এপাশ একবার ওপাশ থেকে জল ঢুকবার উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত স্টীমবোটটিকে বোঝাই করা হয়েছিল। বোটের ওপরের তলা ভর্তি হয়েছিল এক অদ্ভুত রকমের এবং বড় আকারের মালের গাড়ি (ওয়াগন) দিয়ে ; এগুলো সব সাণ্টা ফে-র জন্য। বোটের নিচুতলার খোলের ভেতরেও ছিল অনেক মাল ঠাসা ; এগুলোও যাবে ঐ একই জায়গায়। আর ছিল অরিগন-অভিযাত্রী একটি দলের সরঞ্জাম এবং খাদ্যদ্রব্যাদি, একদল অশ্বতর এবং ঘোড়া, স্তূপীকৃত জিন এবং ঘোড়ার সাজ, তা ছাড়া আরো নানারকমের টুকিটাকি জিনিস যা 'প্রেয়ারি'তে (বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে) অপরিহার্য। এইসব বিচিত্র বস্তুর ভিড়ে নিজেকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল একটি ছোট ফরাসী গাড়ি, সীমান্তের ওধারে যে ধরনের গাড়িকে উচিত ভাবেই বলা হয় 'অশ্বতর-হন্তা' গাড়ি। আরেকটু দূরেই পড়ে ছিল একটি তাঁবু

আর নানা বিচিত্র ধরনের বাক্স আর পিপে। এইসব জিনিসের সমাবেশটি ঠিক চোখ জুড়োবার মতো নয় বটে, কিন্তু এই নিয়েই আমাদের লম্বা আর শক্ত পাড়ি দিতে হয়েছিল। সেই পাড়িতেই সহিষ্ণু পাঠকও আমাদের সহযাত্রী হবেন।

'র‍্যাডনর'-এর যাত্রীরাও ছিলেন এই মালপত্রের মতোই বিচিত্র। এর ক্যাবিনের ভেতর ছিলেন অনেক সাণ্টা-ফে-যাত্রী ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি, ফট্‌কাবাজ আর নানারকমের ডানপিটে মানুষ; এবং সবচেয়ে সস্তা ভাড়ার অংশে ছিলেন বহুসংখ্যক অরিগন-অভিযাত্রী, পাহাড়ী, নিগ্রো, আর একদল ক্যান্‌সাস নদীতীরের বাসিন্দা ইণ্ডিয়ান, যারা সেণ্ট লুইস নগরীতে দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন।

এভাবে বোঝাই হয়ে স্টীমবোট 'র‍্যাডনর' সাত আট দিন ধরে মিজুরি নদীর প্রবল স্রোত ঠেলে বহু কষ্টে এগিয়ে চলল। এগোবার পথে নানা বাধায় মাঝে মাঝে আটকে পড়তে হলো, কখনো কখনো বালুর প্রাচীরে ঠেকে একটানা দু'তিন ঘণ্টার জন্য। আমরা যখন মিজুরি নদীর মোহানায় প্রবেশ করলাম তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু আবহাওয়া অচিরেই পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলো প্রশস্ত, ঘোলাটে নদী, তার কোথাও ঘূর্ণি, কোথাও বালুর প্রাচীর, কোথাও বালুর চড়া, আর দুই তীরে বনের সারি। মিজুরি নদী তার গতিপথ অবিরাম বদলে চলেছে; একদিকের পুরোনো তীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্যদিকে গড়ে উঠছে নতুন তীর, এরই ফলে বদলে যাচ্ছে নদীর খাত। মাঝে মাঝে জেগে উঠছে চর, আবার ধুয়ে ভেসে যাচ্ছে জলের স্রোতে। তীর ভেঙে যাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে একদিকের পুরোনো বন যেমন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি অপরদিকে নতুন মাটিতে জেগে উঠছে নতুন বন। এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে জলের সঙ্গে কাদা আর বালু এমনভাবে মিশে যায় যে বসন্তকালে মিজুরি নদীর জল হয়ে পড়ে রীতিমতো ঘোলাটে; গ্লাসে রাখলে গ্লাসের তলায় কয়েক মিনিটের ভেতরই এক ইঞ্চি পুরু তলানি পড়ে যায়।

বসন্তে নদীর জল বেশ উঁচুই ছিল, কিন্তু তারপর শরতে যখন নিচের দিকে নেমে এলাম তখন জলও অনেক নিচে নেমে গেছে, নদীর অগভীর অংশে অংশে লুকানো বিপদগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখে ভয় হলো, শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবার জন্য কাটা গাছের তৈরী প্রতিরোধ-ব্যূহের মতো কতকগুলো মরা, ভাঙাচোরা গাছ এমনভাবে শক্ত হয়ে বালুতে গেঁথে রয়েছে, যে কোনো দুর্ভাগা স্টীমবোট ভরা নদীতে এদের ওপর দিয়ে যেতে গেলেই শূলবিদ্ধ হওয়ার মতো এদের ডালে আটকে যাবে।

পশ্চিমমুখী যে বিরাট অভিযান চলেছিল, পাঁচ ছয় দিনের ভেতরই আমরা তার

নমুনা দেখতে শুরু করলাম। সর্বজনীন মিলনকেন্দ্র ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শহরে যাবার পথে দেশান্তরযাত্রী কয়েকটি দল তাদের তাঁবু আর মালবাহী গাড়ি (ওয়াগন) নিয়ে নদীর ধারে সাময়িকভাবে আস্তানা গেড়েছিল। এক বাদ্‌লা দিনে সূর্যাস্তের কাছাকাছি আমরা পৌছলাম এ জায়গার অবতরণ-স্থলে। এটি নদী থেকে কয়েক মাইল দূরে, মিজুরি রাষ্ট্রের এক সীমান্তের কাছাকাছি। যে দৃশ্য চোখে পড়ল সেটি বিশেষত্বপূর্ণ, কারণ এই দুরন্ত দুঃসাহসিক অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সব একনজরে দেখতে পাওয়া গেল। কর্দমাক্ত ডাঙায় দাঁড়িয়েছিল ত্রিশ চল্লিশ জন ক্রীতদাস সুলভ চেহারার কৃষ্ণকায় স্পেনিয়ার্ড (স্পেন দেশের লোক); তাদের মাথায় চওড়া টুপি আর চোখে বোকা বোকা চাউনি। এরা সাণ্টা-ফে-যাত্রীদলগুলির একটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই-সব দলের মালবাহী গাড়িগুলো উঁচু জমির ওপর একসঙ্গে জড়ো করে রাখা ছিল। এদেরই মাঝখানে একটি শিখাহীন অগ্নিকুণ্ডের গা ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে বসেছিল একদল ইণ্ডিয়ান ; এরা মেক্সিকোর একটি প্রাচীন গোষ্ঠীর অন্তর্গত। লম্বা চুলওয়ালা এবং হরিণের ছালের তৈরী পোশাক পরা পাহাড় অঞ্চলের দু-একজন ফরাসী শিকারী নৌকোর দিকে তাকিয়ে ছিল, আর কাছাকাছি একটা কাঠের তক্তার ওপর তিনটি লোক বসে ছিল হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাইফ্‌ল্‌ রেখে। এদের ভেতর সবচেয়ে সামনের লোকটি বেশ লম্বা আর জোয়ান ; আলেঘেনি পর্বতমালা থেকে পশ্চিমের বৃক্ষহীন তৃণভূমি পর্যন্ত পথ বানিয়েছে যেসব দুঃসাহসী পথিকৃৎদের কুঠার আর বন্দুক, এ লোকটিকে তাঁদের প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারত। সে তখন যাত্রা করে বেরিয়েছে অরিগন যাবার জন্য। তার পক্ষে হয়তো বিরাট সমতল ভূমিগুলোর এদিকের চাইতে অরিগন অঞ্চলই অনেক বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ।

পরদিন খুব সকালবেলা আমরা পৌছলাম ক্যান্‌সাসে, মিজুরি নদীর মোহানা থেকে প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে। এইখানে আমরা নেমে পড়লাম এবং আমাদের সব জিনিসপত্র কর্নেল চিকের জিম্মায় রেখে দিয়ে একটি ওয়াগনে চড়ে ওয়েস্টপোর্ট রওনা হলাম, সেখানে থেকে আমাদের ভ্রমণের জন্য ঘোড়া এবং অশ্বতর সংগ্রহ করবার আশায়। কর্নেল চিক বেশ ভালো আতিথেয়তা জানতেন, এবং তাঁর কাঠের বাড়িটি রেস্তোরাঁর অভাব পূরণ করেছিল।

মে মাসের সেই স্নিগ্ধ সুন্দর ভোরবেলায় বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম ; সে পথ ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল, আর দু'ধারে নানা পাখির প্রাণচঞ্চলতা। আমাদের ভূতপূর্ব সহযাত্রী যে ক্যান্‌সাস অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা আমাদের আগে এ পথে রওনা হয়েছিল, আমরা পিছন থেকে এসে তাদের ধরে ফেললাম।

তারা তাদের বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বেশ সতেজ গতিতে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। বোটে থাকতে তাদের যাই মনে হয়ে থাক না কেন, অরণ্যের পটভূমিকায় তারা যেন অপরূপ হয়ে উঠল।

ওয়েস্টপোর্ট ছিল বহু ইণ্ডিয়ানে ভর্তি। তাদের ছোট্ট, এবড়ো-খেবড়ো লোমওয়ালা টাট্টু ঘোড়াগুলো ডজনে ডজনে বাড়ির আর বেড়ার পাশে পাশে বাঁধা ছিল। ইণ্ডিয়ানদের ভেতর ছিল নানা পদবীর লোক ; স্যাক্ (Sac) এবং ফক্স্ (Fox)-দের ছিল মাথা ন্যাড়া আর মুখে রং মাখানো ; শাওয়ানো আর ডেলাওয়্যারদের বিশেষত্ব ছিল ক্যালিকো কাপড়ের তৈরী জামা আর পাগ্ড়ি ; ওয়্যান্ডোটেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মতো। কয়েকটি বেচারা গোছের ক্যান্সাস ইণ্ডিয়ান পুরোনো কম্বলে গা মুড়ে রাস্তায় রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর কেউ কেউ দোকান বা বাড়ির ভেতরে বা বাইরে বসে বসে আরাম করছিল।

সরাইখানার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম অসাধারণ চেহারার একটি লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁর মুখ লালবর্ণ, আর মুখ জুড়ে লাল্চে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। মাথার একধারে চাপানো একটা গোল টুপি, তার ওপরে একটা গোল বোতাম ; ঐ ধরনের টুপি স্কটল্যাণ্ডের মজুররা মাঝে মাঝে মাথায় পরে থাকে। গায়ে চাপানো অদ্ভুত কোটটি স্কটল্যাণ্ডে তৈরী ছাইরঙা পশমী কাপড়ের তৈরি, তার এখানে সেখানে ঝালর ঝুলে রয়েছে। পরনের পাৎলুন মোটা ধরনের সাদাসিধে দেশী কাপড়ের তৈরি, আর জুতোর তলায় কাঁটা লাগানো। এ ছাড়া তাঁর মুখের এক কোণে লাগানো একটি ছোট্ট কালো রঙের পাইপ। এই অদ্ভুত সাজে সজ্জিত ব্যক্তিটিকে আমি চিনলাম। তিনি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন সি—, যিনি তাঁর ভাই এবং মিঃ র— নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে শিকার-অভিযানে মহাদেশ পাড়ি দিতে বেরিয়েছেন। এর আগে সেণ্ট লুইস-এ আমি ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখেছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁরা কিছুকাল ওয়েস্টপোর্ট-এ থেকে যাত্রা শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আরো সহযাত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করেছেন, কারণ অভিযানে যাত্রা করার পক্ষে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। অরিগন আর ক্যালিফর্নিয়া যাবার জন্যে যারা রওয়ানা হবার উপক্রম করছিল, এঁরা তাদের দলে যোগ দিতে পারতেন বটে, কিন্তু ঐ 'কেণ্টাকির লোকগুলো'-র সঙ্গে কোনোরকম সংস্পর্শে আসতে এঁদের ছিল ঘোরতর আপত্তি।

ক্যাপ্টেন এবার বিশেষ অনুরোধের সুরে বললেন, "আপনারা আমাদের দলে যোগ দিন, তারপর চলুন একসঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হওয়া যাক।" দেশান্তর-

যাত্রীদের দলে ভিড়বার ইচ্ছা তাঁদের চাইতে আমাদের যে বেশী ছিল এমন নয়, কাজেই এ ব্যবস্থাটা আমাদের মনঃপূতই হলো। আমরা রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের ভাবী সহযাত্রীরা একটি কাঠের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন; সেখানে দেখলাম জড়ো হয়ে আছে অনেকগুলো জিন, ঘোড়ার সাজ, বন্দুক, পিস্তল, দূরবীন, ছুরি ইত্যাদি, 'প্রেয়ারি' (বৃক্ষহীন তৃণভূমি) অঞ্চলে যা যা দরকার। 'র'-র একটু ঝোঁক ছিল জীবতত্ত্বের ওপর, তিনি দেখলাম টেবিলে বসে বসে একটি নকল কাঠঠোকরা পাখি তৈরি করছেন। ক্যাপ্টেনের ভাই—তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক—মেঝের ওপর ফেলে একটা টানা দড়ি পাকাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন বেশ আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গেই তাঁদের সাজ-সরঞ্জামের উপকরণগুলি দেখিয়ে বললেন, "আমরা হচ্ছি পুরোনো পর্যটক। আমাদের চাইতে ভালো বন্দোবস্ত করে কোনো যাত্রীদল প্রেয়ারি অঞ্চলে যাত্রা করেনি, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।" তাঁরা তাঁদের দলে যোগ দেবার জন্য যে শিকারীটিকে নিযুক্ত করেছিলেন সে কানাডার বাসিন্দা, নাম সোরেল, এবং তাঁদের অশ্বতর-চালকটি ছিল সেণ্ট লুইসের বাসিন্দা এক গুণ্ডা-ধরনের আমেরিকান। এরা দুজন বাড়িতে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিল। কাছেই একটা কাঠের তৈরী আস্তাবলে ছিল এ-দলের ঘোড়া আর অশ্বতরগুলো; ক্যাপ্টেন নির্ভুলভাবে বাছাই করে জানোয়ারগুলোকে কিনেছিলেন।

তাঁরা এদিকে তাঁদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে থাকুন, আমরা আমাদের ব্যবস্থা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করতে লেগে গেলাম। যাদের সম্পর্কে আমাদের এই বন্ধুরা অমন বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলেন, সেই দেশান্তরযাত্রী দল আট দশ মাইল দূরে প্রেয়ারির (তৃণভূমি) বুকে তাঁবু গেড়েছিল। সংখ্যায় তারা ছিল এক হাজার অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। আর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থেকে ক্রমাগতই নতুন নতুন দল আসছিল তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। তাদের মধ্যে তখন বিষম বিশৃঙ্খলা; বৈঠক বসছে, তাতে নানা প্রস্তাব পাস হচ্ছে, নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু প্রেয়ারি অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাত্রাকালে তাদের নেতা কারা হবে সে-বিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না। একদিন একটু অবসর পেয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-এ। শহরটা তখন লোকে ভর্তি; সাণ্টা ফে যাত্রী ব্যবসাদারদের ভ্রমণ-পথে যেসব জিনিস দরকার হবে, তার যোগান দেবার জন্যে তখন অনেকগুলো দোকান বসে গেছে; ডজনখানেক কামারশালায় ভারি ওয়াগনগুলো (মাল বয়ে নেবার গাড়িগুলো) সারানো হচ্ছে, ঘোড়া আর ষাঁড়ের খুরে নাল পরানো হচ্ছে, আর সারাক্ষণ কামারের হাতুড়ি আওয়াজ করেই চলেছে ঠক-ঠক-ঠক। রাস্তায় রাস্তায়

মানুষ, ঘোড়া আর অশ্বতরের ভিড়। আমি শহরে থাকতে থাকতেই দেশান্তরযাত্রী এক ঝাঁক ওয়াগন ইলিনয় থেকে এল, প্রেয়ারিতে গিয়ে সেখানে যারা তাঁবু গেড়ে বসে আছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বলে। ওয়াগনগুলো এসে থামল সবচেয়ে বড় রাস্তায়। ওয়াগনের ওপরকার ঢাকনা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল কতকগুলো স্বাস্থ্য-সুন্দর ছোট্ট ছেলে-মেয়ের মুখ। আর দেখলাম এখানে সেখানে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সুগঠিতদেহা তরুণী, রোদে পোড়া মুখের ওপর ধরে আছে পুরোনো ছাতা, যা এককালে হয়তো বেশ রংচঙে ছিল, কিন্তু বর্তমানে বিবর্ণ। বেশ ভারিক্কি বুদ্ধিমান চেহারার পল্লী-অঞ্চল-বাসী বয়স্ক পুরুষেরা ষাঁড়গুলোর কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম তিন বুড়ো তাদের যার যার লম্বা চাবুক হাতে নিয়ে গভীর উৎসাহের সঙ্গে পুনর্জন্ম-তত্ত্ব আলোচনা করছে। দেশান্তরযাত্রীরা অবশ্য সবাই এই ধরনের ছিল না ; অনেকে ছিল দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সমাজ-পরিত্যক্ত জীব। কত রকমের মতলব, কত রকম উদ্দেশ্য এই দেশান্তর-যাত্রার প্রেরণা যোগায়, এ নিয়ে আমি অনেক মাথা ঘামিয়েছি ; কিন্তু আরো সুখের জীবন লাভ করবার উন্মত্ত আশা, আইন এবং সমাজের বাঁধন এড়াবার দুরন্ত কামনা, অথবা নিছক ছটফটানি, চঞ্চলতা বা মানসিক অস্থিরতা, দেশান্তরী হবার লোভটা যে কারণেই হোক না কেন, যাত্রীরা তাদের মহাবাঞ্ছিত ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেই তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে সুখী হয়।

আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছিলাম সাত আট দিনের ভেতর। ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধুরাও তাঁদের প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছিলেন। ওসেস্টপোর্টের ওপর বীতরাগ হয়ে তাঁরা বললেন তাঁরা আমাদের আগেই রওয়ানা হবেন এবং আমরা গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত ক্যান্‌সাস নদীর চৌমাথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেই অনুসারে 'র' এবং অশ্বতর-চালকটি ওয়াগন আর তাঁবু নিয়ে এগিয়ে গেলেন ; তারপর ক্যাপ্টেন এবং তাঁর ভাই সোরেল আর বয়সভার্ড নামে যে ফাঁদ-পাততে-ওস্তাদ লোকটি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সেই লোকটির সঙ্গে একদল ঘোড়া নিয়ে রওনা হলেন। তাঁদের যাত্রার শুরুতেই একটু অশুভ ইঙ্গিত দেখা গেল। ক্যাপ্টেন তাঁর দলের আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, আরেকটি ঘোড়াকে দড়ি ধরে নিজের পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে, এমন সময়ে ঝড় বিদ্যুৎ সহ হঠাৎ বৃষ্টি এসে তাঁদের সবাইকে বিশ্রীরকম ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তাঁদের গন্তব্য স্থানটি মাইল সাতেক দূরে, সেখানে 'র' তাঁদের জন্য তাঁবুটি আগে থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে রেখে অপেক্ষা করবেন, এইরকম কথা ছিল। কিন্তু 'র' হুঁশিয়ার আর সাবধানী মানুষ, ঝড়

আসন্ন দেখে তিনি পূর্বনির্ধারিত স্থানের বদলে বনের ভেতর গাছের আড়ালে একটি নিরাপদ অংশে তাঁবু গেড়েছিলেন। ক্যাপ্টেন যখন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাইলের পর মাইল তাঁর খোঁজে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলেন, 'র' তখন তাঁর নিরাপদ তাঁবুর আশ্রয়ে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চলেছেন। তারপর একসময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। ফাঁদ-বিশারদ লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সে তাঁবুটি খুঁজে বার করে ফেলল। ততক্ষণে 'র'-র কফি পান করা শেষ হয়ে গেছে, তিনি বসে বসে পাইপে ধূমপান করছেন। ক্যাপ্টেন ছিলেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ; তিনি তাঁর এই দুর্ভোগটাকে বেশ সহজেই সয়ে নিলেন, তারপর কফি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে পান করে ভিজে পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুর্ভোগ আমাদেরও কিছু কম হয়নি। একজোড়া অশ্বতর চালিয়ে নিয়ে আমরা চলেছিলাম ক্যান্সাসের দিকে, এমন সময়ে ঝড় শুরু হল। এমন চোখধাঁধানো ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক আর কর্ণবিদারী মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদের অভিজ্ঞতা আমার আর কখনো হয়নি। গভীর গর্জনে মুষলধারায় তির্যক বৃষ্টিপাতের ফলে বনগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। প্রবল বৃষ্টির ছাট মাটি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল, আর জলের স্রোত এত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠছিল যে পায়ে হেঁটে পার হতে রীতিমতো অসুবিধা হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হল কর্নেল চিক-এর কাঠের তৈরী বাড়ি। কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁবুতে তাঁবুতে অনেক বৈঠক দেখে দেখে কর্নেল-পত্নীর মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গিয়ে থাকলেও আতিথেয়তায় তিনি কর্নেলের চাইতে কিছু কম গেলেন না, আমাদের সিক্ত মলিন অবস্থা দূর করবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। কর্নেলের বাড়িটি একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। সূর্যাস্তের কাছাকাছি যখন ঝড় থেমে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন গাড়িবারান্দার ছাদে বসে চোখের সামনে দেখতে পেলাম অতি মনোরম দৃশ্য: ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে খরস্রোতা দুরন্ত মিজুরি নদীর বুকে আর নদীতীরবর্তী বহুদূর বিস্তৃত বনানীর ওপর।

পরদিন ওয়েস্টপোর্টে ফিরে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এক বার্তা পেলাম। ক্যাপ্টেন নিজেই এ বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা ক্যান্সাসে রয়েছি জেনে বার্তাটি রেখে গিয়েছিলেন ফোগেল নামে তাঁর একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে। ফোগেল ছিলেন একটি ছোট মুদিখানা আর মদের দোকানের মালিক। বলে রাখা দরকার, হুইস্কি ওয়েস্টপোর্টে যেরকম অবারিত ভাবে বিক্রি হয় সেটা খুব নিরাপদ নয়, কারণ

এখানে প্রত্যেক পুরুষমানুষের পকেটে একটি করে টোটাভরা পিস্তল। আমরা ফোগেলের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম তাঁর চওড়া জার্মান মুখটি দরজার বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছে তাঁর কিছু বলবার কথা আছে জানিয়ে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন ভেতরে এসে একটু গলা ভেজাবার। যেমন তাঁর মদ, তেমনি খবরও তিনি শোনালেন—কোনোটাই উপাদেয় নয়। ক্যাপ্টেন আমাদের জানাতে এসেছিলেন (ফোগেলের মুখে শুনলাম) যে 'র', যিনি তাঁর দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সঙ্গে যে পথে যাবেন বলে কথা ঠিক হয়েছিল সে-পথে না গিয়ে তিনি অন্য পথে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছেন। অর্থাৎ ব্যবসাদাররা যে পথে যাবে, সে-পথে না গিয়ে তিনি লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যাবেন, গত গ্রীষ্মের অভিযানে সৈন্যেরা যে পথ চিহ্নিত করে গিয়েছিল সেই পথ ধরে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ওভাবে পরিকল্পনা বদ্‌লানো তাঁর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হলো ; কিন্তু আমাদের মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন রেখে আমারা ঠিক করলাম ওঁরা যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন. সেই লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গেই আমরা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হবো।

সেই অনুযায়ী আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হতেই এক সুন্দর প্রভাতে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমেই এক দুর্ভোগ। জানোয়ারগুলিকে সাজ পরিয়ে গাড়িতে জুতবার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়িটানা একটা অশ্বতর পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দড়ি আর চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে ফেলে গাড়িটাকে প্রায় মিজুরি নদীতে ফেলে দেবার উপক্রম করল। কিছুতেই বাগ মানানো যাবে না দেখে ওকে বাতিল করে আরেকটা অশ্বতর নেওয়া গেল ; এটি যোগালেন আমাদের বন্ধু মিঃ বূন, ওয়েস্টপোর্টের বাসিন্দা, পথিকৃৎ ড্যানিয়েল বূনের নাতি। প্রেয়ারির অভিজ্ঞতার এই প্রথম পূর্বাভাস। কিন্তু এই শেষ নয়, এর পরই আবার আরেকটা দুর্ভোগ ঘটল। ওয়েস্টপোর্ট ছাড়িয়ে বেশী দূর যাইনি, এমন সময়ে আমরা একটা কাদায় ভরা খানায় এসে পড়লাম—যে ধরনের খানার সঙ্গে পরে বহু পরিচয় ঘটেছিল। এই কাদায় এক ঘণ্টা কিংবা আরো কিছু বেশীক্ষণ ধরে আমাদের গাড়ির চাকা আটকে রইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাত্রা শুরু

ওয়েস্টপোর্টের কাদার খাদ ছাড়িয়ে উঠে আমরা কিছুক্ষণ ধরে এগিয়ে চললাম সরু বনপথ দিয়ে, যার ওপর এলোমেলো ভাবে রোদ নেমে আসছিল ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে। অবশেষে আমরা এসে পড়লাম পূর্ণ আলোয়; পিছনে পড়ে রইল সেই বিরাট অরণ্যের শেষ প্রান্ত, যে অরণ্য একদা পশ্চিমের সমতল অঞ্চল থেকে অতলান্তিকের বেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারপর একটি ঝোপের সারি অতিক্রম করবার সময়ে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সামনে বিরাট বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিভূমি যেন সবুজ মহাসমুদ্রের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে এগিয়ে গিয়ে সুদূর দিগন্তরেখায় মিশেছে।

সেদিনটা ছিল বসন্তের একটি শান্ত দিন, অমন দিনে মানুষের স্বভাবের সবচেয়ে কোমল দিকটাই প্রবল হয়ে ওঠে, কাজ করার চাইতে বরং বেশী ইচ্ছে করে জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখতে। ঝোপের সারির ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে দল ছেড়ে এগিয়ে গেলাম, তারপর সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি নিরালা জায়গা দেখে আমার এমন লোভ হলো যে আমি ঘোড়া থেকে নেমে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। সবগুলো গাছে আর ছোট ছোট চারাগাছগুলোতে তখন ফুটে রয়েছে ফুল অথবা কচি নতুন পাতা, এখানে ওখানে গোছায় গোছায় প্রচুর লাল ম্যাপ্‌ল্‌ ফুল আর ইণ্ডিয়ান আপেলের চমৎকার কুঁড়ি। এমন চমৎকার বাগানের দেশ পিছনে ফেলে প্রেয়ারিভূমি আর পাহাড়ের রূঢ় এবং কঠোর এলাকায় যাবার কথা ভেবে মনটা একটু যেন খারাপই হয়ে উঠল।

এরই মধ্যে দেখলাম আমাদের দলের লোকেরা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন; সবার আগে আসছেন আমাদের গাইড ও শিকারী হেনরি শ্যাটিলন, একটা বেশ শক্তসমর্থ ওয়াণ্ডট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে। চমৎকার ব্যায়ামবীরের মতো দেহসৌষ্ঠব ভদ্রলোকের। তাঁর পরনে ছিল একটি সাদা কাপড়ের কোট, একটি চওড়া পশমী কাপড়ের টুপি, হরিণের চামড়ার জুতো (মোকাসিন), আর জোড়ের ওপর সারি সারি ঝালর দিয়ে কারুকার্য-করা হরিণের চামড়ার তৈরী পাৎলুন। তাঁর ছুরিটি আট্‌কানো ছিল তাঁর কোমরবন্ধে; পাশে ঝুলছিল গুলী আর বারুদের থলে,

আর তাঁর বন্দুকটা ছিল তাঁর বসবার গদিটার উঁচু সম্মুখভাগের গায়ে লাগানো। এই গদিটাও তাঁর অন্যান্য সরঞ্জামের মতোই বহু ব্যবহারে অনেকটা জীর্ণ। তাঁর খুব কাছাকাছি পিছনে পিছনে ছোট্ট একটি বাদামি রঙের ঘোড়ায় চড়ে আসছিল শ, সেটির চাইতে বড় একটি ঘোড়াকে দড়ি ধরে টেনেও নিয়ে আসছিল পিছনে পিছনে। আমার মতোই ছিল তারও সাজসরঞ্জাম, আর শোভার চাইতে কার্যকারিতার দিকেই বেশী লক্ষ্য রেখে সেগুলোর ব্যবস্থা হয়েছিল। জিনিসগুলো ছিল একটি সাদাসিধে ধরনের কালো স্প্যানিশ জিন, তার সঙ্গে আটকানো কয়েকটা ভারি পিস্তলের খাপ, পিছনদিকে গুটিয়ে রাখা একটি কম্বল, আর ঘোড়ার সঙ্গে লাগানো টানবার দড়িটা, যেটা কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় সামনে ঝুলছিল। তার বন্দুকটা ছিল সাধারণ দোনলা, আর আমারটা ছিল পাউণ্ড পনেরো ওজনের রাইফ্‌ল্‌। সেসময়ে আমাদের বেশভূষা খুব সুশোভন না হলেও তাতে সভ্যতার কিছুটা ছাপ ছিল, ফিরে আসবার পথে আমাদের যে অবর্ণনীয় বিশ্রী হাল হয়েছিল তার চাইতে অনেক ভালো। আমাদের গায়ের জামা ছিল লাল ফ্লানেলের শার্ট, কোমরের চারদিকে ফ্রকের মতো কোমরবন্ধ লাগানো; পুরোনো নষ্টপ্রায় বুটের বদলে পায়ে পরেছিলাম হরিণের চামড়ার জুতো (মোকাসিন); এ ছাড়া আমাদের পোশাকের অপরিহার্য বাকি অংশটুকু ছিল হরিণের নরম চামড়া দিয়ে একজন রেড ইণ্ডিয়ানের হাতে তৈরী এক অদ্ভুত জিনিস। আমাদের অশ্বতর-চালক, ডেস্‌লরিয়ার্স, এলো সবার পিছনে, তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে—তার পা-দুটো গুল্‌ফ পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। সে ঘন ঘন পাইপের ধূম পান করছিল, আর যখনই কোনো অশ্বতর সামনে একটু বড় গর্ত দেখে ভয় খাচ্ছিল তখনই প্রেয়ারি অঞ্চলের অমার্জিত ভাষায় চেঁচিয়ে উঠছিল। গাড়িটা যে ধরনের ছিল, অমন গাড়ি কুয়েবেক-এর বাজারের আশেপাশে গণ্ডায় গণ্ডায় দেখতে পাওয়া যায়। ভেতরের জিনিসগুলোকে নিরাপদ আড়ালে রাখবার জন্য তাদের ওপরে ছিল একটা সাদা আচ্ছাদন। ভেতরের জিনিসগুলো মানে আমাদের খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু, গোলা বারুদ, কম্বল এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য কিছু কিছু উপহারের জিনিস।

আমরা সবশুদ্ধ ছিলাম চারজন পুরুষ আর আটটি জানোয়ার; কারণ শ আর আমি যে বাড়তি ঘোড়াগুলো সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছিলাম, তা ছাড়া একটি অতিরিক্ত অশ্বতরও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল দৈবাৎ প্রয়োজন হতে পারে বলে।

আমাদের দলের বিবরণ মোটামুটিভাবে দেওয়া গেল। এবারে আমাদের এই দুজন সঙ্গীর চরিত্রের কিছু বিবরণ দিলে মন্দ হবে না।

ভেস্‌লরিয়ার্স ছিল কানাডার লোক, সাধু জনের সবগুলো বিশিষ্ট গুণ ছিল তার চরিত্রে। অবসাদ, রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, কঠোর পরিশ্রম, কিছুতেই তার মনের স্ফূর্তি বা হাসিখুশি ভাব অথবা মনিবদের প্রতি নম্র ব্যবহারের হানি ঘটত না ; আর রাত হলে আগুনের ধারে বসে পাইপ টানতে টানতে সে মহা আনন্দে গল্প শোনাত। প্রেয়ারিতেই সে সবচেয়ে ভালো থাকত। হেনরি শ্যাটিলন ছিল অন্য ধরনের মানুষ। আমরা যখন সেণ্ট লুইসে ছিলাম, তখন লোমযুক্ত পশুচর্মের ব্যবসায়ী একটি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন ভদ্রলোক খুব ভদ্রতা করে বলেছিলেন আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী একজন শিকারী আর গাইড যোগাড় করে দেবেন। তারপর একদিন বিকেলে অফিসে গিয়ে একটি লম্বা এবং সুবেশ লোক দেখলাম ; তার মুখের সহজ সরল ভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই লোকটিই আমাদের গাইড হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে নিয়ে যাবে শুনে হঠাৎ বিস্ময় বোধ করলাম। সেণ্ট লুইসের কাছাকাছি একটি ছোট ফরাসী শহরে তার জন্ম ; পনেরো বছর বয়স থেকে সে সব সময়ে থেকেছে রকি পর্বত অঞ্চলের কাছাকাছি, বেশির ভাগ কাজ করেছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য, তাদের কেল্লাগুলোতে মহিষের মাংস সরবরাহ করতে। শিকারী হিসেবে এই সারা এলাকার ভেতর তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সাইমনো, অথচ সাইমনোর সঙ্গে ছিল তার গলায় গলায় ভাব ; এজন্য দুজনেই প্রশংসা পাবার যোগ্য। শ্যাটিলন চার বছর পাহাড়ী অঞ্চলে থেকে এসে আগের দিন এসে সেণ্ট লুইসে পৌঁছেছিল। এখন সে শুধু বলল আরেকটি অভিযানে রওনা হবার আগে সে একটা দিন তার মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে আসতে চায়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, উচ্চতা ছয় ফুট, আর শরীরের বাঁধুনি বেশ সুন্দর আর মজবুত। তাকে যা কিছু শিখিয়েছে প্রেয়ারি অঞ্চল, তাই সে পড়তেও শেখেনি লিখতেও শেখেনি, কিন্তু তার এমন একটা স্বাভাবিক সৌকুমার্য ছিল যা মেয়েদেব ভেতরও কদাচিৎ দেখা যায়। তার মুখখানা ছিল ন্যায়পরায়ণতা, সারল্য আর সহৃদয়তার প্রতিচ্ছবি ; তা ছাডা মানুষের চরিত্র বুঝবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ, আর যে-কোনো সমাজে বিশ্রী ভুল না করে যথাস্থানে যথাকালে যথাযোগ্য ব্যবহার করে ঠিকমতো মানিয়ে চলার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধিও তার ছিল। ইঙ্গ-আমেরিকানদের মতো অস্থির উৎসাহ তার ছিল না, ছটফটে ছিল না সে। যখন যেমন অবস্থা তাই মেনে নিয়ে সে খুশী থাকত ; তার প্রধান দোষ ছিল অত্যধিক সহজ উদারতা, যা পৃথিবীতে উন্নতি বা সমৃদ্ধিলাভের পক্ষে খুব সহায়ক নয়। এ মন্তব্যটা তবু সবাই করতেন যে তার নিজের জিনিস সম্বন্ধে সে যাই করুক না কেন, পরের সম্পত্তি তার হাতে সর্বদাই নিরাপদ। পাহাড় অঞ্চলে তার শিকার-দক্ষতার মতো

তার সাহসেরও খ্যাতি ছিল ; কিন্তু তার চরিত্রের একটা মস্ত বিশেষত্ব ছিল এই যে, যে দেশে ঝগড়া-মীমাংসার প্রধান বিচারক হচ্ছে বন্দুক, সে দেশে সে ঝগড়ায় কদাচিৎ জড়িত হত। দু-একবার অবশ্য তার শান্ত ভদ্র স্বভাবকে কেউ কেউ দুর্বলতা বলে ভুল করে তার সুযোগ নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ভুলের ফল যা হয়েছিল তারপর অমন ভুল আর কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। সবার মুখে মুখে শোনা যেত সে ত্রিশটারও বেশী বিশালকায় ধূসর লোমওয়ালা ভালুক বধ করেছে ; এ থেকেই তার অটল সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। শহরে বা অরণ্য এলাকায় কোথাও আমি আমার এই অকৃত্রিম সুহৃদ হেনরি শ্যাটিলনের চাইতে মানুষ হিসেবে বেশী ভালো আর কাউকে দেখিনি। শিক্ষাদীক্ষার সহায়তা ছাড়াই নিছক প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের গুণে মানুষ কত ভালো হতে পারে, আমার এই বন্ধুটি তার চমৎকার উদাহরণ।

শীগ্‌গীরই আমরা জঙ্গল আর ঝোপ পেরিয়ে পুরোপুরিভাবে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি অঞ্চলে এসে পড়লাম। মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল একজন শাওয়ানো ইণ্ডিয়ান আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তার ছোট অমসৃণ লোমওয়ালা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে ; ঘোড়াটা ছুটছে লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে দিয়ে, আর লোকটার ক্যালিকো কাপড়ের শার্ট, জমকালো উত্তরীয়, আর তার সর্পিল চুলের চারদিকে জড়িয়ে বাঁধা রঙীন রুমালটা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। দুপুরবেলা বিশ্রামের জন্য আমরা একটা ছোট খাঁড়ির খুব কাছে এসে থামলাম, এখানে ব্যাং আর কচ্ছপের বাচ্চার ছড়াছড়ি। ঐ জায়গাতেই আগে ইণ্ডিয়ানদের একটা আস্তানা ছিল ; কতকগুলো বাসার কাঠামো তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাদেরই ওপর কম্বল বিছিয়ে রোদ থেকে আশ্রয় পাওয়া গেল। ঐ আশ্রয়ের আড়ালে আমরা আমাদের জিনের ওপর বসে রইলাম, আর শ সেই প্রথম তার পরম প্রিয় ইণ্ডিয়ান পাইপটা ধরাল ধূমপানের জন্য। ডেস্‌লরিয়ার্স তখন একরাশ জ্বলন্ত কয়লার মুখোমুখি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে এক হাতে চোখ আড়াল করে অন্য হাতে একটি ছোট্ট লাঠি দিয়ে কয়লার ওপর চাপানো কড়ায় কী যেন ভাজছে, আর ভাজার হিস্‌হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘোড়াগুলোকে কর্দমাক্ত মাঠের এখানে সেখানে ঝোপে-ঝাড়ে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। হাওয়ায় তখন বসন্তসুলভ তন্দ্রা-লাগানো উষ্ণতা ; খাঁড়ি আর মাঠ থেকে ভেসে আসছে সদ্য-জাগা দশ হাজার ব্যাং আর কীটপতঙ্গের সমবেত আওয়াজ।

আমরা বসতে-না-বসতেই একজন আগন্তুক এসে হাজির—একজন বৃদ্ধ ক্যান্‌সাস-অধিবাসী ইণ্ডিয়ান, পোশাক দেখে মনে হলো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার ন্যাড়া মাথা লাল রঙে রাঙানো, আর টিকি থেকে ঝুলছে কয়েকটা ঈগলের পালক আর দু-তিনটি

সাপের লেজ। তার গালেও লাল রঙের ছোপ, কানে সবুজ কাচের দুল, গলায় ভালুকের নখের মালা, আর বুকে ঝুলানো ওয়াম্পাম গোটার তৈরি কয়েকটা বড় বড় নেকলেস। আমাদের করমর্দন করে অস্ফুট স্বরে অভিবাদন জানিয়ে সেই বৃদ্ধ লোকটি কাঁধ থেকে তার লাল কম্বলটি নামিয়ে ফেলে পা-দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে মাটির ওপর বসে পড়ল। আমরা তাকে এক পেয়ালা শরবত এগিয়ে দিলাম, সে খুশী হয়ে বলে উঠল, "বেশ।" তারপরই সে বলতে শুরু করল সে একটা সাধারণ লোক নয়, আর কতগুলো পনী গোষ্ঠীর মানুষ সে মেরেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল এক পাঁচমিশেলী জনতা খাঁড়ি পার হচ্ছে আমাদের দিকে আসবার জন্য। তাদের ভেতর ছিল নরনারী আর শিশু। তারা কতক আসছিল ঘোড়ায় চড়ে, কতক পায়ে হেঁটে, কিন্তু সবাই মলিন শ্রীহীন, দুর্দশাপন্ন। জীর্ণশীর্ণ ছোট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে বৃদ্ধা ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরা; তাদের কারও কারও পিছনে বসে দু-একটা সাপের মতো চোখওয়ালা ছেলেমেয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন কম্বল আঁকড়ে ধরে রয়েছে; লম্বা লিকলিকে যুবকেরা তীর ধনুক হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে। ওদের মিছিলে যে মেয়েরা ছিল, তাদের স্বাভাবিক কুৎসিত চেহারা লাল কাপড় আর কাচের দানার বাহারেও ঢাকা পড়েনি, যদিও মাঝে মাঝে দু-একজন এমন পুরুষও চোখে পড়েছিল, যাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এরা কিছুটা সম্ভ্রান্ত। এরা ছিল ক্যান্সাস জাতির নিকৃষ্ট অংশ। এ জাতের ভালো লোকগুলি যখন গিয়েছিল মহিষ-শিকারে, এরা তখন তাদের গ্রাম ছেড়ে ভিক্ষা করতে রওনা হয়েছিল ওয়েস্টপোর্টের দিকে।

এই জীর্ণবসন-পরা ছন্নছাড়া দলটা চলে গেলে পর আমরা আমাদের ঘোড়াগুলোকে ধরে এনে তাদের পিঠে জিন আর মুখে লাগাম লাগিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। খাঁড়িটা পার হতেই দেখলাম বাঁ ধারে কতকগুলো ঝোপ জঙ্গল আর শ্রীহীন বাড়ির নিচু ছাদ। আমাদের সামনে একটা লম্বা গলি, তার দু'ধারে এলোমেলো ভাবে ফুটে রয়েছে অগুন্তি বুনো গোলাপ আর প্রথম বসন্তের নানারকম ফুল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই গলি বরাবর এগিয়ে গিয়ে আমরা সামনে দেখলাম কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী গীর্জা আর কতকগুলো স্কুলবাড়ি। এগুলো সবই মেথডিস্ট শাওয়ানো মিশনের। ইণ্ডিয়ানরা তাদের একটি ধর্মসংক্রান্ত সভায় মিলিত হবার উদ্যোগ করছিল। তাদের কয়েক কুড়ি লম্বা আর আধা-সভ্য বেশ পরা লোক গাছের তলায় তলায় কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে ছিল, তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল ছাউনি আর বেড়াগুলোর সঙ্গে। তাদের সর্দার, পার্কস্, বিরাট পালোয়ান চেহারার লোকটি, তখন সবেমাত্র পৌঁছেছে ওয়েস্টপোর্ট থেকে, যেখানে তার মস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া তার একটি

বড় খামার আর বেশ অনেকগুলো ক্রীতদাস আছে। বাস্তবিকই, মিজুরি সীমান্তে অন্য যে-কোনো গোষ্ঠীর চাইতে শাওয়ানোরা কৃষিকার্যে অনেক বেশী উন্নতি করেছে ; যেমন চেহারায় তেমনি চরিত্রে এরা আমাদের সদ্যপরিচিত ক্যান্‌সাস ইণ্ডিয়ানদের চাইতে অনেক আলাদা।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে কয়েক ঘণ্টা এগোবার পর আমরা এসে পৌঁছলাম ক্যান্‌সাস নদীর তীরে। নদীর তীর ঘেঁষে যে জঙ্গলের সারি ছিল সেগুলো অতিক্রম করে গভীর বালুর ওপর দিয়ে অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে এগিয়ে আমরা তাঁবু ফেললাম নদী-কিনারার অনতিদূরে ডেলাওয়্যার নদীর সংযোগ-স্থলের কাছে। আমাদের প্রথম তাঁবু খাড়া হলো বনের ধারে একটি মাঠের ওপর ; তাঁবু খাটানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা ভাবতে লাগলাম রাতের খাওয়ার কথা। জলের কাছাকাছি একটি তক্তার তৈরী ছোট বাড়ির ঢাকা বারান্দায় বসে ছিল ডেলাওয়্যার অঞ্চলেরই বাসিন্দা একটি স্ত্রীলোক, তার ওজন তিনশো পাউণ্ডের মতো। তারই খবরদারিতে একটি ভারি সুন্দর দো-আঁশলা মেয়ে দরজার আশেপাশে মস্ত এক ঝাঁক টার্কি পাখিকে খাওয়াচ্ছিল। স্ত্রীলোকটিকে টাকা দিতে চাইলাম, এমনকি তামাক পর্যন্ত দিতে চাইলাম, কিন্তু তার ঐ প্রিয় পাখিগুলোর একটিকেও সে ছাড়তে রাজি হলো না। কাজেই আমি অগত্যা বন্দুক নিয়ে রওনা হলাম—জঙ্গলের ভেতর বা নদীর ধারে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে। মাঠের এখানে সেখানে অনেক কোয়েইল পাখি করুণ সুরে শিস দিচ্ছিল, কিন্তু আমার বন্দুকের শিকার হবার যোগ্য দেখলাম শুধু তিনটি বাজার্ড পাখি। পাখিগুলো বসে ছিল একটা পুরনো, প্রাণহীন সিক্যামর গাছের ভূতুড়ে শুকনো ডালের ওপর, যে ডালগুলো সূর্যালোকিত সবুজ পত্রালির ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল। পাখিগুলো তাদের কুৎসিত মুখ বুকে গুঁজে যেন পশ্চিম দিক থেকে আসা মৃদু রোদ উপভোগ করছিল। তাদের চেহারা দেখে রসনা লোভাতুর হলো না, তাই তাদের সেই আনন্দ-উপভোগে বাধা না দিয়ে সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম মুগ্ধচোখে,—দু'ধারের বনরাজির ছায়া বুকে নিয়ে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছিল সেই স্রোতস্বিনী, তার দ্রুত গতিতে ছিল চাঞ্চল্য আর প্রশান্তির অপরূপ সমন্বয়।

তাঁবুতে ফিরে গিয়ে দেখলাম শ আর এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান মাটির ওপর বসে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন ; একই পাইপ থেকে পর পর পালা করে দুজনে ধূমপান করছে কথার ফাঁকে ফাঁকে। বুড়ো বলছিল সাদা লোকদের সে ভালবাসে, আর তামাক জিনিসটার প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত। ডেস্‌লরিয়ার্স তখন আমাদের জন্যে মাটির

ওপর টিনের পেয়ালা আর থালা সাজাচ্ছিল ; অন্য কোনোরকম খাবার না থাকায় সে আমাদের সামনে এগিয়ে দিল বিস্কুট, শুয়োরের শুক্‌নো মাংস আর একটি বড় পাত্রে ভরা কফি। ছুরি বার করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের কাজ শুরু করে দিলাম ; খাবারের বেশির ভাগটাই সাবাড় করে বাকি যা ছিল তা ছুঁড়ে দিলাম ঐ বুড়ো ইণ্ডিয়ানের দিকে। আমাদের ঘোড়াগুলো তখন সামনের দু'পা একসঙ্গে বাঁধা অবস্থায় গাছের ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে যেমন বিরক্ত তেমনি বিস্মিত, কারণ এহেন দুরবস্থা তাদের আর কখনো সইতে হয়নি। ভবিষ্যতে তাদের আরো কী সইতে হবে, তার এই আগাম আভাসটা তাদের খুব ভালো লাগছে বলে মনে হলো না। বিশেষ করে আমার ঘোড়াটির প্রেয়ারি-জীবনের ওপর একটা গভীর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। এই ঘোড়াদের ভেতর একটি—তার নাম হেন্‌ড্রিক, আর চাবুক ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই তার শক্তি আর দুষ্টামিকে সামলে রাখা যেতো না—আমাদের দিকে এমন রাগের ভাব নিয়ে তাকাতে লাগল, যেন একটা লাথি মেরে সে প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছে। আরেকটির নাম পন্টিয়াক ; উঁচুবংশে জন্ম হলেও সে বেশ ভদ্র ঘোড়া। এই ঘোড়াটি দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে, তার ঘাড়ের চুলগুলো ঝুলছিল তার দুটি চোখের ওপর। সে যেন এক জবুথবু অগোছাল ছোকরা, তাকে জোর করে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমনি ক্ষুণ্ণ আর বিরক্ত ভাব তার। ওর ভবিষ্যতের আশঙ্কাটা ঠিক-ঠিক ফলে গিয়েছিল, কারণ আমি যখন সর্বশেষ ওর খবর পেলাম, ও তখন এক ওগিল্লাল্লা সৈনিকের চাবুক খেতে খেতে চলেছে ক্রো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই অভিযানে।

ক্রমে ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। কোয়েইল পাখিদের শিসের পর হুইপ-পুওর-উইল পাখিদের ডাক শোনা যেতে লাগল। আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে তাঁবুতে নিয়ে গেলাম সেগুলোকে বালিসের মতো ব্যবহার করব বলে, মাটির ওপর কম্বলগুলো বিছিয়ে দিলাম, এবং সেই ঋতুতে সর্বপ্রথম মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রি যাপনের জন্য তৈরি হলাম। আমরা প্রত্যেকে বেছে নিলাম ভ্রমণকালে তাঁবুর কোন্ জায়গাটা কে নেবো। ডেস্‌লরিয়ার্স-এর জন্য কিন্তু ঠিক করা হলো গাড়িটা, বৃষ্টি শুরু হলে যার ভেতর ঢুকে সে তাঁবুর চাইতে অনেক ভালো আশ্রয় পাবে।

এখানে ক্যান্‌সাস নদী শাওয়ানোদের দেশ আর ডেলাওয়্যারদের দেশের সীমান্ত-রেখার কাজ করছে। পরদিন আমরা এই নদী পার হলাম। ভেলায় করে ঘোড়া আর জিনিসপত্রগুলো পার করা বেশ কঠিনই হয়েছিল। ওপারে পৌঁছে চড়াই বেয়ে উঠবার জন্য আমাদের গাড়িটা খালি করে হাল্‌কা করে ফেলতে হয়েছিল। তখন

রবিবারের ভোরবেলা—উষ্ণ, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ; ডেলাওয়্যারদের অবহেলিত মাঠগুলোতে আর উঁচুনিচু ঘেরা জায়গাগুলোতে বিরাজ করছে নীরবতা, শুধু আছে বহু কীটপতঙ্গের অবিরাম সমবেত সঙ্গীত। কখনো কখনো দেখা গেল একজন ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে চড়ে সভাগৃহে চলেছে, কখনো বা কোনো জীর্ণ কাঠের বাড়ির প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে দেখা গেল কোনো বৃদ্ধা রমণী আলস্যের আরাম উপভোগ করছে। সে গাঁয়ে ঘণ্টা ছিল না, কারণ ডেলাওয়্যারদের কোনো ঘণ্টা নেই। তবু ভারমণ্টের জঙ্গলে অথবা নিউ হ্যাম্প্‌শায়ারের পাহাড়ী অঞ্চলে নিউ ইংলণ্ডের কতকগুলো গাঁয়ের মতো এই পাণ্ডববর্জিত ছন্নছাড়া উপনিবেশটিতেও ছুটির দিনের বিশ্রাম এবং প্রশান্তির আবহাওয়া বজায় ছিল।

এখান থেকে শুরু হয়ে একটি সামরিক পথ চলে গেছে লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ কেল্লা পর্যন্ত। অনেক মাইল জুড়ে ডেলাওয়্যারদের খামার আর কুটিরগুলো দু'ধারে অল্প দূরে দূরে ছড়ানো। জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষে তক্তার তৈরী ছোট ছোট ঘরবাড়িগুলো দেখতে যেন ছবির মতো ; তাদের যেন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই অঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য বাইরের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, প্রকৃতিদেবী নিজেই তার জন্য যথেষ্ট করেছিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত সবুজ প্রাচুর্যে ভরা প্রেয়ারিভূমি, তারপর ঝাঁক-বাঁধা বা ছোট্ট নদীর ধারে ধারে সারি সারি ঝোপ পালা করে এসে যে স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল, বহু শতাব্দী ধরে মানুষের হাতে গড়া কোনো অঞ্চল তার চাইতে সুন্দর নয়। তা ছাড়া ঋতুর প্রথমদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে সজীবতাও ছিল বেশী। ম্যাপ্‌ল্‌ ফুলের কুঁড়িতে কুঁড়িতে বনানী হয়ে উঠেছিল রাঙা ; পূর্বাঞ্চলে দেখা যায় না, এমন অনেক গুল্মও ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল ; ঢেউ-খেলানো প্রেয়ারির সবুজ বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটেছিল আকাশের বুকে তারার মতো।

পাহাড়ের ধারে এক ঝর্নার কাছে তাঁবু ফেলে আমরা পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করলাম। বিকেলের দিকে রোদ পড়ে আসবার আগেই আমরা লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ কেল্লার অল্প কয়েক মাইলের ভেতর পৌঁছে গেলাম। পথে আমাদের পার হতে হয়েছিল একটা অগভীর স্রোতস্বিনী, যার দুই তীরে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের সারি—জলস্রোত বয়ে চলেছে একটি গভীর খাদের বেশ তলা দিয়ে। আমরা সেই মৃদু স্রোতে নেমে যাবার উপক্রম করছিলাম, এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম একদল লোক আমাদের নিচেকার ঐ জলস্রোত পেরিয়ে এলোমেলো, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হৈ হৈ করতে করতে সোজা ওপরে উঠে আসছে আমাদেরই দিকে। আমরা থেমে পড়ে তাদের

যেতে দিলাম। তারা সবাই ডেলাওয়্যার গোষ্ঠীর, শিকার করে সন্থ ফিরে আসছিল। তারা পুরুষ আর স্ত্রীলোক সবাই ছিল ঘোড়সওয়ার, সঙ্গে টেনে নিয়ে আসছিল অনেকগুলো মালবাহী অশ্বতর। অশ্বতরগুলোর পিঠে চাপানো ফার (বিভিন্ন জানোয়ারের লোমযুক্ত চামড়া), মোষের চামড়ার পোশাক, কেৎলি এবং ভ্রমণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য নানা সরঞ্জাম, যেগুলোর চেহারা তাদের কাপড়-চোপড় এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলোর মতোই শোচনীয়, দেখে মনে হয়েছিল সম্প্রতি সেগুলো খুব বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের দলের সবার পিছনে ছিল এক বুড়ো, সে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ঘোড়া থামাল। সে চড়ে ছিল একটা কোঁকড়ানো লোমওয়ালা টাট্টু ঘোড়ায়। ঘোড়াটার ঘাড়ের লোমে আর লেজে অনেক গাঁট পড়েছে, মুখে একটা মরচে-ধরা ফলা, তার সঙ্গে লাগানো কাঁচা চামড়ার ফিতে লাগামের কাজ করছে। তার জিনটা সম্ভবত কোনো মেক্সিকানের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া; সেটার ওপর কোনোরকম আচ্ছাদন ছিল না—শুধু স্প্যানিশ কায়দার কাঠামোর ওপর লোমশ ভালুকের চামড়া চাপানো, তাই থেকে দু'ধারে ঝুলানো একজোড়া কাঠের তৈরী পা-দান, আর ঘোড়াটার পেটের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে আনা একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে জিনটা পিঠের সঙ্গে আটকানো। গায়ের চামড়ার গাঢ় রং আর সাপের মতন তীক্ষ্ণ চোখ দেখে নিঃসংশয়ে বোঝা গেল লোকটি ইণ্ডিয়ান। তার পরনে হরিণের চামড়ার তৈরী ফ্রক; সেটি চর্বি লেগে আর অনেকদিনের ব্যবহারে মোলায়েম আর কালো হয়ে গেছে। তার মাথায় একটা পুরোনো রুমাল জড়ানো। তার জিনের সামনেই বিশ্রাম করছে একটি রাইফ্‌ল্‌। ডেলাওয়্যাররা রাইফ্‌ল্‌ চালাতে পাকা ওস্তাদ, কিন্তু ওজন বেশী বলে দূরের প্রেয়ারি অঞ্চলের অলস ইণ্ডিয়ানরা রাইফ্‌ল্‌-এর বোঝা বইতে চায় না।

লোকটি প্রশ্ন করল, "তোমাদের দলের সর্দার কে?"

হেনরি শ্যাটিলন আমাদের দিকে দেখিয়ে দিল। সেই ডেলাওয়্যার বুড়ো এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলবে না। বড্ড ছেলেমানুষ।" বলে ঘোড়া চালিয়ে সে তার দলের লোকদের ধরতে চলে গেল।

এই ডেলাওয়্যার গোষ্ঠীর লোকেরা একদা ছিল উইলিয়াম পেন-এর শান্তিপ্রিয় ব... বিজয়ী ইরোকোইদের এরা করও দিত; কিন্তু এরাই এখন প্রেয়ারি অঞ্চলে সব-চেয়ে দুঃসাহসী এবং ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। এরা এখন এমন অনেক দূরের গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করে, যাদের নামও পেনসিলভ্যানিয়ার প্রাচীন বাসভূমিতে এদের পূর্বপুরুষদের জানা ছিল না। খাঁটি ইণ্ডিয়ান-সুলভ তিক্ত বিদ্বেষ নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে এরা সৈন্য

পাঠায় রকি পাহাড় অঞ্চলে আর মেক্‌সিকো এলাকায়। তাদের প্রতিবেশী এবং ভূতপূর্ব মিত্র শাওয়ানোরা কৃষিকাজে মোটামুটি-রকম ভালো, এবং অবস্থাপন্ন; কিন্তু এই ডেলাওয়্যাররা বছর বছর সংখ্যায় কমে যাচ্ছে, কারণ প্রতিবছর তাদের বহু লোক লড়াইতে মরছে।

এদের ছেড়ে এগিয়ে যাবার অল্প পরেই আমরা আমাদের ডান দিকে দেখতে পেলাম বিস্তীর্ণ বনরাজি, যেটি মিজুরি নদীর গতিপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। সামনে কিছু দূরে লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ কেল্লার সাদা ব্যারাকগুলো গাছের সারির মধ্য দিয়ে একটু একটু দেখা যেতে লাগল নদীর বাঁকে একটা উঁচু জায়গার ওপর। মিজুরি নদী আর আমাদের মাঝখানে ছিল হ্রদের মতো সমতল একটি প্রশস্ত সবুজ মাঠ। এই মাঠেরই ওপর একটি ছোট্ট নদীর তীরবর্তী একসারি গাছের কাছাকাছি ছিল ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সঙ্গীদের তাঁবু; সেই তাঁবুর চারধারে তাঁদের ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছিল। তাঁরা নিজেরা কিন্তু ছিলেন অদৃশ্য। তাঁদের অশ্বতর-চালক রাইট মাল-টানা গাড়ির ডাণ্ডার ওপর বসে অশ্বতরের সাজ মেরামত করছিল। তাঁবুর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বয়েস্‌ভার্ড তার রাইফ্‌ল্‌ সাফ করছিল, আর সোরেল অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আরেকটু ভালো করে নজর দিতেই লক্ষ্য করলাম ক্যাপ্টেনের ভাই জ্যাক তাঁবুতে বসে তাঁর প্রিয় সেই পুরোনো কাজে অর্থাৎ দড়ি পাকাতে ব্যস্ত। তিনি তাঁর আইরিশ ভঙ্গিতে টেনে টেনে উচ্চারণ করে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন তাঁর ভাই নদীতে মাছ ধরছেন, আর 'র' গেছেন সৈনিক-মহলে। তাঁরা ফিরে এলেন সূর্যাস্তের আগেই। আমরা অল্প দূরেই তাঁবু ফেললাম, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে বৈঠকে সিদ্ধান্ত করলাম লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গে একদিন থেকে পরদিনই সীমান্ত থেকে শেষ বিদায় নেবো, অথবা এ অঞ্চলের চল্‌তি ভাষায় 'লাফিয়ে পড়ব'। প্রেয়ারিভূমির একটি দূরের অংশে গত গ্রীষ্মের শুক্‌নো ঘাসে আগুন জ্বেলেছিল কারা যেন; ঐ দূরের আগুন থেকে যেটুকু আলো আসছিল, আমাদের সভার কাজ তাতেই চলে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গ

পরদিন আমরা গিয়ে পৌছলাম লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গে। কর্নেল (বর্তমানে জেনারেল) কিয়ার্নি—যাঁর সঙ্গে সেণ্ট লুইসে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল—তখন সবেমাত্র

এসে পৌঁছেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। লেভ্নওয়ার্থ দুর্গ কিন্তু আসলে দুর্গ নয়, কারণ এতে প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই মাত্র দুটি বাড়ি ছাড়া আর কোথাও। কোনো লড়াইয়ের গুজব বা সম্ভাবনা এর প্রশান্তি নষ্ট করেনি এপর্যন্ত। চারদিকে ব্যারাক এবং কর্মচারীদের বাসভবন, মাঝখানে সমচতুষ্কোণ তৃণভূমি, তারই ওপর লোকেরা যাওয়া-আসা করছিল অথবা গাছতলায় বিশ্রাম করছিল। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই অবশ্য এখানকার দৃশ্য বদলে গিয়েছিল, কারণ তখন সাণ্টা ফে-র বিরুদ্ধে সীমান্তের অভিযাত্রীরা এখানেই এসে সমবেত হয়েছিল।

সৈনিকদের আড্ডা পেরিয়ে আমরা কিকাপু গ্রামের দিকে ঘোড়া ছুটালাম। গ্রামটি মাইল পাঁচ ছয় দূরে। এ গ্রামে যাবার পথটা বিঘ্নসঙ্কুল এবং অনিশ্চিত ; মিজুরি নদীর ধারে ধারে অনেক উঁচু খাড়া চড়াই ডিঙিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হলো। ডাইনে বা বাঁয়ে তাকিয়ে আমরা অনেক বিপরীত ধরনের দৃশ্য দেখতে পেলাম। বাঁয়ে বহুদূরবিস্তৃত তরঙ্গিত প্রেয়ারিভূমি, মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কুঞ্জবন, অথবা মাইলের পর মাইল শুধু সবুজ ঘাস ; কখনো বা সুদূরের বাঁকা দিগন্ত-রেখা ছাপিয়ে উঠেছে সূর্যকরোজ্জ্বল বনানী—সে দৃশ্য নববসন্তের নবীন আবহাওয়ায় অপূর্ব নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। আমাদের নীচে ডানদিকে ছিল এক এলোমেলো জংলী এলাকা। আমরা নীচু দিকে তাকিয়ে ডানদিকে দেখতে পেতাম সারি সারি গাছের মাথা, কতক জীবিত আর কতক মৃত ; কতকগুলো খাড়া, কতকগুলো বিভিন্ন কোণে ঝুঁকে পড়েছে, কতকগুলো ঝড়ের ঝাপটায় একসঙ্গে জড়ো হয়ে রয়েছে। এই গাছের সারির শেষ সীমা ছাড়িয়ে ডালপালার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল মিজুরি নদীর ঘোলাটে জল প্রবল উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে চলেছে উল্টোদিকের বনসঙ্কুল ঢালু তীর ঘেঁষে।

আমাদের পথ অচিরেই নদীতীর ছাড়িয়ে চলে গেল ডাঙার ভেতরের দিকে। একটা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে আমরা ক্রমশ-উঁচু জমির ওপর এক ঝাঁক বাড়ি দেখলাম, আর তাদের ঘিরে অনেক লোক। এই বাড়িগুলো ছিল কিকাপু গ্রামের এক ব্যবসায়ীর গুদাম, কুটির আর আস্তাবল। আমরা যখন সেখানে গেলাম, ঠিক সেই সময়ে সেই এলাকার প্রায় আদ্ধেক ইণ্ডিয়ান তার কাছে এসে ভিড় করেছে। তারা তাদের বেচারা টাট্টু ঘোড়াগুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ার বা বাইরের বাড়িগুলোর পাশে বেঁধে রেখে বাইরে ঘুরঘুর করছিল অথবা ব্যবসা-দফ্তরের বাড়ির ভেতরে ভিড় করছিল। এখানে দেখলাম নানা রঙের মুখ—লাল, সবুজ, সাদা আর কালো, এই

রংগুলো অদ্ভুতভাবে মিশে রয়েছে নানারকম ঢঙে। ক্যালিকো শার্ট, লাল আর নীল কম্বল, পিতলের ইয়ার-রিং, ওয়াম্পাম নেকলেস—এসব অনেক দেখতে পেলাম। ব্যবসায়ী লোকটির নীল চোখ আর সরল মুখ ; তার চেহারায় বা আচরণে সীমান্তের রুক্ষতা ছিল না, যদিও এই সময়টা তাকে খরিদ্দারদের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতে হচ্ছিল। এই খরিদ্দাররা, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, তার কাউণ্টারের ওপর উঠে পড়ছিল তো বটেই, তার বাক্স আর কাপড়ের থানগুলোর ওপরও বসে পড়ছিল।

গ্রামটা বেশী দূরে ছিল না, আর গ্রামের চেহারা দেখেই তার হতভাগ্য আর হাল-ছাড়া বাসিন্দাদের অবস্থা আন্দাজ করা যেতো। কল্পনা করে দেখুন একটা ছোট্ট খরস্রোতা নদী এঁকে-বেঁকে নেমে আসছে একটা বন-বহুল উপত্যকার মধ্য দিয়ে ; কখনো তক্তা আর কাটা গাছের তলায় পুরোপুরি অদৃশ্য, কখনো বা ছড়িয়ে পড়ে একটি প্রশস্ত জলাশয়ে পরিণত ; এবং তার তীরে তীরে বনের ফাঁকে ফাঁকে তক্তার তৈরী ছোট ছোট বাড়ি, যত্নের অভাবে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। এদের যোগাযোগের বা যাতায়াতের সরু পথগুলিও এলোমেলো, গোলকধাঁধার মতো। আমরা কখনো কখনো দেখতে পেলাম একটা বাছুর, শুয়োর, বা টাট্টু ঘোড়া, ঐ গাঁয়েরই কোনো বাসিন্দার সম্পত্তি, বাড়ির সামনেই রোদে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে যেন নিরুৎসুক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আরেকটু দূর এগিয়ে আমরা কিকাপূদের তক্তার তৈরী কুটিরের বদলে দেখতে পেলাম তাদের প্রতিবেশী পোট্টাওয়াট্টামিদের 'পাকৃউই' বাড়িগুলো ; দেখে মনে হলো এদের অবস্থা কিকাপূদের চাইতে ভালো নয়।

শেষকালে বিরক্ত হয়ে, আর সেই দিনটির অত্যধিক গরমে অবসন্ন বোধ করে আমরা আমাদের সেই ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছেই ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর ওখানে যারা ভিড় করেছিল তারা চলে গেছে, এবং তিনি একটু স্বস্তিতে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছেন। তিনি আমাদের তাঁর কুটিরে নিমন্ত্রণ করলেন ; সেটি পুরোনো ফরাসী বসতির ধরনে তৈরী সাদা আর সবুজ রঙে মেশানো বাড়ি। একটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দরভাবে আসবাব দিয়ে সাজানো ঘরে তিনি আমাদের নিয়ে বসালেন। জানালাগুলিতে আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছিল, তাই সূর্যের তাপ আর চোখ-ধাঁধানো আলো ঘরে ঢুকছিল না, ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। ঘরের মেঝের ওপর গালিচাও বিছানো ছিল, আর ঘরটি এমন সুন্দরভাবে সাজানো ছিল যা সীমান্ত এলাকায় আশা করা যায় না। ঐ ঘরের সোফা, চেয়ার, টেবিল আর বই-ভর্তি আলমারি পূর্ব অঞ্চলের কোনো নগরীতেও বেমানান হতো না, যদিও দু-একটা ছোট-খাটো যা নমুনা দেখলাম তা এই এলাকার সভ্যতা সম্বন্ধে মনে একটু খট্‌কা জাগাল।

দেখলাম উনুনের তাকের ওপর গুলীভরা আর ক্যাপ-পরানো একটা পিস্তল পড়ে আছে, আর আলমারির কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে কবি মিল্‌টনের গ্রন্থাবলীর ওপর দিয়ে উঁকি মারছে একটি ভীষণদর্শন ছুরির ঝক্‌ঝকে হাতল।

গৃহস্বামী বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এলেন বরফ-দেওয়া জল, কয়েকটি গ্লাস, আর এক বোতল চমৎকার ক্ল্যারেট মদ ; বিশ্রী গরমে এহেন জলযোগের ব্যবস্থায় মনটা খুশী হয়ে উঠল। একটু পরেই আবির্ভূত হলেন একটি হাসিখুশি মহিলা, যিনি দু-এক বছর আগেও অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন বলেই মনে হলো। পাশের ঘরে খাবার তৈরী, এই কথাটাই বলতে এলেন তিনি। ইনিই গৃহকর্ত্রী, আমরা তাঁরই অতিথি। জীবনের আনন্দের দিকটির সঙ্গেই এঁর পরিচয়, দুঃখের দিকটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই বলেই মনে হলো। তিনি আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের আনন্দ বর্ধন করতে লাগলেন মাছ-ধরা, হাসি তামাসা, আর কেল্লার কর্মচারীদের সম্বন্ধে নানারকম মজার গল্প বলে বলে। আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হয়ে এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরে গেলাম সৈন্যদলের ছাউনিতে।

শ চলে গেল তাঁবুতে, আমি রয়ে গেলাম কর্নেল কিয়ার্নির সঙ্গে দেখা করব বলে। দেখলাম তিনি তখনো টেবিলেই রয়েছেন ; আমাদের ক্যাপ্টেনও রয়েছেন সেখানে, যে অদ্ভুত বেশে তাঁকে ওয়েস্টপোর্টে দেখেছিলাম সেই বেশেই, তফাতের মধ্যে শুধু তাঁর মুখে সেই কালো পাইপটি নেই। মাথার টুপিটা হাতে ঝুলিয়ে তিনি বলছিলেন ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার কথা, মাঝে মাঝে মহিষ-শিকারে তাঁর নিজের কৃতিত্বের কাল্পনিক কাহিনী উল্লেখ করে। 'র'-ও সেখানে ছিলেন ; তাঁর বেশভূষা আরেকটু কেতাদুরস্ত। শেষবারের মতো আমরা সভ্য জগতের সুখ-সুবিধা-বিলাসের স্বাদ গ্রহণ করে নিলাম। যে মদ পান করে আমরা সভ্যতার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তা এত ভালো যে বিদায় নিতে আমাদের দুঃখ হচ্ছিল। তারপর ঘোড়ায় চেপে আমরা চললাম আমাদের তাঁবুর দিকে, যেখানে পরদিন রওনা হবার জন্য সব কিছু তৈরি রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সীমান্ত অতিক্রম

আমাদের অতলান্তিক মহাসমুদ্রের ওপারের সঙ্গীরা ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রচুর সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। তাঁদের ছ'টি অশ্বতর দিয়ে টানা একটি

ওয়াগন ছিল ছ'মাসের মতো খাদ্যদ্রব্যে বোঝাই করা ; গুলী বারুদ যা ছিল তা একটি ছোটখাটো সৈন্যদলের পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া ছিল কতকগুলো বাড়্তি রাইফ্‌ল্ আর ছর্‌রা-গুলী চালাবার বন্দুক, দড়ি, ঘোড়ার সাজ, ব্যক্তিগত মালপত্রের গাঁঠরি আর নানারকম মিশ্র জিনিস, যা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। দূরবীন আর সহজে বহনযোগ্য কম্পাসও তাঁদের দেহের শোভাবর্ধন করছিল, এবং তাঁরা তাঁদের ঘোড়ার জিনের সঙ্গে তাঁদের ইংলণ্ডে তৈরী দোনলা রাইফ্‌ল্‌গুলি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন।

২৩শে মে সূর্য উঠবার আগেই আমাদের প্রাতরাশ খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁবুগুলো খুলে ফেলে জানোয়ারগুলোকে জিন আর সাজ পরানো হয়েছিল, রওনা হবার জন্যে সব কিছু তৈরি। ডেস্‌লরিয়ার্স তার অশ্বতরটিকে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "উঠে পড়, উঠে পড়।" আমাদের বন্ধুদের অশ্বতর-চালক রাইট কিছুক্ষণ গালি আর চাবুক চালিয়ে তার দলের কতকগুলো অবাধ্যকে সচল করে তুলল। তারপর পুরো দলটাই সারি বেঁধে রওনা হলো। আমরা লম্বা বিদায় নিলাম এখানকার আরামের আশ্রয় থেকে।

দিনটা ছিল খুবই শুভলক্ষণযুক্ত, তবু শ আর আমি মনের ভেতর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা বোধ করলাম। পরে দেখা গেল আমাদের সেই আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। আমরা একটু আগেই জানলাম যে যদিও 'র' আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের দায়িত্বে এই পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আমাদের দলের ভেতর একটি লোকও রাস্তা চেনে না ; সুতরাং আন্দাজে অগ্রসর হওয়ার যে কোনো অর্থ হয় না, সেটা শীগ্‌গীরই পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল। তাঁর মতলব বা পরিকল্পনা ছিল গত গ্রীষ্মঋতুতে কর্নেল কিয়ার্নির অধীনে কয়েকদল অশ্বারোহী সৈন্য যে পথ বেয়ে লারামী দুর্গ অভিমুখে অভিযান করেছিল সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েই প্লাট নদীর তীর বেয়ে অরিগন-অভিযাত্রীদের প্রধান যাত্রাপথে পৌঁছবেন।

একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা অশ্বারোহণে অগ্রসর হবার পর একটা পাহাড়ের ওপর এক ঝাঁক পরিচিত বাড়ি চোখে পড়ল। কিকাপুর সেই ব্যবসাদার তাঁর বাড়ির বেড়ার ওপর ঝুঁকে চেঁচিয়ে বললেন, "এই যে! কোথায় চলেছেন আপনারা?" কেউ তখন কান পেতে থাকলে হয়তো শুনতে পেতেন আমাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত বিস্ময়ের আর্তস্বর, যখন আমরা বুঝলাম আমরা আমাদের পথ থেকে অনেক মাইল দূরে সরে গেছি, রকি পাহাড়ের দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারিনি। সুতরাং ব্যবসায়ী লোকটি আমাদের যেদিকে দেখিয়ে দিলেন সেদিকেই আমরা অগ্রসর হলাম, এবং সূর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রেয়ারির ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম। ঝোপ-

ঝাড় আর জঙ্গলের সারি ভেদ করে এগোতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো, ছোট ছোট স্রোতস্বিনী আর পুকুর পার হতেও তেমনি। পান্নার মতো সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন মাইলের পর মাইল প্রেয়ারিভূমি, আমরা অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চললাম তারই ওপর দিয়ে। বায়রনের কবিতার নায়ক মাজেপ্পাও বোধ করি ঘোড়ার পিঠে চেপে অত বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করেনি। কবিরই ভাষায় বলা যায়:

"নাই সেথা পশু বা মানব।
উর্বর মাটির বুকে পদচিহ্ন দেখা নাহি যায়,
শ্রমের বা ভ্রমণের চিহ্ন নাই কোনোখানে হায়,
পবনও হেথায় যেন নিতান্ত নীরব।"

দলের কিছুটা আগে চলে গিয়ে পিছনপানে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের ঘোড়সওয়াররা আমাদের পিছনে পিছনে আসছেন এক মাইল বা আরো লম্বা লাইন করে। আরো পিছনে যেন দিগন্তরেখার ওপর দেখা গেল সাদা ওয়াগনগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "এইবারে এসে গেছি।" দেখা গেল আমরা যে রাস্তায় এসে পড়েছি তার ওপর অনেক ঘোড়ার পায়ের ছাপ। আমরা প্রফুল্লচিত্তে এই নতুন পথ ধরে এগিয়ে চললাম, মেজাজ কিছুটা ভালো হলো। সূর্যাস্তের কাছাকাছি আমরা প্রেয়ারিভূমির একটি উঁচু অংশে এসে তাঁবু ফেললাম; তার তলায় একটি স্রোতস্বিনী অলস মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে চলেছে প্রচুর ঘনসন্নিবিষ্ট ঘাসের মধ্য দিয়ে। অন্ধকার হয়ে আসছিল। চ'রে খাবার জন্য আমরা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম। হেনরি শ্যাটিলন বললেন, "ঝড় আসবে। তাঁবুর খুঁটিগুলো বেশ জোর করে পুঁতে দিন।" আমরা তাই করে তাঁবুগুলোকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করলাম। দেখলাম আকাশের চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে, আর হাওয়ায় একটা টাট্‌কা ভেজা গন্ধ জানানি দিচ্ছে সারাদিনের গুমোট গরমের পর ঝড়ের রাত্রি আসবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেয়ারির চেহারাও বদলে গেছে, তার ঢেউ-খেলানো সবুজ বিস্তার মেঘের ছায়ায় কালো আর বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। অল্প কিছুক্ষণ বাদেই দূরে বজ্রনির্ঘোষ শোনা যেতে লাগল। উঁচু ঘাসের ঝোপের ভেতরে খুঁটি পুঁতে পুঁতে আমাদের ঘোড়াগুলোকে তারই সঙ্গে বেঁধে রাখলাম, তাদের সামনের পাগুলোও জোড়া করে বেঁধে দিলাম। বৃষ্টিপড়া শুরু হতেই আমরা আশ্রয় নিলাম, এবং তাঁবুর ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। বৃষ্টিকে পরোয়া না করে তিনি একটা পুরোনো স্কচ পশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘোড়াদের ভিড়ে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁর বিষম ভাবনা

ফুট পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে সেটা ধরে ফেলতে পারব। এই পিছু দৌড়ানোটা বেশ মজার ব্যাপার হয়ে উঠল। মাইলের পর মাইল আমি ওর পিছনে এমনভাবে ছুটলাম যেন ও ভয় না পায়। এভাবে ক্রমেই ওর আরো কাছে আসতে লাগলাম, ফলে শেষ পর্যন্ত বুড়ো হেন্‌ড্রিকের নাক পন্টিয়াকের অজানিতেই প্রায় তার লেজ ছুঁয়ে ফেলল। আমার ঘোড়াটার রাশ না টেনেই আমি ধীরে ধীরে মাটির দিকে ঝুয়ে পড়লাম ; কিন্তু আমার ভারি আর লম্বা রাইফ্‌ল্‌টাই আমার বিঘ্ন ঘটাল, আর আমার বসবার জিনের গায়ে রাইফ্‌ল্‌-এর আঘাত লেগে যে আওয়াজ হতে লাগল তাইতে চম্‌কে উঠে পন্টিয়াক ঘোড়াটা তার কান খাড়া করে এক লাফ মেরে ছুট লাগাল। আমি আবার আমার ঘোড়াটার পিঠে চড়ে নিয়ে ভাবলাম—"বন্ধু, আবার যদি ঐরকম করো তাহলে আমি তোমাকে গুলী করব।"

লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ দুর্গ প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ; আমি পণ করলাম ঐদিকেই আমি তার পিছু নেবো। আমি মনকে তৈরি করে ফেললাম রাতটা একা এবং অনাহারে কাটাবো, তারপর ভোরবেলা আবার রওনা হবো। একটা আশা অবশ্য বজায় রইল। যে খাঁড়িতে গাড়িটা কাদায় আট্‌কে গিয়েছিল, সেটা ঠিক আমাদের সামনেই রয়েছে ; পন্টিয়াক হয়তো ছুটে হয়রান হয়ে এখানেই এসে থামবে তৃষ্ণা মেটাতে। সে যেন আবার ভয় পেয়ে না যায়, সে-বিষয়ে হুঁশিয়ার হয়ে তার যথাসম্ভব্‌ কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তাই হলো, অর্থাৎ গাছের সারির মধ্য দিয়ে এসে পন্টিয়াক জলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। আমি হেন্‌ড্রিকের পিঠ থেকে নেমে তাকে কাদার ওপর দিয়েই টেনে নিয়ে গেলাম, তারপর অসীম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কাদামাখা পিছল টানা দড়িটা তুলে নিয়ে হাতে তিন পাক জড়িয়ে নিলাম। তারপর আবার হেন্‌ড্রিকের পিঠে চড়ে বললাম, "দেখি বাছাধন এইবার কি করে পালাও!"

কিন্তু পন্টিয়াকের দেখলাম ফিরে যেতে বিষম অনিচ্ছা। হেন্‌ড্রিকও বৃথা আশায় নিজেকে ভুলিয়েছিল, মুখ ঘোরাতে বাধ্য হয়ে সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। আচ্ছারকম এক চাবুকের ঘা খেয়ে তার বিরক্ত ভাব ঘুচে গেল। আমি পুনরুদ্ধার-করা পলাতকটিকে পিছনে টানতে টানতে তাঁবুর খোঁজে রওনা হলাম। দু-এক ঘণ্টা বাদে সূর্যাস্তের কাছাকাছি আমি প্রেয়ারি অঞ্চলের একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে একসারি জঙ্গলের ওধারে আমাদের তাঁবুগুলো দেখতে পেলাম। তাঁবুগুলোর কাছেই নীচু মাঠের ওপর ঘোড়াগুলো দল বেঁধে ঘাস খাচ্ছিল। দেখলাম জ্যাক সি— পায়ের ওপর পা রেখে রোদে বসে দড়ি পাকাচ্ছে ; বাকি সবাই

ঘাসের ওপরে শুয়ে ধূমপান বা গল্পগুজবে মত্ত। সে-রাতে নেক্‌ড়েরা আমাদের যে গান শুনিয়েছিলেন তেমন প্রাণবন্ত গান ওঁদের মুখে আগে আর কখনো শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। ভোরবেলা দেখা গেল এই গাইয়েদেরই একজন আমাদের তাঁবুগুলোর অনতিদূরে ঘোড়াগুলোর মধ্যে চুপটি করে বসে আমাদের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দিকে উদ্যত রাইফ্‌ল্‌-এর নল চোখে পড়তেই তিনি ছুটে পালালেন।

এর পরের দু-এক দিনের কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছি উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি বলে। কোনো পাঠক যদি প্রেয়ারি দেখতে আসবার আগ্রহ বোধ করেন, আর প্লাট নদীর পথটাই বেছে নেন (এ পথটাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে ভালো), তাহলে তিনি প্রথমেই তাঁর কল্পনার স্বর্গে এসে পড়বেন এ আশা মনে পোষণ করলে হতাশ হবেন, এ আশ্বাস তাঁকে দিতে পারি। বিরাট বিস্তীর্ণ অনুর্বর ভূমি, মহিষ এবং ইণ্ডিয়ানদের বাস যেখানে, সভ্যতার ছায়ামাত্র যার ত্রিসীমানায় নেই, যার নাম 'বিরাট আমেরিকান মরুভূমি', তার কিনারায় পৌঁছবার আগে প্রথমে বেশ কিছুদূর বেশ কষ্টকর পথ অতিক্রম করতে হবে। তারপর শেষ সীমান্ত পেরিয়ে কয়েক শ' মাইল বিস্তৃত যে প্রশস্ত উর্বর এলাকায় এসে পড়বেন, তা হয়তো তাঁর প্রেয়ারি সম্বন্ধে আগেকার রঙীন কল্পনার সঙ্গে বেশ খানিকটা মিলবে, কারণ সৌখীন পর্যটক, চিত্রশিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি যাঁরা এর বেশী আর অগ্রসর হননি, তাঁরা এই অংশ থেকেই সম্পূর্ণ প্রেয়ারি অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছেন। শিল্পীর চোখ যাঁর আছে, তাঁর কাছে এই শিক্ষানবিশির পর্বটা খুব খারাপ লাগবার কথা নয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব চটকদার বা চমকপ্রদ না হলেও মধুর এবং নয়নাভিরাম—দৃষ্টি দিয়ে মাপা যায় না, এতদূর বিস্তৃত সমতল ভূমি ; স্তব্ধ, অচল সমুদ্রতরঙ্গের মতো তরঙ্গায়িত প্রেয়ারির সবুজ বক্ষ ; আর বনরাজির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা বয়ে চলা স্রোতস্বিনীর পর স্রোতস্বিনী। অবশ্য উৎসাহ আর আগ্রহ তাঁর যতই থাকুক না কেন, নিরুৎসাহের খোরাকও এখানে তিনি যথেষ্ট পাবেন। তাঁর গাড়ি কাদায় আটকে যাবে, ঘোড়া-গুলো ছুটে যাবে তাদের সাজের বাঁধন আল্‌গা করে, গাড়ির চাকা নিয়েও গোল বাধবে, তাঁর শয্যা হবে নরম কালো মাটি। আর খাওয়া? বিস্কুট আর সঙ্গে নিয়ে আসা নুন-মাখানো খাবার খেয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ—ব্যাপারটা যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন—শিকার করে খাবার মতো পশুপাখির এ অঞ্চলে নিতান্তই অভাব। অবশ্য তিনি তাঁর এগিয়ে চলার পথের ধারে ধারে লম্বা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাবেন এল্‌ক্‌-জাতীয় হরিণের বড় বড় শিং ; তারপর আরো

এগিয়ে দেখতে পাবেন সাদা মাথাওয়ালা মহিষ, এই অধুনা পরিত্যক্ত অঞ্চলে এককালে যাদের প্রাচুর্য ছিল। হয়তো আমাদেরই মতো একপক্ষকাল ভ্রমণ করেও তিনি দেখতে পাবেন না কোনো হরিণের পায়ের ছাপ। আর বসন্তকালে একটি বুনো মুরগীও পাওয়া যাবে না।

অবশ্য, শিকার তাঁর নাই বা জুটুক, আপদ জুটবে অসংখ্য। রাত্রে নেকড়েরা সমবেত কণ্ঠে তাঁকে গান শোনাবে ; দিনের বেলা তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করবে ঠিক বন্দুকের পাল্লা এড়িয়ে ; তাঁর ঘোড়াটির পা পড়ে যাবে গর্তের ভেতর ; জলাভূমি আর ডোবা থেকে নানা রং, চেহারা আর আয়তনের অসংখ্য ব্যাং বহু বিচিত্র রকমের আওয়াজ তুলবে ; অনেক সাপ চলে যাবে তাঁর ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে, অথবা তাঁর তাঁবুতে নিঃশব্দে এসে দেখা দেবে, আর অগুনতি মশা অবিরাম গুন্‌গুনিয়ে তাঁর দু'চোখ থেকে ঘুম তাড়াবে। ধুধু-করা প্রেয়ারির বুকে প্রখর রৌদ্রে অনেকক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়িয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন কোনো পুকুরে এসে জল পান করতে নামবেন, তখন পুকুর থেকে জল তুলে দেখবেন পেয়ালার জলের তলায় ব্যাঙাচিরা খেলা করছে। এ ছাড়া সারা সকালবেলাটা যেমন সূর্যের প্রখর তাপ এসে হুলের মতো বিঁধতে থাকবে, তেমনি রোজ বিকেল চারটা নাগাদ ঝড়বৃষ্টি এসে তাঁকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে সপ্‌সপে করে দেবে।

একদিন ভোরবেলা অনেকদূর ঘোড়ায় চড়ে দুপুরবেলা উন্মুক্ত প্রেয়ারিভূমিতে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। একটিও গাছ চোখে পড়ছিল না, কিন্তু কাছাকাছিই একটি চঞ্চলা ছোট্ট নদী যেন এদিকে ওদিকে মোচড় খেতে খেতে একটা খাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, কোথাও ছোট ছোট জলাশয় তৈরি করে, কোথাও বা ঝোপ-ঝাড় বা লম্বা ঘাসের গুচ্ছের ভেতর দিয়ে প্রায়-অদৃশ্য ক্ষীণ স্রোতে। দিনটা ছিল বিশ্রীরকম, প্রাণ-আইঢাই-করা গরম। ঘোড়া আর অশ্বতরগুলো একটু আরাম পাবার জন্য ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ডেস্‌লরিয়ার্স পাইপের ধোঁয়া পান করতে করতে ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আমাদের টিনের থালাগুলো সাজাচ্ছিল। শ শুয়েছিল গাড়ির তলায় ছায়ায়, রওনা হবার ডাক শুনবার আগে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য। হেনরি শ্যাটিলন শুয়ে পড়বার আগে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিল সাপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা—জীবিত প্রাণীদের ভেতর শুধু সাপকেই সে ভয় করত—আর গাড়ির কাছাকাছি কয়েকটা সন্দেহজনক গর্ত দেখেই মহা বিরক্তির আওয়াজ করছিল। আমি একটা চাকায় হেলান দিয়ে একটুখানি ছায়ায় বসে একজোড়া ঘোড়ার পায়ের বেড়ি তৈরি করছিলাম,

আমার দুষ্টু পণ্টিয়াক ঘোড়াটা আগের রাতে যে-জোড়া ভেঙে ফেলেছিল, তারই অভাবটা পুরিয়ে রাখবার জন্য। পাঁচ দশ গজ দূরে আমাদের বন্ধুদের তাঁবুতেও ছিল আমাদের তাঁবুর মতোই অলস প্রশান্তির আবহাওয়া।

সাপের গর্ত পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টি তুলে এনে হেনরি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "আরে! এই যে আমাদের পুরোনো ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "ঐ দেখ, পার্কম্যান, দেখ একবার শ-র দিকে তাকিয়ে। সে চাকার তলায় ঘুমিয়ে আছে, আর চাকার মধ্যবিন্দু থেকে ফোঁটা ফোঁটা আল্কাতরা পড়ছে তার কাঁধের ওপর।"

শুনেই শ আধ-খোলা চোখ নিয়ে উঠে পড়ল, আর কাঁধে হাত দিয়ে দেখতে গেল। দিতেই দেখল কিসের আঠায় যেন লাল ফ্লানেলের শার্টের সঙ্গে হাতটা সঙ্গে সঙ্গে বেশ শক্তভাবে আট্‌কে গেছে।

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন, "শ যখন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের মধ্যে গিয়ে পড়বে, তখন তাকে বেশ ভালোই দেখাবে।" বলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির তলায় গিয়ে গল্প বলতে শুরু করে দিলেন। অফুরন্ত তাঁর গল্পের ভাণ্ডার ; গল্প বলতে বলতে তিনি উদ্বিগ্নভাবে/ঘন ঘন ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাতে লাগলেন। শেষকালে লাফিয়ে উঠে বিষম উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন—"ঐ ঘোডাটাকে দেখ। ঐ যে পাহাডের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। হায় ভগবান, চলেই গেল যে! শ, ও যে তোমার বড ঘোড়াটা। না, তোমার নয়, ওটা জ্যাকের। জ্যাক, জ্যাক, ওহে জ্যাক!" ডাক শুনে জ্যাক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

"যাও, গিয়ে ধরো ঘোড়াটাকে, যদি ওকে হারাতে না চাও।" গর্জন করে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক ছুটলো ঘাসের ভেতর দিয়ে, আর তার পাৎলুনের চওড়া পায়া-দুটো তার দু'পায়ের ওপর ঝাপ্‌টাতে লাগল। জ্যাক ঘোড়াটাকে ধরে না ফেলা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ঐদিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ; তারপর যখন বসে পড়লেন তখন মনে হলো কী যেন তিনি ভাবছেন বিশেষভাবে।

তিনি বললেন, "বলে দিচ্ছি এভাবে চললে আমরা একটি একটি করে সবগুলো ঘোড়া হারাবো, তখন কী দুরবস্থাই না আমাদের হবে! আমি এখন নিঃসংশয়ে বুঝেছি আমাদের এখন একমাত্র পন্থা হচ্ছে আমরা যখনই কোথাও থামব তখন তাঁবুর

প্রত্যেকেই পালা করে ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেবে। ভেবে দেখ, যদি একশো পনী ইণ্ডিয়ান ঐ খাতের ভেতর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে আসে তাদের স্বভাবমতো চীৎকার করতে করতে আর মোষের চামড়ার পোশাক ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে, তখন? দু'মিনিটের ভেতর একটি ঘোড়াকেও আর দেখতে পাওয়া যাবে না।" আমরা ক্যাপ্টেনকে স্মরণ করিয়ে দিলাম একশো পনী ইণ্ডিয়ানকে তাদের লুঠতরাজে বাধা দিতে গেলে আমাদের পাহারাদারকে সম্ভবত তারা আগেই সাবাড় করবে।

এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন—"আমাদের গোটা পদ্ধতিটাই আগাগোড়া ভুল, সে বিষয়ে আমার এক ফোঁটাও সন্দেহ নেই। এই ধরো, আমরা প্রেয়ারির ওপর দিয়ে যেভাবে এক মাইল লম্বা লাইন করে ভ্রমণ করি, তাতে শত্রুপক্ষ হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের সামনের লোকদের মেরে ফেলতে পারে এত তাড়াতাড়ি যে, পিছনের লোকেরা এসে সাহায্য করবার সময়ই পাবে না।"

শ বলল, "আমরা এখন পর্যন্ত শত্রু-এলাকায় আসিনি। যখন আসব, তখন একসঙ্গে জড়ো হয়ে ভ্রমণ করব।"

ক্যাপ্টেন বললেন, "তখন আমাদের তাঁবুর ওপরই আক্রমণ হতে পারে। আমাদের কোনো প্রহরী নেই; আমাদের তাঁবুতে শৃঙ্খলা নেই; হঠাৎ আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে কোনো আগাম সতর্কতা নেই। আমার মনে হয়, আমাদের উচিত একটি চৌকো ফাঁকা জায়গায় তাঁবু ফেলা, তার মাঝখানে রাত্রিতে আগুন জ্বালা থাকবে। প্রহরী থাকবে চারদিকে; আর প্রত্যেক রাত্রির জন্যে থাকবে একটি আলাদা সংকেত-শব্দ বা ছাড-শব্দ, সেটি যে বলতে পারবেনা সে আমাদের দলের নয় বলে বোঝা যাবে। তা ছাড়া একদল অগ্রগামী ঘোড়সওয়ার রাখতে হবে যারা আমাদের দলের আগে গিয়ে তাঁবুর জন্য জায়গা ঠিক করবে আর শত্রুর সন্ধান পেলে সাবধান করে দেবে। এই আমার বিশ্বাস। আমার মত আমি কারও ওপরে চাপাতে চাইনে। আমার সাধ্যমতো সেরা পরামর্শ আমি দিয়ে খালাস; তারপর যার যা খুশি সে তাই করুক।"

অগ্রগামী ঘোড়সওয়ার পাঠাবার পরিকল্পনাটাই তাঁর বিশেষ প্রিয় বলে মনে হলো। আর এ ব্যাপারে তাঁর মতে সায় দিতে যখন কাউকেই রাজি দেখা গেল না, তখন তিনি ঠিক করলেন সেদিন বিকেলে তিনি একাই এগিয়ে যাবেন। আমাকে বললেন, "এসো পার্কম্যান। যাবে নাকি আমার সঙ্গে?"

আমরা একসঙ্গে রওনা হয়ে দু-এক মাইল এগিয়ে গেলাম। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে বিশ বছর কাজ করে ক্যাপ্টেন জীবন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন;

তা ছাড়া বেশ খুশ-মেজাজের লোক বলে সঙ্গী হিসেবে তিনি ছিলেন চমৎকার। তিনি অনেক হাসি-ঠাট্টা করলেন অনেক গল্প শোনালেন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক; তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি প্রেয়ারিভূমি ধুধু করছে বহুদূরে দিগন্তরেখা পর্যন্ত, একটি ঘোড়সওয়ার বা ওয়াগনও চোখে পড়ছে না।

ক্যাপ্টেন বললেন, "আসল দলটা এসে না পৌছানো পর্যন্ত আমার মনে হয় অগ্রগামীদের থেমে পড়াই উচিত।"

আমার মতও ছিল ঠিক তাই। আমাদের ঠিক সামনেই ছিল একটা ঘন বন, আর তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল একটি ছোট নদী। এটি পার হয়ে ওপারে গিয়ে দেখলাম একটি সমতল ভূমি, তাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে কতকগুলো গাছ। কতকগুলো ঝোপের সঙ্গে আমাদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখে আমরা ঘাসের ওপর বসে পড়লাম, তারপর একটা পুরোনো গাছের গুঁড়িকে চাঁদমারী করে আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করতে লাগলাম ক্যাপ্টেনের হাতের হাল-ফ্যাশানের রাইফ্‌ল্-এর চাইতে আমাদের পল্লী-বনাঞ্চলের বিখ্যাত রাইফ্‌ল্ কত বেশী ভালো। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দূরে গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসতে লাগল অনেকের কণ্ঠস্বর।

"ঐ যে ওরা আসছে।" বললেন ক্যাপ্টেন। "চলো দেখি ওরা খাঁড়িটা কি করে পার হয়।"

আমরা ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলাম সেই স্রোতস্বিনীর ধারে, ঠিক যেখান থেকে আমাদের যাবার পথ এই স্রোতস্বিনীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। গাছের সারিতে ভরা গভীর খাতে বয়ে চলেছে স্রোত। আমরা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিশৃঙ্খলভাবে এক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার জলের মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসছে; আর আমাদের দলের লোকদের ম্যাড়্‌মেড়ে পোশাকের ভেতর ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল চারজন অশ্বারোহী সৈনিকের ইউনিফর্ম।

ঘোড়াটাকে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে শ দলের বেশ কিছুটা আগে আগে নদীতীরের চড়াই বেয়ে উঠে এলো; তার মুখে বেশ একটু রাগের ভাব। দেখলাম 'র' আসছেন তার পিছনে পিছনে, নিতান্তই মুষ্‌ড়ে-পড়া গোবেচারার মতো মাথা নীচু করে। শ-র মুখে প্রথম যে শব্দটি উচ্চারিত হলো সেটি 'র' সম্বন্ধেই একটি মিঠে-কড়া ইঙ্গিত। এই ভদ্রলোকেরই অতিবুদ্ধির ফলে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলে প্লাট নদীর দিকে না গিয়ে ভুল করে এসে পড়েছি আইওয়া ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে। একথাটা আমরা জানলাম লেভ্‌ন্‌ওয়ার্থ কেল্লা থেকে সম্প্রতি পালিয়ে আসা ঐ অশ্বারোহী সৈনিকদের কাছ থেকে। তারা বলল আমাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো পন্থা হবে সোজা

উত্তর দিকে এগিয়ে যাওয়া, যেপর্যন্ত না মিজুরি অঞ্চল থেকে কয়েকজন অরিগন-যাত্রী সেই ঋতুতেই যে পথ দিয়ে গেছে সেই পথে গিয়ে না পড়ছি।

অত্যন্ত খারাপ মেজাজ নিয়ে আমরা সেই অলক্ষুণে জায়গায় তাঁবু ফেললাম। পালিয়ে আসা সৈনিক চারজন ঘোড়া চালিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল, কারণ তাদের পক্ষে এখানে দেরি করা নিরাপদ নয়। পরের দিন আমরা সেন্ট জোসেফ থেকে আগত অভিযাত্রীদল যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, তাদের যাত্রা-চিহ্নিত সেই পথে এসে পড়ে অগ্রসর হলাম লারামী দুর্গের দিকে। লারামী দুর্গ তখন প্রায় সাতশো মাইল পশ্চিমে।

পঞ্চম অধ্যায়

নীল নদী

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শহরের চারদিকে অরিগন আর ক্যালিফর্নিয়া অভিযাত্রী যাঁরা বহু সংখ্যায় জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁরা খবর পেয়েছিলেন যে সেন্ট জোসেফ থেকে আরো কতকগুলো অভিযাত্রী দল উত্তরদিক রওনা হবার উপক্রম করছে। সব্বারই সাধারণ ধারণা হলো এরা মর্মন, সংখ্যায় দু'হাজার তিনশো। এ খবরে সবার মনে বেশ ভীতি আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযাত্রীদের বেশির ভাগই ছিলেন ইলিনয় আর মিজুরি অঞ্চলের বাসিন্দা, যাঁদের কোনোদিনই সদ্ভাব ছিল না এই 'নতুন দিনের সন্ন্যাসী'দের সঙ্গে ; এই দু'পক্ষের ঝগড়ায় যে কত রক্তপাত হয়েছে তার তিক্ত কাহিনী দেশ জুড়ে ছড়ানো। থানা-পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর নাগাল থেকে বহুদূরে প্রশস্ত প্রেয়ারির বুকে এই ধর্মোন্মাদ ডানপিটেদের বিরাট সশস্ত্র দল যখন তাদের সবচেয়ে বেপরোয়া এবং দুর্দান্ত শত্রুদের মুখোমুখী হবে, তখন ফলাফলটা যে কী দাঁড়াবে তা সঠিক বলা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের স্ত্রীলোক আর শিশুরা ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে দিল ; এমনকি পুরুষদের মনেও আতঙ্ক জাগল। পরে জেনেছিলাম তারা কর্নেল কিয়ার্নিকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিল তিনি যেন প্লাট নদী পর্যন্ত তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একদল রক্ষী সৈন্য পাঠান, এবং এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পরে যা ঘটল তা থেকে প্রমাণিত হলো অমন আতঙ্কিত হবার কোনো দরকার ছিল না। সেন্ট জোসেফ থেকে আগত অভিযাত্রীরা যেমন ভালো খ্রীষ্টান তেমনি অন্যান্য অভিযাত্রীদের মতোই

তীব্র মর্মন-বিদ্বেষী। প্লাট নদীর পথে এই ঋতুতে এই 'সন্ন্যাসী'দের যে ক'টি পরিবার এসেছিল, অধিকাংশ অভিযাত্রীদের আগে চলে যেতে দিয়ে এরা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, কারণ খ্রীষ্টানদের মনে এদের সম্বন্ধে যত ভয়, এদের মনেও খ্রীষ্টান-ভীতি তার চাইতে কম নয়।

আমরা এবার এই সেণ্ট জোসেফ থেকে আগত অভিযাত্রীরা যে পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই পথেই এসে দাঁড়িয়েছি। রাস্তার ওপর তাদের চলে যাওয়ার চিহ্নগুলো দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কয়েকটি বেশ বড় অভিযাত্রী দল আমাদের কয়েকদিন আগেই চলে গেছে। এরা মর্মন, এই ভেবে আমাদের মনেও একটু আশঙ্কা জেগেছিল ওরা হয়তো কোনোরকম গোল বাধাবে।

শুরু হলো একঘেয়ে ভ্রমণ। একদিন আমরা একটানা কয়েকঘণ্টা অশ্বারোহণে এগিয়েও একটিও গাছ বা ঝোপ চোখে দেখতে পেলাম না; সামনে, পিছনে আর দু'দিকে ধু-ধু করছে বিশাল উঁচুনীচু ঢেউ-খেলানো তাজা সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রেয়ারি-ভূমি। এখানে ওখানে দু-একটা কাক, দাঁড়কাক বা টার্কি পাখি সেই একঘেয়েমির ভাবটা একটু কমিয়ে দিচ্ছিল।

আমাদের তখন প্রশ্ন হলো: 'আজ রাতে জ্বালানী কাঠ আর জলের কী ব্যবস্থা হবে?' কারণ তখন সূর্য অস্ত যাবার আর বেশী দেরি নেই। অবশেষে ডানদিকে অনেক দূরে যেন একটি গাঢ় সবুজ বিন্দুর মতো দেখা গেল; সেটা আর কিছুই নয়, প্রেয়ারির একটি উঁচু জায়গায় একটি গাছের মাথা। যাত্রাপথ ছেড়ে আমরা দ্রুত ঐ দিকে এগিয়ে চললাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওর ওপাশে কতকগুলো ঝোপ আর নীচু গাছ বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গায় কয়েকটি জলাশয়কে ঘিরে রয়েছে। আমরা তারি কাছে চড়াই-এর ওপর তাঁবু ফেললাম।

শ আর আমি তাঁবুতে বসে আছি, এমন সময় ডেস্‌লরিয়ার্স তার বাদামী রঙের মুখ আর ফেল্‌টের টুপিটি ফাঁকের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে দু'চোখ যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে বলল খাবার দেওয়া হয়েছে। ঘাসের ওপর সাজানো ছিল সারি সারি টিনের বাটি, লোহার চামচ, আর মাঝখানে সবচেয়ে বড় মর্যাদার স্থানটি দখল করে ছিল কফির পাত্রটি। খাবার সব শীগ্‌গীরই সাবাড় হয়ে গেল, কিন্তু হেনরি শ্যাটিলন তাঁর পেয়ালায় যেটুকু কফি অবশিষ্ট ছিল সেটুকু একটু একটু করে আস্বাদন করতে লাগলেন। প্রেয়ারি অঞ্চলের এই সর্বজনীন পানীয়টি তাঁর বিশেষ প্রিয়। তিনি পছন্দ করতেন চিনি আর দুধ ছাড়া কফির নিজস্ব আস্বাদ; এক্ষেত্রে কফির স্বাদটা তাঁর সম্পূর্ণ পছন্দ-মতো হয়েছিল, অর্থাৎ বেশ কড়া, তাঁর ভাষায় 'ঠিকমতো কালো'।

সেদিনের সূর্যাস্তটা ছিল দেখবার মতো ; আকাশের রক্তিম আভা প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল ছায়াঘেরা অনেক জলাশয়ের বুকে।

শ বলল, "আজ রাতে আমি স্নান করবই। কি বলো, ডেস্‌লরিয়ার্স? ঐ জলে সাঁতার কাটা যাবে না?"

"আজ্ঞে, তা আপনার যেমন অভিরুচি। আমি আর কি বলব আপনাকে?" জবাব দিল ডেস্‌লরিয়ার্স, দুটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে। বেচারার অসুবিধা এই যে ইংরাজি ভাষাটা তার তেমন রপ্ত নয়, অথচ মনিবদের মন রেখে চলবার আগ্রহ তার ষোলো আনা।

আমি শ-কে বললাম, "ওর পায়ের জুতোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।" জুতো-জোড়া নিশ্চয়ই সম্প্রতি কালো কাদায় ডুবে গিয়েছিল।

শ বলল, "চলো। একবার দেখাই যাক-না চেষ্টা করে।"

আমরা একসঙ্গে রওনা হলাম। কিছুদূরে ঝোপের কাছাকাছি যেতেই টের পেলাম পায়ের তলায় মাটি বিশ্বাসঘাতী হয়ে উঠেছে। আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো কেবলমাত্র বড় বড় ঘন ঘাসের ঝাড়ের ওপর পা ফেলে ফেলে ; সেই ঝাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে অথই কাদা, একবার ভুল করে বা ফস্‌কে তাতে পা পড়লেই পায়ের জুতোর দুরবস্থা হবে ডেস্‌লরিয়ার্সের পায়ের জুতোর মতোই। অবস্থাটা রীতিমতো সঙীন বলেই মনে হলো। আমরা বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধানের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম—শ চলে গেল ডানদিকে, আমি সোজা এগিয়ে চললাম। অবশেষে আমি এসে পড়লাম ঝোপগুলোর কিনারায়, যেখানে ছোট ছোট নবীন উইলো গাছে গাছে ফুটে ছিল শুঁয়োপোকার মতো ফুল, কিন্তু তাদের আর সর্বশেষ ঘাস-ঝাড়ের মাঝখানে ছিল একটি কালো এবং গভীর পাঁকে ভরা ডোবা, যেটা টপ্‌কে গেলাম খুব জোরে লাফ দিয়ে। তারপর জোর করে উইলো ঝোপ কাঁধ দিয়ে ঠেলে আর জোর করে পায়ের তলায় মাড়িয়ে এসে উপনীত হলাম একটি প্রশস্ত জল-স্রোতের সামনে। ইঞ্চি তিনেক গভীর সেই স্রোতটি তলার চক্‌চকে কাদার ওপর দিয়ে অলস মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। আমার আগমনে বেশ্ একটা সাড়া জাগ্‌ল। একটা মস্ত সবুজ কোলা-ব্যাং খুব রাগ করে ডেকে উঠে পাড় থেকে জলে ছলাৎ করে লাফিয়ে পড়ল ; তার জোড়া-আঙুল-যুক্ত পা দুটো জলের ওপর দ্রুত নড়ে উঠল। তারপর দেখলাম সে তলার কাদায় গ্যাঁট হয়ে বসেছে, আর কতকগুলো বুদ্‌বুদ আস্তে আস্তে উঠে আসছে জলের ওপরের দিকে। গায়ে ফোঁটা-ফোঁটা দাগওয়ালা কতকগুলো ছোট্ট ব্যাং ঐ বড় কোলা-ব্যাংটার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করল। আর সেই সময় গায়ে

চমৎকার কালো আর হলুদে ডোরাওয়ালা একটা সাপ এক পাড় থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে ওপারে চলে গেল। নিশ্চল জলের ওপর একজায়গায় একটা পাথর আমার অসাবধানে পায়ের ঠেলা লেগে পড়ে যেতেই সেখানে একঝাঁক কালো ব্যাঙাচির চাঞ্চল্য শুরু হলো।

দূর থেকে শ চেঁচিয়ে বলল, "তোমার ওখানে স্নানের কোনো সম্ভাবনা আছে ?"

জবাবটা শুনে খুব ভরসা পাওয়া গেল না। আমি উইলো ঝোপের মধ্য দিয়ে পিছু হটে গিয়ে আমার সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হলাম, তারপর দুজনে একসঙ্গে আমাদের অনুসন্ধান শুরু করলাম। ডানদিকে অল্পদূরে গাছে আর ঝোপে ঢাকা একটা উঁচু জমি মনে হলো যেন হঠাৎ জলের দিকে নেমে গেছে। দেখে একটু আশা হলো, ঐ দিকে এগিয়ে চললাম দুজনে। সে-জায়গায় পৌঁছে দেখলাম পাহাড় আর জলের মাঝখানের পথ বেয়ে অগ্রসর হওয়া সোজা ব্যাপার নয়, কারণ আমাদের পদে পদে পথ আটকে বাধা দিচ্ছিল কতকগুলো শক্ত, অনমনীয় ছোট ছোট বার্চ গাছ, আঙুরের লতায় লতায় একসঙ্গে জড়ানো। সেই গোধূলি-আলোয় আমরা কখনো কখনো টাল সামলাবার জন্য কোনো সুইটব্রায়ার গাছের সরু কাণ্ডই ধরে ফেলতে লাগলাম। শ আমার আগে আগে চলছিল, হঠাৎ তার কণ্ঠ থেকে একটা জোরালো স্বর নির্গত হলো। তাই শুনে তাকিয়ে দেখলাম সে এক হাতে ধরে রয়েছে একটা কচি চারাগাছ, একটা পা জল থেকে তুলে আনতে ভুলে গেছে, আর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখছে পাঁচ ফুট লম্বা, গায়ে বিচিত্র কালো আর সবুজ ডোরা, একটা জলচর সাপ সাঁতার কেটে জল পার হচ্ছে। সাপটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবার জন্য হাতের কাছে একটিও লাঠি বা ঢিল ছিল না বলে আমরা কিছুক্ষণ ধরে নীরবে বিরক্তভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার এগিয়ে চললাম নানা বাধা ঠেলে। অবশেষে পেলাম আমাদের অধ্যবসায়ের পুরস্কার, কারণ আরো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে এসে পড়লাম ঝোপের মাঝখানে ছোট একফালি সমতল সবুজ-ঘাসে-ঢাকা জায়গায়। আমাদের ভাগ্য অসাধারণ ভালো ; জলাশয়টির অন্যান্য অংশগুলো আগাছায় ঢাকা, কিন্তু এখানটায় যেন আগাছাগুলো একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার ফলে সামনে কয়েক গজ পর্যন্ত জল বেশ পরিষ্কার, আগাছাহীন। একটা লাঠি দিয়ে মেপে দেখলাম জল এখানে চার ফুট গভীর। আমরা আঁজলা ভরে সেখানকার জলের খানিকটা নমুনা তুলে নিলাম ; মনে হলো জলটা মোটের ওপর স্বচ্ছই আছে, সুতরাং যা করার এইবেলা। কিন্তু স্নান শুরু করার কিছুক্ষণ বাদেই চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মস্ত মস্ত মশা গুনগুন করতে করতে এসে আমাদের সারা গায়ে যেন

বিষাক্ত ছুঁচ ফোটাতে লাগল। আমরা যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ছুটে পালাতে বাধ্য হলাম।

আমরা গেলাম তাঁবুর দিকে। একে গরম, তার ওপর আমাদের সংস্কার, এই দুয়ের ফলে স্নানটা খুবই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছিল, আর স্নান করে শরীরটা বেশ তাজাও বোধ করছিলাম।

শ বলে উঠল, "ক্যাপ্টেনের কি হলো? দেখ একবার ওর দিকে তাকিয়ে।" তাকিয়ে দেখলাম ক্যাপ্টেন প্রেয়ারিভূমির ওপর একা দাঁড়িয়ে মাথার চারদিকে বন্‌বন্‌ করে টুপিটা ঘোরাচ্ছেন, আর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার এ-পা একবার ও-পা তুলছেন। প্রথমে তিনি বিষম ঘৃণার ভঙ্গিতে তাকালেন মাটির দিকে; তারপর ওপরদিকে তাকালেন ক্রুদ্ধ আর ধাঁধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে, যেন বায়ুপথে কোনো অদৃশ্য শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছেন। আমরা ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কী; তিনি তার জবাবে শুধু কী এক অজানা বস্তুর উদ্দেশে অভিশাপ ঝাড়তে লাগলেন। আমরা এগিয়ে যেতেই কানে এলো ভন্‌ভন্‌ আওয়াজ, যেন একসঙ্গে এক কুড়ি মৌচাক উল্‌টে ফেলা হয়েছে। মাথার ওপরে উড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পতঙ্গ বিষম চঞ্চলভাবে, আর অনেকগুলো উড়তে লাগল ঠিক ঘাসের ডগাগুলোর একটু ওপরে।

ক্যাপ্টেন আমাদের পিছু হটতে দেখে ডেকে বললেন, "ভয় পেয়ো না। হারামজাদারা কামড়াবে না।"

ক্যাপ্টেনের আশ্বাস পেয়ে এদের একটাকে টুপির ঘায়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে দেখলাম এ আমাদের পূর্বপরিচিত এক নিরীহ জাতের পোকা; আরেকটু ভালো করে নজর দিতেই দেখতে পেলাম মাটির ওপর তাদের অনেকগুলো ঘন ঘন গর্ত।

এই পোকাদের উপনিবেশ থেকে আমরা চটপট বিদায় নিয়ে চড়াই জায়গা বেয়ে উঠে তাঁবুতে গেলাম; গিয়ে দেখলাম ডেস্‌লরিয়ার্স-এর আগুন তখনো বেশ উজ্জ্বল-ভাবেই জ্বলছে, গন্‌গনে রয়েছে। সেই আগুনের চারধারে ঘিরে বসলাম আমরা; আর স্নানের কী চমৎকার সুবিধা আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি তাই নানারকমে ব্যাখ্যা করে শ ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে লাগল পরদিন প্রাতরাশ খাবার আগেই সেখানে যেমন করে হোক যেতেই হবে। ক্যাপ্টেন বলতে যাচ্ছিলেন এটা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে শক্তই হতো, কিন্তু কথাটা শেষ করার আগেই হঠাৎ নিজের গালে একটা চড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"হারামজাদারা আবার আমাকে জ্বালাতন করা শুরু করেছে।" আর সত্যি সত্যি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যেন ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ করতে করতে

বন্দুকের গুলী ছুটতে লাগল। হঠাৎ কি-একটা এসে যেন আমার কপালে ঘা মারল, তারপর ঘাড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করলাম অনেকগুলো সরু ধারালো নখ আমার চামড়ার ওপর কিলবিল করছে, যেন চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে চায়। ওটাকে ধরে আগুনের ভেতর ফেলে দিলাম। আমাদের বৈঠকটাও চট্‌পট্‌ ভেঙে গেল, আমরা যে যার তাঁবুতে ফিরে গেলাম। তাঁবুর দরজাটা একটু ফাঁক করে ঢুকেই খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম যেন পোকাগুলো ঢুকতে না পারে। কিন্তু আমাদের সব হুঁশিয়ারি বৃথা হলো। পোকাগুলো ভোঁ-ভোঁ করতে করতে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল আর সারারাত আমাদের মুখের ওপর ঘুর-ঘুর করে বেড়াল। ভোরবেলা কম্বলগুলো খুলে দেখলাম তার ভেতরে ভেতরে কয়েক ডজন পোকা জোঁকের মতো লেগে রয়েছে। আর দেখলাম ডেস্‌লরিয়ার্স হাতটা সোজা করে সস্‌প্যানের হাতলটা ধরে ঐ দিকে তাকিয়েই বিড়বিড় করছে। কথা শুনে বোঝা গেল ডেস্‌লরিয়ার্স ওটাকে রাত্রে রেখে দিয়েছিল আগুনের ধারে ; সারা তলাটার ওপর ঐ পোকা ঘন আর শক্ত হয়ে আট্‌কে রয়েছে, আর শত শত পোকা আগুনের তাপে ভাজা-ভাজা হয়ে কুঁকড়ে ছড়িয়ে আছে ছাইয়ের ওপর।

ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোকে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা ভোরের খাওয়া সেরে বেশ একটু আরাম করছি, এমন সময় হঠাৎ হেনরি শ্যাটিলন আর ক্যাপ্টেনের চিৎকার শুনে বুঝলাম কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের সবগুলো জানোয়ার, সংখ্যায় তেইশ, সারি বেঁধে রওনা হয়েছে, সবার আগে চলেছে সংশোধনাতীত দুষ্টু ঘোড়া পন্‌টিয়াক, জোড়াবাঁধা পায়ে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি, বিশ্রীরকম লাফাতে লাফাতে। আমরা তিন-চারজন ছুটলাম ওদের ধরতে, শিশিরবিন্দুতে ঝলমল লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়েই। মাইলখানেক কিম্বা তার চাইতেও বেশীদূর ছুটে শ একটা ঘোড়া ধরে ফেল্‌ল। টানা দড়িটা ঘোড়াটার চোয়াল ঘিরে লাগামের মতো করে বেঁধে ওর পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠে শ পলাতক জানোয়ারগুলির সামনের দিকে চলে গেল তাদের পেরিয়ে, আর আমরা শীগ্‌গীরই তাদের একসঙ্গে জড়ো করে তাঁবুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম, সেখানে আমরা যে যার নিজের ঘোড়াটিকে ধরে তার পিঠের ওপর জিন পরালাম। কেউ বা দুঃখ আর কেউ বা রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন, কারণ আদ্ধেক ঘোড়াই তাদের পায়ে লাগানো কাঠের কুঁদা ভেঙে ফেলেছিল, আর অনেকগুলো ঘোড়া পায়ের বেড়ি নিয়েই ছুটতে গিয়ে ভীষণভাবে পা জখম করে ফেলেছিল।

সেই ভোরে আমরা একটু দেরি করেই যাত্রা শুরু করলাম ; আর বিকেলবেলার

প্রথমদিকেই আবার তাঁবু ফেলতে বাধ্য হলাম হঠাৎ ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি আমাদের ঘিরে ফেল্ল বলে। সেই ঝড়ে তাঁবু খাটাতেও বেশ বেগ পেতে হলো, আর সারারাত মাথার ওপর শুনলাম বজ্রের গর্জন। মুষলধারে বৃষ্টি তাঁবুর ক্যান্‌ভাস ভেদ করে আমাদের ভিজিয়ে দিয়েছিল; ভোরের আলোয় শুরু হলো ঝিরিঝিরি স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা। দুপুরের কাছাকাছি ভালো আবহাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল, আমরা আবার অগ্রসর হতে শুরু করলাম।

বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রেয়ারির বুকে কোথাও এতটুকু হাওয়ার পরশ লাগছিল না, মেঘগুলো হাল্‌কা পেঁজা তুলোর মতো দেখা যাচ্ছিল; আর আকাশের নীল রঙে যেন মাখানো ছিল একটা অস্পষ্ট অবসাদের ভাব। সূর্যের তাপ প্রায় অসহ্য হয়ে উঠলো। আমাদের চলার পথের যেন শেষ নেই; আমরা সেই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। ঘোড়াগুলি মাথা হেঁট করে গভীর কাদার ভেতর দিয়ে পা টেনে টেনে অগ্রসর হচ্ছিল, আর তাদের পিঠের ওপর সওয়াররা অলসভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে ছিল। অবশেষে সন্ধ্যার দিকেই দিগন্তে দেখা দিল আমাদের পূর্বপরিচিত বজ্রগর্ভ কালো মেঘরাশি। দূরে গভীর বজ্রনির্ঘোষও শুরু হলো, যেমনটি আমাদের ভ্রমণপথে বিকেলবেলার প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই ধ্বনির স্রোত যেন সারা প্রেয়ারির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতরই সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, আর সেই মেঘের ছায়ার তলায় গোটা প্রেয়ারি আর এখানে সেখানে ঝোপগুলো ঈষৎ লাল-বেগুনী রং ধারণ করল। হঠাৎ সেই মেঘরাশির ঘনতম অংশ থেকে একটা বিদ্যুৎ-চমক ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল প্রেয়ারির প্রান্ত পর্যন্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের প্রচণ্ড আওয়াজ হয়ে তার রেশটা গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ল কিছুক্ষণ। তারপরই পেলাম বৃষ্টির আভাসযুক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই হাওয়ায় পথের দু'ধারে লম্বা ঘাসগুলো নুয়ে পড়ছিল।

"জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলো।" বলে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল শ, তার পাশে যে ঘোডাটাকে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরে ছুটতে ছুটতে হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল। দলের অন্য সবাইও জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম সামনের গাছগুলো লক্ষ্য করে। গাছগুলো পেরিয়ে দেখলাম সামনে একটি মাঠ, যাকে আদ্ধেক ঘিরে রয়েছে এই গাছগুলো। আমরা সেই মাঠের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে যার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জিন খুলে ফেলে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ে কাঠের কুঁদা আটকে দিলাম, যেন ঘোড়াগুলো ছুটে পালাতে না পারে। এই অবস্থায় তাদের চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিলাম।

তারপর আমাদের মালপত্রের গাড়িগুলো (ওয়াগন) এসে পড়তেই চটপট তাঁবুর খুঁটিগুলো নামিয়ে নিলাম। যখন ঝড় এসে পড়ল, ঠিক তখনই আমরা তার জন্য তৈরি হয়ে গেছি। ঝড়-বৃষ্টি এলো প্রায় রাতের অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গেই : খুব কাছের গাছগুলিও গর্জনমুখর মুষলধারার আড়ালে ঢেকে গেল।

আমরা তাঁবুতে বসে আছি, এমন সময় তাঁবুর ফাঁকের মধ্য দিয়ে মুখ বাড়াল ডেস্‌লরিয়ার্স। চওড়া টুপির দু'দিক তার দুই কানের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে, আর ঘাড়ে পড়ছে বৃষ্টির ধারা।

"আপনাদের রাতের খাবার চাই তো?" বলল ডেস্‌লরিয়ার্স। "তাহলে রান্নার জন্যে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করি।"

আমরা বললাম, "রাতের খাওয়ার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না বাপু। বৃষ্টিতে ভিজো না, ভেতরে চলে এসো।"

ডেস্‌লরিয়ার্স আমাদের কথামতো তাঁবুর ভেতরে ঢুকে ঠিক প্রবেশপথের কাছেই গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল; আমাদের অত্যন্ত সমীহ করে বলে সঙ্কোচে আর ভেতরে আসতে পারল না।

সেই প্রচণ্ড বর্ষণের তলায় আমাদের তাঁবুটি যে খুব একটা ভালো আশ্রয় ছিল তা নয়। তাঁবুর ভেতরে বৃষ্টির ধারা সোজাসুজি ঢুকতে পারছিল না বটে, কিন্তু তাঁবুর ক্যান্‌ভাস ভেদ করে নেমে আসছিল ঝিরিঝিরি মৃদু বর্ষণে, আর তাতে আমরা বৃষ্টিতে ভেজার মতোই ভিজছিলাম। আমরা ভীষণ মুখ-গোমড়া করে বসে ছিলাম মাটির ওপর ঘোড়ার জিন পেতে; আমাদের টুপি থেকে গাল বেয়ে নামছিল বৃষ্টির জলের ধারা। আমার রবারের তৈরী ক্লোক থেকে মাটিতে নেমে আসছিল গোটা কুড়ি জলস্রোত, আর শ-র কম্বলের তৈরী কোটটা হয়ে গিয়েছিল জলে বোঝাই স্পঞ্জের মতো। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এই যে অনেকগুলো গর্ত দ্রুতবেগে জলে ভরে উঠছিল; বিশেষ করে তাঁবুর প্রধান খুঁটিটিকে ঘিরে যেরকম জল জমছিল তাতে ভয় হচ্ছিল তাঁবুর ভেতরটা পুরোপুরি জলে ভরে উঠবে, তার ফলে একটা রাত যে একটু আরাম করে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করব, সে-সম্ভাবনা মাঠে মারা যাবে। যাই হোক, ঝড়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল, সূর্যাস্তের কাছাকাছি তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। প্রেয়ারির পশ্চিম কিনারায় দেখা দিল অস্তাচলে ঢলে পড়া সূর্যের শেষ আলোয় রঙীন একফালি উজ্জ্বল লাল আকাশ; অস্তরবির রশ্মিগুলো বর্ষণ-স্নাত ঝোপে ঝোপে আর ঘাসে ঘাসে বহু রঙে বিচ্ছুরিত হয়ে ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল। তাঁবুর ভেতরে যে ছোট ছোট খাদে জল জমা হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

কিন্তু দেখা গেল আমরা প্রবঞ্চনাময়ী আশার ছলনায় ভুলেছিলাম। রাত্রি শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝড়-বৃষ্টি আবার শুরু হলো। এখানে বজ্র অতলান্তিক উপকূলের বজ্রের মতো তেমন নিরীহ নয়। সোজাসুজি আমাদের মাথার ওপর ভীষণ শব্দে ফেটে পড়ে সে যেন তরঙ্গে তরঙ্গে তার ভীম গর্জন ছড়িয়ে দিল প্রেয়ারির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আর আকাশের সীমাহীন বিস্তারে। সারারাত ধরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল তার হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিভূমির অনেকখানি দৃষ্টিগোচর করে আর পরক্ষণেই আমাদের চারধারে অন্ধকারের ঘন কৃষ্ণ যবনিকা ফেলে।

এতে অবশ্য আমাদের খুব বেশী অসুবিধা ঘটেনি। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের আওয়াজে ঘুম ভেঙে টের পাচ্ছিলাম বিদ্যুতের দাপাদাপি চলেছে আকাশে, আর আমাদের মাথার ওপরে তাঁবুর ক্যান্‌ভাসের ছাদ বেয়ে নামছে বাদলধারা। মাটির ওপর বিছানো রবারের চাদর, তার ওপর কম্বল বিছিয়ে আমরা সেই কম্বলের ওপর শুয়েছিলাম। কিছুকাল তারা বেশ ভালোভাবেই জল আট্‌কেছিল, কিন্তু তারপর জল জমে জমে উঁচু হয়ে যখন তাদের কিনারার ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল তখন জল ধরে রাখার কাজেও তারা তেমনি দক্ষতা দেখাল, যার ফলে রাতের শেষের দিকে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে জলের ওপরই শুয়ে ছিলাম।

শেষকালে ভোরবেলা জেগে উঠে দেখা গেল অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়—বৃষ্টি মুষল-ধারায় না হলেও এমন অবিরাম ধারায় একটানা ঝরেই চলেছে যে আমাদের তাঁবুর ক্যান্‌ভাস জলে সপ্‌সপে হয়ে ঝুলে পড়েছে। আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে নিলাম যার যার কম্বল থেকে, যাদের প্রত্যেকটি আঁশের ওপর ঝিক্‌মিক করছে ছোট ছোট জলবিন্দু আর আঁশগুলো যেন বৃথা আশা নিয়ে তাকিয়ে দেখছে ভালো আবহাওয়ার এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কিনা। সীসার মতো ধূসর রঙের মেঘপুঞ্জ ভাসছিল আকাশের হেথায় হোথায়, আর নীচে দেখা যাচ্ছিল শুধু ছোট ছোট ডোবার পর ডোবা, ঝড়-বৃষ্টিতে এলিয়ে পড়া ঘাস, আর আমাদের ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোর পায়ে-দলা কাদা। অদূরে দেখা যাচ্ছিল নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা হয়েছে আমাদের সঙ্গীদের তাঁবুর, আর তাঁদের মাল-টানা গাড়িগুলোরও বৃষ্টিতে ভিজে দুরবস্থার একশেষ হয়েছে। ক্যাপ্টেন তখন সবেমাত্র ঘোড়াগুলোর ভোরাই পরিদর্শন-পর্ব সেরে ফিরছেন বৃষ্টি আর কুয়াসার মধ্য দিয়েই দৃঢ় পদক্ষেপে; তাঁর কাঁধে জড়ানো পশমী উত্তরীয়, গোঁফের তলা থেকে মাথা বাড়িয়ে আছে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মতো অনুজ্জ্বল রঙের পাইপ, আর ঠিক তাঁর পিছনে পিছনে আসছেন তাঁর ভাই জ্যাক।

দুপুরবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, আমরা রওনা হলাম, এগিয়ে চললাম ছ'ইঞ্চি

গভীর কাদা আর আঠালো মাটিতে পা ফেলে ফেলে। সে-রাতটায় আর অন্যান্য রাতের মতো মুষলধারা নামেনি, আমাদেরও ধারাস্নানের দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি।

পরদিন বিকেলে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, আমাদের ডানদিকে একটু দূরেই বনজঙ্গল। জ্যাক সি— ঘোড়ায় চড়ে চললেন আমাদের একটু আগে আগে। সারাদিন তিনি একটি কথাও বলেননি, এখন হঠাৎ পিছন ফিরে ঐ বনজঙ্গলের দিকে দেখিয়ে তিনি তাঁর ভাইকে চীৎকার করে ডেকে বললেন, "বিল! এই যে একটা গরু।"

ক্যাপ্টেন সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন, তারপর দু'ভায়ে মিলে একসঙ্গে বৃথা চেষ্টা করলেন এই লোভনীয় জিনিসটিকে পাকড়াও করতে। কিন্তু গরুটা তাঁদের মতলব সম্বন্ধে উপযুক্ত কারণেই সন্দিহান হয়ে গাছগুলোর ভেতরে লুকিয়ে পড়ে আশ্রয় নিল। দুই ভায়ের সঙ্গে 'র' যোগ দিলেন, আর তিনজনে মিলে গরুটাকে শীগ্‌গীরই বার করে আনলেন। গরুটার চারদিকে ঘোড়ায় চডে তাঁদের দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি আমরা লক্ষ্য করলাম, দেখলাম টানা দড়ি দিয়ে ফাঁস বানিয়ে সেই ফাঁস দিয়ে গরুটাকে তাঁরা আটকাতে বৃথা চেষ্টা করছেন। অবশেষে তাঁরা অপেক্ষাবৃত মোলায়েম এবং ভদ্র উপায় অবলম্বন করে সফল হয়ে গরুটাকে আমাদের দলের সঙ্গে-সঙ্গেই নিয়ে চললেন। একটু পরেই ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত যথারীতি শুরু হলো, হাওয়া এত জোরে বইতে লাগল যে বৃষ্টির ধারা তারই প্রবল ঝাপ্‌টায় প্রেয়ারিভূমির প্রায় সমান্তরালভাবে ছুটতে লাগল জলপ্রপাতের মতো গর্জন করতে করতে। ঘোড়াগুলো ঝড়ের দিকে পিছন ফিরে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরম প্রশান্তভাবে প্রকৃতির সেই দাপট সইতে লাগল। আমরাও দুই কাঁধের মাঝখানে মাথা গুঁজে সামনের দিকে ঝুঁকে রইলাম, যেন প্রাকৃতিক দাপট যা কিছু পিঠের ওপর দিয়েই যায়। এই ফাঁকে গরুটা এই গোলমালের সুযোগ পেয়ে ছুটে পালাল। এতে ক্যাপ্টেন বড অস্থির হয়ে পডলেন। ঝড়-ঝাপ্‌টা তুচ্ছ করে তিনি তাঁর টুপিটা বেশ আঁটসাঁট করে কপালের ওপর টেনে দিয়ে খাপ থেকে মহিষ-শিকারের মস্ত পিস্তলটা হ্যাঁচকা টান মেরে বার করে নিয়ে দ্রুতবেগে সেই গরুটার পিছু নিলেন। বেশ কিছুক্ষণের জন্যে কুয়াসা আর বৃষ্টির অভেদ্য আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তাঁরা দুজন—ক্যাপ্টেন আর সেই গরুটি। তারপর হঠাৎ শোনা গেল ক্যাপ্টেনের উচ্চকণ্ঠ ; দেখলাম আইরিশ বীরপুরুষের ভঙ্গিতে ঘোড়া-টানা পিস্তলটা নিরাপত্তার জন্য উঁচুতে তুলে ধরে ঝড়ের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন, মুখমণ্ডলে উদ্বেগ আর উত্তেজনার চিহ্ন। গরুটা তাঁর আগে আগে আসছিল, কিন্তু তার ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল আবার তার পালাবার ইচ্ছে ;

ক্যাপ্টেন আমাদের চেঁচিয়ে বলছিলেন গরুটাকে মুখোমুখী আট্‌কাতে। কিন্তু বৃষ্টির জল ঢুকে গিয়েছিল আমাদের কোটের কলারের পিছন দিক দিয়ে, ঘাড় বেয়েও নামছিল জলের ধারা, তাই পাছে জল আমাদের কোটের ভেতর আরো বেশী করে ঢুকে পড়ে এই ভয়ে আমরা মাথা নাড়তে সাহস না পেয়ে একটুও নড়াচড়া না করে শক্ত হয়ে বসে ক্যাপ্টেনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাঁর ক্ষ্যাপার মতো অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসাহাসি করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত গরুটা হঠাৎ একটা লাফ মেরে পালিয়ে গেল ; ক্যাপ্টেন বেশ জোরালো ভাবে পিস্তলটি ধরে নলের খোঁচা মেরে ঘোড়াটাকে গরুর পিছনে জোরে ছুটিয়ে দিলেন, পরিষ্কার বোঝা গেল তাঁর একটা বদ মতলব আছে। একটু পরেই আমরা পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেলাম ; বৃষ্টির দরুন আওয়াজটা মৃদু শোনালো। তারপর পুনরাবির্ভূত হলেন বিজয়ী এবং বিজিত, অথবা শিকারী এবং তাঁর শিকার—ক্যাপ্টেন আর গুলীবিদ্ধ অসহায় গরুটি।

কিছুক্ষণের ভেতর ঝড় শান্ত হয়ে এলো, আমরা আবার অগ্রসর হতে লাগলাম। গরুটাকে জ্যাকের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ; জ্যাকের হেফাজতেই সে হেঁটে চল্‌ল—হাঁটতে একটু কষ্টই হচ্ছিল তার। ক্যাপ্টেন ঘোড়া চালিয়ে চললেন আমাদের আগে আগে, তাঁর পুরোনো ভূমিকা অনুযায়ী অগ্রগামী রূপে। আমাদের চলার পথের আড়াআড়ি একটি ছোট্ট নদীর তীরে লম্বা একসারি গাছ। সেই দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় দেখলাম আমাদের 'অগ্রগামী' ক্যাপ্টেন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে বেশ একটু উত্তেজিতই মনে হলো, কিন্তু মুখে একগাল হাসি।

তিনি চীৎকার করে আমাদের বললেন, "গরুটা তোমাদের পিছনেই পড়ে থাক্‌। এই যে ওর মালিকেরা।"

সত্যিই যখন গাছের সারির দিকে এগিয়ে গেলাম তখন দেখতে পেলাম গাছগুলোর পিছনে কী যেন একটা সাদা জিনিস রয়েছে, দেখতে তাঁবুর মতো। আশা করেছিলাম ওটা হয়তো মর্মনদের তাঁবু ; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম তা নয়, জনশূন্য প্রেয়ারির বুকে পথের ধারে একটা মস্ত সাদা পাথরের স্তূপ মাত্র। গরুটা সুতরাং আমাদের দখলেই ফিরে এলো। আমরা ফের তাঁবু না ফেলা পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চল্‌ল। তাঁবু ফেলবার পর 'র' তাঁর ইংলণ্ডে তৈরী দোনলা বন্দুকটি নিয়ে এসে গরুটার বুক লক্ষ্য করে একটি গুলী, তারপর আরেকটি গুলী চালালেন। আমাদের খাদ্যভাণ্ডারে খুব প্রাচুর্য ছিল না ; গরুটিকে বেশ কায়দা করে কেটেকুটে নেবার ফলে তাতে বেশ একটি উপাদেয় সংযোজন হলো।

দু-একদিনের মধ্যেই আমরা 'বিগ ব্লু' (মস্ত নীল) নামক একটি নদীতে পৌঁছলাম। এ অঞ্চলের সবগুলো নদীর নামই এরকম সুন্দর। সেদিন সারাটা ভোরবেলা আমাদের কেটেছে ডোবার পর ডোবা আর ছোট ছোট নদী পার হবার হাঙ্গামায়, কিন্তু এই 'মস্ত নীল' নদীর তীরবর্তী ঘন বনানী পেরিয়ে দেখলাম আমাদের সামনে রয়েছে আরো অনেক কঠিন বাধা, কারণ বর্ষার জলে ফুলে উঠে নদীটা হয়ে উঠেছিল প্রশস্ত, গভীর আর খরস্রোতা।

আমরা যথাস্থানে (অর্থাৎ নদীর ধারে) গিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই 'র' তাঁর পোশাক ছেড়ে ফেলে একটা দড়ির এক মাথা দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে, অথবা অগভীর জলের স্রোত ঠেলে ওপারে চলে গেলেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম তাঁর এই প্রচণ্ড উৎসাহ আর প্রস্তুতি কিসের জন্য। একটু পরেই শুনলাম তিনি চীৎকার করে বলছেন—"দড়ির ও-মাথাটা ঐ খুঁটিটার চারদিকে এক পাক ঘুরিয়ে আট্‌কে ফেল। ওহে সরেল, শুনতে পাচ্ছ? হুঁশিয়ার, বয়েস্‌ভার্ড। তোমাদের ভেতর কয়েকজন এদিকে এসে পড়ো, এসে আমাকে সাহায্য করো।" যাদের উদ্দেশে এত কথা, তারা কিন্তু বার বার অবিরাম ধারায় ঐ চীৎকার শুনেও তাতে কান দিল না। হেনরি শ্যাটিলন পরিচালনা করার ফলে কাজটা বেশ শান্তভাবে আর তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। ওদিকে 'র' একটানা চেঁচিয়েই চলেছেন আর পূর্ণ উদ্যমে লাফালাফি করছেন। তাঁর পরস্পর-বিরোধী আদেশগুলো আমাদের পরম কৌতুকের কারণ হয়ে উঠেছিল; যখন তিনি দেখলেন লোকগুলো কেউ তাঁর কথামতো কাজ করবে না, তখন তিনি অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে—খুব সম্ভব মহম্মদ এবং অবাধ্য পর্বতের কাহিনীটি মনে করেই—যে যা করছিল তাকে ঠিক তাই করতে প্রচণ্ডভাবে আদেশ করতে লাগলেন। শ হেসে উঠল; তাই দেখে 'র' খুব চটে-মটে এগিয়ে এসেই থেমে গিয়ে চট্‌ করে নীরব হয়ে গেলেন।

শেষপর্যন্ত আমাদের ভেলা তৈরি সম্পূর্ণ হলো। আমরা প্রত্যেকে আমাদের বন্দুকগুলো নিজের কাছে রেখে অন্য সমস্ত জিনিসই ঐ ভেলার ওপর চাপালাম। ভেলার চারটি কোণ ধরে সরেল, বয়েসভার্ড, রাইট আর ডেস্‌লরিয়ার্স সাঁতার কেটে ভেলাটিকে নিয়ে ওপারের দিকে রওনা হলো। পরের মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি 'মস্ত নীল' নদীর ঘোলা জলে ভাসতে লাগল। ফলাফল কী হয় দেখবার জন্য আমরা উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম, শেষপর্যন্ত স্রোতের টানে অনেক দূরে গিয়ে নদীর ওপারে আমাদের ভেলাটা নিরাপদেই পৌঁছল। শূন্য ওয়াগনগুলোকে সহজেই পার করে নেওয়া গেল; তারপর যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্রোত

পার হয়ে চললাম, ছাড়া জানোয়ারগুলি আপনা থেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নদী ও মরু

সেণ্ট জোসেফ থেকে আগত যাত্রীরা যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, আমরা এবারে সে-পথের শেষপ্রান্তে এসে পৌছলাম। এ পথটি যেখানে এসে অরিগন-অভিযাত্রীদের পুরাতন এবং স্বাভাবিক যাত্রাপথের সঙ্গে মিশেছে, সেই সংযোগস্থানের কাছাকাছি ২৩শে মে তারিখে আমরা তাঁবু ফেললাম। সেদিন বিকেলবেলা কাঠ আর জলের অনুসন্ধানে ঘোড়ায় চড়ে অনেক ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়ে তারপর দেখতে পেলাম ঝোপ আর পাহাড়ে ঘেরা একটা পুকুরের জলে সূর্যাস্তের লাল আকাশের প্রতিবিম্ব। জল রয়েছে পুকুরের তলার দিকে, আর তার চারদিকে ফুলে ফুলে উঠেছে প্রেয়ারিভূমি। আমাদের তাঁবু পড়ল এই পুকুরটির ধারে; তার আগেই প্রেয়ারি-ভূমির একটি দূরবর্তী উঁচু অংশে হেনরি শ্যাটিলনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল একটি অসাধারণ বস্তু। কিন্তু সেই আর্দ্র, অস্পষ্ট আবহাওয়ায় কিছুই পরিষ্কারভাবে দেখা বা বোঝা যাচ্ছিল না। রাতের আহারের শেষে আমরা যখন আগুনের চারধারে শুয়ে ছিলাম, তখন দূর থেকে একটা মৃদু শব্দ আমাদের কানে ভেসে এল, জলহীন প্রেয়ারিতে সে-শব্দ বড় অদ্ভুত লাগল। সে-শব্দ হাসির, আর নরনারীর মৃদুস্বরে কথাবার্তার। গত আটদিনে আমরা একটি মানুষও দেখতে পাইনি, কাজেই কাছাকাছি মানুষ আছে তার এই প্রমাণ পেয়ে আমরা অত্যন্ত অভিভূত হলাম।

অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় একটি পাণ্ডুবর্ণ মুখ বিশিষ্ট লোক ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় বেয়ে নেমে এলো, তারপর অগভীর পুকুরের জলের মধ্য দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের তাঁবু পর্যন্ত উঠে এল। তার গায়ে একটা বিরাট ক্লোক, আর তার মাথার চওড়া টুপিটার দু'দিক থেকে তার কানের পাশ দিয়ে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ছে সন্ধ্যার হিম। এর পর এলো আরেকটি লোক, বেশ মোটাসোটা শক্ত গড়নের বুদ্ধিমান চেহারার। সে নিজের পরিচয় দিল একটি অভিযাত্রীদলের নেতা বলে; দলটির তাঁবু পড়েছে আমাদের তাঁবু থেকে মাইলখানেক এগিয়ে। সে বলল তার সঙ্গে রয়েছে কুড়িটি ওয়াগন; তার দলের অন্য সবাই রয়েছে 'মস্ত নীল' নদীর ওপারে, সেখানে তারা আসন্নপ্রসবা একটি স্ত্রীলোকের জন্য অপেক্ষা করছে, আর নিজেদের

ভেতর ঝগড়া করছে। মুখোমুখী সাক্ষাৎ এই প্রথম হলেও আমাদের যাত্রাপথে অন্যান্য অভিযাত্রীদের যাত্রার অনেক করুণ চিহ্ন দেখেছি। পথের ধারে দেখেছি এমন অভিযাত্রীদের কবর, চলার পথেই অসুখে পড়ে যার মৃত্যু হয়েছিল। সাধারণতঃ এই কবরগুলোর মাটি তুলে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হতো, আর মাটির ওপর ঘন ঘন নেকড়েদের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেতাম। কতকগুলো কবর অবশ্য নেকড়েদের এই অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছিল। একদিন ভোরবেলা আমরা লক্ষ্য করলাম ঘাসে ঢাকা একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপরে সোজা দাঁড়িয়ে আছে একটা তক্তা। আমরা ঘোড়ায় চড়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখলাম তক্তাটার বুকে বোধকরি গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়েই অস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে :

মেরি এলিস
মৃত্যু : ৭ই মে, ১৮৪৫
বয়স : দু'মাস

এ ধরনের চিহ্ন তো প্রায়ই দেখা যেত।

পরদিন ভোরে তাঁবু ভেঙে ফেলতে একটু দেরিই হয়েছিল। তারপর এক মাইল রাস্তাও বোধহয় যাইনি, যখন আমরা দেখতে পেলাম আমাদের অনেক আগে সুদূর দিগন্তে প্রেয়ারিভূমির কিনারায় একসারি কী বস্তু যেন দাঁড়িয়ে আছে সমান দূরে দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মধ্যবর্তী একটা উঁচু জায়গার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই চড়াই বেয়ে উঠে মিনিট পনেরো বাদে দেখলাম আমাদের সামনেই একটি দেশান্তরযাত্রী ক্যারাভান, যার ভারী সাদা ওয়াগনগুলি এক লম্বা সারিতে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর তাদের পিছনে পিছনে আসছে মস্ত একঝাঁক গবাদি পশু। আধা ডজন পীতবদন ঘোড়সওয়ার মিজুরিয়ান (মিজুরি অঞ্চলের অধিবাসী) নিজেদের ভেতর চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাঁটি করছিল ; তাদের লিক্‌লিকে শরীরে বাদামী রঙের তাঁতে-বোনা কাপড়ের পোশাকগুলো কোনো মেয়ে-দর্জির হাতে তৈরি বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা চীৎকার করে বলল, "কি গো ছেলেরা ? কোথায় চলেছ তোমরা—অরিগন না ক্যালিফর্নিয়া ?"

আমরা দ্রুতবেগে ওদের ওয়াগনগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম সাদা আচ্ছাদন সরিয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ওয়াগন থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখছে ; আর ওয়াগনের সামনের দিকে বসে মুখে চিন্তার ছাপ আঁকা, শীর্ণ চেহারার প্রবীণারা অথবা স্বাস্থ্যোচ্ছলা বয়স্থা মেয়েরা তাদের হাতের বোনা থামিয়ে রেখে বিস্ময়ভরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। প্রত্যেক ওয়াগনের পাশে ওয়াগনের

মালিক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন বলদগুলোকে এগিয়ে চলার জন্য তাড়া দিতে দিতে, আর বলদগুলো কাঁধ দিয়ে জোয়াল ঠেলে ঠেলে বিপুল বোঝা টেনে টেনে ইঞ্চি ইঞ্চি করে যেন অন্তহীন যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছে। সহজেই বোঝা যাচ্ছিল এই যাত্রীদলের ভেতর রয়েছে ভীতি আর মতবিরোধের আবহাওয়া; এদের পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন —একজন বাদে এরা সবাই অবিবাহিত—একবার ঈর্ষাব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখছিল আমরা কেমন হাল্‌কাভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি, আর পরক্ষণেই অধীরভাবে তাকাচ্ছিল তাদের নিজেদের মাল-বোঝাই ভারি ওয়াগন আর মন্থরগতি বলদগুলোর দিকে। অন্য পুরুষদের আর মোটে এগোবার ইচ্ছেই ছিল না যতক্ষণ না তাদের পিছে ফেলে আসা সঙ্গীরা এসে তাদের ধরে ফেলে। অনেকের মুখেই তাদের নির্বাচিত নেতার বিরুদ্ধে নালিশ এবং নেতার পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা শোনা যেতে লাগল; এদের এই ক্ষ্যাপামিতে ইন্ধন যোগাচ্ছিল ঐ পদটির জন্যে লোলুপ কয়েকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। আর মেয়েদের মনে ছিল একদিকে যেমন ছেড়ে আসা ঘরবাড়ির জন্য আফসোস, অন্যদিকে তেমনি তাদের সম্মুখে মরুভূমি আর অসভ্য বর্বরদের সম্পর্কে আতঙ্ক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাদের পিছে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেলাম, আশা করলাম তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীদের ওয়াগনটি এক জায়গায় গভীর কাদায় এমনভাবে আটকে গেল যে সেটা কাদা থেকে ছাড়িয়ে নেবার আগেই সেই ক্যারাভানের প্রথম গাড়িটা অদূরবর্তী একটা উৎরাই বেয়ে নেমে কাছাকাছি এসে পৌঁছল। তারপরে পর পর এলো আরো অনেক গাড়ি। তখন প্রায় মধ্যাহ্নবেলা, আর এ-জায়গায় ছায়া আর জল দুই-ই পাবার আশা আছে; আমরা খুশী হয়ে দেখলাম ওরা এখানেই তাঁবু ফেলবে বলে ঠিক করেছে। ওদের ওয়াগনগুলোকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে রাখা হলো; গবাদি পশুগুলো মাঠে চরে বেড়াতে লাগল; আর ওদের পুরুষেরা বিরক্ত, বিমর্ষ মুখে কাঠ আর জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের সন্ধান খুব যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এমন মনে হলো না। আমরা সে-জায়গা ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম একটি লম্বা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া লোক তার আপন হাতে জলে ভরা একটা টিনের বাটির ভেতরে দৃষ্টি হেনে পুব অঞ্চলের লোকদের মতো নাকী সুরে বলছে—"দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, কত জীব কিল্‌বিল্‌ করছে এর ভেতর।"

বাটিটা সে বাড়িয়ে ধরতেই দেখা গেল সত্যি সত্যি ওটার ভেতর বহু এবং বিচিত্র রকমের প্রাণী আর উদ্ভিদ রয়েছে।

ঘোড়ায় চড়ে ছোট্ট পাহাড়টার ওপরে উঠে গিয়ে পিছন ফিরে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম ঐ দেশান্তর-যাত্রীদের তাঁবুতে কিছু একটা গোলমাল চলেছে। ওদের পুরুষেরা এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেন কি-একটা বিষয় নিয়ে ক্রুদ্ধভাবে আলোচনা করছিল।

দেখা গেল 'র' তাঁর জায়গায় নেই ; ক্যাপ্টেন আমাদের জানালেন তিনি ঐ অভিযাত্রীদলেরই এক কামারের কাছে গেছেন তাঁর ঘোড়ার খুরে নাল পরাতে। আমাদের মন যেন বলতে লাগল একটা অঘটন আসন্ন ; যাই হোক, আমরা তবু এগিয়ে চললাম, এবং মোটামুটিরকম পানযোগ্য জলের একটি স্রোতস্বিনী পেয়ে তারই ধারে থেমে পড়লাম বিশ্রাম এবং আহারাদির উদ্দেশ্যে। 'র' তখনো পিছনে পড়ে। অবশেষে মাইলখানেক দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় যেন আকাশের গায়ে আঁকা স্পষ্ট ছবির মতো ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেখা দিলেন তিনি ; তার পিছনে দেখতে কী যেন একটা সাদা জিনিস ধীরে ধীরে উঠে এসে আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো।

আমরা বলাবলি করলাম—"বোকচন্দ্র কী নিয়ে আসছেন সঙ্গে করে?"

পরমুহূর্তেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ধীর গম্ভীর ভাবে এক সারির পিছনে আরেক সারি, এইভাবে চার সারি বলদ আর চারটি অভিযাত্রী ওয়াগন পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে এসে উৎরাই বেয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই নেমে এলো, সবার আগে আগে 'র' ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুব ডাঁটের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। যতদূর বুঝতে পারা গেল, 'র'-র ঘোড়ার খুরে যখন নাল পরানো হচ্ছিল, তখন ঐ অভিযাত্রী দলের ভেতর যে মতবিরোধ চাপা ছিল তা খোলাখুলি ঝগড়ার রূপ নিয়েছিল। দলের ভেতর কেউ কেউ জোর গলায় বলেছিলেন এগিয়ে চলো, কেউ কেউ বলেছিলেন যেখানে আছি সেখানেই থাকা যাক, আর কেউ কেউ ব্যস্ত হয়েছিলেন ফিরে যেতে। দলের নেতা কিয়ার্সলি শেষটায় উত্ত্যক্ত হয়ে নেতৃত্বভার ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "এবার তোমাদের ভেতর কারও যদি এগিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, চলে এসো আমার সঙ্গে।"

চারটি ওয়াগন, দশজন পুরুষ, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি শিশু, এই নিয়ে তৈরি হয়েছিল এগিয়ে চলার দল, আর 'র' তাঁর ঝামেলা বাধাবার চিরদিনের স্বভাব অনুযায়ী তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে। তাঁর এই গুরুভার মিতালির বোঝা যেচে নেওয়ার মূলে নিশ্চয় ছিল ইণ্ডিয়ানদের ভয়—এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ আমি ভেবে পাই না। তা যাই হোক, এই মিতালির ব্যাপারে আমরা খুব উৎসাহ বোধ করিনি বা প্রকাশ করিনি। আমাদের সঙ্গে এসে যারা এভাবে জুটল, মানুষ হিসেবে তারা খুবই ভালো ; আচরণে একটু রুক্ষ হলেও দিলখোলা,

মর্দানা আর চালাকচতুর। ওদের সঙ্গে আমরা ভ্রমণ করতে পারব না, সে-কথা বলা তখন একেবারেই অসম্ভব। আমি শুধু কিয়ার্সলিকে এইটুকুই মনে করিয়ে দিলাম যে তার বলদগুলো যদি আমাদের অশ্বতরগুলোর সমান গতিতে এগোতে না পারে তাহলে তাকে পিছেই পড়ে থাকবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে, কারণ আমাদের যাত্রা আরও বিলম্বিত করতে আমরা রাজি নই। তাতে সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল তার বলদগুলোকে আমাদের অশ্বতরগুলোর সঙ্গে সমান গতিতে "চলতেই হবে", না পারলে সে তাদের পারিয়ে ছাড়বে।

পরদিন হলো কি, আমাদের ইংরেজ সঙ্গীদের ওয়াগনের ঘানিগাছটি (অর্থাৎ দুটি চাকার সংযোগ-দণ্ডটি) ভেঙে গেল, আর পুরো জবড়জং যন্ত্রটি হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল এক ছোট্ট নদীর খাতের ভেতর। তার মানে আমাদের পুরো একটা দিনের কাজ বাড়ল। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দেশান্তরযাত্রী সঙ্গীরা না থেমে এগিয়েই চলল। তারা তাদের জোয়ান বলদগুলোকে এমন জোরালোভাবে চালিয়ে নিয়ে গেল যে ওয়াগনের ঘানিগাছ ভেঙে যাওয়া এবং অন্যান্য নানারকম দুর্ঘটনার জের সামলে নিয়ে তারপর এগিয়ে গিয়ে তাদের ধরতে আমাদের পুরো এক হপ্তা লেগে গেল। এই এক হপ্তা বাদে এক বিকেলবেলা দেখলাম তারা ধীরে ধীরে প্লাট নদীর বালুকাময় তীর বেয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের ভ্রমণের এই পর্যায়ে এ সম্ভাবনা খুবই ছিল যে পনীরা আমাদের ওপর ডাকাতির চেষ্টা করবে। আমরা এজন্য পালা করে পাহারা দিতে লাগলাম ; রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে পাহারার জন্য দুজন করে লোক নিযুক্ত করা হলো। ডেস্‌লরিয়ার্স আর আমি একসঙ্গে পাহারা দিলাম। আমরা নিখুঁত যথাযথভাবে সামরিক কায়দায় তাঁবুর সামনে এদিক ওদিক পায়চারি করতাম না ; আমাদের নিয়ম-তান্ত্রিক কড়াকড়ি কিছু ছিল না। আমরা কম্বলে দেহ জড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসলাম। ডেস্‌লরিয়ার্স শুধু পাহারাদারই নয়, আমাদের রাঁধুনীও বটে, সে আমাদের ভোরাই খাওয়ার জন্য একটা হরিণের মাথা সেদ্ধ করার কাজে লেগে গেল। তবু কিন্তু দলের কতকগুলো লোকের তুলনায় আমরা ছিলাম আদর্শ পাহারাদার, কারণ পাহারাদারেরা সাধারণতঃ বন্দুকটা মাটির ওপর রেখে নাক পর্যন্ত কম্বলে জড়িয়ে প্রেয়সীর ধ্যান করত বা অন্য যে-কোনো বিষয়ে খুশীমতো মাথা ঘামাতো। পাহারার ব্যাপারে এহেন গাফিলতি চলতে পারে কেবলমাত্র সেখানেই, যেখানকার আশে-পাশের ইণ্ডিয়ানদের শত্রুতা শুধু যাত্রীদের ঘোড়া এবং অশ্বতর চুরি করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যদিও পনী ইণ্ডিয়ানদের সব সময় বিশ্বাস করা উচিত নয় ; কিন্তু আরো পশ্চিমে

কতকগুলি অঞ্চলে প্রত্যেক পাহারাদারকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন আগুনের আলো এসে তার গায়ে না পড়ে, কারণ তাকে আলোয় দেখা গেলে কোনো অন্ধকার আড়াল থেকে কোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষ্যবেধী তার ওপর গুলী বা তীর চালাতে পারে।

আমাদের তাঁবুর আগুনের চারধারে যেসব গালগল্প চালু হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি গল্প বলেছিল বয়েসভার্ড। গল্পটি এখানে বলা অবান্তর হবে না। সে একবার ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানদের এলাকার সীমান্তে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তাদের ঘোড়াগুলোর সাজসজ্জা ঠিক করছিল। পাহারাদার লোকটি যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করাই উচিত ভেবে নিজেকে আগুনের আলোর বাইরে রেখে বসে বসে চারদিকে নজর রাখছিল। বেশ কিছুক্ষণ পাহারা দেবার পর সে টের পেল একটি কালো লোক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে আলোর বৃত্তের ভেতর। পাহারাদার তাড়াতাড়ি বন্দুকের ঘোড়াটা পিছনদিকে টেনে গুলী চালাবার জন্য তৈরি হলো। ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানটার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছিল সজাগ; ঘোড়া-টানা শব্দ সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গেল। ধনুকের ছিলায় আগেই তীর পরানো ছিল, লোকটা তীরসুদ্ধ ধনুক তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে দিল। নিশ্চিত, নির্ভুল লক্ষ্যে তীর দিয়ে পাহারাদারের গলা ভেদ করে জোরে একটা চীৎকার দিয়ে লোকটা লাফ মেরে তাঁবু থেকে পালিয়ে গেল।

আগুনের ধারে বসে বসে চুরুট টানছিল আমার পাহারা-সঙ্গী; তাকে দেখে মনে হলো বিপদের সময় এর কাছ থেকে খুব মূল্যবান সহায়তা পাওয়া নাও যেতে পারে।

তাকে প্রশ্ন করলাম—"ডেস্লরিয়ার্স, পনী ইণ্ডিয়ানরা যদি আমাদের ওপর গুলী চালায়, তাহলে তুমি কি পালাবে?"

ডেস্লরিয়ার্স দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।" ঠিক এমনি সময় প্রেয়ারির একটি অদূরবর্তী অংশ থেকে ভেসে এলো ইতর-প্রাণী-কণ্ঠের এক বিচিত্র পাঁচমিশেলী তান, মনে হলো একঝাঁক নেক্ড়ে একজায়গায় জড়ো হয়ে একসঙ্গে গলা ছেড়েছে। ডেস্লরিয়ার্স হাসতে হাসতে মুখ তুলে ঐ পাঁচমিশেলী আওয়াজের আশ্চর্য মজাদার নকল করতে লাগল। তাতে ওদিকের আওয়াজও আরো জোরদার হয়ে উঠল, যেন এদিকে একজন সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর সাড়া পেয়ে ওদিকের গাইয়েরা ক্ষেপে উঠেছে। ওদিকের আওয়াজ নানারকমের হলেও বেরোচ্ছিল কিন্তু একটি ছোট্ট নেক্ড়ের গলা থেকে। নেক্ড়েটা আকারে একটা ছোট্ট স্প্যানিয়েল কুকুরের মতো, আর একা বসে ছিল আমার তাঁবুর কিছু দূরে। নেক্ড়েটা যে-জাতের তার নাম 'প্রেয়ারির নেকড়ে': এ জাতের নেক্ড়ে চেহারায় হিংস্র হলেও স্বভাবে তা নয়।

এদের সবচেয়ে খারাপ স্বভাব যা, তা হচ্ছে ঘোড়াদের ভেতর ঘুরঘুর করা, আর ঘোড়াগুলোকে তাঁবুর বাইরে চারধারে যে কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় সেগুলোকে দাঁতে কামড়ে-কামড়ে কেটে দেওয়া। এর চাইতে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর চেহারার এবং স্বভাবের জানোয়ার প্রেয়ারি অঞ্চলে বিচরণ করে। এরা হচ্ছে সাদা আর ধূসর রঙের নেক্‌ড়ে, যাদের গভীর গর্জন আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম, কখনো কাছে, কখনো দূরে।

পাহারায় অনেকক্ষণ জেগে আমার একটু তন্দ্রাভাব এলো। তা থেকে জেগে দেখি ডেস্‌লরিয়ার্স গভীর ঘুমে নিমগ্ন। শৃঙ্খলাভঙ্গের এই নমুনা দেখে মর্মাহত হয়ে আমি আমার বন্দুকের বাঁট দিয়ে খুঁচিয়ে তার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু লোকটার ওপর মায়া হলো, ঠিক করলাম তাকে কিছুক্ষণ ঘুমোতে দেবো, তারপর তাকে জাগিয়ে কর্তব্যে এমন অবহেলার জন্য ধম্‌কে দেবো। সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে আমি নীরব ঘোড়াদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাতটা ছিল ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার; ঘাসগুলো নুয়ে পড়েছিল বরফের দানার মতো শিশিরবিন্দুর ভারে। দু-এক রড দূরের তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছিল না, ঘোড়াগুলোকেও দেখাচ্ছিল ঝাপ্‌সা ছায়ার মতো—তাদের কতকগুলো গভীর নিশ্বাস নিতে নিতে ঘুমোচ্ছে আর মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে উঠছে, কতকগুলো তখনো আস্তে আস্তে আওয়াজ করে করে ঘাস চিবোচ্ছে। বহুদূরে, প্রেয়ারির কালো সীমারেখা ছাড়িয়ে, দেখা গেল একটা লাল আলো ক্রমেই ছড়িয়ে পডছে অগ্নিকাণ্ডের মতো। অবশেষে অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠল রক্তরাঙা গোল চাঁদের থালা, চারপাশের বাষ্পের জন্য তাকে আরো বড় দেখাচ্ছে যেন, দু-এক টুক্‌রো মেঘও দেখা যাচ্ছে তার পাশে। চাঁদের আলো অন্ধকার প্রেয়ারির ওপর ঝরে পড়তেই যেন এক অবাঞ্ছিত আগন্তুকের অনধিকার আবির্ভাবের প্রতিবাদেই আমাদের অনতিদূরে একটি বিকট চীৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল। সেই স্থানে এবং সেই কালে যেন মনকে আচ্ছন্ন করা, আধা-ভয়ঙ্কর কি-একটা অদ্ভুত আবহাওয়া ছিল; আমাদের ঘিরে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে চেতন বলতে ছিলাম শুধু আমরা আর ঐ জানোয়ারগুলো।

কিছুদিন বাদে আমরা পৌছলাম প্লাট নদীর কাছে। একদিন ভোরবেলা দেখি দুজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিরালা প্রান্তরে এ-ধরনের সাক্ষাতে যেমনটি স্বাভাবিক, আমরা তেমনি কৌতূহল নিয়ে তাদের দেখতে লাগলাম। তাদের ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল তারা শ্বেতাঙ্গ, যদিও—যা এ অঞ্চলের রীতির বিপরীত—তাদের কারও সঙ্গেই বন্দুক ছিল না।

"মূর্খ! মূর্খ!" বলল হেনরি শ্যাটিলন। "প্রেয়ারির ওপর দিয়ে এভাবে চলেছে! একবার পড়ুক পনীদের নজরে, তখন বুঝবে মজাটা।"

পনী ইণ্ডিয়ানদের নজরে তারা সত্যিই পড়েছিল, আর 'মজাটা'ও তারা আরেকটু হলেই বুঝে ফেলত, শুধু আমরা এসে পড়াতেই তারা বেঁচে গেল। শ আর আমি ওদের ভেতর একজনকে জানতাম, তার নাম টার্নার, তাকে আমরা দেখেছিলাম ওয়েস্টপোর্টে। সে আর তার সঙ্গী দুজনেই ছিল একটি অভিযাত্রী দলে, এদের তাঁবু ফেলা হয়েছিল সামনে কয়েক মাইল দূরে। এরা ফিরে এসেছিল হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি বলদের সন্ধানে; খামখেয়ালী দুঃসাহসের দরুনই হোক বা অজ্ঞতার দরুনই হোক, বন্দুক সঙ্গে আনেনি। এই অবহেলার ফল আরেকটু হলেই ভীষণ হতো; কারণ, ঠিক আমরা এসে পড়ার আগে আধা-ডজন ইণ্ডিয়ান তাদের কাছে এগিয়ে এসেছিল। তাদের অরক্ষিত অসহায় অবস্থা দেখে ঐ বদমায়েসদের ভেতর একজন টার্নারের ঘোড়ার লাগাম ধরে টার্নারকে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তে হুকুম করেছিল। টার্নার ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, কিন্তু তার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে পিস্তল বার করতেই সেই পনী ইণ্ডিয়ানটা পিছু হটে গিয়েছিল; আর ঠিক সেই সময় দূরে আমাদের দলের কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখেই ওদের পুরো দলটা তাদের ছোট অথচ মজবুত ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। টার্নার তবুও এতটুকু না দমে বোকার মতো এগিয়ে যাবার জিদটাই বজায় রাখল।

তাকে ছেড়ে যাবার অনেক পরে সেদিন বিকেলবেলার শেষের দিকে এক নিরানন্দ ঊষর প্রান্তরের মাঝামাঝি আমরা হঠাৎ এসে পড়লাম পনী ইণ্ডিয়ানদের সেই বিরাট চলার পথে, যে পথ দিয়ে তারা তাদের প্লাট নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো থেকে দক্ষিণ দিকে চলে যায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আর শিকারের ক্ষেত্রে। এই পথ দিয়ে প্রত্যেক গ্রীষ্মঋতুতে যাত্রা করে এক বিচিত্র মিছিল: হাজার হাজার অসভ্য মানুষ—পুরুষ, স্ত্রীলোক আর শিশু, ঘোড়া, অশ্বতর, তাদের পিঠে চাপানো অস্ত্রশস্ত্র আর নানারকম যন্ত্রপাতি, আর ঝাঁকের পর ঝাঁক জংলী কুকুর, যারা সভ্য কুকুরদের মতো মার্জিত ঘেউ-ঘেউ শেখেনি, জানে শুধু তাদের প্রেয়ারির বুনো নেকড়ে ভাইদের মতো বিশ্রীরকম চীৎকার করতে।

প্লাট নদীর নীচুদিকের গ্রামগুলোতে পনী ইণ্ডিয়ানরা সারা শীতকালটা কাটায়। কিন্তু সারাটা গ্রীষ্মকাল এই গ্রামগুলোর বেশীর ভাগ বাসিন্দা সমতল অঞ্চলগুলোতে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। এই বিশ্বাসঘাতী, ভীরুস্বভাব দস্যুরা এত বেশী লুঠতরাজ আর খুনখারাবি করে বেড়ায়, যে সরকারের হাতে কঠোর সাজাই এদের যোগ্য

পাওনা। গতবছর একজন ডাকোটা যোদ্ধা এই গ্রামগুলোরই একটিতে যে দুঃসাহসিক কাজ করেছিল তা বলবার মতো। অন্ধকার এক মধ্যরাত্রিতে সে ঐ গ্রামে একাই গিয়েছিল। গ্রামের বাড়িগুলো সবই অর্ধবর্তুলাকার, আর ছাদের মাঝখানে থাকে একটা গোল ফুটো, ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসবার জন্য। যোদ্ধাটি বাইরে থেকে বেয়ে বেয়ে একটি বাড়ির ছাদে উঠে ফুটোর মধ্য দিয়ে ভেতরদিকে তাকাল। ভেতরে অল্প অল্প যে আগুন জ্বলছিল তারই মৃদু আলোয় সে ভেতরকার ঘুমন্ত লোক-গুলোকে দেখতে পাচ্ছিল। ঐ ফুটোর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে নেমে সে খাপ থেকে তার ছোরাটা বার করে আগুনটা নেড়ে দিল, আর কাকে কাকে শিকার করবে ঠাণ্ডামাথায় বেছে ঠিক করে নিল। একটির পর একটিকে ছোরা বিঁধিয়ে হত্যা করে সে তাদের মাথার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিতে লাগল। একটি শিশু হঠাৎ জেগে চীৎকার করে উঠল। যোদ্ধা লোকটা তখন তাড়াতাড়ি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে একবার চীৎকার করে সিওক্স্ রণহুঙ্কার ছাড়ল, বিজয়গর্বে নিজের নামটা উচ্চারণ করল বেপরোয়া অবজ্ঞার স্বরে, তারপর তীরবেগে উধাও হয়ে গেল প্রেয়ারির অন্ধকার বুকে। সারা গ্রাম জুড়ে তখন উত্তেজনা আর হৈ-হল্লা—কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, মেয়েদের আর্তনাদ আর ক্রুদ্ধ যোদ্ধাদের প্রচণ্ড চীৎকার।

আমাদের বন্ধু কিয়ার্সলি-ও—পরে তাঁর সঙ্গে আবার যখন দেখা হয়েছিল তখন তাঁর কাছে শুনেছিলাম—একটা বাহাদুরির কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে এমন খুনখারাবি ছিল না। তিনি এবং তাঁর লোকেরা ছিলেন ভালো শিকারী, বন্দুক চালাতে পাকা ওস্তাদ, কিন্তু প্রেয়ারি অঞ্চলে তাঁরা নিজেদের যেন ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজনও কখনো মহিষ দেখেননি, মহিষের স্বভাব এবং চেহারা সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। প্লাট নদীর ধারে এসে পৌঁছবার পরদিন প্রেয়ারির ওপর অনেকদূর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন একটি উঁচু জায়গার ওপর অনেকগুলো কালো বিন্দু নড়াচড়া করছে।

কিয়ার্সলি বললেন, "বৎসগণ, এইবার বন্দুক ধরো। আজ রাতের আহারের জন্য টাটকা মাংস পাওয়া যাবে।" এই প্রলোভনই যথেষ্ট হলো। দশটি লোক তাদের ওয়াগন ছেড়ে কতক ঘোড়ায় চড়ে আর কতক পায়ে হেঁটেই দূরের ঐ কালো বিন্দুগুলোকে মহিষ ভেবে ঐদিকে ছুটল। মাঝখানে লম্বা একফালি তৃণাচ্ছাদিত উঁচু জায়গা ঐ 'মহিষ'গুলোকে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে দিল। আধঘণ্টা ধরে ছুটে আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঐ চড়াই বেয়ে উঠেই তাদের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল জন ত্রিশেক পনী ইণ্ডিয়ানের। দু'পক্ষই এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে বিস্ময়-বিহ্বল

এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে তীর আর ধনুক ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; তারা ভাবল তাদের সময় হয়ে এসেছে, তাদের এতদিনের অপকর্মের জন্যে পাওনা শাস্তি এইবার পেতে হবে। সেই ভয়ে তারা প্রত্যেকেই গদগদ কণ্ঠে অভিবাদন জানাল আর গভীর আন্তরিকতা দেখিয়ে মিজুরিয়ানদের সঙ্গে করমর্দন করতে উঠে এলো। মিজুরিয়ানরা মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন লড়াই আসন্ন ভেবে। বিপদটা এইভাবে কেটে গেল দেখে তাঁদেরও আনন্দের সীমা রইল না।

আমাদের সামনের দিগন্তে নীচু, ঢেউখেলানো বালুর পাহাড়ের সারি। সেদিন আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দশ ঘণ্টা ধরে এগিয়ে চললাম ; ঐ ছোট্ট পাহাড়গুলোতে যখন গিয়ে পেঁছিলাম, তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অবশেষে আমরা উঠলাম পাহাড়ের চূড়ায় ; এতদিন যার আশায় ছিলাম সেই প্লাট নদীর উপত্যকা আমাদের সামনে। আমরা সবাই ঘোড়া থামিয়ে বসে বসে সানন্দে তাকালাম সামনের দৃশ্যের দিকে। এ দৃশ্য খুবই ভালো লাগল, আশ্চর্য লাগল, কল্পনাকেও তৃপ্ত করল, যদিও এতে এমন কিছুই ছিল না যাকে 'ছবির মতো' বা সুন্দর বলা চলে ; তা ছাড়া বিরাট বিস্তার, জনহীনতা আর বন্যতা ভিন্ন এমন আর কিছুই ছিল না যাকে জমকালো বলা যেতে পারে। আমাদের নীচে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ভূমি হ্রদের বুকের মতো সমতল ; মাঝে মাঝে এখানে সেখানে প্লাট নদী সরু সরু শাখা ছড়িয়ে দিয়ে এই সমতলভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, আর কোথাও বা ঘন-সন্নিবিষ্ট কতকগুলো গাছের ঝোপ যেন সমতল প্রান্তরের সমুদ্রে ছায়া-ঘন দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এই বিরাট প্রান্তর জুড়ে আর কোনো প্রাণী চলাফেরা করছিল না, বালুর ওপর দিয়ে বড় বড় ঘাস আর কাঁটাঝোপের ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত সঞ্চরমাণ গিরগিটি ছাড়া।

আমাদের ভ্রমণের বেশী ক্লান্তিকর অংশটা তখন আমরা পার হয়ে এসেছি ; কিন্তু লারামী কেল্লায় পৌছতে তখনো আরো চারশ' মাইল বাকি। এই চারশ' মাইল যেতে আমাদের তিন সপ্তাহ লাগল। পুরো এই তিন সপ্তাহ আমরা অগ্রসর হলাম একটি লম্বা, সরু, বালুকাময় সমতলভূমির মাঝখান দিয়ে, এই অঞ্চলটি ছড়িয়ে গিয়ে প্রায় রকি পর্বতমালাতে গিয়ে পেঁছেছে। এই উপত্যকার ডাইনে বাঁয়ে এক বা দু' মাইল দূরত্বে দু'সারি বালুর পাহাড়, মাঝে মাঝে ভেঙে ভেঙে গিয়ে তারা অদ্ভুত রূপ নিয়েছে ; আর তাদের ওধারে রয়েছে ঊষর, পথরেখাহীন পরিত্যক্ত প্রান্তর, শত শত মাইল বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে একদিকে আরক্যানসাস, অন্যদিকে মিজুরি পর্যন্ত। আমাদের সামনে পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতলভূমি চলেছে একটানা, একঘেয়ে

সমতলভাবে—কখনো সূর্যের আলোয় ঝলমল, গরম, নিরাবরণ বালু, কখনো বা লম্বা, স্থূল ঘাসে ঢাকা। মহিষের মাথার খুলি আর সাদা হাড় সর্বত্র এলোমেলো ছড়ানো; মাটির বুকে তাদের অগুনতি পায়ের ছাপ। মাঝে মাঝে মাটির ওপর গোল ছাপ পড়েছে যেখানে ষাঁড়ের চলাফেরা ঘটেছে গ্রীষ্মঋতুতে। প্রত্যেক পাহাড়ী খাদ থেকে নেমে এসেছে গভীর, বহু চলাচলের চিহ্ন আঁকা পথ, যে পথ দিয়ে মহিষেরা দিনে দু'বার নিয়মিতভাবে দল বেঁধে আসে প্লাট নদীতে জল পান করতে। সমতলভূমির মাঝখান দিয়েই বয়ে চলেছে ঘোলাটে জলের এই খরস্রোতা নদী, চওড়ায় আধ মাইল কিন্তু পুরো দু'ফুটও গভীর নয়। এ নদীর নীচু দুই তীরের অধিকাংশ জায়গায় একটি ঝোপ বা গাছও নেই, আছে আল্‌গা বালু যা নদীর জলের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে পান করতে গেলে দাঁতে বালু কচকচ্‌ করে। এখানকার নগ্ন, প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যহীন ভূদৃশ্য এমনিতে বিরক্তিকর, একঘেয়ে, কিন্তু বন্য জন্তু এবং বন্য মানুষ এই উপত্যকায় প্রায়ই আসে বলেই এ জায়গাটি ভ্রমণকারীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। যাঁরাই এখানে বেড়াতে এসেছেন তাঁদের কেউ কখনো পিছনপানে তাকিয়ে তাঁর ঘোড়া এবং বন্দুকের জন্য আফসোস না করে পারবেন না।

আমরা প্লাট নদীতে পৌঁছবার পরদিন খুব ভোরে নোংরা অসভ্যদের একটা লম্বা শোভাযাত্রা আমাদের তাঁবুতে এলো। এরা প্রত্যেকেই এলো পায়ে হেঁটে, ষাঁড়ের চামড়ার তৈরী দড়ি দিয়ে তার ঘোড়াটাকে সঙ্গে টেনে আনতে আনতে। প্রত্যেকের পরনে ছিল শুধু একটি পাতলা কটিবন্ধ, আর মহিষের চামড়ার তৈরী পুরাতন পোশাক, বহুব্যবহারে ছিন্নভিন্ন, মলিন। মাথা প্রায় ন্যাড়া, শুধু কপালের মাঝখান থেকে একথাক চুল চলে গেছে মাথার তালুর ওপর দিয়ে, অনেকটা হায়েনার পিঠের ওপর লম্বা লম্বা শক্ত লোমের মতো। হাতে তার তীরধনুক, আর তার পাতলা ছোট ঘোড়াটির পিঠে চাপানো তার শিকারের সওদা—মহিষের শুক্‌নো মাংস। আমরা প্রেয়ারি অঞ্চলের খাঁটি অসভ্যদের নমুনা এই প্রথম দেখলাম—এরা নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবিহীন।

কিয়ার্সলির সঙ্গে আগের দিন যাদের মুখোমুখী হয়েছিল, এরা সেই পনী ইণ্ডিয়ান। কাছাকাছির মধ্যে যে শিকারী দল প্রেয়ারি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জানা গিয়েছিল, এরা সেই দলেরই অন্তর্গত। তারা আমাদের তাঁবুর এক ফার্লং দূর দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল, ইণ্ডিয়ানরা মনের ভেতর শয়তানী বুদ্ধি আঁটতে থাকলে বা সাজা পাবার মতো কোনো দুষ্কার্য করে থাকলে যেমন করে। আমি এগিয়ে গেলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে, তাদের সর্দারদের সঙ্গে বন্ধুভাবেই কথাবার্তা বললাম, তাকে আধা

পাউণ্ড তামাকও দিলাম, যোগ্যতার অতিরিক্ত যে দান পেয়ে সে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। এই লোকগুলি, অথবা এদেরই কতকগুলো সঙ্গী, আমাদের আগে আসা একদল যাত্রীর ওপর জঘন্য আক্রমণ করেছিল। দুজন যাত্রী দলছাড়া হয়ে পড়েছিল, তখন এরা তাদের ধরে ফেলেছিল। ওরা দুজন তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই পনীরা চীৎকার শুরু করে পিছনের যাত্রীটির পিঠ ফুঁড়ে কয়েকটি তীর চালাল। আগেকার যাত্রীটি তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে যাত্রীদলকে এ খবরটা জানাল। যাত্রীদলের মনে এমন আতঙ্ক ছেয়ে গেল যে মৃতদেহের সন্ধানেও কেউ আসতে সাহস করল না।

প্লাট অঞ্চলের জলবায়ুর তুলনায় আমাদের নিউ ইংল্যাণ্ডের জলবায়ু মৃদু এবং নাতিশীতোষ্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেই ভোরবেলাটাই ছিল গুমোট আর গরম, সূর্যের তাপটা ক্রমেই কষ্টদায়ক হচ্ছিল ; হঠাৎ পশ্চিম দিকটা অন্ধকার হয়ে এলো আর অত্যন্ত ঠাণ্ডা শিলাবৃষ্টি আমাদের দিকে এমন প্রবল বেগে আসতে লাগল যে মনে হতে লাগল যেন গায়ে হাজারো ছুঁচ বিঁধছে এসে। ঘোড়াগুলির দিকে তাকিয়ে ভারি অদ্ভুত লাগছিল ; শিলাবৃষ্টির উল্টোদিকে তারা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল, চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে রইল, আর দুরন্ত ঝাপ্টাগুলো যখন একঝাঁক নেকড়ের সমবেত চীৎকারের মতো আওয়াজ করতে করতে আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। ঝড়ের তাডা খেয়ে এক লম্বা সারিতে ছুটে এলো রাইটের অশ্বতরগুলো, শীতের ঝড়ে উড়িয়ে আনা হাল্কা পাখিদের মতো। কয়েক মিনিট ধরে আমরা সবাই একজায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আমাদের ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের কাছাকাছি মাথা গুঁজে ; কথা কইবার মতো মেজাজ তখন আমাদের কারও ছিল না। ক্যাপ্টেন মাঝে মাঝে তাঁর কোটের দুটি কলারের মাঝখান থেকে তাঁর রক্ত-রাঙা মুখটি তুলছিলেন ; দেখতে পাচ্ছিলাম ঠাণ্ডায় তাঁর মুখের পেশীগুলো অদ্ভুতরকম কুঁকড়ে গিয়ে প্রায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তিনি বিষম অসন্তুষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন, মনে হলো যে কুক্ষণে তিনি বাড়ি ছেড়ে আসবার কথা প্রথম ভেবেছিলেন তাকে প্রাণ ভরে অভিশাপ দিচ্ছেন। কিন্তু এই পরম উপভোগ্য মজার দৃশ্যটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না ; হাওয়ার দাপটটা কমে আসতেই আমরা তাঁবু খাটালাম আর সেই বিষণ্ণ মেঘলা দিনের বাকি অংশটা তাঁবুর ভেতরেই রইলাম। দেশান্তর-যাত্রীরাও আমাদের কাছাকাছিই শিবির স্থাপন করলেন। আমরাই আগে এসেছিলাম, কাজেই বনের যতটা নাগালের ভেতর পেয়েছিলাম সবটাই দখল করে নিয়েছিলাম ; আমাদের তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডটাই ভালোভাবে জ্বলছিল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে

একদল জবুথবু চেহারার লোক এসে আমাদের সেই আগুন ঘিরে বসল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ল দু'তিনজন আধা অসভ্য লোক, যারা তাদের বেপরোয়া জীবন কাটায় রকি পর্বত অঞ্চলে ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে অথবা ইণ্ডিয়ান গ্রামগুলোতে ফার (লোমযুক্ত পশুচর্ম) কোম্পানির জন্য কেনাবেচা করে। এরা সবাই ক্যানাডার লোক ; সাদা টুপির তলায় তাদের কড়া, রোদে-পোড়া চেহারা আর খোঁচা খোঁচা গোঁফ, আর মুখে বিশ্রী পাশবিক অভিব্যক্তি, দেখে মনে হয় এরা যে-কোনো অপকর্ম অম্লানবদনে করতে পারে। বস্তুতঃ এদের ভেতর বেশীর ভাগই এই চরিত্রের।

পরদিন আমরা এগিয়ে গিয়ে কিয়ার্সলির ওয়াগনগুলো ধরে ফেললাম ; তারপর থেকে দু-এক সপ্তাহ আমরা একসঙ্গেই ভ্রমণ করলাম। এই সহযোগিতায় অন্তত একটি লাভ হলো এই, যে পাহারা দেবার ক্লান্তি অনেকখানি কমে গেল, কারণ আমাদের সম্মিলিত দলটা সংখ্যায় অনেক ভারি হওয়ায় আমাদের প্রত্যেকের পাহারা দেবার পালা আসতে লাগল অনেক বাদে বাদে।

সপ্তম অধ্যায়

মহিষ

প্লাট উপত্যকায় চারদিন, অথচ একটিও মহিষের দেখা নেই! গতবছরও যে এখানে অনেক মহিষ ছিল তার প্রচুর প্রমাণ সুস্পষ্ট দেখে মন আরো খারাপ হয়ে উঠেছে। জ্বালানি কাঠের একান্ত অভাব ; দেখলাম তার বদ্‌লি হিসেবে মহিষের শুক্‌নো চর্বি চমৎকার, জ্বলেও ভালো, কিছু ক্ষতিও করে না। একদিন হয়েছে কি, ওয়াগনগুলি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেছে ; শ আর আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছি, কিন্তু হেনরি শ্যাটিলন তখনো প্রায় নিবে আসা আগুনের ধারে পা দুটি আড়াআড়ি করে বসে গম্ভীরভাবে তার বন্দুকের কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এবং পিছনে দাঁড়িয়ে তার ওয়াণ্ডট টাট্টু ঘোড়াটা তার মাথার ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। অবশেষে সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে তারপর একটু বিষণ্ণ ভঙ্গিতে তার পিঠে চড়ল। (এই ঘোড়াটির গুণের মর্মগ্রহণে একটু বাড়াবাড়ি করেই সে তার নাম দিয়েছিল "পাঁচশ' ডলার"।)

শুধালাম—"কি ব্যাপার, হেনরি ?"

"বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আগে যখনই এখানে এসেছি তখনই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেছি শুধু মহিষ আর মহিষ।"

বিকেলবেলা সে আর আমি দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম একটা কৃষ্ণসার মৃগের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরেই ডানদিকে দু-এক মাইল দূরে কোনোরকমে অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল লম্বা সাদা ওয়াগনের আর ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো ঘোড়সওয়ারের সারি ; অত্যন্ত ধীরগতি বলে মনে হচ্ছিল তারা যেন একজায়গাতেই থেমে রয়েছে। বাঁ-ধারে দেখতে পেলাম রোদে পোড়া, জনহীন ভাঙা-ভাঙা বালুর পাহাড়ের সারি। বিরাট সমতলভূমির বুক জুড়ে ঘন ঘন লম্বা ঘাস হাওয়ায় দুলে দুলে আমাদের ঘোড়া দুটির গায়ে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ; এরা মৃদু হাওয়ায় তরঙ্গ তুলে এদিকে ওদিকে দুলছিল, আর এদেরই মধ্য দিয়ে কাছে আর দূরে চলাফেরা করছিল কৃষ্ণসার মৃগ আর নেকড়ের দল। নেকড়েদের লোমশ পিঠগুলো দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণসার হরিণগুলো তাদের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের খুব কাছে এসে তাদের ছোট ছোট শিং আর সাদা গলাগুলো লম্বা ঘাসের ডগার ওপর দিয়ে গোল কালো চোখ দিয়ে খুব একাগ্রভাবে আমাদের দেখতে লাগল।

আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেকড়েদের ওপর গুলী চালাতে লাগলাম মনের আনন্দে। হেনরি চারদিকে তাকিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগল ; তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বালুর পাহাড়গুলোর দিকে দেখিয়ে আমাকে ঘোড়ায় চড়ে বসতে বলল। আমাদের কাছ থেকে দেড় মাইল দূরে দুটি কালো বিন্দু একটি পাহাড়ের সাদা বুকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে চূড়ার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার "পাঁচশ' ডলার"-এর পেটে খোঁচা মেরে সে চেঁচিয়ে বলল, "চলুন যাওয়া যাক।" আমি তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলাম ঐ পাহাড়গুলোর তলের দিকে।

একটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে একটি গভীর পাহাড়ী খাত, ক্রমেই আরো চওড়া হতে হতে। আমরা এই খাতের মধ্যে ঢুকে ঘোড়া চালিয়ে ওপরদিকে গিয়েই বালুর পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে পড়লাম। তাদের খাড়া ধারগুলির আধাআধি ন্যাড়া, অনাবৃত, আর বাকি আধা অল্প অল্প ঢাকা রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাসে আর সরীসৃপের মতো চেহারার একরকম কাঁটাঝোপে। তা থেকেও বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য সরু সরু গিরিপথ। আকাশ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, তাই সম্পূর্ণ এই পাহাড়ী এলাকাটাই আরো বেশী বীভৎস, নিরানন্দ এবং নির্জন মনে হচ্ছিল। হেনরির মুখে কিন্তু পুরো উৎসাহের ভাব আঁকা। সে তার জিনের তলা থেকে মহিষের চামড়ার তৈরী পোশাক থেকে একগাছা লোম ছিঁড়ে নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিল হাওয়া কোন্ দিকে বইছে দেখবার জন্য। হাওয়া বইছিল

সোজা আমাদের সামনের দিকে। যেদিকে হাওয়ার গতি সেদিকেই আমাদের শিকার, কাজেই তাদের গিয়ে ধরতে হলে আমাদের সাধ্যমতো দ্রুততম গতিতে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা তাড়াহুড়ো করে এই গিরিপথ ছাড়িয়ে দু'পাশের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম। কিনারার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে উঠে গেলাম ওপরদিকে। অবশেষে হেনরি হঠাৎ লাগাম কষে ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। দেখা গেল সিকি মাইল দূরে, সবচেয়ে বেশী দূরের পাহাড়ের ওপর লম্বা একসারি মহিষ বেশ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে হাঁটছে। তারপর অদূরবর্তী একটি কোটর থেকে একটার পিছনে আরেকটা আরো অনেক মহিষ উঠে আসতে লাগল আরেকটা পাহাড়ের ঘাসে ঢাকা ঢালু গায়ের ওপর দিয়ে। তারপর আমাদের কাছাকাছি একটি গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এসে দেখা দিল লোমে ঢাকা একটি মাথা আর দুটি ছোট্ট ভাঙা শিং, আর তার পিছনে পিছনে উঠে এলো বিরাটকায় জানোয়ারগুলো, শত্রু সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন। মুহূর্তের মধ্যে হেনরি মাটির ওপর লম্বা হয়ে পড়ে ঘাস আর কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পরম নিশ্চিন্ত শিকারগুলোর দিকে এগোতে শুরু করল। তার সঙ্গে ছিল দুটো বন্দুক—আমারটা আর তার নিজেরটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেনরি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল; মহিষগুলো তখনো গিরিপথ বেয়ে এসে উপত্যকায় পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল। আমি হেনরির ঘোড়াটা ধরে রইলাম, ভাবতে লাগলাম ওর মতলবটা কী। হঠাৎ পর পর খুব তাড়াতাড়ি দুটো বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, আর সবগুলো মহিষ তাড়াতাড়ি ছুট্ লাগিয়ে পাহাড়ের ওধারে পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হেনরি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, "শিকার ফস্‌কে গেল।"

হেনরি বলল, "হ্যাঁ। চলুন দেখা যাক।" সে খাদে নেমে গিয়ে বন্দুকগুলোত গুলী ভরল, তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

মহিষগুলো যে-পথে চলে গিয়েছিল পাহাড় বেয়ে আমরা সেদিকেই উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের মাথায় যখন উঠলাম, তখন মহিষের দল অদৃশ্য, কিন্তু ঘাসের ওপর একটা মহিষ মরে পড়ে আছে, আরেকটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ভীষণভাবে ছট্‌ফট্ করছে।

"এই দেখুন কিরকম ফস্‌কেছি।" বলল হেনরি। দেড়শো গজেরও বেশী দূর

থেকে সে গুলী চালিয়েছিল, কিন্তু দুটো গুলীই ভেদ করেছে দুটো মহিষের ফুস্‌ফুস—মহিষ-শিকারে ওটাই হচ্ছে মর্মস্থান।

অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল দুরন্ত ঝড়। আমাদের ঘোড়াগুলোকে মহিষ দুটোর শিং-এর সঙ্গে বেঁধে ফেলে হেনরি তখন ছুরি নিয়ে পাকা ওস্তাদের মতো দক্ষ হাতে লাশ-কাটা শুরু করল, আমি তার ব্যর্থ অনুকরণ করতে লাগলাম। আমাদের জিনের পিছনে সব সময় কাঁচা চামড়ার দড়ি ঝুলানো থাকত; তাই দিয়ে আমি কাটা মহিষের মাংস বাঁধবার চেষ্টা করতেই বুড়ো হেণ্ড্রিক বিষম ভয়ে আর রাগে পিছিয়ে গেল। অনেক চেষ্টায় তার খুঁতখুঁতি সারালাম; তারপর মহিষ দুটির খাদ্যোপযোগী অংশগুলোর ভারি বোঝা নিয়ে আমরা ফেরার পথে রওনা হলাম। গিরিপথের গোলকধাঁধা পেরিয়ে যেমনি প্রেয়ারির উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়েছি, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে শিলাবৃষ্টি সোজা আমাদের মুখের ওপর এসে যেন ঠাণ্ডা ছুঁচ বেঁধাতে লাগল। সূর্যাস্তের তখনো এক ঘণ্টা বাকি, তবুও অদ্ভুত অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ঝড়ো হাওয়ায় হিমকণাগুলো যেন গায়ের চামড়া ভেদ করতে শুরু করল, কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলোর চলার ঝাঁকানি আমাদের শরীর গরম রেখেছিল; আমরাও শিলাবৃষ্টির মুখে চাবুক মেরে মেরে ঘোড়াগুলোকে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে যেতে বাধ্য করছিলাম। প্রেয়ারির এই অংশটি ছিল শক্ত এবং সমতল। এখানে দেখলাম প্রেয়ারির কুকুরদের চমৎকার একটি বসতি গড়ে উঠেছে, চারদিকেই তাদের গর্ত ঘিরে তাজা মাটির ছোট ছোট ঢিবি যেন ছোট ছোট পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের একটি চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল না, একটির নাকও চোখে পড়ছিল না, তাদের সবাই যে যার গর্তের আশ্রয়ে বিশ্রাম করছিল। আমরা ওদের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম। ঘোড়ায় চড়ে এক ঘণ্টা হয়রান হবার পর ঝড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের তাঁবুটা ঝাপ্‌সা দেখতে পাওয়া গেল; তার একটা দিক যেমন হাওয়ার ঠেলায় ফুলে উঠেছে, অন্যদিকটা সেই অনুপাতে চুপ্‌সে গেছে, বেচারা ঘোড়াগুলো তাঁবুর কাছাকাছি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে, আর ঝড়ো হাওয়া তিনটি অর্ধমৃত গাছের ডালপালার মধ্য দিয়ে হুহু আওয়াজ করে বয়ে চলেছে। শ তাঁবুর প্রবেশপথে তার জিন পেতে তার ওপর বসে ছিল গোষ্ঠীপতির মতো গম্ভীর ভঙ্গিতে; তার মুখে পাইপ, দুটি হাত বুকের ওপর জোড়া। আমরা মাংসের বোঝা স্তূপাকারে তার সামনে মাটির ওপর ফেলতে সে খুশীমনে প্রশান্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘন অন্ধকার বিশ্রী রাতের পর সূর্য উঠে ক্লান্তিকর তাপ ছড়িয়ে দেহ-মনে এমন আলস্য এনে দিল, যে একটা বুড়ো ষাঁড় নিতান্ত বোকার মতো মন্থর গতিতে নদীতে তৃষ্ণা

মেটাতে চলেছে দেখেও ক্যাপ্টেন তাকে ছেড়ে দিলেন, এগিয়ে গিয়ে তাকে শিকার করবার উৎসাহ পেলেন না। প্লাট অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধে এই বলা গেল।

কিন্তু ক্যাপ্টেন যে কর্মোৎসাহ সবসময়ে দেখিয়ে এসেছেন তা হঠাৎ কমে যাওয়ার মূলে যে শুধু আবহাওয়া, তা নয়। আগের দিন বিকেলবেলা তিনি তাঁর দলের কয়েকজনকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন; তাঁর সেই শিকার-অভিযানের একমাত্র ফল হয়েছিল দলের বাছাই ঘোড়াগুলোর ভেতর একটির লোকসান। একটা আহত ষাঁড়কে অনর্থক তাড়া করতে গিয়ে সোরেল এই ঘোড়াটাকে ভীষণভাবে আহত করেছিল। ঘোড়ায় চড়ার আদর্শ সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের ধারণাগুলো সব আটলান্টিকের ওপার থেকে পাওয়া। সোরেল ঘোড়া ছুটিয়ে যেভাবে পাহাড়ী খাদ টপ্‌কে পার হতো, খাড়া পাহাড়ের চড়াই উৎরাই বেয়ে পূর্ণবেগে ওঠা-নামা করতো রকি পাহাড় অঞ্চলের ঘোড়সওয়ারদের মতো বেপরোয়াভাবে ঘোড়াকে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে, তাতে সোরেলের বাহাদুরি দেখে চমৎকৃত হয়ে তিনি খুব বাহবা দিতেন। ঘোড়া বেচারার দুর্ভাগ্য, তার মালিক ছিল 'র', যিনি ছিলেন সোরেলের দু'চক্ষের বিষ। মনে হলো ক্যাপ্টেন নিজেও ঘোড়ায় চড়ে একটা মহিষকে তাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দক্ষ এবং অভ্যস্ত ঘোড়সওয়ার হয়েও তিনি সে-চেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন যে জায়গার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে হবে তার অবস্থা দেখে বিস্মিত আর বিরক্ত হয়ে।

পরদিন সকালবেলা আমরা চারপাশের জায়গাগুলো পরিদর্শন করে ফিরতেই হেনরি চেঁচিয়ে বলল, "এই যে বুড়ো পেপিন আর ফ্রেডারিক, এসেছে লারামি দুর্গ থেকে।" আমরা কিছুদিন ধরেই এদের আগমন প্রত্যাশা করছিলাম। পেপিন ছিল লারামি দুর্গের প্রধান পাণ্ডা বা 'সর্দার'। নদী বেয়ে সে চলে এসেছে মহিষের চামড়ার তৈরী পোশাক ইত্যাদি নিয়ে—এগুলো গত শীতকালের ব্যবসায় পাওয়া। আমাদের মালপত্রের ভেতর একটা চিঠি ছিল, আমার ইচ্ছা হলো সেটা আমি ওদের হাতে দিয়ে দেবো; তাই আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নৌকোগুলোকে যেন আট্‌কে রাখে, হেনরিকে এই অনুরোধ করে আমি রওনা হয়ে গেলাম ওয়াগনগুলোর খোঁজে। ওয়াগনগুলো ছিল মাইল চারেক আগে। আধঘণ্টার মধ্যে আমি তাদের ধরে ফেললাম, চিঠিটা সংগ্রহ করলাম, তারপর ফেরার পথে মনোযোগ দিয়ে দু'পাশে তাকাতে তাকাতে দেখলাম ঝড়ে ভাঙাচোরা কতকগুলো গাছ, আর তাদেরই কাছাকাছি নড়াচড়া করছে কতকগুলো কালো বিন্দু, দেখে মনে হলো মানুষ আর ঘোড়া। ওখানে গিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত জমায়েত। এগারোটা নৌকো, প্রচুর

পরিমাণে পশুচর্মে বোঝাই করা, দ্রুত প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয়ে নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে। নৌকোর মাল্লারা কৃষ্ণকায় নিম্নশ্রেণীর মেক্সিকান। আমি নদীতীরে পৌঁছতেই তারা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। একটা নৌকোর মাঝখানে পেপিন বসে ছিল নৌকোর মালপত্র ঢাকা ক্যান্‌ভাসের ওপর। পেপিন লোকটি মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবান, ছোট্ট ধূসর চোখ দুটিতে একটু অসাধারণ-রকম দুষ্টুমিভরা ঔজ্জ্বল্য। 'ফ্রেডারিক'ও এই 'সর্দার'-এর কাছাকাছি তার লম্বা দেহটি ছড়িয়ে দিয়েছিল। আর ছিল কতকগুলো 'পাহাড়ী মানুষ'—এরা কতক বিশ্রাম করছিল নৌকোয়, কতক বেড়াচ্ছিল নদীর ধারে ; কতক রংচঙে মহিষের চামড়ার পোশাক পরা, সৌখীন ইণ্ডিয়ান ফুল-বাবুদের মতো ; কারও কারও চুল লাল রঙে ছোপানো এবং শিরীষের আঠা দিয়ে মাথার দুই পাশে আট্‌কানো ; আর একজনের কপালে আর দুই গালে সিঁদুর মাখা। এরা বর্ণসঙ্কর, কিন্তু এদের ভেতর ফরাসী রক্তেরই প্রাধান্য বলে মনে হলো। কয়েকজনের অবশ্য কালো সর্পিল চোখ, যেমন থাকে আধা-ইণ্ডিয়ানদের। মনে হলো এদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য নিজেদের রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া।

আমি এদের সর্দারের সঙ্গে করমর্দন করে তার হাতে চিঠিখানা দিলাম ; তারপর নৌকোগুলো স্রোতের ভেতর ঢুকে গিয়ে ভেসে গেল। তাদের একটু তাড়া ছিল, কারণ লারামি দুর্গ থেকে যাত্রায় পুরো একটি মাস লেগে গেছে, আর নদীগুলোও দিনে দিনে আরো অগভীর হয়ে যাচ্ছিল। নৌকোগুলো রোজ পঞ্চাশবার করে ডাঙায় উঠে পড়েছিল ; সত্যিকথা বলতে কি, প্লাট-নদীপথে যাঁরা পাড়ি দেন তাঁদের অর্ধেকটা সময় কাটাতে হয় চড়ার ওপর। এগুলোর মধ্যে দুটো নৌকো ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি। এগুলো দলছাড়া হয়ে গিয়ে পনীদের গাঁয়ের অনতিদূরে অগভীর জলে আট্‌কে পড়েছিল, আর শীগ্‌গীরই একঝাঁক পনী ইণ্ডিয়ান এসে তাঁদের ঘিরে ফেলেছিল। যা কিছু ভালো জিনিস বলে তাদের মনে হয়েছিল সবই তারা নিয়ে গিয়েছিল, পোশাকগুলোর বেশির ভাগই ছিল তার ভেতর ; মালের পাহারায় যারা ছিল, তাদের বেঁধে লাঠিপেটা করে হাতের সুখ করে যেতেও ছাড়েনি।

সে-রাতে আমরা নদীর ধারে তাঁবু খাটালাম। দেশান্তর-যাত্রীদের ভেতর বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলে ছিল, বয়সের তুলনায় তার দেহটি বড় বেশী বেড়ে উঠেছিল। তার মাথাটি ছিল মস্ত গোলগাল একটি কুমড়োর মতো, আর ঘন ঘন কম্পজ্বর আর গায়ের ব্যথায় ভুগে ভুগে বেচারার মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক রং ফুটে উঠেছিল। তার মাথায় পরা ছিল একটা পুরোনো সাদা টুপি, চিবুকের তলায় রুমাল দিয়ে বাঁধা।

তার দেহটি ছিল যেমন বেঁটে আর মোটা, পাগুলো তেমনি বেয়াড়ারকম লম্বা। সূর্যাস্তের সময় দেখলাম সে বিরাট লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গিয়ে মস্ত সাঁড়াশির মতো ছ'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তার একটু পরেই চূড়ার ওধার থেকে তার প্রচণ্ড চীৎকার ভেসে এলো। ছেলেটা ইণ্ডিয়ানদের বা লোমশ ভালুকদের পাল্লায় পড়েছে ধরে নিয়ে দলের কয়েকজন তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল ওকে উদ্ধার করতে। গিয়ে দেখল ছেলেটির চীৎকারটা পুলকের উচ্ছ্বাস মাত্র ; ছুটো নেকড়ের ছানাকে তাড়া করে সে তাদের গর্ত পর্যন্ত গিয়েছিল, তারপর গর্তের বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে গর্তের মুখের কাছে হাত দিয়ে মাটি খুঁড়বার চেষ্টা করছিল ওদের নাগাল পাবার জন্যে, শিকারী কুকুরদের মতো।

ভোরের আগে সে তাঁবুতে এর চাইতে বেশী অশান্তি বাধাল। তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় তার পাহারা দেবার পালা এলো। কিন্তু তাকে যখন এ দায়িত্ব দেওয়া হলো, তার খানিক বাদেই সে বেশ ঠাণ্ডামাথায় দুটি জিনের থলে একটা ওয়াগনের তলায় বালিশের মতো সাজিয়ে তার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল, আর হাঁ করে ঘুমোতে লাগল। তাঁবুর যেদিকে আমরা ছিলাম, সেদিককার পাহারাদার ভাবল দেশান্তর-যাত্রীদের গবাদি পশুর ওপর নজর রাখার দায়িত্ব তার নয়, তাই সে শুধু আমাদের নিজেদের ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোর ওপর নজর রেখেই সন্তুষ্ট রইল। নেকড়েদের চীৎকার বড বেশী শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু সূর্য না ওঠা পর্যন্ত কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করা যায়নি। সূর্য উঠলে একটি খুর বা শিং-ও চোখে পড়ল না। টম (অর্থাৎ সেই মস্ত ছেলেটি) যখন দিব্বি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিল, সেই ফাঁকে নেকড়েরা গবাদি পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

আমাদের তারপর ভোগ করতে হলো 'র'-র মূল্যবান পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশান্তর-যাত্রীদের সহযাত্রী হবার ফল। এহেন দুর্গত অবস্থায় এদের ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, সুতরাং এদের হারানো জানোয়ারগুলোর সম্ভব হলে পুনরুদ্ধার, অথবা অন্ততঃ ভালোভাবে অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই অবশ্যকর্তব্য বলে আমাদের মনে হয়েছিল। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যে এই নিদারুণ অবহেলার অপরাধে টমের কী শাস্তি হলো তা জানতে পাঠক কৌতূহল বোধ করতে পারেন। প্রেয়ারি অঞ্চলের সুচিন্তিত কল্যাণকর আইন অনুসারে যে পাহারা দেবার সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তার শাস্তি হচ্ছে—ঘোড়ার লাগাম ধরে সে সারাদিন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলবে ; টমের ওপর এই শাস্তি কার্যকরী না করাটা আমরা আমাদের সহযাত্রীদের পক্ষে খুব দোষের বলেই মনে করলাম। তা যাই হোক, আমার মনে হয়, টম

আমাদের দলের হলেও ঐভাবেই রেহাই পেতো। কিন্তু দেশান্তর-যাত্রীরা অপরাধ-মার্জনার চাইতেও আরো বেশীদূর এগিয়ে গেল : তাদের রায় হলো টম যখন পাহারা দিতে গেলেই ঘুমিয়ে না পড়ে থাকতে পারে না তখন তার আর পাহারা দেবার দরকারই নেই। এর পর থেকে তার ঘুম হলো নির্বিঘ্ন। তন্দ্রালুতাকে এভাবে পুরস্কৃত করার ফলটা আমাদের পাহারাদারদের পাহারাদারী উৎসাহের পক্ষে খুব শুভ হলো না, কারণ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে পথ চলে তারপর ঘুমটা জমে এলে কেউ যদি বন্দুকের কুঁদা দিয়ে খোঁচা মেরে তন্দ্রালু কণ্ঠে বলে এবার উঠে পড়ে রাতের তিনটি ঘণ্টা ঠায় জেগে থেকে শীতে কাঁপতে হবে, তখন মেজাজটা খুব ভালো হয় না।

—"মহিষ! মহিষ!"

শুনে চেয়ে দেখি গম্ভীর চেহারার একটিমাত্র বুড়ো মহিষ একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেয়ারির বুকে, যেন মানুষকে ঘৃণা করে বলেই মানুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে। মনে হলো পাহাড়ের পিছনে হয়তো আরো মহিষ থাকতে পারে। তাঁবুর একঘেয়ে আল্‌সেমি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, এই আশঙ্কায় শ আর আমি আমাদের ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে আর পিস্তলের খাপ কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে নিয়ে হেনরি শ্যাটিলনকে সঙ্গে নিয়ে মহিষ-শিকারে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটবার ইচ্ছা ছিল না হেনরির ; সে শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তাই সঙ্গে তার ভারি বন্দুকটা নিয়ে নিল, আর আমাদের বন্দুকগুলো বোঝা হবে বলে আমরা সঙ্গে নিলাম না। ঘোড়ায় চড়ে আমরা পাঁচ-ছ'মাইল পথ চললাম, কিন্তু নেক্‌ড়ে, সাপ আর প্রেয়ারি অঞ্চলের কুকুর ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর দেখা পেলাম না।

শ বলল, "না, এ চলবে না।"

"কী চলবে না?" প্রশ্ন করলাম আমি।

শ বলল, "আহতকে বয়ে নেবার ডুলি বানাবার মতো কাঠ এখানে দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে আজকের দিনটা শেষ হবার আগেই আমাদের ভেতর একজনের জন্যে ও-জিনিস দরকার হবে।"

শ-র অমন ধারণা হওয়া যুক্তিযুক্তই মনে হলো, কারণ জায়গাটা ঘোড়দৌড়ের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল না ; যতই এগিয়ে চললাম, জমির অবস্থা যেন ততই আরো বেশী খারাপ হতে লাগল। শীগ্‌গীরই এমন জায়গায় এলাম যেখানে পাহাড় আর খাদ এলোমেলো ছড়ানো, আর মাঝে-মাঝেই এমন গিরিপথ যার মধ্য দিয়ে পার হওয়া সহজ নয়। অবশেষে দেখতে পেলাম মাইলখানেক সামনে একঝাঁক মহিষ। তাদের কতকগুলো একটা ঢালু সবুজ মাঠে এলোমেলো চরে বেড়াচ্ছে, আর অন্যগুলো

তার নীচে প্রশস্ত সমতল ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে রয়েছে। ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় সেইভাবে একটু ঘোরা পথে আমরা ঘোড়ায় চড়ে তাদের দিকে এগোতে লাগলাম, তারপর তাদের এক ফার্লং-এর ভেতর একটি পাহাড়ে উঠলাম। ঐ পাহাড়ের পর আর এমন কিছু ছিল না যা ঐ মহিষগুলোর দৃষ্টি থেকে আমাদের আড়াল করে রাখতে পারে। আমরা পাহাড়ের আড়ালেই ঘোড়া থেকে নেমে জিনের বন্ধনীগুলো কষে নিয়ে পিস্তলগুলো পরীক্ষা করে নিলাম, তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে তার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে ঐ মহিষগুলোর দিকে নেমে গেলাম দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে। মহিষগুলো সঙ্গে-সঙ্গেই টের পেয়ে গেল ; যেগুলো পাহাড়ের ওপর ছিল সেগুলো সমতলভূমিতে নেমে গেল, যেগুলো নীচে সমতলভূমিতে ছিল সেগুলো একসঙ্গে এসে জড়ো হলো, আর সবগুলো একসঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ছুটে চল্‌ল। আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের পিছু নিলাম ; ওরা যখন আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল, আমরা তখন পিছন থেকে এসে তাদের প্রায় ধরে ফেলেছি, ধুলোর মেঘে মেঘে আমাদের দম আধা-বন্ধ হয়ে আসছে। আমরা ওদের আরো কাছাকাছি যেতেই ওদের আতঙ্ক আর গতিবেগ বেড়ে গেল ; আমাদের ঘোড়াগুলো এ কাজে নতুন বলে ভীষণ ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। মহিষগুলোর দিকে যতই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি, ঘোড়াগুলো ততই লাফিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চায়, মহিষমণ্ডলীর ভেতর কিছুতেই ঢুকতে চায় না। মহিষগুলো তখন কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটে চলে গেল ; আমি শ-কে হারিয়ে ফেললাম, শ-ও জানল না আমি কোথায় আছি। আমার পুরোনো পন্টিয়াক ঘোড়াটা পাগলা হাতীর মতো পাহাড়ী চড়াই উৎরাই বেয়ে ওঠা-নামা করতে লাগল, ওর খুরগুলো যেন কামারের হাতুড়ির মতো প্রেয়ারিভূমির বুকের ওপর ঘা দিতে লাগল। ওর মধ্যে দেখা গেল আগ্রহ আর আতঙ্কের অদ্ভুত মিশ্রণ, আতঙ্কগ্রস্ত মহিষের দলকে গিয়ে ধরে ফেলবার জন্যে চেষ্টাও করছে খুব, কিন্তু ওদের কাছাকাছি যেতেই ভীষণ ভয়ে পিছিয়ে আসে। পলাতক মহিষগুলো অবশ্য এমন দেখবার মতো কিছুই ছিল না—ঘাড়ের লোমগুলো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, আর গত শীতের পর ওদের পিঠের যে লোমগুলো এলোমেলোভাবে পিঠের ওপর থোকায় থোকায় রয়ে গেছে, সেগুলো ছোটাছুটি করবার সময় হাওয়ায় লাফাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত আমি আমার ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালাম একটা মহিষের পিছনে, তারপর চাবুক আর নালের খোঁচা মেরেও যখন ওকে পাশাপাশি নিতে পারলাম না

তখন অগত্যা অসুবিধা সত্ত্বেও পিছন থেকেই গুলী চালালাম। গুলীর আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই পন্টিয়াক হঠাৎ এত বেশী ঘুরে গেল যে আমি আবার আমার শিকারের একটু পিছনে পড়ে গেলাম। গুলীটা খুব বেশী পিছনদিকে লাগার ফলে মহিষটা ঐ গুলীতে কাবু হলো না; কারণ কতকগুলো বিশেষ জায়গায় গুলী না লাগলে মহিষ কাবু হয় না, পালিয়ে যায়। মহিষের দলটা ছুটে একটা পাহাড়ের ওপরে উঠে গেল, আমিও তাদের পিছু নিলাম। পন্টিয়াক পাহাড় পেরিয়ে ওপাশের উৎরাই বেয়ে দ্রুত নীচুদিকে ছুটে নামছে, এমন সময় আমি দেখলাম ডানদিকের উৎরাই বেয়ে ধীরগতিতে ঘোড়া চালিয়ে নেমে আসছে শ আর হেনরি, আর সামনের পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে মহিষগুলো সবেমাত্র অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করেছে, তাদের ছোট্ট লেজগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে, আর ধুলোর মেঘের মধ্য দিয়ে তাদের খুরগুলো মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে উঠছে।

সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম শ আর হেনরি আমাকে ডাকছে। কিন্তু পন্টিয়াক তখন যে বিষম দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছিল, তাতে আমার চাইতে বেশী জোরালো হাতের পক্ষেও তাকে হঠাৎ রাশ টেনে থামানো সম্ভব হতো না। এর ওপর আবার সেই ভোরে আমি ওর মুখে একটা সাদাসিধে বল্‌গা পরিয়ে এনেছিলাম; কারণ ওর মুখে সাধারণত যে শক্ত লাগামটা লাগাতাম, সেটা তার আগের দিন আমার অন্য ঘোড়াটার মুখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পন্টিয়াকের চাইতে জোয়ান আর শক্ত ঘোড়া প্রেয়ারিতে কখনো পা দেয়নি। কিন্তু মহিষের ঝাঁকের এই দৃশ্য তার কাছে এত অভিনব, যে সে ভয়ে অস্থির হয়ে পূর্ণবেগে ছুটতে লাগলো। সে-অবস্থায় তাকে সামলানো প্রায় অসম্ভব। পরের পাহাড়ের মাথায় উঠে আমি একটিও মহিষ দেখতে পেলাম না, ওরা সবাই পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার পিস্তল-গুলোতে আবার গুলী ভরে নিয়ে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম ওরা আবার পাহাড়ের গোড়া ঘেঁষে ছুটে চলেছে, ওদের আতঙ্ক কিছুটা কমেছে। পন্টিয়াক ওদের ভেতরে দ্রুতবেগে নেমে গিয়ে ওদের ডাইনে বাঁয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এরপরই এক লম্বা দৌড় শুরু হলো। আমাদের সামনে এক ডজন মহিষ পাহাড়র ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, উৎরাই বেয়ে নেমে চলেছে বিরাট ওজন আর প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে, তারপর আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে চড়াই বেয়ে ওপর-দিকে। পন্টিয়াক তবু, খোঁচানো আর চাব্‌কানো সত্ত্বেও, ওদের কাছাকাছি ঘেঁষতে রাজি হলো না। অবশেষে একটা মহিষ দলছাড়া হয়ে পিছনে একা পড়ল, আর আমি তখন অনেক চেষ্টা করে এই মহিষটার ছয় কি আট গজের ভেতরে আমার

ঘোড়াটাকে নিয়ে গেলাম। মহিষটার পিঠ তখন ঘামে ভিজে গেছে, বেচারা ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে, আর তার জিভটা চোয়াল থেকে এক ফুট বেরিয়ে এসে ঝুলছে। ক্রমে আমি তার পাশাপাশি এসে পড়লাম, তারপর পন্টিয়াককে পা আর লাগামের সাহায্যে মহিষটার আরো কাছে নিয়ে গেলাম। এ অবস্থায় মহিষরা সর্বদাই যা করে থাকে, এ মহিষটাও হঠাৎ তাই করল, গতি থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে যুগপৎ ক্রুদ্ধ আর বিপন্ন ভাব নিয়ে তার বিরাট, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা নীচু করল তেড়ে এসে আক্রমণ করবার ভঙ্গিতে। পন্টিয়াক চিঁ-হি-হি শব্দ করে ভীষণ ভয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল; আমি এই হঠাৎ লাফের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আরেকটু হলেই ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে যেতাম। আমি বিষম রেগে পিস্তলটা তুললাম, তাই দিয়ে এক ঘা ঘোড়াটার মাথায় কষিয়ে দেবো ভেবে, কিন্তু তারপর বিবেচনা করে মতটা বদ্‌লে ফেলে পিছন থেকে মহিষটাকে লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। মহিষটা ততক্ষণে আবার পলায়ন শুরু করেছে। তারপর রাশ টানলাম এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলাম আমার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দেবো। তার সময়ও হয়ে এসেছিল। পন্টিয়াকের নাকের মধ্য দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস খুব জোরে বইতে শুরু করল, এবং তার দেহের দু'ধার বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছিল ঘাম। আমি নিজেও যেন উষ্ণ জলে স্নান করে উঠেছি বলে মনে হচ্ছিল। ভবিষ্যতে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করে আমি কোথায় আছি বুঝবার জন্য নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কোথাও এমন কোনো চিহ্ন মেলে কিনা, যা থেকে বুঝব এবার কোন্‌দিকে আমার যাওয়া উচিত। সে যেন মহাসমুদ্রের মাঝখানে পথ-নির্দেশক চিহ্ন খুঁজে বার করবার চেষ্টা। কোন্ দিকে বা কত মাইল পথ ছুটে এসেছি সে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, আর আমার চারিদিকে প্রেয়ারিভূমির ওঠা-নামার গোলকধাঁধা, আমাকে পথ-নির্দেশ দেবার মতো কোনো বিশেষ চিহ্ন কোথাও নেই। আমার গলায় ঝুলছিল একটা ছোট দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র। প্লাট নদী যে এইখানে এসে তার পূর্বমুখী গতি থেকে অনেকখানি সরে গেছে তা আমার জানা ছিল না, তাই ভাবলাম সোজা উত্তর দিকে চলে গেলে প্লাট নদীর তীরে গিয়ে পৌছব নিশ্চয়। এই ভেবে ঘণ্টা-দুয়েক ঐ দিকেই চললাম। যত এগোতে লাগলাম, প্রেয়ারির চেহারা বদলাতে লাগল, চড়াই উৎরাই অনেক কমে গেল, কিন্তু কোথায় প্লাট নদী? কোনো মানুষের চিহ্নও দেখা গেল না, আমার চারধারে তেমনি ধুধু-করা অরণ্য-প্রান্তর। মনে হলো আমি আমার লক্ষ্য থেকে আগেকার মতোই দূরে রয়ে গেছি। এই জঙ্গলের ভেতর আমার হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই এবার মনে হলো। যাই হোক,

জঙ্গল সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান ছিল তাই কাজে লাগিয়ে এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো আমার সেরা পথপ্রদর্শক হতে পারে মহিষ। একটু বাদেই একটা পথ আবিষ্কার করলাম, যে-পথে মহিষেরা নদীতে যায়। আমি যে পথে চলেছিলাম, মহিষদের পায়ে-চলার এই পথটি তার প্রায় সমকোণে চলে গেছে। আমার ঘোড়ার মুখটা ঐ দিকে ঘুরিয়ে দিতেই তার গতি স্বচ্ছন্দ আর কান খাড়া হয়ে উঠল। নিশ্চিত বুঝলাম আমি ঠিক করেছি।

কিন্তু এর আগে যতটা পথ অতিক্রম করেছিলাম, তা মোটেই নিরালা ছিল না। সারা অঞ্চল জুড়ে ছিল অগুন্তি মহিষের ছড়াছড়ি। দেখেছিলাম অনেক ষাঁড়, গরু আর বাছুরও পাহাড়ের উৎরাইয়ের সবুজ বুকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সাড়া পেয়েই তারা তাড়াহুড়ো করে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ডাইনে আর বাঁয়ে ছুটে পালাল। অনেক দূরে হাল্‌কানীলরঙা উঁচু জায়গার ওপরও অগুন্তি কালো কালো বিন্দু দেখতে পেলাম। কখনো বা কোনো ষাঁড় একা একা ঘাস খেতে খেতে অথবা ঘুমের মাঝখানে আমার আওয়াজ পেয়ে চম্‌কে উঠতে লাগল। কৃষ্ণসার হরিণ দেখলাম এখানে অনেক। মহিষদের কাছাকাছি এরা সর্বদাই নির্ভীক। এরা এক এক বার আমার কাছাকাছি এসে বড় গোল-গোল চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একধারে লাফিয়ে পড়েই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো দ্রুতবেগে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে ছুট্‌ লাগাতে লাগল। নোংরা গুণ্ডা-চেহারার নেক্‌ড়েগুলো এখানে ওখানে ফাঁক থেকে মাঝে মাঝে চোরের মতো উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। বারকয়েক আমি গেলাম প্রেয়ারির কুকুরদের বসতি এলাকার মধ্য দিয়ে। যেতে যেতে দেখতে পেতাম কুকুরগুলো তাদের গর্তের মুখের কাছে বসে আছে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাবাগুলো সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঘেউ ঘেউ করছে, আর প্রত্যেকটি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে লেজ ঝাপ্‌টাচ্ছে। সঙ্গী-নির্বাচনে প্রেয়ারি-কুকুরগুলো মোটেই খুঁতখুঁতে নয়; এদের পল্লীর মাঝখানেই লম্বা চিত্রবিচিত্র নানারকমের সাপ রোদ পোহাচ্ছিল, আর চোখের চারদিকে সাদা বৃত্ত আঁকা গুরুগম্ভীর প্যাঁচারাও এখানকার ন্যায্য দাবিদার বাসিন্দাদের পাশ ঘেঁষেই স্থির হয়ে বসে ছিল। প্রেয়ারির এ অঞ্চলে জীবিত প্রাণীর প্রাচুর্য দেখতে পেলাম। বারবার আমি পাহাড়ের ধারগুলোতে ভিড় দেখে ভাবলাম ওরা নিশ্চয় ঘোড়সওয়ার; মনে আশা আর আশঙ্কা নিয়ে এগিয়ে গেলাম—ইণ্ডিয়ানরাও ঐ সময় প্রেয়ারিতে ঘুরতে বেরিয়েছে জানতাম—গিয়ে দেখি ওরা একঝাঁক মহিষ। শুধু জানোয়ার আর জানোয়ার, একটি মানুষও নেই।

মহিষদের পায়ে-চলার পথ বেয়ে যখন এগিয়ে চললাম, তখন মনে হলো প্রেয়ারি

অঞ্চলটা যেন বদলে গেছে ; শুধু দুটো-একটা নেক্‌ড়ে মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে জ্ঞানপাপীর মতো আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। এখন আর মনে উদ্বেগ ছিল না, আমি আমার চারদিকের জিনিসগুলি খুঁটিয়ে দেখবার অবসর পেলাম। এখানেই আমি সর্বপ্রথম দেখলাম কতকগুলো পতঙ্গ, যেগুলো আরো পূবদিকে যত-রকমের পতঙ্গ পাওয়া যায় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নানারকম জমকালো প্রজাপতি আমার ঘোড়ার মাথার কাছাকাছি ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল ; আগে কখনো দেখিনি এমনি নানারকম ছোট ছোট গাছের ওপর বেয়ে উঠছিল অদ্ভুত গড়নের কাঁচপোকা, তাদের গায়ে ধাতুর মতো ঔজ্জ্বল্য ; নানারকমের গিরগিটিও বিদ্যুদ্বেগে বালুর ওপর চলাফেরা করছিল।

বুঝতে পারলাম আমি নদী থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। মহিষদের চলার পথ বেয়ে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর যাওয়ার পর আমি একটা বালুর পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে পেলাম উষর উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা প্লাট নদীর জল চিক্‌-চিক্‌ করছে, আর দূরে আকাশের বুকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সারি। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সারা রোদে-পোড়া অঞ্চলে একটিও ঝোপ, গাছ বা প্রাণী দেখা যাচ্ছিল না। আধাঘণ্টার ভেতর আমি নদীর অনতিদূরে আসল যাত্রাপথে এসে পড়লাম। আমাদের দল এখান দিয়ে তখনো চলে যায়নি দেখে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য পূবদিকে চললাম। পন্টিয়াকের ভুলে ভুলে পা ফেলার ভঙ্গি দেখে আবার বুঝলাম এবারও আমি ভুল করিনি। ভোরবেলা তাঁবু থেকে বেরোবার সময়ই আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, কাজেই ছ'সাত ঘণ্টা হয়রানী ঘোড়দৌড়ের ফলে আমি অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করছিলাম। তাই শীগ্‌গীরই আমি আমার ঘোড়া থামিয়ে নেমে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে মাটিতে ফেলে তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম, ঘোড়ার দড়িটা আল্‌গাভাবে হাতে জড়িয়ে। শুয়ে আমাদের দলের আগমন প্রতীক্ষা করতে করতে ভাবতে লাগলাম পন্টিয়াক কী পরিমাণ চোট খেয়েছে বা আহত হয়েছে। অবশেষে সমতলভূমির প্রান্তে দিগন্তরেখার ওপরে ওয়াগনের সাদা আবরণ দেখা দিল, আর—কী অদ্ভুত যোগাযোগ!—ঠিক সেই সময়েই দুজন ঘোড়সওয়ারকে পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেখা গেল। তারা শ আর হেনরি। তারা ভোরে কিছুক্ষণ আমাকে খুঁজেছিল, তারপর এরকম এলাকায় আমাকে খুঁজে বার করা সহজ হবে না ভেবে তারা তাদের নাগালের ভেতর সবচেয়ে বেশী উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে ঘোড়াগুলোকে তাদের কাছাকাছি বেঁধে রেখে (আমি যেন দূর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসি) মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেশান্তর-যাত্রীদের মুখে শুনলাম

হারিয়ে-যাওয়া গবাদি পশুগুলোকে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল দুপুরের কাছাকাছি। সূর্যাস্তের আগেই আমরা আট মাইল রাস্তা এগিয়ে গেলাম।

আমার নোট-বইতে লেখা আছে দেখছি :

"৭ই জুন, ১৮৪৬। চারজন পুরুষকে পাওয়া যাচ্ছে না : 'র', সরেল, আর দুজন দেশান্তর-যাত্রী। তারা আজ ভোরবেলা রওনা হয়ে গিয়েছিল মহিষের খোঁজে। তারা এখনো ফিরে আসেনি ; নিহত হয়েছে, না হারিয়ে গেছে, বলতে পারি না।"

এ উপলক্ষ্যে আমরা যে আলোচনার বৈঠকে বসেছিলাম তা বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। আমরা বৈঠক জমিয়েছিলাম আমাদের তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ঘিরে বসে ; কারণ অভিজ্ঞতায় আর দক্ষতায় হেনরি শ্যাটিলন ছিল আমাদের সবার সেরা, কাজেই আমাদের সামনে যখনই কোনো সমস্যা আসত, তার সমাধানের জন্য পরামর্শ নিতে আমরা সবাই যেতাম হেনরির কাছে। হেনরি তখন ঐ আগুনের তাপে ছাঁচে ঢেলে বন্দুকের টোটা তৈরি করছিল ; ক্যাপ্টেন বিশেষ উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে গেলেন হেনরির কাছে। ক্যাপ্টেনের পিছনেই জ্যাক, তার মুখেও তেমনি উদ্বেগের চিহ্ন আঁকা। তারপর এলো দেশান্তর-যাত্রীরা তাদের ওয়াগন থেকে নেমে, বিক্ষিপ্তভাবে। যে চারজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের অনুপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে বৈঠকে বিভিন্ন মতামত শোনা গেল। দেশান্তর-যাত্রীদের মধ্যে দু-একজন বলল তাদের জানোয়ারগুলোর খোঁজ করবার সময় তারা দেখেছিল কতকগুলো ইণ্ডিয়ান নেকড়ে বাঘের মতো গুটিগুটি এগোতে এগোতে পাহাড়ের গা বেয়ে ঐ চারজনের পিছনে পিছনে যাচ্ছে। এই শুনে ক্যাপ্টেন দ্বিগুণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে গুরুগম্ভীরভাবে বললেন, "এই অভিশপ্ত জংলী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করা রীতিমতো গুরুতর ব্যাপার।" জ্যাকও ঠিক এই কথাটারই প্রতিধ্বনি করল সঙ্গে সঙ্গে। হেনরি নিশ্চিতভাবে কোনো মত প্রকাশ করতে রাজি হলো না। সে শুধু বলল, "হয়তো মহিষের পিছনে ধাওয়া করে অনেকদূর চলে গেছে ; হয়তো ইণ্ডিয়ানদের হাতে নিহত হয়েছে ; অথবা হয়তো হারিয়ে গেছে। ঠিক করে কিছুই বলা যায় না।"

শ্রোতাদের এই শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। দেশান্তর-যাত্রীরা মোটেই আতঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে মনে হলো না, শুধু তাদের চারজন সঙ্গীর কী হলো সেটা জানবার কৌতূহল নিয়ে তারা তাদের ওয়াগনগুলোতে ফিরে গেল। ক্যাপ্টেন চিন্তান্বিতভাবে তাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন। শ আর আমি তাঁর পন্থাই অবলম্বন করলাম।

অষ্টম অধ্যায়

প্রস্থান

৮ই জুন, বেলা এগারোটায় আমরা প্লাট নদীর 'সাউথ ফর্ক'-এ এমন জায়গায় উপস্থিত হলাম যেখান থেকে এ অঞ্চলের লোক সাধারণত হেঁটে নদী পার হয়। তাকিয়ে দেখলাম মাইলের পর মাইল উষর মরুর একঘেয়েমি ; পাহাড়গুলোতে এখানে-সেখানে ছড়ানো কুঁকড়ে-যাওয়া ঘাসের গুচ্ছ, কিন্তু এই ঘাসগুচ্ছগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধানে সাদা বালু রোদে ঝিকমিক করছিল। নদীটা প্রায় আধমাইল চওড়া, জল প্রায় পাড়ের সমান উঁচু। নদীর জলের তলায় বালু, বালু আর বালু। জল এত অগভীর যে নদীর তলদেশ দেখা যাচ্ছিল ; আর এখানে প্লাট নদীর গভীরতা গড়ে দেড় ফুটের বেশী নয়। নদীতীরের কাছাকাছি থেমে আমরা মহিষের মাংস দিয়ে খানা খেলাম। দূরে ওপারে একটা সবুজ মাঠের ওপর দেখলাম একটি দেশান্তর-যাত্রীদলের সাদা তাঁবু আর ওয়াগন। ঠিক আমাদের উল্টোদিকে দেখলাম একদল লোক আর জানোয়ার এসেছে জলের কিনারায়। চার-পাঁচজন ঘোড়সওয়ার শীগ্‌গীরই নদীতে নামল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই জলের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে এদিকে আল্‌গা বালুর ওপর দিয়ে বেশ অসুবিধার সঙ্গেই পা ফেলে ফেলে উঠে এলো। তারা সবাই বিশ্রী চেহারার লোক, ছিপ্‌ছিপে আর কালো, সবার মুখেই উদ্বেগের ছাপ আর ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। তাদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণও ছিল। তিনদিন আগে তারা এইখানে প্রথম আস্তানা গেড়েছিল ; প্রথম রাত্রেই তাদের পাহারাদারের গাফিলতির সুযোগে একদল নেকড়ে তাদের বাছাই একশো তেইশটি জানোয়ারকে টেনে নিয়ে গেছে। এতে নিরুৎসাহ এবং আতঙ্কিত হবারই কথা, বিশেষ করে যখন চলার পথে এই তাদের প্রথম দুর্ভাগ্য নয়। যাত্রার শুরু থেকেই দুর্ভাগ্য যেন তাদের পিছনে লেগেই ছিল। তাদের দলের কয়েকজনের মৃত্যু হলো ; একজনকে পনী ইণ্ডিয়ানরা মেরে ফেলল ; আর তার এক সপ্তাহ আগে ডাকোটা ইণ্ডিয়ানরা তাদের সেরা ঘোড়াগুলোকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, রেখে গিয়েছিল শুধু ওঁছা ঘোড়া-গুলোকে, আর এই ওঁছা ঘোড়াদের পিঠে চেপেই এই আগন্তুক দল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের মুখে শুনলাম সূর্যাস্তের কাছাকাছি তারা প্লাট নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়েছিল, তাদের ষাঁড়গুলো ছড়িয়ে ছিল মাঠের ওপর, আর ঘোড়াগুলো একটু

দূরে ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ পাহাড়গুলোর ওপরে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়সওয়ার ইণ্ডিয়ান, সংখ্যায় অন্তত ছ'শো। এরা উৎকট চীৎকার করতে করতে তাঁবুর দিকে দ্রুতগতিতে তাঁবুর খুব কাছাকাছি নেমে এসে তাঁবুর বাসিন্দাদের ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তুলল। তারপর হঠাৎ থেমে মুখ ঘুরিয়েই তারা ঘোড়াগুলোকে ঘিরে ফেলল, আর পাঁচ মিনিটের ভেতর তাদের নিয়ে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এরা যখন এদের গল্প বলছিল, তখন দেখলাম আরো চারজন লোক এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল তারা হচ্ছে 'র' আর তার সঙ্গীরা। তাদের কোনো বিপদই হয়নি, তারা শুধু শিকারের পিছু পিছু একটু বেশী দূর চলে গিয়েছিল মাত্র। তারা নাকি কোনো ইণ্ডিয়ান দেখেনি, শুধু দেখেছে 'লক্ষ লক্ষ মহিষ'। 'র' আর সোরেলের জিনের পিছনে ঝুলছিল মহিষের মাংস।

দেশান্তর-যাত্রীরা আবার নদীর ওপারে ফিরে গেল, আমরাও ওপারে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। প্রথমে ষাঁড় দিয়ে টানা ভারি ওয়াগন ঝুপ্ করে নেমে পড়ল নদীর অগভীর জলে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওপারের দিকে; কোথাও কোথাও স্রোত এত অগভীর যে তাতে ষাঁড়গুলোর খুরও পুরো ডোবে না, কিন্তু তারপরেই হয়তো চাকাগুলো পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে চঞ্চল জলস্রোতে। একটু একটু করে এগোতে এগোতে ওয়াগন-টানা ষাঁড়গুলো তীর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, মনে হলো ক্রমেই যেন ওরা ছোট হয়ে যাচ্ছে; শেষে মনে হলো ওরা যেন অনেক দূরে নদীর মাঝখানে ভাসছে। এর চাইতে আরো কঠিন পরীক্ষা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ আমাদের অশ্বতর-টানা ছোট্ট গাড়ি এত দ্রুতগামী স্রোত সইবার উপযুক্ত ছিল না। আমরা খুব উদ্বিগ্নভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম; কিছুক্ষণ পর মনে হলো যেন জলের ভেতর একটা ছোট্ট সাদা ফুট্‌কি নিশ্চল হয়ে রয়েছে। সত্যিই চোরাবালিতে চাকা আট্‌কে গিয়ে গাড়িটা নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। অশ্বতরগুলো পা রাখবার মতো শক্ত জায়গা পাচ্ছিল না, চাকাগুলো ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে, আর জল উঠে গাড়ির ভেতরকার জিনিসপত্র সব ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমরা যারা এপারে ছিলাম, তারা সবাই ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম ওদের উদ্ধার করতে; গিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লাম জলে। মানুষের শক্তি অশ্বতর-শক্তির সঙ্গে যোগ দিল, ফলে অনেক কষ্টে বালুর বাধা থেকে মুক্ত করে গাড়িটাকে ওপারে নিয়ে যাওয়া গেল।

আমরা ওপারে গিয়ে পৌঁছতেই একদল কাঠখোট্টা গোছের লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। তারা খুব পুষ্ট বা লম্বা-চওড়া না হলেও, চেহারা দেখেই বোঝা গেল

ওরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু। ঘরে তাদের অদম্য উৎসাহ আর কর্মশক্তির সদ্ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ নেই দেখেই তারা প্রেয়ারিতে বেরিয়ে পড়েছিল। এদের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে রোমক সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রেরণায়। পূর্বপুরুষদের সেই তেজ যেন দ্বিগুণিত হয়ে নতুন করে জেগে উঠেছিল এদের ভেতর। একপক্ষকাল পরে আমরা যখন লারামি কেল্লায় ছিলাম, এই দুর্ভাগা দল তখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। তাদের হারানো ষাঁড়গুলোর একটিরও পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি, যদিও তারা তাদেরই খুঁজবার জন্য এক সপ্তাহ ধরে একজায়গাতেই তাঁবু রেখেছিল। বেশীর ভাগ লটবহর আর খাদ্যদ্রব্য তাদের বাধ্য হয়েই ছেড়ে আসতে হয়েছিল, ওয়াগনগুলো টানবার জন্যে গরুবাছুরগুলোকে কাজে লাগাতে হয়েছিল ষাঁড়ের অভাবে, অথচ তাদের যাত্রাপথের সবচেয়ে বেশী ক্লান্তিকর আর সঙ্কটবহুল অংশই তখনো তাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে প্লাট অঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বহু পুরাতন, খাবার মতো পায়া-যুক্ত টেবিলের ধ্বংসাবশেষ, বেশ ভালোভাবে পালিশ করে মোম লাগানো, অথবা ওক কাঠের তৈরী বিরাট দেরাজওয়ালা লিখবার টেবিল। এদের কতকগুলো খুব সম্ভব ঔপনিবেশিক যুগের সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্ন ; আর এরা সবই অদ্ভুত ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। সম্ভবত এদের সর্বপ্রথমে আনা হয়েছিল ইংল্যাণ্ড থেকে ; তারপর এদের মালিকদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এরা আলেঘানি পর্বতমালা পার হয়ে চলে এসেছে ওহায়ো অথবা কেণ্টাকির অরণ্য অঞ্চলে ; তারপর ইলিনয় বা মিজুরিতে ; আর এখন অন্তহীন অরিগন-যাত্রা-পথে পারিবারিক ওয়াগনে খুব যত্ন করে বেশ আদরেই তাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু পথের নানা নিদারুণ অসুবিধার কথা আগে জানা ছিল না, আশঙ্কাও করা যায়নি। সাদরে সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিচিহ্নটাও অচিরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় রৌদ্রদগ্ধ প্রেয়ারির বুকে। সেখানে তারা রোদে পুড়ে ফেটে যেতে থাকে।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম ; কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই 'র' পিছু ডেকে বললেন, "আজ আমরা এখানেই তাঁবু খাটাব।"

"এখনই তাঁবুর কথা কেন ? সূর্যের দিকে তাকাও। এখনো তিনটে বাজেনি।"

"আমরা এখানেই তাঁবু ফেলব।" এই একটি মাত্র জবাব শোনা গেল।

ডেস্‌লরিয়ার্স তার গাড়ি নিয়ে আগে আগে চলছিল। অশ্বতর-টানা গাড়িগুলোকে যাত্রাপথের বাইরের দিকে ঘুরতে দেখে সেও তার গাড়ি ঐ দিকে ঘোরাবার উপক্রম করল। আমরা বললাম, "এগিয়ে চলো, ডেস্‌লরিয়ার্স।" শুনে ডেস্‌লরিয়ার্স আবার

আগেকার মতোই সামনের দিকে এগিয়ে চলল তার ছোট্ট গাড়িটি নিয়ে। আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে যেতে যেতে শীগ্ গীরই শুনতে পেলাম আমাদের সঙ্গীদের ওয়াগনের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। ওয়াগনটি উঁচুনিচু পথে ঝাঁকানি খেতে খেতে আসছিল, আর তার চালক—রাইট, তার অশ্বতরগুলোকে বিষম হুঙ্কার ছেড়ে ধমক আর গালি দিচ্ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যোগ্যতর পাত্রের ওপর যে রাগ ঝাড়তে সে সাহস পাচ্ছিল না, তা সে অশ্বতরগুলোর ওপর ঝেড়েই গায়ের ঝাল মেটাচ্ছিল।

এ ধরনের ব্যাপার আগেও অনেকবার ঘটেছিল। আমাদের ইংরেজ সঙ্গীটি আমাদের ওপর খুব খুশী ছিলেন না, এবং তাঁর ব্যবহার দেখে আমাদের মনে হতো তাঁর মতলবই হচ্ছে আমাদের বিঘ্ন আর বিরক্তি ঘটানো, বিশেষ করে আমাদের অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে, যখন তিনি জানতেন দ্রুত এগিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তিনি তাই যখন-তখন বেয়াড়া সময়ে জিদ করতেন তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার জন্য, একদিনে পনেরো মাইল অগ্রগতি যথেষ্ট, এই অজুহাতে। আমাদের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে দেখে আমরা পরিচালনার ভার নিজেদের হাতেই নিয়ে নিলাম। সব সময়েই আমরা এগিয়ে থাকতে লাগলাম, তাতে 'র' মনে মনে ভীষণ চটে উঠলেন, যদিও মুখে কিছু বলতে পারলেন না। যখন এবং যেখানে উচিত মনে হলো আমরা তাঁবু ফেলতে লাগলাম, অন্যান্য সহযাত্রীরা কী করবেন না করবেন তা নিয়ে একেবারেই মাথা না ঘামিয়ে। আমরা যা করতাম, বাকি যাত্রীরাও অবশ্য ঠিক তাই করত ; মনে মনে যতই রাগ করুক না কেন, তাঁবু ফেলত আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই।

পারস্পরিক যখন এইরকম মনোভাব, এ অবস্থায় একসঙ্গে ভ্রমণ করা আমাদের রুচিতে সইল না, আমরা এদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার কথা কিছু সময় ধরে ভাবলাম। আমরা ঠিক করলাম খুব ভোরে উঠেই তাঁবু তুলে আমরা যত দ্রুতবেগে পারি লারামি দুর্গ অভিমুখে এগিয়ে চলব ; আশা করা গেল দ্রুত ভ্রমণের ফলে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা লারামি দুর্গে পৌঁছে যাব।

একটু পরেই ঘোড়া টগ্ বগিয়ে ক্যাপ্টেন এসে হাজির হলেন আমাদের মধ্যে। তাঁকে আমরা আমাদের মতলবগুলো বুঝিয়ে বললাম।

তিনি বললেন, "এ এক অদ্ভুত ব্যাপার করতে যাচ্ছ তোমরা, এ আমি বলবই।" বোঝা গেল তাঁর মনে এই ধারণাটাই প্রবল হয়েছে যে তাঁর মতে আমাদের যাত্রা-অভিযানের একটি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পর্যায়ে এসে আমরা তাঁর দলকে ফেলে চলে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম আমরা তো মোটে চারজন, আর তাঁর দলে

তখনও ষোলোজন লোক ; এবং আমরা যখন আগে আগে যাবো, তাঁরা আসবেন আমাদের পরে, যেসব বিপদ তিনি আশঙ্কা করছেন তাদের সবগুলোরই প্রথম ঝাপ্‌টা আসবে আমাদেরই ওপর। কিন্তু তাতেও ক্যাপ্টেনের মুখের গম্ভীর ভাবটা গেল না। "ভারি বেয়াড়া ব্যাপার করছ তোমরা।" বলতে বলতে তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন তাঁর প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

পরদিন সকালে সূর্য উঠবার আগেই আমরা তাঁবু খুলে ফেললাম, গাড়ির সঙ্গে সেরা ঘোড়াগুলোকে জুতলাম, তারপর সে-জায়গা ছেড়ে রওনা হলাম। অবশ্য তার আগে আমরা আমাদের দেশান্তর-যাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন করলাম ; তাঁরা আন্তরিকভাবেই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমাদের যাত্রা যেন নিরাপদ হয়, যদিও দলের ভেতর এমন লোকেরও অভাব ছিল না যারা আমরা যাত্রাপথে ইণ্ডিয়ানদের পাল্লায় পড়লে সান্ত্বনা পেতেন। ক্যাপ্টেন আর তাঁর ভাই দাঁড়িয়েছিলেন একটি পাহাড়ের চূড়ায় পশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে, মূর্তিমান কুয়াসার মতো, নীচে ঘোড়াগুলোর দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে। আমরা ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাত দুলিয়ে বিদায় জানালাম। ক্যাপ্টেন খুব মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে আমাদের বিদায়-অভিবাদনের জবাব দিলেন। জ্যাক তাঁর অনুকরণ করতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু খুব সফল হলো না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা পাহাড়গুলোর গোড়ায় এসে পড়লাম, কিন্তু এইখানেই আমাদের থেমে পড়তে হলো। হেন্‌ড্রিক ঘোড়াটা ছিল গাড়ির দুই ডাণ্ডার মাঝখানে, কিন্তু সে মূর্তিমান শয়তানী একগুঁয়েমির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই আর এক পা-ও নড়বে না। ডেস্‌লরিয়ার্স চাবুক মেরে মেরে আর গালি দিয়ে দিয়ে হয়রান হয়ে গেল, কিন্তু হেন্‌ড্রিক পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল তার শত্রুদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। তারপর একবার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে সে হঠাৎ ডাণ্ডার তলা দিয়ে দিয়ে হিংস্রভাবে লাথি চালালো। সেই লাথিটাকে ডেস্‌লরিয়ার্স হঠাৎ যেভাবে উঁচুতে লাফ মেরে এড়িয়ে গেল, তা শুধু এক ফরাসীর পক্ষেই সম্ভব। শ আর সে তখন একসঙ্গে যোগ দিল, আর একসঙ্গে দু'দিক থেকে তাকে চাব্‌কাতে লাগল। জানোয়ারটা কিছুক্ষণ মাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আর সইতে না পেরে এমন-ভাবে লাফালাফি করতে আর লাথি চালাতে লাগল যেন গাড়িটা আর তার সাজসজ্জা সব একেবারে ভেঙেচুরে তচনচ হয়ে যাবে। আমরা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তাঁবু বেশ পরিষ্কার আর পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। আমাদের সহযাত্রীরা আমাদের

দেখাদেখি তাদের তাঁবু খুলে ফেলেছে আর তাদের জানোয়ারগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করছে।

আমি বললাম, "ঘোড়াটাকে বার করে নাও।"

পন্টিয়াকের পিঠ থেকে জিনটা খুলে নিয়ে আমি হেন্‌ড্রিকের ওপর চাপালাম। পন্টিয়াককে জুড়ে দেওয়া হলো গাড়িটার সঙ্গে। "চল্ এগিয়ে", বলল ডেস্‌লরিয়ার্স। পন্টিয়াক পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট গাড়িটাকে এমন অনায়াসে টেনে নিয়ে চলল, যেন ওটা তার কাছে পাখির পালকের মতোই হাল্‌কা। পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা দেখলাম আমাদের ছেড়ে আসা সঙ্গীরাও রওনা হচ্ছে, কিন্তু তারা আমাদের ধরতে পারবে বলে মনে হলো না।

চলার প্রধান পথ ছেড়ে আমরা গাঁয়ের মধ্য দিয়ে প্লাট নদীর প্রধান স্রোতে দ্রুত পৌঁছবার জন্য সবচেয়ে সোজা রাস্তাটাই ধরলাম। মাঝখানে হঠাৎ একটা গভীর গিরিখাত আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়াল। আমরা এটার কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম এর খাড়াই ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে। তারপর খুব সাবধানে এগিয়ে আমরা এই গিরিখাতটি অতিক্রম করলাম। 'অ্যাশ্ হলো' অর্থাৎ 'ভস্ম-কোটর' নামে অভিহিত কতকগুলো বালুকাময় গিরিখাত পিছনে ফেলে আমরা দুপুরবেলায় একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য বৃষ্টির-জল-জমা একটি ছোট্ট জলাশয়ের ধারে থামলাম ; একটু বিশ্রাম করেই আবার যাত্রা শুরু করে সূর্যাস্তের কয়েক ঘণ্টা আগে গিরিখাতের উৎরাই বেয়ে নেমে 'ভস্ম-কোটর'-এর পশ্চিমে প্লাট নদীর অদূরে এসে পড়লাম। আমাদের ঘোড়াগুলোর খুরের ওপরের লোমগুচ্ছ পর্যন্ত বালুতে ডুবে গেল, রোদ যেন আগুনের হল্‌কার মতো গায়ে ছেঁকা দিতে লাগল, আর হাওয়ায় উড়তে লাগল অগুন্‌তি বালুর মাছি আর মশা।

অবশেষে আমরা প্লাট নদীতে এসে পড়লাম। এই নদীটির গতি অনুসরণ করে মাইল পাঁচেক এগোবার পর সূর্য যখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে তখন দেখলাম এক মস্ত মাঠ, তার ওপর শত শত গবাদি পশু চরে বেড়াচ্ছে, আর তাদের ওধারে একদল দেশান্তর-যাত্রী তাঁবু ফেলেছে। তাদেরই একদল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, প্রথমে আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে। আমরা চারজন চেহারায় আর সাজ-সরঞ্জামে তাদের থেকে আলাদা, বেরিয়ে আসছি পাহাড় থেকে ; ওরা ভাবছিল আমরা মর্মন দলেরই চারজন অগ্রগামী। মর্মনদের মুখোমুখী পড়বার ভয়ে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল। আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় তাদের জানাতেই তারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। আমরা মাত্র চারজনের এই ছোট দল নিয়ে এ অঞ্চলে ভ্রমণ

করতে সাহস করছি দেখে তারা বিস্ময় প্রকাশ করল, যদিও এধরনের দুঃসাহস মাঝে মাঝে দেখিয়ে থাকে ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা আর যারা ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে তারা। আমরা ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে তাদের তাঁবুতে গেলাম। তাদের ওয়াগনগুলি, সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশটি, যথারীতি বৃত্তাকারে সাজানো, মাঝে মাঝে দু-একটা তাঁবু ; বাছাই ঘোড়াগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এই বৃত্তের ভেতরের দিকে। এই বৃত্তের সারা পরিধি জুড়ে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছিল, আর সেই আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছিল আগুন ঘিরে রয়েছে স্ত্রীলোক আর শিশুরা। ওদের গোষ্ঠী-জীবনের এই দৃশ্য অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক লাগল বটে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারা গেল আমরা সেখান থেকে কেটে পড়লাম, কারণ আমাদের ঘিরে এদের পুরুষগুলোর গায়ে-পড়া কৌতূহলী প্রশ্নবাণগুলো আমাদের বড় বেশী বিঁধছিল। এদের কৌতূহলের কাছে ইয়াঙ্কী কৌতূহল কিছুই নয়। আমাদের নাম কী, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলেছি, কেন চলেছি, এই সবই তাদের জানা চাই। এগুলোর ভেতর শেষের প্রশ্নটাই বিশেষরকম অসুবিধাজনক, কারণ বিশেষ কোনো লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া এদেশে, অথবা অন্য কোথাও, কেউ ভ্রমণ করতে পারে, এ তাদের ধারণার বাইরে, অবিশ্বাস্য। কিন্তু দেখতে-শুনতে তারা সবাই চমৎকার লোক ; তাদের ব্যবহারে সারল্য, সহৃদয়তা, এমনকি ভদ্রতাও ছিল, কারণ তারা আসছিল সীমান্ত প্রদেশগুলোর সবচেয়ে কম বর্বর অঞ্চল থেকে।

আমরা তাদের ছেড়ে এক মাইল এগিয়ে গিয়ে তাঁবু ফেললাম। আমরা সংখ্যায় এত কম যে পাহারা দিতে হলে ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তাই পাছে ভ্রাম্যমাণ ইণ্ডিয়ানদের নজরে পড়ে এই ভয়ে আগুন নিবিয়ে ফেললাম। তারপর ঘোড়াগুলোকে আমাদের কাছাকাছি বেঁধে রেখে আমরা ভোর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নিদ্রাসুখ উপভোগ করলাম। তিনদিন বিনা বাধায় ভ্রমণ করে তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা 'স্কট্স্ ব্লাফ'-এর বিখ্যাত ঝরনার পাশে তাঁবু ফেললাম।

হেনরি শ্যাটিলন আর আমি ঘোড়ায় চড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম ভোরবেলা। ব্লাফের পশ্চিম ধার দিয়ে নেমে ওপারের সমতলভূমিটির ওপর দিয়ে চলেছি, এমন সময় আমাদের কয়েক মাইল সামনে পাহাড় বেয়ে যেন একসারি মহিষ দেখতে পাচ্ছি বলে আমার মনে হলো। হেনরি রাশ টেনে ঘোড়া থামাল, তারপর আমার চাইতে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ আর অভ্যস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "ওরা ইণ্ডিয়ান। যদ্দূর মনে হচ্ছে, ওল্ড্ স্মোকের বাড়ি ওগুলো। চলুন, যাওয়া যাক। ওরে ও 'পাঁচশো ডলার', ওঠ্, যেতে হবে।" ঘোড়াটাকে চাব্‌কে সে ছুটিয়ে নিয়ে চলল, আমিও আমার

ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে পাশে চললাম। একটু পরেই পুরো দু'মাইল দূরে প্রেয়ারির বুকে একটা কালো ফুট্‌কি দেখা গেল। সেটা ক্রমেই বড় হতে লাগল; ধীরে ধীরে বোঝা গেল ওটা ঘোড়ার পিঠে একজন মানুষ; তার একটু পরেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম একটি নগ্ন ইণ্ডিয়ান পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমাদের এক ফার্লং দূরত্বের মধ্যে এসেই সে ঘোড়াটাকে বৃত্তাকারে ঘোরালো আর ঘোড়াটাকে প্রেয়ারির ওপর নানারকম রহস্যময় নক্‌শায় ঘোরাতে লাগল। হেনরিও সঙ্গে সঙ্গে তার 'পাঁচশো ডলার' ঘোড়াটাকেও অমনি কশরৎ করাতে লাগল। এইসব ইসারার তাৎপর্য বুঝে হেনরি বলল, "এটা সত্যিই ওল্‌ড্‌ স্মোকের গ্রাম। বলিনি আপনাকে?"

ইণ্ডিয়ান লোকটি এগিয়ে আসতে লাগল, আমরা তার অপেক্ষায় থেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ লোকটি যেন মাটির তলায় সেঁধিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই প্রেয়ারির এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে গভীর খাদ; তাদের একটির মধ্যেই সে ঢুকে গিয়েছিল। পরের মুহূর্তেই তার ঘোড়াটার মাথা খাদের কিনারার ওপর দেখা গেল, তারপর সওয়ারসুদ্ধ ঘোড়াটা একটু কষ্ট করেই বেরিয়ে এসে লাফিয়ে আমাদের কাছে চলে এলো। লোকটি লাগাম ধরে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিতেই ঘোড়াটা উদ্দাম লাফালাফি বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সাধারণ ভদ্রতা অনুযায়ী করমর্দনের পালা। আগন্তুক লোকটির নামটি আমার মনে নেই। বয়সে সে তরুণ, আর নিজের জাতের ভেতর একটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি। তবু দেহসৌষ্ঠবে আর সাজসরঞ্জামে সে সাধারণ ভ্রমণের পোশাকে একজন ডাকোটা যোদ্ধার সুন্দর উদাহরণ। অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানের মতোই এই লোকটিও লম্বায় প্রায় ছয় ফুট; দেহটি নমনীয়, সুন্দর আর বেশ মজবুত; গায়ের চামড়া আশ্চর্য পরিষ্কার আর নরম। তার দেহে কোথাও রং মাখানো নেই; মাথা খালি; লম্বা চুল মাথার পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা, তার ওপর, অলঙ্কার হিসেবেই হোক বা অমঙ্গল-নিবারক কবচ হিসেবেই হোক, আড়াআড়িভাবে আট্‌কানো একটি যাদুবাঁশী। সে-বাঁশীটি ঈগল পাখির ডানার হাড় দিয়ে তৈরি, আর কতকগুলি অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন। তার মাথার পিছনদিক থেকে নেমে গেছে একসারি ঝক্‌ঝকে পিতলের চাক্‌তি, আকারে ক্রমশ ছোট থেকে বড। এই অদ্ভুত অলঙ্কারটি ডাকোটাদের ভেতর খুব চালু আর এর জন্য এরা এদের ব্যবসায়ীদের খুব বেশী দাম দেয়। লোকটার বুক আর দুটো হাতই সম্পূর্ণ অনাবৃত। মহিষের চামড়ার পোশাকটা—যেটা বিশ্রামের সময় সে গায়ে দিয়ে বুক আর হাত ঢেকে রাখত—কোমরবন্ধ থেকে ঝুলে পড়েছিল

কোমরের চারধারে। এছাড়া পায়ে পরা ছিল চটকদার মোকাসিন। এই হলো তার পুরো সাজের বিবরণ। তীর বয়ে নেবার জন্য তার পিঠে ঝুলছিল কুকুরের চামড়ার তৈরী একটি তূণ, আর হাতে ছিল একটা দেখতে ভালো না হ'লেও বেশ জোরদার ধনুক। তার ঘোড়ার মুখে লাগামের বদলে পরানো ছিল চুলের তৈরী একগাছা দড়ি। জিনটা ছিল কাঁচা চামড়ায় মোড়া কাঠের তৈরি ; জিনের সামনের দিক আর পিছনের দিক খাড়া আঠারো ইঞ্চি উঁচু, কাজেই ঐ জিনের ওপর একবার চেপে বসলে জিনের বাঁধন ছিঁড়ে না গেলে জিন থেকে যোদ্ধা সওয়ারকে কোনোমতেই খসানো যেত না।

আমাদের এই নতুন সঙ্গীর সঙ্গে এগিয়ে আমরা দেখলাম এদের আরো অনেকে পাহাড়ের মাথার ওপরে গোল হয়ে বসে আছে ; ওপাশের একটা গুহা থেকে এলোমেলোভাবে নেমে আসছে একসারি পুরুষ, স্ত্রীলোক আর শিশু, আর তাদের পিছনে পিছনে তাদের ঘোড়াগুলো টেনে নিয়ে আসছে তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলো। সেই ভোরবেলায় আমরা এগিয়ে যেতে যেতে সারাক্ষণই দেখতে পেলাম লম্বা বর্বর লোকগুলো আমাদের চারধারে নীরবে ঘুরঘুর করছে। দুপুরবেলায় আমরা 'হর্স ক্রীক' (ঘোড়া-খাঁড়ি) পৌছলাম। ইণ্ডিয়ানদের প্রধান দলটা আমাদের আগেই এসে পৌছেছিল। খাঁড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল এক লম্বা-চওড়া জোয়ান। লোকটি প্রায় উলঙ্গ ; একটা সাদা ঘোড়ার গলায় বাঁধা লম্বা দড়ির এক মাথা ধরে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল আমরা ওর কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই। ঠিক ওর পিছনেই একটা চমৎকার অশ্বতরের পিঠে বসে ছিল ওর সর্বকনিষ্ঠা আর প্রিয়তমা স্ত্রী। সেই অশ্বতরটির গায়ে চাপানো সাদা চামড়ার আবরণ, তার ওপর বাহারের জন্য নীল আর সাদা গুটি পরানো, আর তলায় ঝুলছে ধাতুর তৈরী অলঙ্কারের ঝালর, যা জানোয়ারটির নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই টুং-টাং আওয়াজ করে উঠছে। মেয়েটির গায়ের রং বেশ পরিষ্কার, আর দু'গালেই সিঁদুরের ফোঁটা। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটি, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝক্‌ঝকে দু'পাটি দাঁত দেখা গেল। মেয়েটির হাতে তার অভব্য স্বামীর লম্বা বল্লম, তার গায়ে লাগানো পালকগুলি উড়ছে বাতাসে ; স্বামীর সাদা ঢালটি ঝুলছে তার অশ্বতরের পাশে, বাঁশীটি ঝুলছে তার পিঠে। মেয়েটির পরনে হরিণের চামড়ার তৈরী জামা, প্রেয়ারিতে পাওয়া যায় এমনি একরকম মাটি দিয়ে চমৎকার সাদা রং করা, আর তার ওপর নানা নক্‌শায় গুটি সাজানো, আর তলায় ঝুলছে চওড়া ঝালর। দেখলাম সর্দারের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো জোয়ান চেহারার লোক, তারা তাদের মহিষের চামড়ার

পোশাকগুলি কাঁধে ঝুলিয়ে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তাদের পিছনে বেশ কয়েক একর জায়গা জুড়ে পড়েছে অস্থায়ী তাঁবু। যোদ্ধা, স্ত্রীলোক আর শিশুর দল যেন মৌমাছির মতো কিলবিল করছে; বিভিন্ন আয়তনের আর রঙের কুকুর চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে; আর কাছেই প্রশস্ত অগভীর স্রোতের জলে পা ডুবিয়ে মজা উপভোগ করছে ছেলেমেয়েরা আর নববধূর দল। আর তখনই দেশান্তর-যাত্রীদের এক লম্বা সারি তাদের ভারী ওয়াগনগুলো নিয়ে খাঁড়ি পার হচ্ছিল। তারা এবং তাদের বংশধরেরা যে জাতকে একশো বছরের ভেতরই ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দেবে, সেই জাতের লোকদের তাঁবুর পাশ দিয়েই এরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

দিনের বেলায় যতক্ষণ গরম বেশী থাকবে, শুধু ততক্ষণের জন্যই এই ইণ্ডিয়ানরা এখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁবুগুলোও তাই খাটানো হয়নি; তাঁবুর ভারী চামড়ার তৈরী আচ্ছাদনগুলো আর সেগুলোকে ঠেকা দিয়ে রাখবার লম্বা খুঁটিগুলো অস্ত্রশস্ত্র, বাসন, আর ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোর সাজসজ্জার সঙ্গেই এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছিল। প্রত্যেকটি আয়েসী যোদ্ধাকে তার স্ত্রীরা রোদ থেকে আড়াল করবার জন্য খুঁটির ওপর মহিষচর্মের পোশাক বা তাঁবুর আচ্ছাদন বিছিয়ে ছায়ার আশ্রয় তৈরি করে দিয়েছিল। এই আশ্রয়ের ছায়ায় যোদ্ধারা বসেছিল; সম্ভবত রকমারি অলঙ্কারে সজ্জিতা তরুণী প্রিয়তমাকে পাশে নিয়ে। প্রত্যেক যোদ্ধার পাশে দাঁড় করানো ছিল যোদ্ধা হিসেবে তার পদমর্যাদার চিহ্ন, ষাঁড়ের চামড়ার তৈরী তার সাদা ঢাল, তার ওষুধের থলে, তার তীরধনুক, তার বল্লম আর বাঁশী—তিন খুঁটির ত্রিপদের ওপর ঝুলানো। কুকুরগুলো ছাড়া সেখানে সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত আর শব্দমুখর ছিল বুড়ীরা। তারা সবাই 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনী বুড়ীদের মতো, তাদের এলো চুল উড়ছে বাতাসে, আর তাদের জীর্ণশীর্ণ দেহগুলোর ওপর ছিন্নভিন্ন পুরোনো মহিষচর্মের পোশাক ছাড়া অন্য কোনো আবরণ নেই। তাদের আদরের দিন বিগত হয়েছে দুই পুরুষ আগে, এখন যত কিছু শক্ত কাজ চাপে এদেরই ওপর—ঘোড়াগুলোকে সাজ পরানো, তাঁবু খাটানো, মহিষচর্মের পোশাকগুলোকে পরিষ্কার রাখা, আর শিকারীদের জন্য মাংস বয়ে নিয়ে আসা। এইসব ডাইনীর মতো বুড়ীদের কর্কশ কণ্ঠস্বর, কুকুরগুলোর ঘেউ-ঘেউ, শিশুদের আর মেয়েদের হাসি-হুল্লোড়, আর সেইসঙ্গে যোদ্ধা পুরুষগুলোর নির্লিপ্ত প্রশান্তি, সবকিছু মিলিয়ে এমন একটি জীবন্ত মনোরম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যা ভোলা অসম্ভব।

আমরা যে তাঁবু ফেললাম তা ইণ্ডিয়ানদের শিবির থেকে বেশী দূরে নয়। ওদের

কয়েকজন সর্দারকে আমাদের সঙ্গে আহারে নিমন্ত্রণ করে এনে তাদের বিস্কুট আর কফি খেতে দিলাম। মাটির ওপর অর্ধবৃত্তাকারে উবু হয়ে বসে তারা চট্ করে তা সাবাড় করে ফেলল। বিকেলবেলা যখন যাত্রাপথ বেয়ে অগ্রসর হলাম, আমাদের এই অতিথিদের কয়েকজনও তখন আমাদের সঙ্গে চলল। এরা ছাড়া এক মস্ত নাদুসনুদুস চেহারার বর্বর চলল আমাদের সঙ্গে, তার ওজন তিনশো পাউণ্ডের ওপর। শুয়োরের মতোই তার বিশাল মোটাসোটা চেহারা আর একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য তার ডাকনাম ছিল 'শুয়োর'। এই 'শুয়োর' চলেছিল একটা সাদা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে, সে বেচারার তো এই বিরাটকে বয়ে নিতে প্রায় প্রাণান্ত অবস্থা। শুয়োরের সেদিকে খেয়াল নেই ; সে দুটি পা ক্রমাগত দুলিয়েই চলেছে পালাক্রমে ঘোড়াটার দু'দিকের পাঁজরায় ঘা মেরে মেরে। এই বুড়ো কোনো দলের সর্দার নয়, সর্দার হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তার ছিল না ; বেজায় মোটা আর অলস বলে যোদ্ধা বা শিকারীও সে হতে পারেনি ; কিন্তু তার গাঁয়ে সে ছিল সবচেয়ে বড ধনী। ডাকোটা ইণ্ডিয়ানদের ধন হচ্ছে ঘোডা ; এই 'শুয়োর'-এর ঘোড়া ছিল ত্রিশটির বেশী, তার প্রয়োজনের দশগুণ, তবু তার ঘোড়ার খাঁই মেটেনি। ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে সে আমার করমর্দন করল আর বুঝিয়ে দিল সে আমার পরমভক্ত বন্ধু। তারপরই সে শুরু করল নানারকম ভাবভঙ্গি ; তার খোসামুদে মুখে গালভরা হাসি, আর ফোলা-ফোলা গালের মাংসের আডালে প্রায় চাপা-পডে-যাওয়া ছোট্ট চোখ দুটোয় কী যেন দুষ্টুমি মতলবের আভাস ফুটে উঠেছে। ইণ্ডিয়ানদের ইসারার ভাষা তখনো কিছুই শেখা হয়নি, আন্দাজে বুঝবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার। আমি তাই হেনরির শরণ নিলাম।

যদ্দুর জানা গেল, 'শুয়োর' এসেছিল একটা বিয়ের ঘটকালি করতে ; আমাকে ওর একটি মেয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে আমার ঘোড়াটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। আমি তার এ প্রস্তাব বাতিল করে দিলাম ; 'শুয়োর' কিন্তু তাতে মেজাজ একটুও খারাপ না করে হাসতেই লাগল, তার পোশাকটা কাঁধের দু'পাশে ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সে-রাতে আমরা যেখানে তাঁবু ফেললাম, সেখান দিয়ে প্লাট নদীর একটি শাখা দুটি উঁচু আর খাড়া পাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ; আগে যেমন দেখেছিলাম, এখানেও তেমনি স্রোত ঘোলাটে আর দ্রুত, কিন্তু এখানে দেখলাম ভেঙে-ভেঙে-পড়া পাড়ের ওপর গাছ জন্মাচ্ছে, আর জল আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় ঘাস জন্মাচ্ছে। এখানে আসবার ঠিক আগেই আমরা দেখলাম আমাদের ডানধারে দু-এক মাইল

দূরে দেশান্তর-যাত্রীরা তাঁবু ফেলেছে ; আর আমাদের কাছে ইণ্ডিয়ানরা যে আপ্যায়ন পেয়েছিল তেমনি আপ্যায়নের লোভেই যেন পাশের পাহাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে ইণ্ডিয়ানরা। আমাদের তাঁবুর সামনে বর্বর প্রাকৃতিক পরিবেশের নীরবতা ভঙ্গ করছিল একমাত্র প্লাট নদীর খরস্রোত। গাছের ভাঙাচোরা আধমরা ডালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আমরা দেখতে পেলাম কালো পাহাড়গুলোর আড়ালে অস্তাচলে ঢলে পড়ছে লাল সূর্য, তারই আলোয় লাল হয়ে উঠেছে নদীর চঞ্চল বক্ষ ; সেই রঙেই রঙীন আমাদের সাদা তাঁবু, নদীর খাড়া পাড়গুলি, আর পাড়ের ওপরের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলো। এ রং অচিরেই মিলিয়ে গেল ; তারপর আমাদের তাঁবুর আগুনের আলো ছাড়া আর কোনো আলো রইল না। আমরা এই আগুন ঘিরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে ধূমপানে আর কথাবার্তায় প্রায় আধা রাত কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোরে আমরা একটি রোদে পোড়া সমতলভূমি অতিক্রম করলাম। প্লাট নদীর তীর বেয়ে চলেছিল লম্বা এক কটন-উড গাছের সারি ; এই সারিই ঐ সমতল এলাকার একটি সীমান্ত। দূরে এই গাছতলায় একটা বাড়ির মতো কী যেন ঝাপসা দেখতে পেলাম। আরো কাছে যেতে ওটার আকার আর আয়তন স্পষ্টতর হয়ে উঠল, দেখলাম বাড়িই বটে, গাছের গুঁড়ি দিয়ে সৌন্দর্যের দিকে নজর না দিয়েই তৈরি। এটি একটি ছোট ব্যবসাদারী কেল্লা, দুজন ব্যবসাদারের যুক্ত সম্পত্তি। এটিকে এ অঞ্চলের অন্যান্য দুর্গগুলির মতো করেই তৈরি করার মতলব ছিল প্রথমে— মাঝখানে একটা চৌকো ফাঁকা জায়গা অর্থাৎ উঠোন, আর চারদিকে এই উঠোনের দিকে দরজাওয়ালা থাকবার আর মাল রাখবার ঘর। কিন্তু দুটো দিক মাত্র তৈরি হয়েছিল, বাকি দুটো দিক ফাঁকা ছিল। কাজেই প্রতিরক্ষার পক্ষে এই আধখেঁচড়া দুর্গ টি খুব উপযোগী ছিল না।

দুর্গটির কাছেই দুটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল ; সূর্যের প্রখর তাপ যেন কাঠের গুঁড়িকেও ঝল্সে দিচ্ছিল। এই অলস-করা দুঃসহ গরমে একটি মানুষও নড়াচড়া করছিল না, শুধু একটি বৃদ্ধা ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক ছাড়া। এই বৃদ্ধা সবচেয়ে কাছের তাঁবু থেকে তার গোল মুখটি বার করে ছিল। কয়েকটা কুকুরছানাও তাঁবুর তলা দিয়ে পিট্‌পিট্ করে তাকাচ্ছিল। শীগ্‌গীরই একটা দরজা খুলে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোটখাটো, রোদে-পোড়া চেহারার, কালো-চোখ ফরাসী লোক বেরিয়ে এলো। তার বেশভূষা একটু অদ্ভুত ধরনের ; কালো কোঁকড়ানো চুল আঁচড়ানো হয়েছে মাথার ঠিক মাঝখানে, আর ঝুলে পড়েছে কাঁধের নিচে। তার পরনে

ধোঁয়ায় সেঁকা মৃগচর্মের তৈরী আঁটসাঁট পোশাক, তার ওপর রং-করা সজারুর কাঁটা দিয়ে নানারকমের নক্শার বাহার। তার জুতো আর পায়ে জড়ানো চামড়ার পটিও ঐরকমই কাজ-করা। হেনরির কাছে পরে জেনেছিলাম এই লোকটির নাম রিচার্ড। রিচার্ডের দেহটি ছোট হলেও আশ্চর্যরকম মজবুত, সবল আর চটপটে। সারা দেহে কোথাও অনাবশ্যক মেদ নেই,—এ কথাটি অবশ্য এ অঞ্চলের প্রায় যে-কোনো শ্বেতাঙ্গ সম্বন্ধেই সত্য— , প্রতিটি অঙ্গ আঁটসাঁট আর শক্ত ; প্রতিটি পেশী পুষ্ট আর নমনীয় ; গোটা মানুষটাই যেন কঠোর শক্তি আর নমনীয়তার অপরূপ মিশ্রণ।

রিচার্ড আমাদের ঘোড়াগুলোকে সঁপে দিল এক নাভাহো ক্রীতদাসের জিম্মায়। বিশ্রী চেহারার এই লোকটা মেক্সিকো সীমান্তে বন্দী হয়েছিল। অতি অমায়িকভাবে আমাদের হাত থেকে বন্দুকগুলো নিয়ে রিচার্ড তার বাসগৃহের সেরা ঘরের দিকে আমাদের নিয়ে চলল। এ ঘরটি চৌকো, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ ফুট। মেঝে আর দেয়ালগুলো কালো মাটির তৈরি ; ছাদ তৈরি অমসৃণ কাঠ দিয়ে ; আর ঘরের ভেতরকার মস্ত আগুনের চুল্লীটা তৈরি প্রেয়ারির বুকে কুড়িয়ে পাওয়া চারটি চ্যাপ্টা পাথরের টুকরো সাজিয়ে। দেখলাম একটি ইণ্ডিয়ান ধনুক, ভোঁদড়ের চামড়ার তৈরী তূণ, রকি পাহাড় অঞ্চলের কয়েকটি চটকদার সৌখীন জিনিস, একটি ইণ্ডিয়ান ওষুধের থলে, একটি পাইপ আর তামাকের বটুয়া দেয়ালগুলোর শোভা বর্ধন করছে আর বন্দুকগুলো ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর আসবাব বলতে ছিল কেবলমাত্র মহিষ-চর্মের তৈরী পোশাক দিয়ে ঢাকা একটি এব্ড়ো-খেব্ড়ো ধরনের সোফা, তার ওপর মিশ্র রক্তের একটি লম্বা লোক অলসভাবে শুয়ে ছিল। লোকটির চুল তার মাথার দু'পাশে থোকায় থোকায় শিরীষের আঠা দিয়ে আঁটা আর সিঁদুর দিয়ে রাঙানো। আরো দু-তিনটি 'পাহাড়ী লোক' মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ছিল। লক্ষ্য করলাম তাদের পোশাকের সঙ্গে রিচার্ডের পোশাকের খুব বেশী তফাৎ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চমক লাগাল ষোলো বছরের একটি নগ্ন ইণ্ডিয়ান ছোকরা। মুখখানা সুন্দর, দেহের গঠন হাল্কা হলেও বেশ কর্মঠ, ছেলেটি বেশ সহজ ভঙ্গিতে বসে ছিল দরজার কাছেই এক কোণে। তার দেহের একটি অঙ্গও একচুলও নড়ছিল না, চোখের দৃষ্টিও অচল হয়ে ছিল উপস্থিত কোনো মানুষের দিকে নয়, মনে হচ্ছিল যেন ওর বিপরীত কোণে আগুনের চুল্লীর দিকে।

প্রেয়ারি অঞ্চলে ইণ্ডিয়ানদের বা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে ধূমপান করার রীতিটা অবহেলিত হতে বড় একটা দেখা যায় না। দেয়াল থেকে তাই পাইপটা

নামানো হলো, পাইপের মাথার বাটির ভেতর যথাযথ অনুপাতে তামাক আর শোংসাশা মিশিয়ে ঠেসে দেওয়া হলো। সেই পাইপ ধরানো হয়ে হাতে হাতে ঘুরতে লাগল আর প্রত্যেকেই পাইপে দু-একটি টান মেরে পাশের লোকের হাতে পাইপটা দিয়ে দিতে লাগল। এখানে আধঘণ্টা থেকে আমরা বিদায় নিলাম। বিদায় নেবার আগে এই নতুন বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানালাম নদীর গতিপথের উল্‌টো দিকে এখান থেকে মাইলখানেক দূরে আমাদের তাঁবুতে এসে আমাদের সঙ্গে কফি পান করে আসতে।

এসময় আমাদের চেহারা হয়ে গিয়েছিল প্রায় ঝোড়ো কাকের মতো ; পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে এসেছিল, অথচ সেগুলোকে মেরামত করবার কোনো উপায় ছিল না। লারামি কেল্লা তখন সাত মাইল দূর। এই চেহারা নিয়ে গিয়ে সেখানকার ভদ্র সমাজে হাজির হবো, এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগল। আমরা তাই নদীর ধারে থেমে চেহারাটাকে কত শুধ্‌রে নেওয়া যায় সেই সাধনায় লেগে গেলাম। গাছের গায়ে ছোট আয়না ঝুলিয়ে আমরা গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নিলাম, গত ছয় সপ্তাহ যা করিনি। প্লাট নদীতে যতটা সম্ভব গা ধুয়ে নিলাম অতি সন্তর্পণে, অনেক হাঙ্গামা করে, কারণ ঐ জলের চেহারা ছিল এক পেয়ালা চকোলেটের মতো, আর পাড়েও ছিল এমন হল্‌দে নরম কাদা যে জলে নামতে প্রথমে ঐ কাদার ওপর গাছের ডালপালা বিছিয়ে পা ফেলে এগোবার মতো রাস্তা করে নিতে হয়েছিল। রিচার্ডের আস্তানার একটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সংগৃহীত ঝক্‌ঝকে মোকাসিন পায়ে দিয়ে, আর আমাদের এই সংকীর্ণ সুযোগের ভেতর যেটুকু সম্ভব ফিটফাট হয়ে নিয়ে আমরা যেন অনেক বেশী সম্ভ্রান্ত বোধ করে ঘাসের ওপর বসে আমাদের নিমন্ত্রিত অতিথিদের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তারা এলো ; ভোজ উৎসব শেষ হলো ; পাইপে ধূমপান করা হলো। তারপর তাদের বিদায় জানিয়ে আমরা আমাদের ঘোড়াগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম কেল্লার দিকে।

এক ঘণ্টা বাদে আমাদের সামনে পাহাড় এসে সম্মুখ দৃষ্টি আট্‌কে দিল। পাহাড়ের ওপর উঠে উল্‌টো দিক দিয়ে নামতে দেখলাম ওধারে পাহাড়ের তলার পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে একটি স্রোত বয়ে চলেছে প্লাট নদীতে মিলতে। স্রোতের ওধারে সবুজ মাঠ, তার এখানে ওখানে ঝোপ, আর এই ঝোপের ভেতর ঐ দুটি নদীর মিলন-স্থানের কাছে দেখা যাচ্ছে একটি কেল্লার নীচু মাটির দেয়ালগুলো। এ কেল্লা লারামি কেল্লা নয়, আরেকটি এবং আরো আগে তৈরী ঘাঁটি। সফল প্রতিযোগীর কাছে হেরে গিয়ে এই কেল্লাটা পরিত্যক্ত, অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। একটু পরেই পাহাড়গুলো

আমরা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন দু'দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের রাস্তা করে দিল, আমাদের দৃষ্টিপথে এলো লারামি কেল্লা, নদীর ওধারে বাঁ দিকে একটি উঁচু জায়গার ওপর দেখা যাচ্ছে কেল্লার উঁচু বুরুজ আর খাড়া দেয়ালগুলো। কেল্লার পিছনে একসারি অনুর্বর নির্জন পাহাড়, আর তারও পিছনে সাত হাজার ফুট উঁচু গুরুগম্ভীর ব্ল্যাক পাহাড়।

আমরা লারামি কেল্লার প্রায় বিপরীত দিক থেকেই লারামি খাঁড়ি পার হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্রোতটা বৃষ্টিতে ফুলে এত দ্রুত হয়ে উঠেছিল যে আমাদের নিরস্ত হতে হলো। আমরা খাঁড়ির তীর বেয়ে এগিয়ে চললাম, স্রোত পার হবার জন্য আরো ভালো জায়গা বেছে নিতে। আমাদের দেখবার জন্য দেয়ালের ওপর লোকের ভিড় হলো। তাদের ভেতর চেনা মুখ দেখতে পেয়ে আনন্দে উজ্জ্বল মুখে হেনরি বলে উঠল—"ঐ যে বর্ডো, দূরবীন হাতে। ঐ হচ্ছে বুড়ো ভাস্কিস, ঐ টাকার, ঐ মে। কি আশ্চর্য! সাইমনো-ও রয়েছে দেখছি।" এই সাইমনো ছিল হেনরির সেরা বন্ধু, শিকারে সারা দেশে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমরা শীগ্‌গীরই পার হবার একটা ভালো জায়গা পেয়ে গেলাম। হেনরি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, টাট্টু ঘোড়াটা নিতান্তই উদাসীনভাবে নদী-কিনারে এগিয়ে গেল, তারপর পরম প্রশান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে স্রোতের ভেতর নেমে গেল। আমরা গেলাম ওর পিছু পিছু। আমাদের জিনগুলোর ওপর এসে জলের স্রোত আলোড়িত হতে লাগল, কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো সহজেই আমাদের বয়ে নিয়ে ওপারে পৌঁছে দিল। বেচারা ছোট্ট অশ্বতরগুলি তাদের টানা গাড়ি সুদ্ধ স্রোতে প্রায় ভেসে যাচ্ছিল; আমরা মনে মনে একটু ভয় নিয়েই দেখলাম তারা স্রোতের তলায় বিছানো পাথরের গোল টুকরোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে স্রোতের দাপটকে তুচ্ছ করে। অবশেষে সবাই নিরাপদে গিয়ে ওপারে উঠলাম; একটি সমতলভূমি অতিক্রম করে, ঢালু খাদে নেমে, তারপর চড়াই বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা পৌঁছলাম লারামি কেল্লার সদর দরজার সামনে, প্রবেশপথটি সুরক্ষিত রাখবার জন্যে তৈরী দালানের মুখোমুখী।

নবম অধ্যায়

লারামি কেল্লায়

একবছর বাদে পিছনপানে তাকিয়ে লারামি কেল্লা এবং তার বাসিন্দাদের কথা ভাবলে তাদের বাস্তবের চাইতে কল্পনা বলেই বেশী মনে হয়, অতীতের সেই দৃশ্যের

সঙ্গে পৃথিবীর যে দিকটা এখন দেখছি তার প্রভেদ এত বেশী। লম্বা ইণ্ডিয়ানরা তাদের মহিষের চামড়ার তৈরী সাদা পোশাকে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অথবা উঠোনের চারধারের দালানগুলোর নীচু ছাদের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। অগুন্তি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক খুব সাজগোজ করে ঘরগুলোর সাম্‌নে সাম্‌নে বসে ছিল। আর তাদের বর্ণসংকর ছেলেমেয়েগুলো সারা কেল্লা জুড়ে হৈ-হল্লা আর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল; ফাঁদপাতা শিকারী, ব্যবসায়ী আর কেল্লার কর্মীরা তাদের কাজে বা আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত ছিল।

আমাদের দেখে প্রবেশদ্বারের কাছে কেল্লার লোক এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু ওরা যে খুব খুশীমনে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল তা নয়। বরং আমরা ওদের সন্দেহ-ভাজনই হয়ে রইলাম, যেপর্যন্ত না হেনরি শ্যাটিলন বুঝিয়ে দিল আমরা ব্যবসায়ী নই, আর ওর কথার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আমরা 'বুর্জোয়া' অর্থাৎ কেল্লার সর্দারের হাতে তার উপরওয়ালাদের লেখা একটি পরিচয়পত্র দিলাম। চিঠিখানা সে উল্‌টো করে ধরে পড়বার খুব জোর চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু তার নিজের বিদ্যায় কুলাচ্ছে না দেখে সে সাহায্য নিল তার কেরানীর। কেরানীটি বেশ ছিমছাম, হাসিমুখ একজন ফরাসী, নাম মঁথাল। চিঠিখানা পড়া হতেই বর্ডো (কেল্লার সর্দার) তার কর্তব্য সম্বন্ধে একটু একটু করে সচেতন হয়ে উঠল। মনে তার অতিথি-বাৎসল্যের অভাব না থাকলেও অতিথি-সৎকারের অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা তার একেবারেই ছিল না। অভ্যর্থনার কোনো রীতিনীতিই সে মানল না, একটা কথা বলেও আমাদের মর্যাদা দিল না; দ্রুতপায়ে সে হেঁটে চলল, আমরা একটু অবাক হয়েই তার পিছু পিছু গেলাম বাড়ির দরজার মুখোমুখী একটা রেলিং আর সিঁড়ির সামনে। রেলিং-এর সঙ্গে আমাদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখবার ইসারা করে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বারান্দার ওপর দিয়ে আওয়াজ করে করে হেঁটে গিয়ে লাথি মেরে একটা দরজা খুলে ফেলল। দরজা খুলতেই দেখা গেল একটা বড় ঘর, তার সাজসজ্জা আসবাব ইত্যাদি গোলাঘরের চাইতেও বেশী। দেখা গেল আসবাব বলতে রয়েছে একটা সাদামাটা অসৌখীন ধরনের খাট, তাতে বিছানা নেই; দুটি চেয়ার, দেরাজওয়ালা একটি টেবিল, একটি জলের বাল্‌তি, আর তামাক কাটবার জন্য একটি কাষ্ঠফলক। পিতলের তৈরী একটি ক্রুসবিদ্ধ যীশুমূর্তি ঝুলছিল দেয়ালে, আর তারই কাছাকাছি একটি পেরেক থেকে ঝুলছিল পুরো একগজ লম্বা চুলওয়ালা একটা সম্প্রতি-সংগৃহীত মানুষের মাথার খুলি। এই বীভৎস স্মৃতিচিহ্নটির উল্লেখ পরে আমাকে আবার করতে হবে, কারণ আমাদের পরবর্তী কার্যাবলীর সঙ্গে এ বস্তুটির ইতিহাস জড়িত আছে।

লারামি কেল্লার ভেতর এই ঘরটিই সবচেয়ে ভালো। এ ঘরে সাধারণতঃ থাকত কেল্লার আসল সর্দার পেপিন, যার অনুপস্থিতিতে কেল্লার সর্দারি করবার ভার পেয়েছে বর্ডো। এই লোকটি ছোটখাটো, মোটাসোটা, স্পষ্টবাদী মানুষ। নতুন ক্ষমতার গরমে সে যে একটু ফুলে উঠেছে, সেটা বোঝা যাচ্ছিল মহিষের চামড়ার পোশাকের জন্য তার হাঁকডাকের বহর দেখে। এগুলো এনে মেঝের ওপর বিছিয়ে সেগুলোই হলো আমাদের বিছানা; সম্প্রতি কিছুদিন ধরে যেরকম বিছানায় শুয়ে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, তার চাইতে এ বিছানা অনেক ভালো। আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেলে আমরা বাইরে বারান্দায় এসে আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই আশ্রয়কে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। আমাদের নীচেই চৌকো উঠোন, যার চারদিকে ছোট ছোট ঘর অথবা খুপ্‌রি, যাদের দরজাগুলো উঠোনের দিকে। ঘরগুলো ব্যবহৃত হতো নানা কাজে, বিশেষ করে কেল্লায় যারা কাজ করত সেই পুরুষদের আর তাদের প্রতিপালিত স্ত্রীলোকদের থাকবার জন্য। আমাদের বিপরীত দিকে প্রবেশদ্বারের ওপর ঘরওয়ালা গাড়িবারান্দা। সেই ঘরে দ্রুত ধাবমান একটি ঘোড়ার মূর্তি আঁকা ছিল কাঠের ফলকের ওপর লাল রঙের পোঁচ বুলিয়ে। এই শিল্পীর দক্ষতার কাছে হার মেনে যায় পোশাকের আর তাঁবুর ওপর ইণ্ডিয়ানদের নক্‌শা-আঁকার দক্ষতা। ওদিকে একটা ব্যস্ততার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। পুরোনো ব্যবসায়ী ভাস্কিস-এর ওয়াগনগুলো এক সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের দিকে রওনা হবার উপক্রম করছিল, ক্যানাডার লোকেরাও যথাসম্ভব হট্টগোল করে প্রস্তুত হচ্ছিল, আর এখানে সেখানে এক এক জন ইণ্ডিয়ানকে দেখা যাচ্ছিল অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে।

লারামি কেল্লা হচ্ছে 'আমেরিকান ফার কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো ঘাঁটির একটি। এ অঞ্চলে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এই কোম্পানিরই একচেটিয়া ব্যবসা। এখানে এই কোম্পানির কর্মচারীদেরই একাধিপত্য; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এখানে কোনো জোর নেই, কারণ আমরা যখন এখানে ছিলাম তখন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সীমান্ত ঘাঁটিগুলো ছিল এখান থেকে প্রায় সাতশো মাইল পুবে। এই ছোট্ট কেল্লাটি রোদে-শুকানো ইঁট দিয়ে তৈরি, প্রস্থের চাইতে লম্বায় বেশী, আর এর দুটি কোণে রয়েছে মাটির তৈরী বুরুজ, আকারে অনেকটা সাধারণ বাসাবাড়ির মতো। দেয়ালগুলো প্রায় পনেরো ফুট উঁচু, আর তাদের মাথায় ছোট ছোট খুঁটি পুঁতে সরু বেড়ার মতো তৈরি করা রয়েছে। দেয়ালের ভেতরে ঘরগুলো প্রায় দেয়ালের গা ঘেঁষেই তৈরি; ঘরগুলোর ছাদ ভোজ-উৎসবের কাজে লাগানো চলে। ভেতরে কেল্লাটি একটি ব্যবধান

প্রাচীর দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা। এই ব্যবধানের একদিকে হচ্ছে এই চৌকো উঠোন, তার চারদিকে জিনিসপত্র রাখার ঘর, অফিস-ঘর আর থাকবার ঘর। অন্যদিকে রয়েছে গবাদি পশুর খোঁয়াড় ; এটি মাটির তৈরী উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা সরু একফালি জায়গা, যেখানে রাত্রিতে, অথবা বিপজ্জনক ইণ্ডিয়ানরা কাছাকাছি থাকলে, ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোকে নিরাপত্তার জন্য একত্র জড়ো করে রেখে দেওয়া হয়। প্রধান প্রবেশপথে পর পর দুটি দরজা আছে, দুয়ের মাঝখানে একটি খিলানপথ। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে একটি ছোট চতুষ্কোণ জানালা পাশের একটি ঘর থেকে এই খিলান-পথের ওপর খুলেছে। ফলে ভেতরদিকের দরজাটা যখন বন্ধ থাকে তখনও বাইরের লোক এই ছোট জানালার ফাঁক দিয়েই ভেতরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারে। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, কেনাবেচার ব্যাপারে সন্দেহজনক ইণ্ডিয়ানদের কেল্লার ভেতরে ঢুকতে না দিলেও চলে ; বিপদের আশঙ্কা হলেই ভেতরের দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং যা কিছু কথাবার্তা চলে ঐ জানালার মধ্য দিয়ে। এই সতর্কতা কোম্পানির কতকগুলো ঘাঁটিতে দরকার হলেও লারামি কেল্লায় খুব কমই নেওয়া হয়, কারণ আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে প্রায়ই মানুষ খুন হলেও ইণ্ডিয়ানদের দিক থেকে শত্রুতার কোনোরকম মতলবের আশঙ্কা এদিকে অনুভূত হয় না।

আমরা আমাদের নতুন আস্তানাটি নিরুপদ্রবে বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারলাম না। আমাদের ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে ঠেলে খুলে রাতের অন্ধকারের মতো কালো মুখে দুটি চোখ আমাদের দিকে তাকাল ; তারপর ঢুকল একটি লাল হাত আর কাঁধ। একটি লম্বা ইণ্ডিয়ান ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে আমাদের হাতে হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে অস্ফুট ভাষায় অভিবাদন জানিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। এর পর এলো আরো কয়েকজন, তেমনি কালো-মুখওয়ালা ইণ্ডিয়ান ; কাঁধ থেকে ভারী পোশাকগুলো নামিয়ে ফেলে তারা দিব্বি সহজভাবে আমাদের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসে পড়ল। এবার হাতে হাতে ঘোরাবার জন্য ধূমপানের পাইপ ধরাতে হলো ; এরা তখনকার মতো এইটুকু আতিথেয়তাই আমাদের কাছে আশা করেছিল। এই আগন্তুকেরা ছিল কেল্লার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের বাবা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয় ; কেল্লার ভেতরে এদের সম্পূর্ণ অলসভাবেই থাকতে আর ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হতো। আমাদের সঙ্গে যারা ধূমপান করল তারা সবাই তাদের সমাজে পদস্থ এবং নামী ব্যক্তি। এর পরেও যে দু-তিনজন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল, তারা বয়সে বা কৃতিত্বে বৃদ্ধ আর যোদ্ধাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন নয় ; তারা তাই তাদের গুরুজনদের উপস্থিতিতে সঙ্কুচিত বোধ করে তফাতে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের দিক থেকে একবারও দৃষ্টি না সরিয়ে। তাদের

গালগুলো সিঁদুর দিয়ে রাঙানো, কানে ঝিনুকের দুল, গলায় পুঁতির মালা। এই ছোকরারা তখনও শিকারী রূপে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, একটি মানুষকে হত্যা করার সম্মানও অর্জন করেনি ; এদের তাই এত তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো যে এরা সেই অনুপাতে আত্মবিশ্বাসহীন আর লাজুক ছিল। আগন্তুকদের এই ভিড়ে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হতে লাগল। ঘরের সবকিছুই ওদের পরীক্ষা করে দেখা চাই ; আমাদের বেশভূষা, সাজসরঞ্জাম সবকিছু তারা খুঁটিয়ে দেখল, কারণ এর উল্টো কথা অনেক বলা হয়ে থাকলেও নিজেদের সাধারণ চিন্তার আওতায় যতরকম বিষয়বস্তু আছে তাদের সম্বন্ধে বোধ হয় ইণ্ডিয়ানদের মতো এত বেশী কৌতূহল অন্য কোনো জাতের নেই। অন্যান্য সব বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন বলেই মনে হয়। যা তাদের বোধগম্য নয় তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না। তাদের বুদ্ধি চলে বাঁধাধরা পথে, বুদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা বা অনুমান তাদের ধাতে নেই। এদের আত্মা ঘুমন্ত ; পুরোনো বা নতুন জগতের জেসুইট বা পিউরিটান, কোনোরকম মিশনারীদের চেষ্টা আজ পর্যন্ত এদের আত্মার এই ঘুম ভাঙাতে পারেনি।

সূর্যাস্তের সময় দেয়ালের ওপর থেকে আমরা যখন কেল্লার চারদিকের জনশূন্য সমতল প্রান্তরগুলো দেখছিলাম, দূরে লাল পশ্চিমাকাশের পটভূমিকায় লক্ষ্য করলাম কতকগুলো অদ্ভুত জিনিস, যেগুলোকে উঁচু মঞ্চ বলে মনে হলো। মঞ্চগুলোর ওপরে কতকগুলো অদ্ভুত বোঝা চাপানো, আর তাদের তলায় হাড়ের মতো সাদা কী যেন সব দেখা যাচ্ছে। ঐ জায়গাটা ছিল ডাকোটা সর্দারদের সমাধিস্থান। এই সর্দারদের মৃতদেহ তাদের জাতের লোকেরা কেল্লার কাছাকাছিই রাখতে ভালবাসে এই আশায়, যে তাহলে শত্রুরা ঐ মৃতদেহগুলোর ক্ষতি বা অমর্যাদা করতে পারবে না। তবু কিন্তু এমনও হয়েছে, আর খুব বেশী আগেও নয়, যে 'ক্রো' ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা ডাকোটা সর্দারদের মৃতদেহ মঞ্চ থেকে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, আর ডাকোটা ইণ্ডিয়ানরা কেল্লার ভেতরে থেকে শুধু চীৎকারই করেছে, সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প বলে তাদের সম্মানিত পবিত্র স্মৃতিচিহ্নগুলোকে এই অমর্যাদা থেকে বাঁচাতে পারেনি। মাটির ওপরে যে সাদা জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, সেগুলো ছিল মহিষের মাথার খুলি। খুলিগুলো তাদের গুপ্ততন্ত্রানুযায়ী বৃত্তাকারে সাজানো। ইণ্ডিয়ানদের সমাধিক্ষেত্রে এমনটি প্রায়ই দেখা যায় ; তারা ঐ বৃত্তের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে।

গোধূলিলগ্নে দেখতে পেলাম পঞ্চাশ-ষাটটি ঘোড়া দল বেঁধে কেল্লার দিকে এগিয়ে আসছে। এগুলো এই কেল্লারই ঘোড়া, সশস্ত্র পাহারাদারের তত্ত্বাবধানে নীচের মাঠে

গিয়েছিল ঘাস খেতে, এখন রাত্রের জন্য এদের খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। খোঁয়াড়ের ভেতরে যাবার দরজা খুলে গেল, দরজার ধারে দাঁড়াল যে প্রহরী, সে এক বুড়ো ক্যানাডিয়ান (ক্যানাডার লোক), তার চোখের ভ্রূযুগল ধূসর আর ঘন, আর কোমরবন্ধে আট্‌কানো একটি সৈনিকের পিস্তল। তার সঙ্গীটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে, রাইফেলটি জিনের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে ঘোড়ার সারির পিছন থেকে ঘোড়াগুলোকে সামনের দিকে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে সরু খোঁয়াড়টা ভর্তি করে আধা-জংলী ঘোড়াগুলো নানারকম দুরন্তপনা করতে লাগল।

কান-ঝালাপালা-করা ঘণ্টা বাজিয়ে এ অঞ্চলের একজন ক্যানাডিয়ান আমাদের খেতে যাবার আহ্বান জানাল। কেল্লার নীচুদিকের একটি ঘরে একটি অমসৃণ টেবিলের ওপর আমাদের খাবার পরিবেশন করা হলো রুটির টুকরো আর মহিষের শুকনো মাংস,—দাঁতের জোর বাড়াবার পক্ষে চমৎকার। আমাদের সঙ্গেই খেতে বসল কেল্লার সর্দার আর উচ্চ কর্মচারীরা, এরা হেনরি শ্যাটিলনকেও নিজেদের মধ্যেই ধরে নিল। আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই দ্বিতীয়বার টেবিল সাজানো হলো (এবার অবশ্য রুটির রাজভোগটি বাদ পড়ল); এ দফায় খেতে বসল কয়েকজন শিকারী প্রভৃতি নীচুস্তরের লোক। কেল্লার কয়েকজন সাধারণ ক্যানাডিয়ান কর্মীকে শুকনো মাংস দিয়ে পরিতৃপ্ত করা হলো তাদের থাকবার ঘরের একটিতে। লারামি কেল্লার গৃহস্থালির একটু নমুনা দেবার জন্যে একটি কাহিনী বলি। আমরা কেল্লায় থাকাকালে এ কাহিনী সেখানকার লোকদের মধ্যে চালু ছিল।

পিয়ের নামে একটি বৃদ্ধ লোক ছিল ; তার কাজ ছিল ভাঁড়ার-ঘর থেকে খাবার-ঘরে মাংস নিয়ে আসা। বুড়ো পিয়ের তার সঙ্গীদের জন্য মাংসের ভালো ভালো অংশগুলো বেছে রাখত। এই পক্ষপাতের ব্যাপারটা সর্দারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেশীদিন এড়াতে পারল না। এতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে সর্দার ভাবতে লাগল এটা কি করে বন্ধ করা যায়। শেষপর্যন্ত একটা উপযুক্ত মতলব তার মাথায় খেলল। যে ঘরে মাংস রাখা হতো, তার পাশের ঘরেই রাখা হতো 'ফার' অর্থাৎ লোমশ পশুচর্ম। দুটি ঘরের মাঝখানে একটি মাটির দেয়ালের ব্যবধান। কেল্লার সঙ্গে এই ফারের ঘরটির যোগাযোগের পথ ছিল শুধু দেয়ালের গায়ে একটি ছোট্ট চৌকো ছিদ্র। ঘরটা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকার। এক সন্ধ্যাবেলা সবার অলক্ষ্যে সর্দার চুপি চুপি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহ গলিয়ে ছোট ঘরটির ভেতর ঢুকে ফার আর মহিষ-চর্মের পোশাকের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে রইল। একটু পরেই বুড়ো পিয়ের এলো লণ্ঠন হাতে। আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে মাংসের গাঁইট বার করে যথারীতি মাংসের ভালো ভালো

টুকরোগুলো বেছে রাখছে, এমন সময় ভেতরের ছোট ঘরটির ভেতর থেকে ফাঁপা ভূতুড়ে কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—"পিয়ের, পিয়ের! ঐ ভালো মাংস রেখে দাও। শুধু মাংসের সরু টুকরোগুলো নাও।" পিয়ের ভীষণ ভয় পেয়ে হাত থেকে লণ্ঠনটা ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে কেল্লার ভেতর ছুটে এলো চীৎকার করতে করতে; সে ভেবেছিল ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকেছে স্বয়ং শয়তান। বিষম আতঙ্কে ছুটতে ছুটতে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে সে কাঁকরের ওপর পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেল। ক্যানাডিয়ানরা ছুটে গেল পিয়েরকে সামলাতে। কেউ কেউ পিয়েরকে ভূমিশয্যা থেকে তুলল, আর বাকি সবাই দুটি লাঠি দিয়ে ক্রসচিহ্ন তৈরি করে শয়তানকে তার ঘাঁটিতে আক্রমণ করতে রওনা হবার উপক্রম করল। সর্দার তখন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। পিয়েরের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তার ভয় ভাঙাবার জন্য সর্দারকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হলো।

পরদিন ভোরে আমরা দুটি দরজার মধ্যবর্তী খিলান-পথে বসে ভাস্‌কিস আর মে নামে দুজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। এই দুটি লোক, আর আমাদের সৌখীন বন্ধু কেরানী মঁথাল—সারা কেল্লার ভেতর পড়তে আর লিখতে জানতো শুধু এই তিনজন। মে একটি অদ্ভুত গল্প বলছিল পর্যটক ক্যাটলিন সম্বন্ধে, এমন সময় এক কদাকার ক্ষুদে ইণ্ডিয়ান একটা বিশ্রী ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে এসে কেল্লায় ঢুকল। আমাদের প্রশ্নের জবাবে সে বলল স্মোকের গ্রাম এখান থেকে খুব কাছে। এর কয়েক মিনিট বাদেই নদীর ওপারের পাহাড়গুলি অসভ্যদের ভিড়ে প্রায় ঢেকে গেল—তারা কতক ঘোড়ায় চড়া, কতক এলো পায়ে হেঁটে। মে তার গল্প শেষ করল। ততক্ষণে ঐ অসভ্যদের দল নেমে এসে লারামি খাঁড়ির ওপারে এসে পৌঁছেছে আর একসঙ্গে খাঁড়ি পার হতে শুরু করেছে। আমি খাঁড়ির ধারে পায়ে হেঁটে চলে গেলাম। স্রোতটা প্রশস্ত, স্রোতের গভীরতা ছিল তিন থেকে চার ফুট, আর বেগ খুব দ্রুত। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত স্রোতের জল যেন আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছিল কুকুর, ঘোড়া আর ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ে। তাঁবু খাটাবার লম্বা লম্বা খুঁটি বয়ে আনছিল ঘোড়াগুলো, খুঁটির ভারী দিকটা দড়ি দিয়ে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা—জিনের দু'দিকের প্রত্যেক দিকে দুটো বা তিনটে খুঁটি—বাকি দিকটা মাটিতে। ঘোড়ার ফুটখানেক পিছনে দুটি খুঁটির মাঝখানে ঝুলানো একটি বড়-রকমের ঝুড়ি, জায়গামতো শক্ত করে বাঁধা। ঘোড়ার পিঠের ওপর চাপানো নানারকম জিনিসপত্র; ঝুড়িটাতেও থাকে ঘরোয়া বাসনপত্র, কিংবা কতকগুলো কুকুরছানা, ছোট শিশু, অথবা এক অতি বৃদ্ধ পুরুষ। এইরকম অদ্ভুত মিছিল তখন এদিকে আসছিল স্রোত অতিক্রম করে। এদের সঙ্গে অনেক কুকুরও আসছিল সাঁতার কাটতে কাটতে; মাঝে মাঝে তাদেরও বইতে হচ্ছিল

কিছু কিছু বোঝা। যোদ্ধারাও আসছিল ঘোড়া ছুটিয়ে, তাদের কারও কারও পিছনে লেপ্‌টে রয়েছে কোনো রোগা হাল্‌কা ছেলে। দলের স্ত্রীলোকেরা বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো অনেকগুলো ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে ছিল। গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার কথা বলার নয়। কুকুরগুলো সমবেত কণ্ঠে নানারকম চীৎকার করছিল। ঝুড়ির ভেতর ছোট ছোট কুকুরছানাগুলি আরামে শুয়ে ছিল; সেখানে জল ঢুকে তাদের নিশ্চিন্ত আরামের ব্যাঘাত ঘটাতেই ছানাগুলি বিশ্রী-রকম কেঁউ-কেঁউ করতে লাগল। ঝুড়ির ভেতর ক্ষুদে শিশুর দলও তাদের ঝুড়ির কিনারাগুলো দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তাদের গা ঘেঁষে বয়ে চলা স্রোতের দিকে কালো কালো চোখ দিয়ে ভীষণ ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল, আর জলের ঝাপ্‌টা মুখে এসে লাগতেই মুখ বিকৃত করছিল। কতকগুলো কুকুর তাদের পিঠের বোঝা সহ স্রোতে ভেসে যেতে যেতে করুণ, অসহায় ভাবে চীৎকার করছিল, আর বৃদ্ধা ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকগুলি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে যার প্রিয় কুকুরগুলোকে ঘাড় ধরে তুলে আনছিল। ঘোড়াগুলো তীরের নাগাল পেয়েই যেমন করে পারল তীরের ওপর উঠে পড়ল। ছাডা ঘোডা আর ঘোড়ার ছানাগুলোও এলো তারপর। কখনো বা ভিড়ের ভেতর দিয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে ইণ্ডিয়ান বুড়ীরা এলো তাদের পিছু পিছু চেঁচাতে চেঁচাতে; উত্তেজনার কিছুমাত্র কারণ পেলেই এভাবে চেঁচানো এদের স্বভাব। গোলমাল হাসিখুশী ইণ্ডিয়ান তরুণীরা সিঁদুরের রঙে নিজেদের রূপের বাহার যথাসাধ্য বাড়িয়ে নদীতীরে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল যে-যার প্রভুর বল্লম উঁচু করে; সেটা হলো ঐ প্রভুর গৃহস্থালির বাকি অংশগুলোকে একজায়গায় জড়ো করবার জন্যে ডাক বা ইশারা। কয়েক মুহূর্তের ভেতর ভিড় সরে গেল; প্রত্যেকটি পরিবার ঘোড়া আর জিনিসপত্রাদি নিয়ে কেল্লার পিছনের সমতলভূমিতে সারি বেঁধে চলে গেল। তারপর সেখানে আধঘণ্টার ভেতর তাদের ষাট-সত্তরটি ঘর উঠে গেল, সবগুলো ঘর ক্রমশ ওপরদিকে সরু হয়ে গেছে। তাদের ঘোড়াগুলো শয়ে শয়ে চারধারের প্রেয়ারিভূমিতে চরে ঘাস খেতে লাগল, আর কুকুরগুলো বেড়াতে লাগল যেখানে সেখানে। কেল্লাটা ছিল যোদ্ধায় ভরা, আর দেয়ালগুলোর তলায় তলায় ছোট ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ হৈ-হল্লা করছিল।

নতুন আগন্তুকরা এসে পেঁছিতে না পেঁছিতেই বর্ডো কেল্লার এধার থেকে ওধারে ছুটতে ছুটতে তার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলল দূরবীনটা দিতে। মেরী আদর্শ স্ত্রী, পরম পতিভক্ত, দূরবীনটা বার করে দিল; বর্ডো সেটা নিয়ে দেয়ালের পাশে ছুটে গেল। দূরবীনের মাথাটা পূবদিকে ঘুরিয়ে একটা দিব্বি দিয়ে বলল, "ঐ আসছে পরিবারগুলো।" কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল দেশান্তর-যাত্রীদের ভারী ক্যারাভান পাহাড়

থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। নদীতে পৌঁছে তারা একটুও না ঘুরে বা না থেমে সোজা জলে নেমে পড়ে স্রোতটা পেরিয়ে চলে এসে উল্‌টো দিকের তীরে উঠে এসে সোজা কেল্লা আর ইণ্ডিয়ান পল্লীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তারপর সিকি মাইল দূরে একটা ভালো জায়গা পেয়ে তারা ঘুরে ঘুরে একটা বৃত্ত তৈরি করল। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের শান্তি অবিঘ্নিত রইল। দেশান্তর-যাত্রীরা তাদের তাঁবু ঠিক করতে ব্যস্ত রইল; কিন্তু তাঁবু ঠিক করা হয়ে যেতেই ওরা যেন কেল্লার ওপর ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। চওড়া টুপি, সরু মুখ আর ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির ভিড় জমে গেল কেল্লার সদর দরজায়। বাদামী রঙের কাপড়ের পোশাক-পরা, লম্বা, বেখাপ্পা চেহারার পুরুষ আর বিদ্‌ঘুটে চেহারার রোগা লিক্‌লিকে স্ত্রীলোকের দল একসঙ্গে ভিড় করে এসে এমনভাবে কেল্লার প্রতিটি কোণ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, যেন কৌতূহলের ভূত চেপেছে তাদের ঘাড়ে। এই আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম, ঘরের আশ্রয়ে এদের হাত থেকে নিরাপদে থাকা যাবে, এই ভ্রান্ত আশায়। দেশান্তর-যাত্রীরা পূর্ণ উদ্যমে তাদের অনুসন্ধান চালাল। তারা ঢুকে পড়ল বিস্মিত ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের ঘরেও, যেগুলোকে ঘর না বলে গুহা বলাই ঠিক। সবকিছুই তন্নতন্ন করে জেনে যাবে, এই পণ করেই তারা পুরুষদের ঘরগুলো দেখতে লাগল, এমনকি কেল্লার সর্দার আর মেরী যে ঘরে থাকত সে-ঘরটাও তাদের অনুসন্ধান থেকে বাদ পড়ল না। অবশেষে ওদের একটা বড় দল এসে হাজির হলো আমাদের ঘরের দরজায়, কিন্তু আমাদের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে থাকবার উৎসাহ পেল না।

কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবার পর তারা কাজের কাজ শুরু করল। পুরুষরা তাদের আগামী যাত্রাপথের জন্য দরকারী জিনিসপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হলো—দাম দিয়ে কিনে, অথবা বিনিময়ে তাদের বাড়তি মাল দিয়ে।

ফাঁদপাতা শিকারী আর ব্যবসায়ীদের এই দেশান্তর-যাত্রীরা বলত ফরাসী ইণ্ডিয়ান, আর এদের ওপর ভীষণ বিরুদ্ধভাব পোষণ করত। তাদের ধারণা ছিল—এবং এই ধারণার কারণও ছিল—যে এই ফরাসী ইণ্ডিয়ানদের তাদের ওপর মনোভাব খুব প্রসন্ন নয়। তাদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফরাসীরা ইণ্ডিয়ানদের উস্‌কানি দিচ্ছে দেশান্তর-যাত্রীদের আক্রমণ করে কেটে ফেলতে। ওদের শিবিরে গিয়ে বুঝতে পারলাম কী অসাধারণ উদ্বেগ আর দ্বিধার ভেতর তারা রয়েছে। তারা যেন জলের মাছ, এসে পড়েছে ডাঙায়; অথবা একদল স্কুলের ছাত্র, জঙ্গলের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলেই পরিষ্কার বোঝা যেতো তাদের ভেতর

কয়েকজনের মনে কী অসামান্য সাহস। গ্রামের প্রান্তবর্তী জঙ্গলে যে অভ্যস্ত, সে অরণ্যে ততটা অস্বস্তি বোধ করবে না, কিন্তু অসহায় বোধ করবে সুদূর প্রেয়ারি অঞ্চলে। খাঁটি পাহাড় অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তার তফাৎ হবে ঠিক ততটাই, যতটা তফাৎ ওটাওয়া নদীর খরস্রোতে নৌকো-বেয়ে-চলা ক্যানাডিয়ান পর্যটকে আর হর্ন অন্তরীপের কাছাকাছি সমুদ্রের ঝড়ে আমেরিকান নাবিকে। তবু আমার সঙ্গী আর আমি ওদের বর্তমান উদ্বিগ্ন মনোভাবের কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণটা কাপুরুষতা নিশ্চয়ই নয়, কারণ এরা মণ্টেরি আর বুয়েনা ভিস্টার স্বেচ্ছা-সৈনিকদেরই সমগোত্রীয়। তবু এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই সীমান্তের অধিবাসীদের ভেতর সবচেয়ে ভোঁতা আর অজ্ঞ, এ অঞ্চল আর এর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে এদের কোনো জ্ঞানই নেই; অনেক দুর্ভাগ্য ইতিপূর্বে তাদের সইতে হয়েছে, এবং আরো দুর্ভাগ্যের তারা আশঙ্কা করছে; মানুষের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়নি, এবং এদিক দিয়ে তাদের নিজের ক্ষমতাও তারা কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখেনি।

ওদের পুরো সন্দেহ পড়ল আমাদের ওপর। আমরা ওদের অপরিচিত বলেই ওদের শত্রু বলে পরিগণিত হলাম। সীসা এবং আরো কিছু কিছু দরকারী জিনিস সংগ্রহের জন্য আমরা মাঝে মাঝে দেশান্তর-যাত্রীদের তাঁবুতে যেতাম। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আর পকেটে হাত নাড়াচাড়া করতে করতে, দর ঠিক হলে দামটা দেওয়া হতো, তারপর দেশান্তর-যাত্রী লোকটি জিনিসটা আনতে যেতো। লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে তার খোঁজে গিয়ে দেখতাম সে তার ওয়াগনের লম্বা কাঠটার ওপর বসে আছে।

আমাদের দেখেই সে বলে উঠত, "শোনো হে অপরিচিত—কেনা-বেচা না করাই আমি ঠিক করলাম।"

দরদস্তুর ঠিক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর কোনো বন্ধু ওর পিছু পিছু গিয়ে ওর কানে-কানে বলেছিল আমরা ওকে ঠকাতে চাইছি, সুতরাং আমাদের সঙ্গে কারবার না করাই ওর পক্ষে নিরাপদ।

দেশান্তর-যাত্রীদের এই ভীরু মনোভাবটা ওদের পক্ষে অত্যন্ত বেশী দুর্ভাগ্যজনক, কারণ এটা তাদের পক্ষে সত্যিকারের বিপদের কারণ ছিল। ইণ্ডিয়ানদের সামনে সাহস আর সতর্ক আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখাতে পারলে প্রতিবেশী হিসেবে তারা মোটামুটি-রকম নিরাপদ। ওদের কাছে আপনার নিরাপত্তা নির্ভর করবে আপনি ওদের কতটা শ্রদ্ধা আর ভীতি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, তার ওপর। একটু ভীরুতা বা দ্বিধা দেখিয়েছেন কি, অমনি সেই মুহূর্ত থেকেই ওরা আপনার বিশ্বাসঘাতী,

ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হবে। ডাকোটা ইণ্ডিয়ানরা এই দেশান্তর-যাত্রীদের ভীতি আর উদ্বেগের আঁচ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সুযোগ নিতে শুরু করল। তারা বিষম দুর্বিনীত হয়ে উঠে কড়া-রকমের দাবি করতে লাগল। যে-কোনো দল কেল্লায় আসুক না কেন, এসে একটা ভোজ দাবি করা এদের যেন রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। স্মোকের গ্রামের বাসিন্দারা কয়েকদিনের পথ চলে এসেছে কফি আর বিস্কিটের লোভে। তারা এসে 'ভোজ' দাবি করায় দেশান্তর-যাত্রীরা তাদের দাবি অস্বীকার করতে সাহস পায়নি।

একদিন গোধূলিবেলায় দেখতে পেলাম গ্রাম ফাঁকা; বুড়ো, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক আর ছোটরা দেশান্তর-যাত্রীদের তাঁবু লক্ষ্য করে দলে দলে এগিয়ে আসছে রংচঙে পোশাক পরে, মুখে আসন্ন আনন্দের আভাস নিয়ে। তাঁবুতে পৌঁছেই তারা অর্ধবৃত্তাকারে বসে পড়ল। স্মোক বসল মাঝখানে, তার দু'পাশে সৈনিক কয়েকজন, তারপর যুবক আর বালকবৃন্দ, আর সর্বশেষে অর্ধচন্দ্রের দুই মাথায় স্ত্রীলোক আর শিশু। তারা বিস্কিট আর কফি দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল; দেশান্তর-যাত্রীরা হাঁ করে মুখ খুলে তাদের বর্বর অতিথিদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যখনই কোনো নতুন দেশান্তর-যাত্রীদল লারামি কেল্লায় এসে পৌঁছতে লাগল, তখনই এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল, আর রোজই ইণ্ডিয়ানরা আরো লোভী আর দুর্দান্ত হয়ে উঠতে লাগল। এক সন্ধ্যায় নিছক দুষ্টুমি করে যে পেয়ালায় তাদের কফি খেতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এতে দেশান্তর যাত্রীরা এমন ভীষণ চটে উঠল যে তাদের ভেতর কয়েকজন হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে বেয়াড়া ইণ্ডিয়ানদের ওপর গুলী চলোবে ঠিক করল; অনেক কষ্টে তাদের নিবৃত্ত করা গেল। আমরা এ অঞ্চল ছেড়ে যাবার আগে ডাকোটা ইণ্ডিয়ানদের এই দৌরাত্ম্য করার মনোভাব আরো বেড়ে উঠল, তারা খোলাখুলি দেশান্তর-যাত্রীদের ধ্বংস করে ফেলবে বলে শাসাতে লাগল, আর দু-একটা দলকে লক্ষ্য করে সত্যি সত্যি গুলীও চালাল। এই বিপজ্জনক অঞ্চলে সৈন্যদল মোতায়েন আর সামরিক আইন চালু রাখা অত্যন্ত আবশ্যক; এবং লারামি কেল্লায় বা কাছাকাছি কোথাও তাড়াতাড়ি সৈন্য মোতায়েন না করলে দেশান্তর-যাত্রী এবং অন্যান্য যাত্রীরা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হবে।

ডাকোটা আর সিয়োক্স্ ইণ্ডিয়ানদের ওগিল্লাল্লা, ব্রুলে প্রভৃতি পশ্চিমী দলগুলো পুরোপুরি বর্বর, সভ্যতার সঙ্গে কোনোরকম সংস্পর্শে এসে এদের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এদের একজনও নেই যে ইউরোপীয় ভাষা জানে অথবা কোনো আমেরিকান

উপনিবেশ দেখেছে। গত দু-এক বছর ধরে এরা দেশান্তর-যাত্রীদের অগ্নিগন-যাত্রার পথে এদের দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দেখছে, তার আগে পর্যন্ত এরা কোনো শ্বেতাঙ্গ চোখে দেখেনি, ফার-কোম্পানির ঘাঁটিগুলোতে নিযুক্ত অল্প দু-চারজনকে ছাড়া। এদের ধারণা ছিল তাদের তুলনায় কিছু কম হলেও এই সাদা লোকগুলোর বুদ্ধি আছে, তাদেরই মতো সাদারাও চামড়ার তৈরী বাড়িতে থাকে আর মহিষের মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। কিন্তু যখন ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা মানুষ তাদের দেশে আসতে লাগল গবাদি পশু আর ওয়াগন নিয়ে, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারা ভাবতেই পারেনি পৃথিবীতে এত সাদা মানুষ আছে। তাদের সেই বিস্ময় এখন ক্রোধে পরিণত হচ্ছে। যদি এখন থেকেই খুব সাবধান না হওয়া যায়, তাহলে এর ফল হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

এবারে একটি ইণ্ডিয়ান বাড়ির অভ্যন্তরটা দেখা যাক। শ আর আমি প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি দেখতে যেতাম। সন্ধ্যাগুলো বেশীর ভাগ ওদের গ্রামেই কাটাতাম ; শ নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিত, কাজেই বেশ ভালো একটা অজুহাতও পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের একদিনের সফরের বিবরণ দিলেই তা থেকে অন্যদিনের সফরগুলোর নমুনা বোঝা যাবে। সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে, ঘোড়াগুলোকে খোঁয়াড়ের ভেতরে এনে রাখা হয়েছে। 'প্রেয়ারির মোরগ', ইণ্ডিয়ানদের ভেতর নামকরা সৌখীন যুবক, একদল মেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে খেতে নাচ শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে সে বুকের ভেতর থেকে যেন ধাক্কা মেরে মেরে অদ্ভুত একঘেয়ে একরকম আওয়াজ বার করতে লাগল আর মেয়েগুলো সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে করুণ সুরে গান গাইতে লাগল। গেটের বাইরে ছেলেমেয়েরা হাসি-তামাসায় মগ্ন ; আর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যোদ্ধার পোশাক-পরা একজন যোদ্ধা, সম্প্রতি সে এক পনী ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করে তার মাথার খুলি খুলে নেবার গৌরব লাভ করেছে, তারই চিহ্নস্বরূপ তার সারা মুখ জুড়ে কুচকুচে কালো রঙের পোঁচ লাগানো। এদের ছাড়িয়ে গিয়ে দেখলাম আমাদের আর লাল পশ্চিমাকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইণ্ডিয়ানদের উঁচু কালো কালো বাড়িগুলো। আমরা চলে গেলাম সর্দার বুড়ো স্মোকের বাড়িতে। অন্যান্য বাড়ির তুলনায় এ বাড়িটা একটুও ভালো নয়, বরং অত্যন্ত শ্রীহীন। এদের এই গণতান্ত্রিক সম্প্রদায়ে কোনো সর্দার উচ্চ মর্যাদা দাবি করে না। স্মোক একটা মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ছিল। আমাদের দেখেই সে যে অভ্যর্থনাসূচক আওয়াজ করল তাতে গভীর

আন্তরিকতার সুর মাখানো; তার মূলে বোধ হয় শ-র ডাক্তারী প্রতিভা মর্যাদায়। বাড়ির চারদিকে বসে ছিল কতকগুলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক আর বহু ছেলেমেয়ে। শ-র রোগীদের উপসর্গ ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অত্যধিক রোদ লাগার দরুন চক্ষুপ্রদাহ; এই রোগটির চিকিৎসা শ ভালোই করত। সে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এবং ওগিল্লাল্লাদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বোধকরি সেই প্রথম চালু করেছিল। আমাদের বসবার জন্য চামড়ার পোশাক পেতে দেওয়া হলে আমরা যেইমাত্র তার ওপর বসলাম, অমনি এক রোগী এসে হাজির। এ আর কেউ নয়, সর্দারের মেয়ে, এ গাঁয়ের সেরা সুন্দরী। ডাক্তারের সঙ্গে আগেই সে পরিচিত ছিল, কাজেই বেশ সহজভাবেই সে নিজেকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিল, আর ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করবার সময় সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতেও লাগল। এটা একটু অসাধারণ ব্যাপার, কারণ ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকরা হাসতে জানে না বললেই চলে। একে দেখা হয়ে গেলে এল আরেক রোগীর পালা। এক বীভৎস, জরাজীর্ণা বৃদ্ধা ঘরের সবচেয়ে বেশী অন্ধকার কোণে বসে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আর চোখ দুটিকে আলো থেকে আড়াল করবার জন্য দু'হাত দিয়ে চেপে ঢেকে রেখেছিল। স্মোকের আদেশে সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে এলো আর এক-জোড়া চোখ দেখাল ডাক্তারকে। দুটি চোখ এত ভয়ানকভাবে ফুলে গেছে যে চোখের তারা দুটি প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। ডাক্তার তাকে শক্ত করে ধরতেই সে এমন আর্তনাদ আর ছটফট করতে লাগল যে ডাক্তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। কিন্তু ডাক্তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নাছোড়বান্দা, শেষপর্যন্ত তার প্রিয় ওষুধগুলো প্রয়োগ করে ছাড়ল।

প্রাথমিক পর্ব শেষ করে শ বলল, "কি আশ্চর্য, আসবার সময় সঙ্গে স্প্যানিশ মাছি নিয়ে আসিনি। যন্ত্রণা কমাবার জন্য পাল্টা যন্ত্রণার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।"

আরো ভালো কিছুর অভাবে সে আগুন থেকে একটা গন্‌গনে কাঠ তুলে নিয়ে বৃদ্ধা ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকটির মাথার একপাশে তাই দিয়ে ছেঁকা লাগিয়ে দিল। স্ত্রীলোকটি বিকট চীৎকার করে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল বাড়ির অন্য সবাই।

এই সময় স্মোকের জ্যেষ্ঠা পত্নী এসে ঢুকল পাথরের মাথা আর কাঠের হাতলওয়ালা একটা হাতুড়ি হাতে। পাথরের মাথাটা কাঁচা চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে কাঠের হাতলের সঙ্গে শক্ত করে আটকানো। কিছুক্ষণ আগেই লক্ষ্য করেছিলাম একধারে মহিষ-চর্মের পোশাকের স্তূপের ভেতর কতকগুলো নধর কালো কুকুরছানা একসঙ্গে জড়ো

হয়ে আরাম উপভোগ করছে। এই নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাদের আরামে থাকতে দিল না, একটিকে পিছনদিকের পা দুটি ধরে তুলে নিয়ে দরজার ধারে গিয়ে মাথায় হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে সেটাকে মেরে ফেলল। এরপর কী হবে তা খানিকটা আন্দাজ করতে পেরে আমি তাঁবুর পিছনদিকের একটা ছেঁদার মধ্য দিয়ে দেখতে লাগলাম এর পরের ব্যাপারটা। দেখলাম স্ত্রীলোকটি মরা কুকুরছানাটার ঠ্যাং ধরে একটা অগ্নিকুণ্ডের ওপর দোলাতে লাগল, যেপর্যন্ত না সেটার লোমগুলো সব আগুনে পুড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সে খাপ থেকে ছুরি বার করে কুকুরছানাটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে একটা কেট্‌লির মধ্যে ফেলে দিল সিদ্ধ হবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই মস্ত একটা কাঠের থালায় এই চমৎকার খাবার আমাদের সামনে দেওয়া হলো। ডাকোটা ইণ্ডিয়ানরা অতিথিদের কুকুরের মাংস খাওয়ানোকেই তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া বলে মনে করে; এ মাংস না খেলে ওরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবে জেনে আমরা কুকুরছানাটার মাংস খেতে শুরু করলাম। বাচ্চাটার মা জানল না ওর চোখের সামনেই আমরা ওর সন্তানের মাংস খাচ্ছি। স্মোক ততক্ষণে ধূমপানের জন্য তার মস্ত পাইপটিকে প্রস্তুত করছে। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই পাইপ ধরানো হয়ে হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, যেপর্যন্ত না পাইপের বাটির তামাক পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপরই আর কোনোরকম আড়ম্বর না করে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরে গিয়ে কেল্লার দরজায় টোকা দিলাম, আর নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেলাম।

দশম অধ্যায়

রণোন্মাদ দলগুলি

১৮৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে ডাকোটা ইণ্ডিয়ানদের পশ্চিমী দলগুলি রণোন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। ১৮৪৫ সালে তাদের বহু বিপর্যয় সইতে হয়েছিল। এদের অনেক-গুলো দল লড়াই করতে গিয়েছিল; কতকগুলো কাটা পড়েছিল, আর বাকিগুলো ফিরে এসেছিল ভগ্নদেহে, ভগ্নহৃদয় নিয়ে; তাই এদের সারা জাতিটাই ছিল শোকে নিমগ্ন। অবশিষ্টদের মধ্যে 'ঘ্রাণ-হাওয়া' নামে খ্যাত ওগিল্লাল্লা ইণ্ডিয়ানদের এক সর্দারের ছেলের নেতৃত্বে দশজন যোদ্ধা গিয়েছিল স্নেকদের দেশে। লারামি এলাকার সমতলভূমিতে যেতেই এরা পড়ল এদের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী শত্রুদলের হাতে; তাদের হাতে এদের একজনও জীবিত রইল না। এই হত্যাকাণ্ডটি করে

ফেলেই স্নেকরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল, ডাকোটারা এতে ভীষণ রেগে যাবে ভেবে; এই আতঙ্কে তারা অবিলম্বে সন্ধি-কামনার ইঙ্গিতরূপে নিহত নেতার মাথার খুলিটা এক পুলিন্দা তামাক সহ তার গোষ্ঠীর আর পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিল। তাদের দূতরূপে এলো ব্যবসায়ী বুড়ো ভাস্কিস্; সে নিয়ে এলো যে মাথার খুলিটা, সেটাই পরে কেল্লায় আমাদের ঘরে ঝুলানো দেখেছিলাম। 'ঘূর্ণি-হাওয়া' কিন্তু তার রাগ ভোলেনি। তার নামের সঙ্গে চরিত্রের মিল যদিও সামান্যই, তবু সে ইণ্ডিয়ান, আর স্নেকদের ওপর তার ভীষণ রাগ। তার ছেলের মাথার খুলিটা এসে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই সে প্রতিশোধের জন্য তৈরি হয়ে ছিল। সে তামাক আর অন্যান্য উপহার সহ দূত পাঠিয়েছিল তিনশো মাইলের মধ্যে যত ডাকোটা ছিল সকলের কাছে, স্নেকদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য একজোট হবার জন্য প্রস্তাব জানিয়ে এবং মিলিত হবার দিনক্ষণ আর স্থানের উল্লেখ করে। প্রস্তাবটা সবাই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছিল, আর এই সময়টায় অনেকগুলো গ্রামের মানুষ, সংখ্যায় বোধকরি পাঁচ কি ছয় হাজার, ধীরে ধীরে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল নির্ধারিত মিলন-কেন্দ্রে, প্লাট নদীর তীরে লা বন্টি-র শিবিরে। এইখানে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সমারোহের সঙ্গে তাদের নানারকম সামরিক অনুষ্ঠানাদি হবে, আর একহাজার যোদ্ধা শত্রুদের দেশের দিকে রওনা হয়ে যাবে। এই রণসজ্জার ফলাফল কী হলো তা যথাকালে বর্ণনা থেকেই বোঝা যাবে।

ওদের এই আসন্ন সমারোহের কথা শুনে আমি খুবই খুশি হলাম, কারণ আমি এদের দেশে এসেছিলাম প্রধানত ইণ্ডিয়ান চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবারই উদ্দেশ্য নিয়ে। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমাকে তাদের ভেতর বাস করতে, এমনকি প্রায় তাদেরই একজন হয়ে যেতে হয়েছিল। আমি ঠিক করলাম এদের এক গ্রামে যোগ দিয়ে এদেরই এক বাড়ির বাসিন্দা হবো। এর পর থেকে আমার এই কাহিনীতে আমি লিখে যাবো প্রধানত আমার এই পরিকল্পনার অগ্রগতির কথা, এবং এ ব্যাপারে আমাকে যেসব অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাদের কথা।

আমরা ঠিক করলাম লা বন্টি-র শিবিরে ওদের এই মহাসম্মেলনটি দেখবার সুযোগ কিছুতেই হারানো চলবে না। কথা হলো ডেস্‌লরিয়ার্সকে কেল্লায় রেখে যাবো আমাদের জিনিসপত্র আর ভালো ঘোড়াগুলোর ভার ওর ওপর দিয়ে, আর আমাদের সঙ্গে নেবো শুধু আমাদের অস্ত্র আর সবচেয়ে খারাপ ঘোড়াগুলো। মনে হলো সুদূর প্রেয়ারি আর পাহাড় অঞ্চল থেকে পরস্পরের অপরিচিত নানা দল এসে একজায়গায় জড়ো হবে, অথচ এদের সবার ওপরে কোনো নেতা থাকবে না, সুতরাং

এইসব খামখেয়ালী বর্বরদের ভেতর হিংসা আর ঝগড়া-বিবাদ হবার খুবই সম্ভাবনা। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা ঠিক করলাম আমাদের দেখে ইণ্ডিয়ানদের লোভ জেগে না ওঠে সে-বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনাই সার হলো; দুঃখের বিষয়, এভাবে লা বন্টি-র শিবিরে যাওয়া আমাদের বরাতে ছিল না, কারণ এক ভোরবেলা একটি তরুণ ইণ্ডিয়ান কেল্লায় এসে খারাপ খবর দিয়ে গেল। এই নতুন আগন্তুকটি একটু বেশীরকম 'বাবু'। ওর বিশ্রী মুখটায় সিঁদুর মাখানো, মাথায় বাঁধা একটা 'প্রেয়ারির মোরগ'-এর (বড় জাতের ফেজ্ণ্ট্ পাখি—শুনেছি রকি পাহাড়ের পূবদিকে এ-পাখির দেখা মেলে না) লেজ; দু'কান থেকে ঝুলছে ঝিনুকের দুল; আর তার গায়ে জড়ানো টকটকে লাল কম্বল। তার হাতে একটা তলোয়ার; সেটা শুধু শোভা বাড়াবার জন্য, কারণ প্রেয়ারির লড়াইতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় ছুরি, তীর-ধনুক আর বন্দুক দিয়ে। কিন্তু কেউ এদেশে অস্ত্র না নিয়ে বাইরে বেরোয় না বলে এই ফুলবাবুটি একটি ধনুক আর তীরভরা একটি ভোঁদড়ের চামড়ার তৈরী তূণ পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে। এই সাজে সজ্জিত হয়ে হলদে ঘোড়ার পিঠে খুব মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে চড়ে 'ঘোড়া' (ইণ্ডিয়ান যুবকটির এই নাম) গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকে এলো ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে। সে শুধু আড়চোখে তাকাল কেল্লার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের দিকে, যারা তাদের বর্ণসংকর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরে ঘরে দরজার সামনে বসেছিল। 'ঘোড়া' যে দুঃসংবাদ বহন করে এনেছিল সেটি এই: হেনরি শ্যাটিলনের ইণ্ডিয়ান স্ত্রী—যার সঙ্গে হেনরির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বহুবছরের—ভীষণভাবে অসুস্থ। সে আর সন্তানরা রয়েছে 'ঘূর্ণি-বায়ু'র গ্রামে, কেল্লা থেকে যে গাঁয়ের দূরত্ব অল্প কয়েকদিনের। হেনরি এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর আগে তাকে দেখবার, এবং তার পরম প্রিয় শিশুদের নিরাপত্তা আর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠল। এতে হেনরিকে বাধা দেওয়া মানেই অমানুষিকতা। সুতরাং আমরা যে পরিকল্পনা করেছিলাম স্মোকের গ্রামে যাবো, তারপর সেই গ্রামের লোকদের সঙ্গে তাদের মিলন-কেন্দ্রে যাবো, সেটা বাতিল করে দিয়ে ঠিক করলাম 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র কাছেই যাবো, তারপর তার দলের সঙ্গেই রওনা হবো।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই আমি সামান্য অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু লারামি কেল্লায় পেঁছিবার পর তৃতীয় রাত্রিতে অসহ্য ব্যথায় আমি জেগে উঠলাম, দেখলাম গ্র্যাণ্ড নদীতে যে রোগের ফলে সৈন্যদলের প্রভূত লোকসান হয়েছিল, আমিও ঠিক সেই রোগেই আক্রান্ত। দেড় দিনের ভেতর আমি এত দুর্বল হয়ে পড়লাম যে হাঁটতে গেলেই

ভয়ানক কষ্ট হতো। সঙ্গে ডাক্তার নেই, পথ্য-পরিবর্তনেরও সুযোগ নেই, এ অবস্থায় আরোগ্যলাভের জন্য ঠিক করলাম নিজেকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবো, এবং অসুখ যাই হয়ে থাকুক না কেন, সেদিকে মোটেই মন না দিয়ে যেটুকু শক্তি আছে তার সদ্ব্যবহার করে যাব। তাই ২০শে জুন লারামি কেল্লা থেকে রওনা হয়ে গেলাম 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র গ্রাম অভিমুখে। যদিও সামনে-পিছনে বেশ উঁচু জিনের ওপরই বসেছিলাম, তবু যেন ঘোড়ার পিঠে থাকাটাই আমার পক্ষে শক্ত হচ্ছিল। কেল্লা ছাড়বার আগে আমরা আরেকজন লোককে যাত্রার সঙ্গী হিসেবে ভাড়া করে নিলাম। লোকটি একজন লম্বা-চুলওয়ালা ক্যানাডিয়ান, নাম রেমণ্ড, মুখ প্যাঁচার মতো গম্ভীর, ডেস্‌লরিয়ার্সের চঞ্চল মুখের উল্‌টোটি। আমাদের দলে নতুন সংযোজন এই প্রথম নয়। রেনাল নামে এক ভবঘুরে ইণ্ডিয়ান ব্যবসাদার তার স্ত্রী মার্গটকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। মার্গটের সঙ্গে তার দুই ভাইপো—আমাদের ফুলবাবু বন্ধু 'ঘোড়া' এবং তার ছোট ভাই 'শিলাবৃষ্টি'। এই সঙ্গীদের নিয়ে আমরা প্রেয়ারিতে পড়লাম, ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে, লারামি খাঁড়ির তীরবর্তী উপত্যকার পাহাড়-গুলোর ওপর দিয়ে। ইণ্ডিয়ান আর শ্বেতকায় সবসুদ্ধ মিলিয়ে আমরা ছিলাম আটজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক।

রেনাল নামে লোকটি ছিল ছিমছাম এবং আত্মসন্তুষ্ট স্বার্থপর ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার উদাহরণ। 'ঘোড়া'র তলোয়ারটা রাখবার তার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু তাতেই সে বেশ মজা পাচ্ছিল। কারণ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে জীবনের অর্ধেক সময় কাটিয়ে সে তার স্বভাবেই শুধু নয়, চিন্তাধারায়ও অনেকটা ইণ্ডিয়ানদের মতোই হয়ে গিয়েছিল। মার্গট নাম্নী স্ত্রীলোকটির ওজন দু'শো পাউণ্ডেরও বেশী। সে গাড়ির 'ঝুড়ি'তে অর্থাৎ মাল রাখবার অংশে জাঁকিয়ে বসে ছিল, তাছাড়া তার সঙ্গে নানারকমের বাসনপত্র। তার গাড়ির পিছনের সঙ্গে টানা দড়িতে বাঁধা একটা মালটানা ঘোড়া একটা গাড়ি টেনে নিয়ে আসছিল, সেই গাড়ির ওপর রেনালের তাঁবুর আচ্ছাদন চাপানো। ডেস্‌লরিয়ার্স আসছিল গাড়ির পাশে পাশে দ্রুতপায়ে হেঁটে; তার পিছনে পিছনে রেমণ্ড আসছিল বাড়তি ঘোড়াগুলোকে সামাল দিয়ে আনতে আনতে আর তাদের গালি দিতে দিতে। চঞ্চল ইণ্ডিয়ান যুবকদল হাতে ধনুক আর পিঠে ঝুলানো তূণ নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে-আসতে মাঝে মাঝে ঝোপে-ঝাড়ে নেকড়ে আর কৃষ্ণসার হরিণগুলোকে চমকে দিতে লাগল। শ আর আমি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম এই জন-মিছিলের বাকি অংশের লোকগুলোর সঙ্গে। অন্য পোশাকে সুবিধা না হওয়ায় আমরা ফাঁদপাতা

শিকারীদের মতো মৃগচর্মের তৈরী পোশাক পরে নিয়েছিলাম। হেনরি হ্যাটিলন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল সকলের আগে আগে। এর পর আমরা অতিক্রম করে গেলাম পাহাড়ের পর পাহাড়, আর উপত্যকার পর উপত্যকা, গোটা দেশটাই উষর, সূর্যের তাপে মাটি এমনভাবে শুকিয়ে ফেটে ফেটে গেছে যে আমাদের পরিচিত উর্বর সরস ভূমিতে যেসব গাছগাছড়া জন্মায় সেগুলো এখানে জন্মায় না। তা না জন্মালেও এখানে দেখতে পেলাম নানারকম অদ্ভুত ওষুধের গাছগাছড়া, বিশেষ করে অ্যাবসিন্থ, ছড়িয়ে রয়েছে ঢালু জায়গাগুলোতে, আর গিরিপথের কিনারায় কিনারায় ক্যাক্‌টাস ঝুলে ঝুলে রয়েছে সরীসৃপের মতো। অবশেষে আমরা উঠলাম একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়, ঘোড়াগুলোকে চক্‌মকি, অ্যাগেট, জ্যাস্‌পার প্রভৃতি নানারকম পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে। একেবারে চূড়ার ওপর উঠে আমরা তাকিয়ে দেখলাম অনেক নীচুতে লারামি খাঁড়ির সর্পিল আঁকাবাঁকা গতি, কটন-উড আর অ্যাশ গাছের সারির মধ্য দিয়ে। এই সবুজ বন আর মাঠ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে খড়ির মতো সাদা উঁচু খাড়া পাহাড়। এই সবুজ এলাকায় নেমে এসে আমরা রাতের জন্য শিবির স্থাপন করলাম। ভোরবেলা আমরা নদীর ধারের একটি প্রশস্ত সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি অতিক্রম করলাম ; সামনে ছিল একটা ঝোপ, আর তারই ছায়ার তলায় কাঠের কারবারের একটা পুরাতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। এই ঝোপে ফুটে ছিল অসংখ্য বুনো গোলাপ ; তাদের সুরভি আমাদের মনে গৃহের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। গাছগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়েই দেখি মানুষের বাহুর মতো মোটা আর চার ফুটের চাইতেও বেশী লম্বা একটা র‍্যাট্‌ল্ সাপ একটা বড পাথরের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ভীষণভাবে ফোঁস-ফোঁস করছে আর ল্যাজ ঠক্‌ঠক্ করছে ; একটা ধূসর খরগোশ লম্বা ফার্ন ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠল, সেটা নিউ ইংল্যাণ্ডের খরগোশদের দ্বিগুণ বড ; লম্বা ঠোঁটওয়ালা জলার পাখিগুলো চীৎকার করতে করতে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল ; আর একদল প্রেয়ারির কুকুর কিছুদূরে তাদের গর্তের মুখের কাছে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। হঠাৎ বুনো 'সেজ'-এর ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে একটা কৃষ্ণসার মৃগ আমাদের দিকে বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর তার সাদা লেজটা সোজা করে গ্রেহাউণ্ড কুকুরের মতো ছুট লাগাল। ইণ্ডিয়ান ছেলে তুটো একটা খাদে বাছুরের মতো বড় একটা নেকড়ে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু নেক্‌ডেটা স্রোতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পার হয়ে গেল। তারপরই শোনা গেল বন্দুকের গুলীর আওয়াজ ; কিন্তু গুলীটা চলে গেল নেক্‌ড়েটার মাথার ওপর দিয়ে,

আর নেক্‌ড়েটা চড়াইয়ের গা বেয়ে প্রাণপণে উঠে গেল, পায়ের ধাক্কায় পাথরের অনেক টুকরো ঝুপ ঝুপ করে পড়ল নীচের জলে। একটু এগিয়ে স্রোতের ওপারে যে দৃশ্য দেখলাম, তেমন দৃশ্য এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। দেখলাম গাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্রায় দু'শো এল্‌ক্‌ হরিণ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে খোলা মাঠের ওপর এসে ভিড় করল, তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের লম্বা শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি লেগে ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ হতে লাগল। আমাদের দেখেই তারা ছুট লাগিয়ে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের বাঁ দিকে একটি অনুর্বর প্রেয়ারিভূমি দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত; আমাদের ডাইনে একটি গভীর খাত, তার তলায় লারামি খাঁড়ি। আমরা অবশেষে একটি উঁচু খাড়াইয়ের কিনারায় এসে পেঁাছলাম; একটা সরু উপত্যকা আমাদের সামনে নদীর তীর বরাবর মাইলখানেক অথবা আরো বেশীদূর পর্যন্ত চলে গেছে, তাতে এখানে সেখানে গাছের পর গাছ আর প্রচুর লম্বা ঘাস। উপত্যকার ওধারে পেঁাছে আমরা থেমে তাঁবু ফেললাম একটি প্রাচীন আর বিরাট বিস্তৃত কটন-উড গাছের তলায়, তার শাখা-প্রশাখাগুলো ভূমির সমান্তরালভাবে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে আমাদের তাঁবুর ওপর। আমাদের সামনেই লারামি খাঁড়ি অর্ধবৃত্তাকারে আমাদের আধা ঘিরে ফেলেছে। খাঁড়ির ওপারে একসারি উঁচু সাদা পাহাড় যেন নীচুদিকে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। আমাদের ডানধারে ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের ঝোপ; পাহাড়গুলোও ঝোপের আড়ালে প্রায় আদ্ধেক ঢাকা পড়েছিল, যদিও আমাদের পিছনে সবুজ প্রেয়ারির বুকে শুধু কয়েকটি কটন-উড গাছ ছাড়া দৃষ্টিকে বাধা দেবার আর কিছুই ছিল না, যার ফলে ওদিকে একমাইল দূর পর্যন্ত বন্ধু বা শত্রুর উপস্থিতি নজরে আসত। আমরা ঠিক করলাম এইখানে থেকে 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র আগমন প্রতীক্ষা করব; সে লা বন্টি-র শিবিরে যাবার পথে নিশ্চয়ই এখান দিয়ে যাবে। তার খোঁজে যাওয়াটা খুব সুবুদ্ধির কাজ হবে না বলেই মনে হলো, কারণ এ অঞ্চলের পথঘাট ভারি অসুবিধাজনক, আর সে কখন কোথায় থাকবে বা কোন্‌দিকে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই; তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলোও প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, আর আমারও তখন ভ্রমণ করবার মতো অবস্থা ছিল না। ভালো ঘাস, ভালো জল, নদীর মোটামুটি-রকম ভালো মাছ, আর শিকারের জন্য অনেক হরিণ —এসবই ছিল আমাদের সামনে, যদিও মহিষের চিহ্নও ছিল না। অবস্থা এখানে মোটের ওপর ভালো হলেও ছোট্ট একটি অসুবিধাও ছিল: আমাদের ঠিক পিছনে ঝোপ আর শুকনো ঘাসের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল র‍্যাট্‌ল্‌ সাপে ভর্তি, কাজেই ওদিকে যাওয়া নিরাপদ ছিল না মোটেই। হেনরি শ্যাটিলন 'ঘোড়া'কে আবার

গ্রামে পাঠাল তার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে যেন সে আর তার আত্মীয়েরা অন্যদের ছেড়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের তাঁবুতে চলে আসে।

আমাদের রোজকার কার্যক্রম প্রায় সুশৃঙ্খল গৃহস্থালির মতোই নিয়মিত হয়ে উঠল। প্রকৃতির বহু-বিপর্যয়-সওয়া বুড়ো গাছটি ছিল মাঝখানে; আমাদের বন্দুকগুলো সাধারণতঃ এই গাছের বিরাট গুড়িতে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো, আমাদের ঘোড়ার জিনগুলো গুঁড়ির চারধারে মাটির ওপর ছড়িয়ে রাখা হতো; গাছটির বিচিত্র শেকড়গুলি এমনভাবে জট-পাকানো ছিল যে আরামকেদারার মতোই তাদের ওপর ছায়ায় বসে বই পড়া বা ধূমপান করা চলত। কিন্তু খাওয়ার সময়গুলোই দিনের ভেতর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল, আর সেজন্য প্রচুর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একটি কৃষ্ণসার মৃগ অথবা হরিণ সাধারণতঃ একটি গাছের ডাল থেকে ঝুলানো থাকতই, আর দেহের মধ্যভাগটা ঝুলানো থাকত গুঁড়ির গায়ে। সেই তাঁবুর ছবিটা আমার মনে স্পষ্টভাবে গাঁথা হয়ে আছে: সেই প্রাচীন গাছ; সেই সাদা তাঁবু, শ ঘুমিয়ে আছে যার ছায়ায়; আর নদীর ধারে রেনালের বিশ্রী বাড়িটা। ওটা গড়নে অনেকটা উনুনের মতো, কতকগুলো খুঁটির কাঠামোর ওপর কালি-মাখানো ছিন্নভিন্ন মহিষের চামড়া বিছিয়ে তৈরি; একটা দিক ছিল খোলা, আর এই খোলা মুখের ধারেই ঝুলানো থাকত বাড়ির মালিকের বারুদ রাখবার শিং, বন্দুকের গুলীর থলে, তার লম্বা লাল পাইপ, ভোঁদড়ের চামড়ার তৈরী চমৎকার একটি তূণ আর তীর-ধনুক। রেনাল ছিল গায়ের রঙে না হলেও অন্যান্য প্রায় সব বিষয়েই ইণ্ডিয়ান, তাই এইসব আদিম যুগের অস্ত্র দিয়েই মহিষ শিকার করা পছন্দ করত। এই গুহার মতো বাড়িটির অন্ধকারে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যেতো শ্রীমতী মার্গটের বিশাল দেহটিকে যেন গুদামে রেখে দেওয়া হয়েছে তার ঘরোয়া জিনিসপত্র, ফার, পোশাক, কম্বল, আর শুকনো মাংস রাখবার কাঁচা চামড়ার থলের সঙ্গে। এইখানে সে বসে থাকত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যেন পেটুকতা আর আলস্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে, ওদিকে যখন তার স্নেহময় মালিক ধূমপান করছে, অথবা আমাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু কিছু উপহার ভিক্ষা করছে, অথবা নিজের অনেক কৃতিত্বের কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে শোনাচ্ছে, অথবা হয়তো প্রেয়ারি অঞ্চলের মুখরোচক খাবার তৈরি করছে যা বেচে ওর কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। এ কাজে রেনাল ছিল পাকা ওস্তাদ; সে আর ডেস্‌লরিয়ার্স জোট বেঁধে কাজে লেগে আগুনের ওপর রান্না চাপিয়ে দিল, আর এদিকে রেমণ্ড টেবিল-ক্লথের মতো করে তাঁবুর সামনে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল একটা মহিষের চামড়া,

পাইপ বানাবার কাদা দিয়ে সযত্নে সাদা-করা। এর ওপর সে চায়ের পেয়ালা আর পিরিচগুলো সাজাল ; তারপর কুকুরেব মতো হামাগুড়ি দিয়ে এসে তাঁবুর ফাঁকের মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল। একমুহূর্তের জন্য দেখলাম তার প্যাঁচার মতো গোল চোখ দুটি ভীষণভাবে পাক খাচ্ছে, যেন আমাদের যে-কথাটা বলতে এসেছিল সে-কথাটা সে হঠাৎ ভুলে গেছে ; তারপরেই যেন অনেক চেষ্টায় তার এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সুসংহত করে সে আমাদের খাবার তৈরি এই খবরটা জানিয়ে দিয়েই চট্ করে চলে গেল। এলো সূর্য অস্ত যাবার সময়, যখন এই নির্জন জংলা জায়গাটার চেহারাই যায় বদ্‌লে ; ঘোড়াগুলোকে মাঠ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। তারা পাশের মাঠে সারাদিন ধরে ঘাস খেয়ে এসময় তাঁবুর কাছাকাছি বাঁধা ছিল। প্রেয়ারি অন্ধকার হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগুনের চারদিকে বসে কথাবার্তা কইতে লাগলাম, তারপর চোখে তন্দ্রা নেমে আসতেই আমাদের জিনগুলো মাটির ওপর পেতে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যেই আমরা এমন অলস হয়ে পড়েছিলাম যে পাহারার কোনো ব্যবস্থা রাখলাম না ; কিন্তু হেনরি শ্যাটিলন তার গায়ে জড়ানো কম্বলের ভেতরেই তার টোটাভরা বন্দুকটা ভাঁজ করে রাখল ; বলল এখানে যখনই সে তাঁবু ফেলে তখন সর্বদাই ঘুমোতে যাবার সময় এমনি করেই সে বন্দুক সঙ্গে রাখে। যথেষ্ট কারণ না থাকলে হেনরির মতো সাহসী লোক কখনোই এত সতর্কতা অবলম্বন করত না। মাঝে মাঝে দু-একটি ইঙ্গিতও পেতে লাগলাম যে আমাদের অবস্থাটা খুব নিরাপদ নয় ; জানা গিয়েছিল বেশ কয়েকদল লড়াইবাজ ক্রো ইণ্ডিয়ান কাছাকাছিই আছে, এবং এদের ভেতর একটি দল কিছুদিন আগেই এইখান দিয়ে চলে গেছে, এবং কাছাকাছি একটি গাছের ছাল তুলে ফেলে সাদা কাঠ বার করে তার ওপর কতকগুলো সাঙ্কেতিক চিত্রলিপিতে জানিয়ে রেখে গেছে যে তারা তাদের শত্রু ডাকোটাদের এলাকাগুলোতে প্রবেশ করে তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছে। একদিন ভোরবেলা গোটা এলাকাটাই ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল। শ আর হেনরি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেল, ফিরে এলো এক চমক-লাগানো খবর নিয়ে : আমাদের তাঁবু থেকে রাইফেল চালালে গুলী যতদূর যায় তার ভেতরে তারা দেখেছে এক পথের ওপর অতি সম্প্রতি জন-বিশেক ঘোড়সওয়ারের চলে যাওয়ার চিহ্ন। তারা শ্বেতাঙ্গ হতে পারে না, ডাকোটাও নয়, কারণ এদের কোনো দল কাছাকাছি কোথাও আছে বলে আমাদের জানা ছিল না ; সুতরাং বুঝে নিলাম এরা ক্রো-ই হবে। ভাগ্যিস্ অমন ঘন কুয়াশা এসেছিল, সেইজন্যেই আমরা একটি ভীষণ লড়াইয়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম ; কারণ ওরা

আমাদের তাঁবু দেখতে পেলেই আমাদের এবং আমাদের ইণ্ডিয়ান সঙ্গীদের আক্রমণ করত। এবিষয়ে আমাদের মনে যদি বা একটু সন্দেহ হতে পারত, দু-তিনদিন বাদেই দু-তিনটি ডাকোটা এসে তার নিরসন করে দিয়ে গেল। এরা আমাদের কাছে এসে বলল সেদিনই ভোরে তারা একটি পর্বতগুহায় লুকিয়ে থেকে ক্রো-ইণ্ডিয়ানদের দেখেছে এবং শুনেছে। তারা বলল, "ওরা যেন দেখতে না পায় সেইভাবে দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে থেকে আমরা ওদের পিছু নিয়েছিলাম। তারপর ওরা চাগ্‌ওয়াটার ছাড়িয়ে ওপরদিকে চলে গেল। ক্রো-ইণ্ডিয়ানরা এইখানে প্রথামতো গাছের ওপর যত্ন করে রাখা পাঁচটি ডাকোটা মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে ফেলে দেহগুলিকে মাটিতে ফেলে বন্দুকের গুলী চালিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।"

আমাদের তাঁবু সম্পূর্ণ নিরাপদ না হলেও আরামদায়ক ছিল যথেষ্ট, অন্ততঃ শ-র কাছে. কারণ আমি অসুখে ভুগছিলাম আর আমার পরিকল্পনাগুলো কার্যকরী হতে দেরি হওয়ায় ভারি বিরক্ত হচ্ছিলাম। অসুখ একটু কম হওয়ায় যখন শক্তি ফিরে পেতে লাগলাম, তখন ভালোভাবে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রেয়ারিতে যেতাম অথবা শ-র সঙ্গে নদীর জলে স্নান করতাম, অথবা কাছাকাছি প্রেয়ারি-কুকুরদের গাঁয়ে ছোটখাটো লড়াই বাধাতাম। রাত্রে আগুন ঘিরে আমাদের আলোচনা চলল ইণ্ডিয়ানদের চপলমতি এবং অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে। 'ঘূর্ণি-হাওয়া' আর তার দলের সব লোকগুলোরও প্রচুর নিন্দা করলাম। পরিস্থিতিটা অবশেষে অসহ্য হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "কাল ভোরে আমি কেল্লার দিকে রওনা হবো। দেখবো সেখানে গিয়ে কোনো খবর পাই কিনা।" সেদিনই সন্ধ্যা বেশ ঘন হতেই যখন আগুন জ্বলতে-জ্বলতে মৃদু হয়ে এসেছে, আর শিবিরে সবাই ঘুমে মগ্ন, তখন অন্ধকারে একটা জোরালো চীৎকার শোনা গেল। হেনরি লাফিয়ে উঠল, আর সেই কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সাড়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ভেতর এসে হাজির হলো আমাদের 'ঘোড়া' নামক সেই সৌখীন বন্ধুটি; সে গ্রাম থেকে তার কাজ সমাধা করে ফিরেছে। সে বেশ ঠাণ্ডাভাবে তার ঘুড়ীটিকে বেঁধে রেখে একটি কথাও না বলে আগুনের ধারে বসে খেতে শুরু করল, কিন্তু তার সেই নির্লিপ্ত দার্শনিক মনোভাব আমাদের অসহ্য মনে হলো। গ্রামটা কোথায়? এ প্রশ্নের জবাবে সে জানাল আমাদের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে; সেখান থেকে ওরা আস্তে আস্তে আসছে, এক হপ্তার আগে এসে আমাদের এখানে এসে পৌঁছতে পারবে না। হেনরির

ইণ্ডিয়ান স্ত্রীটি কোথায়?—যথাসাধ্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে মাহ্তো-তাতোঙ্কা আর তার অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে, কিন্তু সেও এসে পৌছতে পারবে না কারণ সে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর বার বার শুধু হেনরিকে দেখতে চাইছে। হেনরির পুরুষোচিত মুখখানা বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল; সে বলল আমরা মত দিলে সে ভোরবেলাই তার স্ত্রীর খোঁজে রওনা হয়ে যাবে। শুনে শ-ও তার সঙ্গে যাবে বলল।

পরদিন ভোরে আমরা আমাদের ঘোড়াগুলোর গায়ে জিন পরালাম। রেনাল ঘোরতর আপত্তি জানাল, কাছাকাছি যখন শত্রুরা রয়েছে, এ অবস্থায় শুধু দুজন ক্যানাডিয়ান আর কয়েকটা ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে আমরা চলে যাচ্ছি বলে। তার আপত্তি কানে না তুলে আমরা তাকে ফেলেই রওনা হলাম, তারপর চাগ্‌ওয়াটার নদীর মুখে এসে আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম—শ আর হেনরি গেল ডানদিকে নদীর গতিপথ বেয়ে তার তীরের ওপর দিয়ে, আর আমি চললাম কেল্লার দিকে।

আমার বন্ধু আর তার হতভাগিনী ইণ্ডিয়ান পত্নীর প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার আমি একটু বর্ণনা করব লারামি কেল্লায় আমি কী দেখলাম আর কী করলাম। আঠারো মাইল পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করে আমি লারামি কেল্লায় পৌছলাম। দেখলাম গেটে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট জীর্ণশীর্ণ মানুষ ষাঁড়ের চামড়ার দড়ি দিয়ে একটা লোমশ জংলী ঘোড়াকে টেনে ধরে রয়েছে; এই জানোয়ারটাকে সে সম্প্রতি পাকড়াও করেছে। বেশ চোখা চেহারা লোকটার। দুটো সাপের মতো ধূর্ত চোখ তাকিয়ে ছিল ক্যাপুশ্যাঁ পাদ্রীদের টুপীর মতো করে পরা চওড়া টুপীর তলা থেকে। তার মুখটা যেন একটুকরো পুরোনো চামড়া, আর মুখের হাঁ-টা এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বিস্তৃত। লম্বা লিক্‌লিকে হাত বাড়িয়ে সে আমাকে যে অভ্যর্থনা জানাল, তাতে মামুলী ইণ্ডিয়ান অভ্যর্থনার চাইতে অনেক বেশী আন্তরিকতা ছিল, কারণ আমরা দুজন ছিলাম পুরাতন বন্ধু। আমরা পরস্পরের সঙ্গে ঘোড়া বিনিময় করে দুজনেই লাভবান হয়েছিলাম, আর পল-ও নিজেকে আমাদ্বারা উপকৃত বোধ করে সর্বত্র বলে বেড়িয়েছিল যে শ্বেতাঙ্গরা মানুষ ভালো হয়। এই পল ছিল মিজুরি অঞ্চলের একজন ডাকোটা। আর্ভিং-এর 'অ্যাস্টোরিয়া'-তে যে পিয়ের ডোরিওঁ নামে একজন বর্ণসংকর দোভাষীর অনেকবার উল্লেখ আছে, পল তারই ছেলে বলে পরিচিত। সে বলল সে রিচার্ডের ব্যবসা-বাড়িতে যাচ্ছে দেশান্তর-যাত্রীদের কাছে তার ঘোড়াটাকে বেচতে; আমাকে সে তার সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানাল। আমরা একসঙ্গে অগভীর

স্রোতটা পার হলাম। পল তার জংলী ঘোড়াটাকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল। ওধারে গিয়ে যখন বালুকাময় সমতলভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হলাম তখন সে তার মনের অনেক কথাই আমাকে বলতে লাগল। পল অনেকটা সংকীর্ণতামুক্ত, কারণ শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশে সে অনেক গেছে, আর লড়াই এবং শান্তি দু'রকম পরিস্থিতিতেই একহাজার মাইল আওতার ভেতর প্রায় সবগুলো জাতের সঙ্গেই সে মিশেছে। সে অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা ফরাসী বলত, ইংরাজিও তাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ছিল পুরোদস্তুর ইণ্ডিয়ান; আর শত্রুদের ওপর তার স্বজাতীয়দের হিংস্র কার্যাবলীর বিবরণ শোনাতে শোনাতে তার ছোট্ট চোখ দুটি বীভৎস-রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সে বলত কিভাবে মিজুরির উঁচু অঞ্চলে হোহে গোষ্ঠীর একটি গ্রামের নরনারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে ডাকোটারা গ্রামটিকে জনশূন্য করে ফেলেছিল; কি করে সংখ্যাধিক্যে কাবু করে ষোলোটি বীর ডেলাওয়্যারকে তারা কেটে ফেলেছিল, আর কিভাবে সেই ষোলোজন শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে ভীষণভাবে লড়াই করেছিল। পল আমাকে আরেকটি গল্পও শুনিয়েছিল। সে-গল্পটি আমি প্রথমে সত্য বলে বিশ্বাস করিনি। তারপর কয়েকটি স্বতন্ত্র সূত্র থেকে এ কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সমর্থন পেয়ে আমার সন্দেহ প্রায় দূর হয়েছিল।

ছয় বছর আগে জিম বেক্‌ওয়ার্থ নামে একটি লোক—তার দেহে ছিল ফরাসী, আমেরিকান এবং নিগ্রো রক্তের মিশ্রণ—ফার-কোম্পানির তরফ থেকে ক্রো-দের একটি বড গ্রামে ব্যবসা করছিল। গত গ্রীষ্মে সে ছিল সেণ্ট লুইস শহরে। লোকটা অতি জঘন্য চরিত্রের গুণ্ডা, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক, অসৎ, আত্মমর্যাদাবোধহীন; প্রেয়ারিতে অন্তত ওর চরিত্র এইরকম। কিন্তু এই লোকটির বেলায় মানবচরিত্র সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়মগুলো খাটে না, কারণ সে যেমন ঘুমন্ত মানুষকে ছুরি মারতে পারে, তেমনি আবার অসীম সাহসের কাজও করতে পারে, যার একটি নমুনা এই-রকম: একবার সে যখন ক্রো-দের গ্রামে রয়েছে, তখন একদল ব্ল্যাকফুট যোদ্ধা, সংখ্যায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ, লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেয়ারি অঞ্চলের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো। বড় দল থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে, এরকম যাদের পেত তাদেরই এরা হত্যা করত আর ঘোড়া চুরি করত। ক্রো যোদ্ধারা তাদের গতিপথ টের পেয়ে তাদের এমন-ভাবে ঘিরে ফেলল যে তাদের আর পালাবার পথ খোলা রইল না। ব্ল্যাকফুট যোদ্ধারা তখন একটা খাড়া পাহাড়ের তলায় অর্ধবৃত্তাকারে গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে চার-পাঁচ ফুট উঁচু ব্যূহ রচনা করে তার আড়ালে থেকে ক্রো-দের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্রো-রা এই ব্যূহ লোপাট করে ফেলে শত্রুদের সাবাড় করে ফেলতে

পারত ; কিন্তু সংখ্যায় দশগুণ বেশী হলেও তারা এই ছোট্ট দুর্গটিকে ধ্বংস করার কথা কল্পনাতেও আনল না, কারণ সেটা তাদের লড়াই-সম্পর্কিত নীতির বা ধারণার সঙ্গে খাপ খেতো না। মূর্তিমান অপদেবতাদের মতো তারা বিকট চীৎকার করতে করতে এদিক ওদিক লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্য শুরু করে দিল, আর গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর তীর আর গুলী চালাতে লাগল। একটি ব্ল্যাকফুটও আহত হলো না, কিন্তু ক্রো-দের ভেতর বেশ কয়েকজন তাদের লাফানো আর গোপ্তা খাওয়া সত্ত্বেও গুলী বা তীরে বিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। এই অদ্ভুত ছেলেমানুষী কায়দায় দু-এক ঘণ্টা লড়াই চলল। কখনো বা কোনো একটি ক্রো যোদ্ধা বীরদর্পে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে তার রণগীতি শুনিয়ে নিজেকে বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে তার কুড়ালটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাছের গুঁড়ির বেড়ার ওপর ঘা দিতে লাগল, তারপর ফিরে আসবার সময় তীরবিদ্ধ হয়ে মারা পড়তে লাগল। কিন্তু তবু এরা সমবেতভাবে আক্রমণ করল না। ফলে বেড়ার আড়ালে ব্ল্যাকফুটেরা নিরাপদই রইল। শেষকালে ধৈর্য হারাল জিম বেক্‌ওয়ার্থ। সে ক্রো-দের ডেকে বলতে লাগল : "তোমরা সবাই উজবুক আর বুড়ী মেয়েমানুষের দল। তোমাদের মধ্যে যদি কারও সাহস থাকে তো এসো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেবো লড়াই কিভাবে করতে হয়।"

সে তার পোশাক ছেড়ে ফেলে ঠিক ইণ্ডিয়ানদের মতোই নগ্ন হয়ে নিল, বন্দুকটা মাটিতে ফেলে রেখে হাল্‌কা কুড়ালটা হাতে নিয়ে ব্ল্যাকফুটরা তাকে দেখতে না পায় এইভাবে ডানদিকে ছুটে চলে গেল একটা খাদের আড়াল দিয়ে। তারপর পাহাড় বেয়ে উঠে চলে গেল ব্ল্যাকফুটদের ঠিক পিছনের পাহাড়ের ওপর। চল্লিশ-পঞ্চাশটি ক্রো যোদ্ধাও তার পিছু পিছু গেল। নীচের চীৎকার, হৈ-হল্লা শুনে জিম বেক্‌ওয়ার্থ বুঝে নিল ঠিক তার তলায় রয়েছে ব্ল্যাকফুটেরা। সে তখন ছুটে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ব্ল্যাকফুটদের মাঝখানে। পড়েই লম্বা চুলের ঝুঁটি ধরে একটা ব্ল্যাকফুটকে টেনে নিয়েই তাকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে সাবাড় করল। আরেকটাকে কোমরবন্ধ ধরে টেনে এনে তাকেও জোরে এক ঘা মেরে ঠাণ্ডা করল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বিকট চীৎকার করে ক্রো-জাতির রণহুঙ্কার ছেড়ে এমন ভীষণভাবে কুড়ালটি চারদিকে ঘোরাতে লাগল, যে ভীত-চকিত ব্ল্যাকফুটেরা সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। ইচ্ছা করলেই সে তখন বেড়া টপ্‌কে পালাতে পারত, কিন্তু পালাবার কোনো দরকার ছিল না, কারণ পৈশাচিক চীৎকার করতে করতে দ্রুতবেগে একটির পর একটি ক্রো যোদ্ধা পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে শত্রুদের ভেতরে লাফিয়ে পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার এধারে ক্রো-দের বড় দলটাও চীৎকার করতে

করতে একই সঙ্গে এদিক থেকেও ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল। বেড়ার ভেতরে তখন ভীষণ সংঘর্ষ চলছে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ব্ল্যাকফুট যোদ্ধারা খাঁচায় কোণঠাসা বাঘের মতো চীৎকার করতে করতে লড়াই করল, কিন্তু তাদের নিধনকার্য খুব শীঘ্রই সমাধা হলো, তাদের ছিন্নভিন্ন দেহগুলো স্তূপাকারে পড়ে রইল পাহাড়ের তলায়। একটি ব্ল্যাকফুট-ও পালাতে পারল না।

পলের এই গল্প শেষ হতে হতে আমাদের দৃষ্টির আওতায় এলো রিচার্ডের কেল্লা, তার চারদিকে এলোমেলো মানুষের ভিড, আর সামনেই দেশান্তর-যাত্রীদলের একটি তাঁবু।

আমি বললাম, "আচ্ছা, পল, তোমাদের মিনিকঙ্গিউদের বাড়িগুলো কোথায়?"

"এখনো অদ্দূর আসিনি।" পল বলল। "হয়তো কাল দেখতে পাবো।"

ডাকোটাদের দুটি বড গ্রামের লোক মিজুরি অঞ্চল থেকে তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করে আসছিল যুদ্ধে যোগ দিতে। সেদিন ভোরবেলাই তাদের রিচার্ডের ওখানে পৌঁছবার কথা ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের আসবার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না দেখে আমি কোলাহলমুখর, মত্ত জনতা ঠেলে এগিয়ে গিয়ে, কাঠের গুঁড়ি আর কাদা দিয়ে তৈরী একটি ঘরে উপস্থিত হলাম। এ ঘরটিই কেল্লার ভেতর সবচেয়ে বড। ক্যালিফর্নিয়া-যাত্রীদের দেখে মনে হলো এরা যেন অবশেষে বুঝতে পেরেছে যে যাত্রাপথে তাদের প্রয়োজনীয় এত বেশী জিনিসপত্র সঙ্গে রেখেছে বলেই সেগুলো তাদের পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেছে। তাই এই জিনিসের কিছু অংশ তারা ফেলে দিল অথবা অনেক লোকসান দিয়ে ব্যবসাদারদের কাছে বেচে ফেলল। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিজুরি অঞ্চলের যে প্রচুর মদ্য ছিল, তা তারা ঠিক করেছিল পান করেই শেষ করে ফেলবে। এ ঘরে মহিষ-চর্মের পোশাকের গাদার ওপর ছড়িয়ে শুয়ে আর বসে ছিল ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরা কাঁদো-কাঁদো মুখে, নোংরা মেক্সিকানরা ছিল তীর-ধনুক নিয়ে; ইণ্ডিয়ানরা মদ্যপান করেও শান্তই ছিল; লম্বা-চুল-ওয়ালা ক্যানাডিয়ানরা, ফাঁদপাতা শিকারীরা আর আমেরিকার অরণ্য-অঞ্চলের বাসিন্দারা ছিল বাদামী রঙের তাঁতে-বোনা কাপড়ের তৈরী জামা পরে, তাদের প্রিয় পিস্তল আর মস্ত ছোরাগুলি খোলাখুলিভাবেই তাদের দেহ থেকে ঝুলানো। ঘরের মাঝখানে একটি লিকলিকে লম্বা লোক, পরনে মলিন রঙের পুরু কাপড়ের কোট, খুব হাত আর মাথা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে; এক হাতে সে যেন হাওয়ার ওপর করাত চালাচ্ছে, অন্য হাতে ধরে রয়েছে বাদামী রঙের একটি হুইস্কির পাত্র, আর সেই পাত্রেই চুমুক লাগাচ্ছে বার বার, ভুলে গেছে পাত্রের মদ সে নিঃশেষে সাবাড় করে ফেলেছে। রিচার্ড

আমাকে এই ব্যক্তিটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিল; ভদ্রলোক যে-সে লোক নন, কর্নেল র—, এই দলের অধিনায়ক ছিলেন এককালে। পরিচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি আগ্রহাতিশয্যে, বোতাম না পেয়ে আমার জামার চামড়ার তৈরী কিনারা হাতের মুঠোয় চেপে, তাঁর অবস্থাটা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি বললেন তাঁর লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মনের উৎকর্ষে তিনি এত বড় যে ওদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব রয়েছে, সুতরাং নামে না হলেও কার্যতঃ তিনিই তখনো দলের নেতা। কর্নেল যখন কথা বলছিলেন তখন আমি চারদিকে তাকিয়ে নানারকম মানুষের এই বিচিত্র সমাবেশ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম মরুভূমির ওপর দিয়ে এই বিচিত্র মানুষের মিছিলকে ক্যালিফর্নিয়া নিয়ে যাওয়ার মতো নেতৃত্বের যোগ্যতা এঁর নেই। অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তিনজন লম্বা যুবক, তারা ড্যানিয়েল বূন-এর নাতি। প্রথম-অভিযাত্রীদের শীর্ষস্থানীয় ড্যানিয়েল বূন-এর অদম্য অভিযান-স্পৃহা এরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে পরিষ্কার বোঝা গেল, কিন্তু যে ধীর স্থির প্রশান্ত ভাব সেই অসাধারণ পুরুষের বিশেষত্ব ছিল, তার কিছুই এদের ভেতর দেখতে পেলাম না।

এই দলেরই কয়েকজন কয়েকমাস পরে ভীষণ দুরবস্থায় পড়েছিল। ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরে এসে সেই দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়েছিলেন জেনারেল কিয়ার্নি। এরা পার্বত্য অঞ্চলে ঘন তুষারে আট্‌কা পড়ে শীতে আর ক্ষুধায় অস্থির হয়ে একে অন্যের মাংস খেতে শুরু করেছিল!

এখানকার এই হট্টগোল আর এলোমেলো অবস্থা আমার ভালো লাগল না। আমি বললাম, "পল, এইবারে চলো যাই।" পল রোদে বসে ছিল, কেল্লার দেয়ালের তলায়। সে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ায় চড়ল, আর আমরা দুজন লারামি কেল্লার দিকে এগিয়ে চললাম। সেখানে যখন পৌঁছলাম, তখন একটি লোক পিঠে একটা বাণ্ডিল আর ঘাড়ে একটা বন্দুক নিয়ে গেটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলো। দেখলাম অন্যেরা তার চারধারে জড়ো হচ্ছে, তার সঙ্গে করমর্দন করছে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে। কেউ প্রেয়ারি অঞ্চলে একা পায়ে হেঁটে রওনা হবে এটা ভাবতেও আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। শীগ্‌গীরই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পেলাম। পেরন্ট্‌—যদ্দুর মনে পড়ে এই ক্যানাডিয়ান লোকটির এই নামই ছিল—কেল্লার সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, যার ফলে কেল্লায় থাকাটা তার পক্ষে আর সুবিধাজনক ছিল না। বর্ডো তার কর্তাগিরি ফলাতে গিয়ে একে ধম্‌কে তার জবাবে এর হাতের একটি চড় খেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে

কেল্লার মাঝখানে দুজনের কুস্তির লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। চোখের পলকে ভীষণ ক্রুদ্ধ ক্যানাডিয়ানটি বর্ডোকে মাটিতে ফেলে তার ওপর চেপে বসেছিল। পেরন্টের হাতে বর্ডোর দুরবস্থার একশেষ হতো, যদি না বর্ডোর ইণ্ডিয়ান স্ত্রীর ভাই এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান এসে পেরন্টকে চেপে না ধরত। পেরন্ট সেই ইণ্ডিয়ান বুড়োর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর সে আর বর্ডো দুজনেই দুজনের ঘরের দিকে ছুটল যে যার বন্দুক নিয়ে আসতে। কিন্তু বন্দুক-হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে পেরন্ট যখন বর্ডোকে বেরিয়ে এসে লড়বার জন্যে আহ্বান জানাতে লাগল, তখন ঘরের ভেতর থেকে তা দেখে বর্ডো একেবারে দমে গেল, সে কিছুতেই ঘর থেকে বেরোতে রাজি হলো না। বুড়ো ইণ্ডিয়ানটি তার ভগ্নীপতির এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে তাকে বার বার বলতে লাগল খোলা জায়গায় গিয়ে সাদা মানুষদের রীতি অনুযায়ী লড়াই করে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে ; এমনকি বর্ডোর ইণ্ডিয়ান স্ত্রীটি পর্যন্ত ভীষণ ক্ষেপে উঠে তার পতি-দেবতাটিকে কুত্তা আর বুড়ী মেয়েমানুষ বলে গালি দিতে লাগল। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। সাহসের চাইতে সুবুদ্ধিই ভালো ভেবে বর্ডো ঘরের ভেতর থেকে নড়ল না। পেরন্ট তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপুরুষ কেল্লা-সর্দারকে যা-ইচ্ছে-তাই গালি দিয়ে যেতে লাগল। তাতেও যখন কিছু হলো না, তখন বিরক্ত হয়ে শুকনো মাংসের একটা বাণ্ডিল পিঠে ঝুলিয়ে একাই রওনা হলো মিজুরি নদীর তীরে 'পিয়ের কেল্লা' অভিমুখে। কেল্লাটি সেখান থেকে তিনশো মাইল দূরে, আর যেতে হবে শত্রুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ান-অধ্যুষিত মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

সে-রাতে আমি কেল্লাতেই রইলাম। ভোরে প্রাতরাশ সেরে ম্যাক্‌ক্লাস্কি নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখলাম এক অদ্ভুত চেহারার ইণ্ডিয়ান গেটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা ভারী চেহারার লম্বা জোয়ান।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কে এই লোকটি ?"

ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলল, "এই হচ্ছে 'ঘূর্ণি-হাওয়া'। এ লোকটাই এই যুদ্ধের হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সিয়োক্‌স্‌দের স্বভাবই এইরকম ; তারা নিজেদের ভেতর গলা কাটাকাটি না করে থাকতে পারে না ; এই একটি কাজই তারা পারে। ঘরে বসে যদি পোশাক-তৈরির কাজ করে, তাহলে শীতকালে আমাদের কাছে বেচতে পারে, কিন্তু তা তারা করবে না। এ লড়াই যদি কিছুদিন চলে, তাহলে আসছে মরশুমে আমাদের ব্যবসা মোটেই ভালো হবে না মনে হচ্ছে।"

সমস্ত ব্যবসায়ীদেরই ছিল এই মত ; তাদের স্বার্থ ব্যাহত হবে বলে তারা ছিল ভীষণভাবে যুদ্ধের বিরোধী। 'ঘূর্ণি-হাওয়া' আগের দিন তার গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে কেল্লায় আসবে বলে। পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার মতলবটা ঠিক করার পর ধীরে ধীরে তার রণস্পৃহাটা বেশ কমে এসেছে। বিরাট যুদ্ধ-অভিযানের জন্য যে দীর্ঘ এবং জটিল প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা তার মতো চঞ্চলমতি লোকের পক্ষে অসহ্য। সেই ভোরেই বর্ডো 'ঘূর্ণি-হাওয়া'কে নিয়ে পড়ল, উপহার দিয়ে তাকে ভুলালো, আর বুঝিয়ে দিল যুদ্ধ বাধলে তার ঘোড়াগুলো মরবে, মহিষ-শিকার হবে না, ফলে সাদা লোকদের সঙ্গে ব্যবসাও হবে না ; মোটের ওপর যুদ্ধের কথা ভাবাই তার পক্ষে মস্ত বোকামি, এবং তার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িতে বসে পাইপে ধূমপান করা। স্পষ্ট বোঝা গেল 'ঘূর্ণি-হাওয়া' মূল মতলব থেকে অনেকখানি টলেছে, বাচ্চা ছেলের শখ মিটে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে তার। বর্ডো তখন খুব উচ্ছ্বসিত হয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করল 'ঘূর্ণি-হাওয়া' যুদ্ধে অগ্রসর হবে না। কল্যাণবুদ্ধির চাইতে আমার মনে কৌতূহলের জোরটাই ছিল বেশী ; তাই লড়াই দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনায় মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, 'ঘূর্ণি-হাওয়া, শুধু আগুনের ফুল্‌কিটুকুই ফেলেছিল মাত্র, তাতে দাবানল জ্বলে উঠেছিল ব্যাপকভাবে। পশ্চিম অঞ্চলের সবগুলো ডাকোটা দলই যুদ্ধ করবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল ; আর ম্যাক্‌ক্লাস্কির মুখে শুনেছিলাম ছয়টি বড গ্রামের লোক ইতিমধ্যেই চল্লিশ মাইল দূরে একটি ছোট্ট নদীর ধারে এসে সমবেত হয়েছে এবং প্রতিদিন তাদের এই অভিযানে সহায় হবার জন্য তাদের মহাদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি তখন সম্প্রতি তাদের ছেড়ে এসেছে আর তারা নাকি লা বন্টি-র শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেছে ; সেখানে তারা পৌছেও যাবে এক হপ্তার ভেতরে, যদি না খবর পায় সেখানে মহিষ একেবারেই নেই। এই সর্তটা আমার ভালো লাগল না, কারণ এই মরশুমে কাছাকাছির ভেতর মহিষ ছিল দুর্লভ। মিনিকঙ্গিউদের দুটি গ্রামের লোকের কথা আগেই বলেছি ; কিন্তু দুপুরের কাছাকাছি রিচার্ডের কেল্লা থেকে একজন ইণ্ডিয়ান এলো এই খবর নিয়ে, যে তাদের নিজেদের ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে, দল ভেঙে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ হলো দেশান্তর-যাত্রীদের হুইস্কির কীর্তি। নিজেরা সব হুইস্কি পান করে শেষ করতে না পেরে বাকিটা এই ইণ্ডিয়ানদের কাছে বেচে ফেলেছিল, আর তারই ফলে এই কাণ্ড। শুকনো বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়লেও বোধ হয় তার ফলাফল এত দ্রুত হতো না। গলা দিয়ে হুইস্কি নামার সঙ্গে-সঙ্গেই ইণ্ডিয়ানদের পুরোনো হিংসা, আড়াআড়ি, দ্বন্দ্ব যা-কিছু

মনের ভেতর চাপা ছিল, সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, আর অমনি ভীষণ ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করে তারা যে যুদ্ধ-অভিযানে যোগ দিতে এসেছে, সে-কথা তারা ভুলে গেল। তারা যেন অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল দামাল ছেলের দল, ভীষণতম উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ভেতর অনেকে ছোরার ঘায়ে আহত হলো মদের নেশায় এই মারামারি-কাটাকাটির ফলে; তারপর ভোরবেলা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তারা মিজুরির দিকে ফিরে চলল। আমার ভয় হলো শেষপর্যন্ত হয়তো এতদিনের পরিকল্পিত মোলাকাত আর তার আনুষঙ্গিক ঘটা বা সমারোহ কিছুই হবে না, আর আমিও ইণ্ডিয়ানদের জাতীয় বিশেষত্বসূচক ভয়ঙ্কর রূপটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার এমন চমৎকার একটি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব; যাই হোক, এই সুযোগ হারিয়ে অন্যদিক দিয়ে তেমনি বিপদও এড়ালাম, কারণ যুদ্ধের গোল বাধলে ওরা লুঠতরাজ করে আমার জিনিসপত্র, এমনকি পরনের পোশাকও ছিনিয়ে নিতে পারত, ছোরা বা বন্দুক চালিয়ে ঘায়েলও করতে পারত। মনকে এই সান্ত্বনা দিয়ে আমি তাঁবুতে খবর দিতে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম।

ঘোড়াটাকে ধরেই অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দেখলাম ওর একটা পায়ের নাল হারিয়ে গিয়ে খালি খুরটা পাথরের গায়ে লেগে ভেঙে গেছে। লারামি কেল্লায় ঘোড়ার পায়ে নাল পরানো হয় বেশ সস্তা দরে—পা-পিছু তিন ডলার। আমি তাই হেন্‌ড্রিককে খোঁয়াড়ের একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রুবিডো নামে কামারকে ডেকে আনলাম।

হেন্‌ড্রিকের খুরটা দুই হাঁটুর ভেতর নিয়ে রুবিডো হাতুড়ি আর উকো নিয়ে কাজে লেগে গেছে আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময় শুনলাম কে যেন অদ্ভুত কণ্ঠে আমাকে বলছে: "আরো দুটো গেল! যাক্‌গে, তবু আমাদের আরো কয়েকজন তো বাকি রইল। এই যে গিংগ্রাস আর আমি, কালই পাহাড়ে রওনা হয়ে যাবো। হয়তো এরপরই আমাদের পালা। জীবনটাই এক ঝক্‌মারি, যা হোক!"

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম লোকটি পাঁচ ফুটের চাইতে খুব বেশী লম্বা নয়, কিন্তু বেশ শক্ত গাঁট্টা-গোঁট্টা। অত্যন্ত মলিন, অনুজ্জ্বল চেহারা লোকটির; তার পুরোনো হরিণের চামড়ার জামাটা অনেকদিনের ব্যবহারে আর চর্বি লেগে লেগে কালো আর মোলায়েম হয়ে গেছে; তার কোমরবন্ধ, ছুরি, তামাকের থলে প্রভৃতিও বহু ব্যবহারের চোট সয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। তার দুটি পায়ের পাতারই কিছু অংশ ঠাণ্ডায় ক্ষয়ে-ক্ষয়ে খসে পড়ে গেছে, সেজন্য জুতো-জোড়াও সেই মাপে সংক্ষিপ্ত। সব মিলিয়ে তার মোটামুটি চেহারাই যেন বলে দিচ্ছিল ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরাই লোকটির পেশা।

তার মুখটা লাল আর গোলগাল ; তাতে যে নিরুদ্বেগ আনন্দের ভাব ফুটে আছে, তার সঙ্গে একটু আগে সে যে-কথা বলল তার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আরো দুটো গেল! তার মানে?"

লোকটি বলল, "পাহাড়ের ওপর আরাপাহোরা সম্প্রতি আমাদের দুজনকে মেরে ফেলেছে। বুড়ো 'বুল-টেইল' এসেছে এই খবর দিতে। ওরা একজনকে ছুরি মেরেছে পিছন থেকে, অন্যজনকে তার নিজের বন্দুক দিয়েই গুলী করে মেরেছে। এই হলো আমাদের এখানকার জীবন। এবছরের পরই ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরার কাজ ছেড়ে দেবো ঠিক করেছি। আমার স্ত্রী বলছে তার একটা ঘোড়া আর কিছু লাল ফিতে চাই। এগুলো পাবার জন্যে আমাকে কতকগুলো বীবর ধরে তার পশম যোগাড় করতে হবে। সেইটে হয়ে গেলে ব্যাস্, খতম! এরপর সমতলভূমিতে নেমে গিয়ে চাষবাস করব, খামার করব।"

আরেকটি ফাঁদপাতা শিকারী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, "প্রেয়ারির ওপর তোমার হাড্ডিগুলো শুকোবে, রোলো।" লোকটার চেহারা কঠোর, নৃশংস ধরনের, মুখটা বুল-ডগের মুখের মতো বদমেজাজী গম্ভীর।

রোলো শুধু একটু হেসে একটা সুর ভাঁজতে লাগল গুনগুন করে, আর ক্ষয়ে-যাওয়া দুটি পায়ের ওপর ভর করে একটু নাচবার চেষ্টাও করল।

অপর লোকটি বলল, "শীগ্‌গীরই দেখবে আমরা তোমাদের তাঁবুর পাশের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি।"

আমি বললাম, "বেশ, তাহলে একটু থেমে আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা কফি খেয়ে যেয়ো।" তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে, তাই আর দেরি না করে কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেরোতেই দেখলাম দেশান্তরযাত্রী একসারি ওয়াগন অগভীর নদীর স্রোত অতিক্রম করে যাচ্ছে। দু-তিনটি কণ্ঠের সমবেত প্রশ্ন শুনলাম : "কোথায় চলেছ, বিদেশী?"

বললাম, "খাঁড়ি বরাবর আঠারো মাইল ওপরদিকে।"

"অতদূর যাবার পক্ষে বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে যে! তাহলে জল্‌দি করো। আর ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার।"

উপদেশটি মোটেই তুচ্ছ করবার মতো নয়। স্রোতটি পার হয়ে ওপারের সমতলভূমির ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। কিন্তু 'যত তাড়াহুড়ো তত দেরি' প্রবাদটি যে কত সত্যি, কেল্লা থেকে তিন মাইল দূরের পাহাড়ে পৌঁছতে-

পৌঁছতেই তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। চলার পথের চিহ্নগুলো ছিল একটু অস্পষ্ট ; দ্রুতবেগে ঘোড়া চালাতে গিয়ে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে সেই চিহ্ন আমার নজর এড়িয়ে গেল। আমি সোজা চললাম ডানদিকে লারামি খাঁড়ির ওপর নজর রেখে। সূর্যাস্তের আধ ঘণ্টা আগে আমি খাঁড়ির তীরে এসে পড়লাম। সে-জায়গার বন্য নির্জনতায় যেন কেমন একটা আশ্চর্য মাদকতা ছিল। হঠাৎ আমার সামনের একটা ঝোপের ভেতর থেকে একটা কৃষ্ণসার মৃগ লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। আমার ঘোড়া থেকে গজ ত্রিশেক দূরে আসতেই আমি গুলী চালালাম। কৃষ্ণসারটি সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ওর সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ করেই আমি আমার ঘোড়াটাকে ধীরে ধীরে ওর দিকে নিতে নিতে তাড়াতাড়ি না করেই রাইফেলে নতুন গুলী ভরলাম। হঠাৎ আমাকে চম্‌কে দিয়ে জানোয়ারটা লাফিয়ে উঠল, আর তিনপায়ে এত দ্রুত ছুট্ লাগিয়ে পাহাড়ের অন্ধকারে পালিয়ে গেল যে আমি ওর পিছু ধাওয়া করবার সময়ই পেলাম না। দশ মিনিট বাদে আমি একটি গভীর উপত্যকার তলার ওপর দিয়ে যেতে যেতে একবার পিছনপানে তাকিয়ে মৃদু আলোয় দেখলাম কি-একটা যেন আমাকে অনুসরণ করছে। ওটাকে নেকড়ে ভেবে আমি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ঘোড়ার পিছনে বসে লুকিয়ে রইলাম নেকড়েটাকে গুলী করে মারব বলে। কিন্তু জানোয়ারটা আরো কাছে আসতেই দেখলাম ওটা আরেকটি কৃষ্ণসার। এটি আমার একশো গজ দূরত্বের মধ্যে এলো, তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তার বুকের সাদা জায়গাটা লক্ষ্য করে গুলী চালাবার উপক্রম করতেই সে ছুট্ লাগাল, আর হাওয়ার ঝাপ্‌টার মুখে জাহাজের মতো একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুটতে লাগল, তারপর দ্রুতবেগে আমার উল্‌টোদিকে ছুট্ লাগাল। তারপর আবার থেমে, কৌতূহলী চোখে পিছু তাকিয়ে মধ্যগতিতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আগেকার চাইতে সাহস এবার একটু কম, তাই দাঁড়িয়ে পড়ে দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি গুলী চালালাম ; জানোয়ারটা লাফিয়ে উঠেই পড়ে গেল। দূরত্ব মেপে দেখলাম দু'শো চার পদক্ষেপ। পাশে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, কৃষ্ণসারটি মুমূর্ষু চোখে ওপরদিকে তাকাল। সুন্দরী মেয়ের চোখের মতো কালো উজ্জ্বল দুটি চোখ। ভাবলাম, ভাগ্যিস্ আমার এখন যাবার তাড়া রয়েছে। নইলে অবসর থাকলে হয়তো অনুতাপের দুঃখ পেতাম।

আনাড়ি হাতেই জানোয়ারটাকে কেটেকুটে মাংসগুলো জিনের পিছনে ঝুলিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলাম। পাহাড়গুলো আমাকে ঘিরে ফেলল ; একটিকেও আগে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। ভাবলাম : 'এখন আর এগিয়ে চলবার সময়

নেই ; বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আজ রাত্রে এখানেই থাকব, কাল ভোরে পথ খুঁজে নেবো।' তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, সেখান থেকে সানন্দে দেখলাম লারামি খাঁড়ি এলোমেলো গাছের সারির মধ্য দিয়ে চলে গেছে, আর আরো দূরে একটি পুরোনো ব্যবসাদারী কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে গাছের ছায়ার নীচে। ওখানে গিয়ে পৌছলাম গোধূলিবেলায়। গোধূলির অস্পষ্ট আলোতে ঘন বনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া মোটেই আরামদায়ক ছিল না। আমি মানুষ বা জানোয়ারের পদধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। প্রাণের একমাত্র স্পন্দন শুনতে পেলাম একটা বাদামী রঙের নিরীহ পাখির কণ্ঠে, গাছের ডালে বসে সে কিচিরমিচির করছিল। পরে যখন প্রেয়ারির মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে পড়লাম তখন মনটা খুশিতে ভরে উঠল, কারণ কোনো কিছু এগিয়ে আসছে কিনা তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। চাগ্‌ওয়াটার নদীটির মুখে যখন এলাম, তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে। লাগাম আল্‌গা করে দিয়ে ঘোড়াটাকে যেদিকে খুশি সেদিকে যেতে দিলাম। ঘোড়াটা নির্ভুল সহজবুদ্ধিতে এগিয়ে চলল, আর ন'টার ভেতরই দেখতে পেলাম যে-মাঠে আমাদের তাঁবু, পাহাড়ের ঢল বেয়ে সেই মাঠের দিকেই নেমে চলেছি। তাঁবুর আগুনটা কোন্‌দিকে তাই ভাবছি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না, এমন সময় হেন্‌ড্রিক—ওর নজর আর অনুভূতি আমার চাইতে তীক্ষ্ণতর—গলা ছেড়ে একটা আওয়াজ করল ; সঙ্গে-সঙ্গেই দূর থেকে আরেকটি ঘোড়া গলা ছেড়ে এই আওয়াজের জবাব দিল। তারপরই অন্ধকারের আড়াল থেকে রেনালের ডাক ভেসে এল ; কে আসছে তাই দেখবার জন্য সে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এসেছিল।

তাঁবুতে তখন ছিল শুধু সে, তার ইণ্ডিয়ান স্ত্রী, সেই দুজন ক্যানাডিয়ান আর ইণ্ডিয়ান ছেলেগুলি। শ আর হেনরি শ্যাটিলন তখনো ফেরেনি। পরদিন দুপুরবেলা তারা ফিরে এলো, তাদের ঘোড়া দুটি পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত। হেনরিকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখা গেল। তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ; তার সন্তানদের এখন থেকে ইণ্ডিয়ান জীবনের দুঃখকষ্ট, ঝড়-ঝাপ্‌টা সবকিছুর মুখোমুখী হতে হবে, তা থেকে আড়াল করবার কেউ রইল না। এই দুঃখের মধ্যেও হেনরি তার 'সর্দার'-এর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ভোলেনি দেখা গেল ; সে তার ইণ্ডিয়ান আত্মীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল সুন্দর কারুকার্য-করা দুটি মহিষ-চর্মের পোশাক, সেগুলো সে আমাদের জন্য উপহার হিসেবে মাটির ওপর বিছিয়ে দিল।

শ তার পাইপ ধরিয়ে অল্প কথায় তার ভ্রমণের ইতিহাস শুনালো। আগেই বলেছি আমি যখন কেল্লার দিকে গেলাম, ওরা তখন আমাকে চাগ্‌ওয়াটার নদীর মুখে

রেখে চলে গেল। তারা সারাদিন এই ছোট্ট নদীটির গতি অনুসরণ করে একটি জনহীন অনুর্বর অঞ্চল অতিক্রম করল। বেশ কয়েকবার তারা একটি বড় যোদ্ধা-দলের সদ্য রেখে যাওয়া চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল ; যে দলের আক্রমণের হাত থেকে আমরা একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম, এ বোধকরি সেই দল। সূর্যাস্তের কিছু আগে, পথে একটি লোকেরও মুখোমুখী না পড়ে, এরা এসে পৌছেছিল হেনরির ইণ্ডিয়ান স্ত্রী আর তার ভাইদের তাঁবুতে। এরা সবাই হেনরির পাঠানো বার্তা অনুসারে ইণ্ডিয়ান গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়েছিল আমাদের তাঁবুতে এসে যোগ দেবার জন্য। পাঁচটি তাঁবু ইতিমধ্যেই খাটানো হয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। তাদের একটির ভেতর শুয়ে ছিল কঙ্কালসার স্ত্রীলোকটি। হেনরির প্রতি তার ভালবাসা ছিল অসাধারণ ; তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল শুধু হেনরিকে দেখবার আশা। হেনরি তার ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে যেন নতুন জীবন পেল ; রাতের বেশির ভাগটাই সে হেনরির সঙ্গে কথা বলে কাটাল। পরদিন খুব ভোরবেলা তাকে একটি ডুলিতে তুলে নিয়ে পুরো দলটা আমাদের তাঁবুর দিকে রওনা হলো। দলে যোদ্ধা ছিল মাত্র পাঁচজন ; বাকি সব স্ত্রীলোক ও শিশু। সবাই ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিল, কারণ কাছাকাছিই ছিল ক্রো-যোদ্ধার দল, যাদের সামনে পড়লে সবাইকে ওদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হতে হতো। দু-এক মাইল এসেই তারা দূরে দিগন্তরেখার কাছাকাছি একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেই তারা থেমে গিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। ঘোড়সওয়ারটি অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উদ্বেগ দূর হয়নি। তারপর তারা আবার চলা শুরু করেছিল। হেনরি আর শ দুজনে ইণ্ডিয়ানদের ছাড়িয়ে কিছুদূর আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে চলেছিল। হঠাৎ স্ত্রীলোকটির একটি ছোট ভাই, নাম মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা, তাদের পিছন থেকে ডাকল। তারা পিছন ফিরে দেখল স্ত্রীলোকটি যে ডুলিতে শুয়ে ছিল, ইণ্ডিয়ানরা সবাই সেই ডুলিটিকে ঘিরে রয়েছে। তারা তাড়াতাড়ি যখন তার কাছে গিয়ে পৌছল, তখন স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে শুরু হয়ে গেছে মৃত্যুর ঘর্ঘর। পরক্ষণেই তার মৃত্যু হলো। কিছুক্ষণ বিরাজ করলো পূর্ণ নিস্তব্ধতা ; তারপরই মৃতদেহটি ঘিরে ইণ্ডিয়ানরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের শোক-বিলাপের মধ্য থেকে শ কয়েকটি অদ্ভুত শব্দ পরিষ্কার বেছে নিতে পেরেছিল, সেগুলির সঙ্গে খ্রীষ্টানদের প্রার্থনার 'অ্যালিলুইয়া' শব্দটির সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য এবং আরো কয়েকটি আকস্মিক মিল থেকেই এই উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে ইণ্ডিয়ানরা ইজরায়েলের দশটি হারিয়ে-যাওয়া গোষ্ঠীর বংশধর।

ইণ্ডিয়ান রীতি অনুসারে হেনরির এবং মৃতার অন্যান্য আত্মীয়দের কর্তব্য হলো

শেষ বিশ্রামের স্থানে মৃতদেহের পাশে রেখে দেবার জন্য মূল্যবান উপহার দেওয়া। ইণ্ডিয়ানদের ওখানেই রেখে হেনরি আর শ আমাদের তাঁবুতে চলে এলো দুপুরের কাছাকাছি। উপহারের জিনিসগুলি সংগ্রহ করে তারা অবিলম্বে ফিরে গেল। সেই ইণ্ডিয়ান তাঁবুগুলোতে গিয়ে তারা পৌছল অনেক দেরিতে, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাঁবুগুলো ছিল পাহাড়ে ঘেরা একটি গভীর উপত্যকায়। চারটি তাঁবু সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনোরকমে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু পঞ্চম (এবং বৃহত্তম) তাঁবুটির ভেতরের আগুনের আলো তাঁবুর বাইরেও দেখা যাচ্ছিল। ওরা দুজন যখন গিয়ে পৌছল তখন সবগুলো তাঁবু নীরব, একটিতেও কেউ আছে বলে মনে হয় না। প্রাণের কোনো সাড়া নেই কোথাও—সারা আবহাওয়াতেই কেমন এক বিষণ্ন বীভৎসতা। ঘোড়ায় চড়ে তারা চলে গেল তাঁবুর প্রবেশদ্বার পর্যন্ত, তখনো সেই নীরবতা ভঙ্গ করছে শুধু তাদের ঘোড়া দুটির খুরের আওয়াজ। একটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে একটি কথাও না বলে ঘোড়া দুটির ভার নিল। হেনরি আর শ ভেতরে ঢুকে দেখল ঘর ভরে গেছে ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ে; মাঝখানে জ্বলছে একটি অগ্নিকুণ্ড, শোকার্তদের দল তিনটি সারিতে সেটিকে ঘিরে রয়েছে। এই নব আগন্তুকদের জন্য ঘরের মাথার দিকে বিশেষভাবে জায়গা করে একটি চামড়ার পোশাক পেতে তাদের বসানো হলো তার ওপর। একটি পাইপ ধরিয়ে সম্পূর্ণ নীরবে তাদের হাতে দেওয়া হলো। প্রায় সারাটা রাত এইভাবেই কেটে গেল। কখনো কখনো আগুন নেমে গিয়ে প্রায় ছাইয়ের সঙ্গে মিশে যাবার ফলে চারধারের মানুষগুলোকেও খুব অস্পষ্ট দেখা যেতে লাগল; তখন কোনো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক অগ্নিকুণ্ডের ভেতর একটুকরো মহিষের চর্বি ফেলে দিতেই একটা উজ্জ্বল অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠে বীভৎস মুখগুলোর ওপর আলো ফেলতে লাগল—সবগুলো মুখ ধাতুর তৈরী মুখের মতো নিস্পন্দ। এইভাবে সারারাত চলল একটানা নিস্তব্ধতা। দিনের আলো দেখা দিতেই শ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল; এইবার সে এই শোকভবন থেকে পালাতে পারবে। সে আর হেনরি ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলো। তার আগে অবশ্য তারা তাদের উপহারগুলো সাজিয়ে দিল উপবেশনের ভঙ্গিতে রাখা সুসজ্জিত মৃতদেহটির পাশে। একটি সুন্দর ঘোড়া অল্প দূরে বেঁধে রাখা ছিল, সেটিকে ভোরবেলা হত্যা করা হবে মৃতার আত্মার সেবা করবার জন্য; কারণ মৃতা স্ত্রীলোকটি ছিল খোঁড়া, প্রেয়ারির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পরলোকের গ্রামে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। অন্তিম যাত্রাপথে দরকার হবে বলে খাদ্য আর নানারকম গৃহস্থালির জিনিসপত্রও দেওয়া হলো।

মৃতাকে তার আত্মীয়দের জিম্মায় রেখে হেনরি শ-র সঙ্গে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলো। বিষাদ কাটিয়ে উঠতে তার বেশ কিছু সময় লাগলো।

একাদশ অধ্যায়

তাঁবুর কাহিনী

একদিন রেনাল তাঁবু থেকে মাইলখানেক কি মাইল দুয়েক দূরে বন্দুকের গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে উঠল। সে কল্পনার চোখে ক্রো-যোদ্ধাদলের দৃশ্য দেখতে লাগল। আমরা ফিরে এলে পর (উক্ত বন্দুকের গুলীর আওয়াজের সময় আমরা তাঁবুতে ছিলাম না) সে আবার নালিশ জানাতে লাগল তাকে তাঁবুতে শুধু দুজন ক্যানাডিয়ান আর তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে হয় বলে। পরদিন রেনালের আতঙ্কের জন্যে যারা দায়ী তারা এসে হাজির হলো। মোরিন, সারাফিন, রুলো আর গিংগ্রাস নামে চারজন ফাঁদপাতা শিকারী আমাদের তাঁবুতে এসে আমাদের দলে যোগ দিল। বন্দুকের গুলী চালিয়ে এরাই আমাদের বন্ধু রেনালের আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। তারা শীগ্‌গীরই আমাদের পাশেই তাদের তাঁবু ফেললো। তাদের বহু ব্যবহারে মলিন এবং ঘা-খাওয়া বন্দুকগুলি আমাদের বন্দুকগুলোর সঙ্গেই বুড়ো গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। তাদের শক্ত জিনগুলো, মহিষ-চর্মের পোশাকগুলো, ফাঁদগুলো এবং তাদের ভ্রমণে প্রয়োজনীয় আরো বিভিন্ন জিনিস আমাদের তাঁবুর পাশেই স্তূপ করে রাখা হলো। তাদের পাহাড়ী ঘোড়াগুলোকে আমাদের ঘোড়াগুলোর সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে ঘাস খাবার জন্যে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হলো। এই লোক চারটি—ঘোড়াগুলোর চাইতে কিছু কম কষ্টসহিষ্ণু বা কম কঠোর নয়—দিনের প্রায় আধা সময় কাটিয়ে দিত আমাদের গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর গড়িয়ে আরাম করে অলসভাবে ধূমপান করতে করতে আর নিজেদের নানা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলতে বলতে। রকি পাহাড়ে যারা ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে, তাদের রোমাঞ্চকর বিপদসঙ্কুল জীবনের কাহিনীর কাছে ইতিহাসের বা রূপকথার কাহিনীও হার মেনে যায়।

এই চারটি ডানপিটে দুঃসাহসী লোক আমাদের দলে যোগ দেওয়াতে রেনালের আতঙ্ক কিছুটা কমলো। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছে সে-জায়গার ওপর কেমন

একটা মায়া জন্মাতে লাগলো ; কিন্তু আমাদের জায়গা বদলের সময় হয়ে এসেছিল, কারণ খুব বেশীদিন একজায়গায় থাকলে তার কতকগুলো অপ্রীতিকর ফল দেখা দেয়, নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে যা এড়ানোই বাঞ্ছনীয়। আমাদের তাঁবুর পাশের ঘাসগুলো আমাদের পায়ের চাপে চাপে সবুজ রং হারিয়ে ফেলেছিল, কোথাও কোথাও ঘাস মরে গিয়ে মাটি দেখা দিয়েছিল। আমরা তাই আরেকটা আরো বড় পুরোনো গাছের তলায় উঠে গেলাম তাঁবু তুলে নিয়ে। এ গাছটি নদী থেকে এক ফার্লং দূরে। এর গুঁড়ির ব্যাস ছিল পুরো ছয় ফুট ; গুঁড়ির একদিকে একদল ইণ্ডিয়ান বিচিত্র দুর্বোধ্য চিত্রলিপিতে তাদের কোনো যুদ্ধ-অভিযানের কাহিনী খোদাই করে রেখে গেছে, আর উঁচুতে ডালপালার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা মাচানের ধ্বংসাবশেষ, যার ওপর ইণ্ডিয়ানরা তাদের রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ জমা করে রাখত।

ঘাসের ওপর খেতে বসেছি, এমন সময় হেনরি শ্যাটিলন বলল, "ঐ যে ষাঁড়-ভালুক আসছে।" তাকিয়ে দেখি ওধারের পাহাড়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। ওদের ভেতর থেকে চারটি জোয়ান চেহারার যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সামনে নেমে পড়ল। এদের ভেতরই একজন ওগিল্লাল্লা দলের প্রধান সর্দারের ছেলে মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা (ষাঁড়-ভালুক); এই নামটা সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে পিতার কাছ থেকে। তার সঙ্গে তার এক ভাই আর অন্য দুটি যুবক। আমরা আগন্তুকদের সঙ্গে করমর্দন করলাম, তারপর আমাদের খাওয়া শেষ করে—কারণ ইণ্ডিয়ানদের ভেতর যারা সেরা তাদেরও এইভাবেই আপ্যায়ন করাটাই রীতি—আমরা তাদের প্রত্যেককে টিনের পেয়ালায় কফি আর একটি করে বিস্কিট দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গেই তারা কণ্ঠের ভেতর থেকে একটা গভীর আওয়াজ বার করে সানন্দ কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর ওরা মাটিতে বসতেই পাইপ ধরিয়ে তাদের হাতে দিলাম।

প্রশ্ন করলাম, "গ্রামের লোকেরা কোথায় ?"

মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ ওদিকে। দু'দিনের ভেতরই এসে পড়বে।"

"ওরা কি যুদ্ধ করতে যাবে ?"

"হ্যাঁ।"

প্রেয়ারির ওপর কেউই মানবহিতৈষী থাকে না। আমরা তাই এই আসন্ন যুদ্ধের খবরটাকে সানন্দে অভিনন্দন জানালাম, এবং 'ঘূর্ণি-হাওয়া'কে তার রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা থেকে নিবৃত্ত করবার মতলবে বর্ডো যে সাফল্যলাভ করেনি তাতে খুবই আনন্দিত

হলাম। আরো খুশি হলাম এই ভেবে যে লা বন্টি-র তাঁবুতে গিয়ে মিলিত হবার আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল, তা সফল করবার পথে কোনো বাধা রইল না।

সেদিন আর আরো কয়েকদিন মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা আর তার বন্ধুরা আমাদের অতিথি রইল। আমাদের ভুক্তাবশেষ তারা খেতে লাগল; আমাদের পাইপ ধরিয়ে দিতে লাগল, ধূমপানেও আমাদের প্রসাদ পেতে লাগল। মাঝে মাঝে তারা ছায়ায় পাশাপাশি শুয়ে নানারকম এমন ধরনের ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগল যা ওদের মতো বীর যোদ্ধার পক্ষে মর্যাদাহানিকর।

দুটো দিন কেটে গেল, তিন দিনের দিন ভোরবেলা ভাবলাম ইণ্ডিয়ান গ্রামের লোকগুলো আসবে। কিন্তু তারা এলো না; আমরা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলাম ওদের দেখতে। আটশো জন ইণ্ডিয়ান দেখতে পাবো আশা করেছিলাম, তার বদলে দেখলাম মাত্র একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে খবর দিল ইণ্ডিয়ানরা তাদের মতলব বদলে ফেলেছে, তিনদিনের ভেতর তারা আসবে না। দুঃসংবাদবাহী এই ভগ্নদূতটিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তাঁবুতে ফিরলাম, সারাটা রাস্তা ইণ্ডিয়ানদের এই অস্থিরমতিত্বকে অভিশাপ দিতে দিতে। ফিরে দেখি বড় গাছের তলায় আমাদের ছোট্ট সাদা তাঁবুটি আর একা নেই, ওর পাশে দাঁড়িয়েছে বেশ বড় একটি তাঁবু, ঝড়-বৃষ্টিতে রং-উঠে-যাওয়া, দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ, আর তার ওপর যে ঘোড়া, মানুষ আর লম্বা করে বাড়ানো হাতের অদ্ভুত ছবি আঁকা ছিল, সেগুলোও লুপ্তপ্রায়। তাঁবুর লম্বা খুঁটিগুলি তাঁবুর ছাদের ওপর মাথা উঁচু করে রয়েছে; প্রবেশদ্বারের ওপর ঝুলানো রয়েছে একটা ওষুধের পাইপ আর যাদুবিদ্যার অন্যান্য সরঞ্জাম। দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন রঙের আর বিভিন্ন আয়তনের অনেকগুলো মানুষ আমাদের শান্ত তাঁবুটির চারধারে কিলবিল করছে। ফাঁদপাতা-শিকারী মোরিন দু-একদিন অনুপস্থিত ছিল; মনে হলো সে তার পুরো পরিবারটা নিয়েই ফিরে এসেছে। সে একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছিল তার বিনিময়ে নির্ধারিত মূল্য হিসেবে একটি ঘোড়া দিয়ে। দরটা প্রথমে খুব সস্তা মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে ইণ্ডিয়ান স্ত্রী কেনার ব্যাপারে খুব ধীরভাবে চিন্তা না করে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, কারণ শুধু দাম ফেলে দিলেই দায়িত্ব চুকল না, যে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি এভাবে ইণ্ডিয়ান স্ত্রী গ্রহণ করবে সেই স্ত্রীর যত আত্মীয়-স্বজন আছে সবাইকে খাওয়াবার দায়িত্ব চাপবে তারই ঘাড়ে। তার নতুন আত্মীয়েরা এসে জোঁকের মতো তাকে নিঃশেষে শুষে নেবে।

মোরিনের এই বিয়েটা অভিজাত বংশে হয়নি। তার স্ত্রীর আত্মীয়রা ছিল ওগিল্লাল্লা সম্প্রদায়ের অতি নিম্নস্তরের মানুষ; কারণ এই প্রেয়ারির গণতান্ত্রিক সমাজেও,

সভ্যতার সমাজে যেমন আছে তেমনই, স্থান এবং বংশগত কৌলীন্য আছে। মোরিনের স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল না, তাছাড়া মোরিনেরও এমন বিশ্রী রুচি যে সে তাকে ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের মতো সাদা হরিণের চামড়ার পোশাক না পরিয়ে, পরিয়েছিল দেশান্তর-যাত্রীদলের একজন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কেনা ক্যালিকো কাপড়ের তৈরী একটি পুরোনো গাউন। এই গৃহস্থালির নেত্রী ছিল এক আশিবছরের বুড়ী, যার চাইতে বিশ্রী চেহারার রাক্ষসী বা ডাইনী কল্পনাও করা যায় না। বুড়ীর পাঁজরার সবগুলো হাড় তার চামড়ার ভাঁজের মধ্য দিয়ে গোনা যেতো। তার মুখের দিকে তাকালে জ্যান্ত মানুষের মুখের বদলে মরা মানুষের মুখ বলেই মনে হতো; তার ছোট্ট চোখ-দুটো ঢুকে গিয়েছিল দুটি কোটরের অনেক তলায়। তার বাহু দুটি শুকিয়ে হয়ে গিয়েছিল চাবুকের মতো সরু। বুড়ীর চুল আধ-কালো আধ-ধূসর, মাটিতে লুটিয়ে পড়তো একান্ত অবহেলায়, আর তার পরনে একমাত্র ছিল শুধু একটা পরিত্যক্ত জীর্ণ মহিষ-চর্মের পোশাক, চামড়ার দড়ি দিয়ে তার কোমরের চারদিকে বাঁধা। কিন্তু এই বুড়ীর ক্ষীণ দেহে ছিল আশ্চর্য শক্তি। সে তাঁবু খাটাত, ঘোড়ার গায়ে জিন পরাত, তাঁবুর সবচেয়ে বেশী শক্ত কাজগুলোও সেই করত। ভোর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সে তাঁবুর চারধারে ঘুরঘুর করত, আর কেউ কোনো-রকমে তার মেজাজ খারাপ করে দিলেই বিশ্রীরকম চীৎকার করে উঠত। তার ভাই ছিল একজন 'ওঝা' বা যাদুকর; সেও এই বুড়ীর মতোই রোগা আর শিরা-বার-করা। লোকটার মুখের হাঁ-টা এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বিস্তৃত, আর তার ক্ষুধাও যে তেমনি প্রচণ্ড তার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। তাঁবুর অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল সদ্য-বিবাহিতা এক তরুণ দম্পতি; স্বামীটি ছিল এক অলস, অকর্মণ্য ছোকরা যেমনটি শুধু ইণ্ডিয়ানদের গ্রামেই নয়, আরো সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। ছোকরার ভাবলেশহীন বোকা-বোকা মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত সে না পারে শিকার করতে, না পারে লড়াই করতে। এই সুখী দম্পতিটির সবেমাত্র মধুচন্দ্রিকা শুরু হয়েছে। খুঁটির মাথায় মহিষ-চর্মের পোশাক টাঙিয়ে তার ছায়ায় ফার বিছিয়ে তার ওপর তারা পাশাপাশি বেশ ঘন হয়ে বসে আদ্ধেক দিন কাটিয়ে দিত, কিন্তু ওদের দুজনের ভেতর কথাবার্তা হতে বড় একটা দেখতাম না। সম্ভবতঃ তাদের বলবার কিছুই ছিল না; ইণ্ডিয়ানদের ভেতর আলাপের বিষয় খুবই কম। তাঁবুতে আধা-ডজন ছোট ছেলেমেয়েও ছিল, তারা এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি করে খেলা করছিল। মাঝে মাঝে তারা তীর-ধনুকের সাহায্যে পাখি শিকার করছিল, কখনো বা লাঠির পর লাঠি

সাজিয়ে নকল বাড়ি তৈরি করছিল, অন্য রঙের ছেলে-মেয়েরা যেমন করে কাঠের খণ্ড সাজিয়ে।

একটা দিন অতিবাহিত হলো। ইণ্ডিয়ানরা দ্রুতবেগে আসতে লাগল। এক এক দলে দুই, তিন বা আরো বেশী ঘোড়ায় চড়ে এসে ঘাসের ওপর বসে পড়ত। চতুর্থ দিনে পাশের পাহাড়ের মাথায় দেখা গেল একসারি ঘোড়সওয়ার; তাদের পিছনে এক বিচিত্র মিছিল তাড়াহুড়ো করে এলোমেলোভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে সমতলের দিকে নেমে আসছে—ঘোড়া, অশ্বতর, কুকুর; ভারী ওজনে বোঝাই ডুলি, অশ্বারোহী যোদ্ধা, ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক আর শিশুরা। পুরো আধঘণ্টা ধরে তারা নেমে আসতেই লাগল; আর ঠিক নদীর বাঁক অনুসরণ করে এসে আমাদের এক ফার্লং-এর মধ্যে তারা একত্রিত হলো, তারপর যেন যাদুমন্ত্রে দেড়শোটি উঁচু তাঁবু খাড়া হয়ে উঠল। নির্জন ভূমি একটি জনবহুল শিবিরে পরিণত হলো। আমাদের চার-দিকের মাঠে অগুনতি ঘোড়া চরে বেড়িয়ে ঘাস খেতে শুরু করল, আর প্রেয়ারিভূমি সজীব হয়ে উঠল প্রাণচঞ্চল অশ্বারোহীদের দাপটে অথবা লম্বা সাদা পোশাক-পরা ইণ্ডিয়ানদের পায়চারিতে। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত 'ঘূর্ণি-হাওয়া' এসে পৌছল। এখন বাকি রইল শুধু একটি প্রশ্নের জবাব: "সে কি যুদ্ধে যাবে, যেন আমরা এহেন সম্ভ্রান্ত রক্ষীদলের সঙ্গে লা বণ্টি-র তাঁবুর মতো বিপদসঙ্কুল জায়গায় গিয়ে পৌছতে পারি?"

এ বিষয়ে তখনো সন্দেহ ছিল। তাদের বৈঠকে তারা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিল না; ইণ্ডিয়ান চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য। এরা অনেকে একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তারা সংহত হতে পারে না। রাজা ফিলিপ, পণ্টিয়াক আর তেকুমসে, এঁরা সবাই এই নিদারুণ সত্যটি ঠেকে শিখেছিলেন। ওগিল্লাল্লাদের একসময়ে একজন যুদ্ধনেতা ছিল যে তাদের পরিচালনা করতে পারত; কিন্তু সে তখন বেঁচে নেই, সুতরাং এখন এরা ছিল সম্পূর্ণ তাদের দ্রুত-পরিবর্তনশীল খেয়ালের অধীন।

এই ইণ্ডিয়ান গ্রাম এবং এর বাসিন্দারা এই কাহিনীর বাকি অংশে একটি বিশেষ স্থান দখল করবে, কাজেই এরা যে বর্বর জাতির অন্তর্গত সেই জাতি সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া হয়তো অবান্তর হবে না। ডাকোটা অথবা সিয়োক্স্ ইণ্ডিয়ানরা বাস করে বিরাট এলাকা জুড়ে, সেণ্ট পিটার নদী থেকে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত। এরা কয়েকটি স্বাধীন গোষ্ঠীতে বিভক্ত; গোষ্ঠীগুলো কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোনো একজন নেতার অধীন নয়। তাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে এদের সবারই এক ভাষা,

একই আচার-ব্যবহার, আর কুসংস্কারগুলিও একই রকম। যুদ্ধের সময়ও তারা এক হতে পারে না। পুবদিকের গোষ্ঠীগুলি লড়াই করে উঁচু হ্রদ-অঞ্চলের ওজিবোয়েদের সঙ্গে, আর পশ্চিমের গোষ্ঠীগুলো রকি পাহাড় অঞ্চলের স্নেক ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সারা বছরই যুদ্ধরত। পুরো জাতটা যেমন কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীও তেমনি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত। প্রত্যেক গ্রামে থাকে একটি করে সর্দার, তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্যই তাকে গ্রামের লোকেরা যেটুকু সম্মান বা ভয় করবার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে শুধু নামে মাত্র সর্দার, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা প্রায় একচ্ছত্র, খ্যাতি তার নিজ গ্রামের বাইরেও বহুদূর বিস্তৃত, তার গোষ্ঠীর সবাই তাকে নেতা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত। এখন থেকে কয়েক বছর আগে ওগিল্লাল্লাদের ছিল এই অবস্থা। যে-কোনো যোদ্ধা সাহস, ব্যক্তিত্ব, উদ্যম ইত্যাদি দেখাতে পারলে উচ্চতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, বিশেষ করে সে যদি পূর্ববর্তী কোনো সর্দারের পুত্র অথবা এমন কোনো বড় পরিবারের একজন হয় যে পরিবারের লোকেরা তার সহায়তা করবে এবং তার সঙ্গে যারা ঝগড়া করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু সে যখন সর্দারের মর্যাদায় উন্নীত হবে, এবং বুড়োরা আর যোদ্ধারা মিলে এক অদ্ভুত অনুষ্ঠানে তাকে সর্দার বলে বরণ করে নেবে, তখনও কিন্তু সে তার পদমর্যাদার কোনো বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করবে না। তার এই পদটি যে কত ঠুন্‌কো তা সে বেশ ভালোরকমই জানে। তাকে তার অস্থিরমতি প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। গ্রামের অনেকেরই সর্দারের চাইতে অবস্থা অনেক ভালো, তাদের স্ত্রী আর ঘোড়ার সংখ্যাও বেশী, পোশাকও তারা সর্দারের চাইতে ভালো পরে। প্রাচীন টিউটন-জাতীয় সর্দারদের মতো ইণ্ডিয়ান সর্দারও তার গোষ্ঠীর যুবকদের হাতে রাখবার জন্য নানারকম উপহার দিয়ে খুশি করে, আর তার ফলে নিজে গরীব হয়ে পড়ে। অথচ খুশি না রাখলেও বিপদ, কারণ তাহলে যুবকরা তার সর্দারি ঘুচিয়ে দেবে তাকে একেবারেই গ্রাহ্য না করে ; কারণ এদের গোষ্ঠীর এমন কোনো আইন-কানুন নেই যার দ্বারা সর্দারের কর্তৃত্ব কার্যকরী করা যায়। এদের মধ্যে—অন্তত এদের পশ্চিমী গোষ্ঠীদের মধ্যে—কোনো সর্দারকেই বড় একটা ক্ষমতাবান হতে দেখা যায় না, যদি সে এক মস্ত পরিবারের প্রধান না হয়। অনেকসময় দেখা যায় গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই তার আত্মীয় অথবা আত্মীয়দের বংশধর ; এবং ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীগুলো সাধারণতঃ পিতৃপ্রধানই হয়ে থাকে।

পশ্চিমের ডাকোটাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। তারা গ্রীষ্ম আর শীত ঋতুতে শিকার আর লড়াই করতে করতে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে

বেড়ায়। এদের কিছু অংশ ধুধু-করা প্রেয়ারির ওপর দিয়ে বুনো মহিষ অনুসরণ করে ; বাকি অংশ ঘোড়ায় চড়ে আর পায়ে হেঁটে 'কালো পাহাড়' অতিক্রম করে অনেক অন্ধকার খাদ আর গুহা পার হয়ে অবশেষে সুন্দর অথচ বিপদসঙ্কুল জায়গায় এসে পড়ে, যেখানে বুনো শিকার মেলে। তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো যোগায় মহিষ—তাদের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু), খাদ্য, পোশাক, বিছানা আর জ্বালানী ; ধনুকের ছিলা, শিরীষ, সুতো, দড়ি, ঘোড়াদের জন্যে টানা দড়ি, জিনের আবরণ, জল রাখবার পাত্র, স্রোত পার হবার নৌকো, এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের দরকারী জিনিসপত্র কিনবার উপায়। মহিষ লোপ পেলে এরাও ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে।

যুদ্ধই তাদের জীবন। আশেপাশের অধিকাংশ গোষ্ঠীর ওপরই এদের বিজাতীয় ঘৃণা পিতা থেকে পুত্রে বংশানুক্রমে চলে আসছে, আর আক্রমণ আর প্রত্যাক্রমণের দুষ্টচক্রের অবিরাম আবর্তনের ফলে, এ ঘৃণার আগুনও অবিরাম জলে চলেছে। বছরের ভেতর বহুবার প্রত্যেক গ্রামে হয় এদের মহাদেবতার আবাহন, উপবাস, আর সামরিক কুচকাওয়াজ ; তারপর এরা ছোট ছোট দলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে চলে যায়। এই লড়াই মনোবৃত্তিই তাদের প্রাণশক্তি আর উদ্যম জাগিয়ে রাখে। এ নইলে তারা একেবারে অলস, অপদার্থ হয়ে যেতো, পাহাড়ের ওধারের যুদ্ধবিমুখ ইণ্ডিয়ানদের মতো, যারা জানোয়ারের মতো পাহাড়ের বুকে এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকে আর নানারকমের মূল আর সরীসৃপের মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। এই শেষোক্ত মানুষগুলোর শুধু চেহারাটাই যা মানুষের মতো, এছাড়া তাদের মনুষ্যোচিত গুন কিছু নেই। কিন্তু অহঙ্কারী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডাকোটা যোদ্ধারা কখনো কখনো তাদের বীরোচিত গুণের জন্য গর্ববোধ করতে পারে। এদের সমাজে একমাত্র বাহুবল ছাড়া মর্যাদা আর প্রভাব লাভের অন্য কোনো উপায় নেই। অবশ্য যারা নিজেদের যাদুকর বলে ভান করে, কুসংস্কারের বশে ইণ্ডিয়ানরা তাদের যেমন প্রচুর ক্ষমতা দেয় তেমনি সুদক্ষ বক্তাদেরও তারা সম্মান করে।

এইবার আগেকার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আমাদের তাঁবুর ভেতর উঁকি দিন, অথবা ভেতরের গুমোট বাতাস আর দম-আট্‌কানো ধোঁয়া সইতে পারলে একেবারে ঢুকেই আসুন। দেখবেন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হয়ে বসে আছে একদল মোটা-সোটা যোদ্ধা। ধূমপানের পাইপটি হাতে হাতে ঘোরাতে-ঘোরাতে তারা হাসি-তামাসা করছে, গল্প বলছে, আর তাদের নিজস্ব কায়দায় হৈ-হুল্লোড় করছে। কতকগুলো ছোট ছোট তামাটে রঙের উলঙ্গ ছেলে আর সাপ-চোখো মেয়েও

আমাদের ঘরে ভিড় করেছিল। তারা মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে বিড়বিড় করে যে-ক'টি শব্দ উচ্চারণ করত তাদের সারমর্ম হচ্ছে : "খেতে এসো।" শুনে আমরা উঠে পড়তাম, ডাকোটাদের অতিথি বাৎসল্যকে মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে, কারণ এই অতিথি-বাৎসল্যের ফলেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহারের নিমন্ত্রণ, পুরো একটি ঘণ্টাও যে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করব তার উপায় নেই। অথচ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে, নইলে নিমন্ত্রণ-কর্তাদের অসম্মান করা হবে। এতে কষ্ট হতো আমারই বেশী, কারণ আমি এত অসুস্থ ছিলাম যে হাঁটতে আমার কষ্ট হতো, আর দিনে কুড়িবার করে খাওয়ার মতো অবস্থাও আমার ছিল না। অতিথিসেবার এমন উদার প্রাচুর্য দেখে মনে হতে পারে এদের প্রেমপ্রীতি যেন উপ্‌চে পড়ছে, কিন্তু আমাদের যারা এভাবে আপ্যায়ন করছিল তাদের ভেতর শতকরা অন্তত পঞ্চাশজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলতে পারি প্রেয়ারির বুকে আমাদের একা আর নিরস্ত্র অবস্থায় পেলে ওরা আমাদের ঘোড়া কেড়ে নিত, আর সেইসঙ্গে হয়তো আমাদের পিঠে একটি করে তীরও ফুঁড়ে দিত।

একদিন ভোরবেলা আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো এক বুড়োর তাঁবুতে; এই বুড়োই এই গোষ্ঠীর জ্ঞানী উপদেষ্টা বলে সম্মানিত। গিয়ে দেখি বুড়ো আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে এক সাদা মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর। বয়স তার আশি-বছরের কাছাকাছি, কিন্তু লম্বা মিশকালো চুল তার শীর্ণ দেহের দু'ধারে ঝুলে পড়েছে। তার রোগা হলেও সুঠাম দেহ যেমন তার অতীত শক্তির পরিচয় দিচ্ছিল, তার চেয়ে তার জরাজীর্ণ হলেও তীক্ষ্ণ মুখাবয়বে তার মনের সজীবতা অনেক বেশী স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। এই বুড়োর পাশে ছিল তার ভাইপো, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা। এছাড়া এ তাঁবুতে ছিল দু-একটি স্ত্রীলোক।

এই বৃদ্ধের কাহিনী বড় অদ্ভুত; ইণ্ডিয়ানদের ভেতর একটি কুসংস্কার কিরকম প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, এ কাহিনী তারই উদাহরণ। এই লোকটি ছিল অনেক লড়াইতে কীর্তিমান একটি পরিবারের একজন। তরুণ বয়সে সে একটি বিশেষ ধরনের ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল যা সাবালক জীবনে প্রবেশ করবার আগে এ গোষ্ঠীর অধিকাংশ পুরুষকেই করতে হয়। সারা মুখে কালো রং মেখে সে কালো পাহাড়ের এক নিরালা অংশে একটি গুহা খুঁজে বার করে নিয়ে, কয়েকদিন ধরে সেখানে অনাহারে শুয়ে শুয়ে অশরীরী আত্মাদের কাছে প্রার্থনা করেছিল। এই কৃচ্ছ্রসাধনজনিত দুর্বলতা আর স্নায়বিক উত্তেজনার ঘোরে সে স্বপ্ন বা অলীক দৃশ্য দেখেছিল, সেগুলোকেই সে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মতোই অলৌকিক দিব্যদর্শন বলে

ভেবে নিয়েছিল। বার বার তার সামনে দেখা দিয়েছিল একটি কৃষ্ণসার। কৃষ্ণসারই হচ্ছে ওগিল্লাল্লা ইণ্ডিয়ানদের শাস্তির প্রতীক; কিন্তু এ গোষ্ঠীর যুবকদের সাবালক জীবনে প্রবেশলাভের ব্রতানুষ্ঠানের প্রাথমিক উপবাসের সময় এই শান্ত আগন্তুকের আবির্ভাব বড় একটা হয় না। এসময় সাধারণত উপবাসী ব্রতধারী যুবকটির সামনে এসে দেখা দেয় তাদের যুদ্ধের দেবতা, ভীষণ লোমশ ভালুক রূপে, হৃদয়ে যুদ্ধের উন্মাদনা আর খ্যাতির তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে। অবশেষে কৃষ্ণসারটি মুখ খুলে সেই স্বপ্নদর্শী যুবককে বলল যুদ্ধের পথ তার জন্যে নয়, তার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে নিরুপদ্রব শান্তির জীবন, এরপর থেকে তার কাজ হবে তার গোষ্ঠীর লোকদের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সুপথে পরিচালিত করতে এবং ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে বিরত রাখতে। অন্যেরা নাম করবে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, কিন্তু তার জন্যে সেজে রয়েছে অন্য ধরনের মহত্ত্ব।

ইণ্ডিয়ান যুবকেরা এই উপবাসের সময় যে স্বপ্ন ছাখে, সাধারণতঃ তারই ভিত্তিতে তার সমগ্র জীবনের গতি নির্ধারিত হয়। সেই স্বপ্নদর্শনের পর থেকেই লে বর্নিয়ে (বুড়োকে এই নামেই আমরা জেনেছিলাম) সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করে শান্তি-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করল। সে তার গোষ্ঠীর লোকদের খুলে বলল তার স্বপ্ন-কথা। তারা তার এই ব্রতকে মর্যাদা দিয়ে তাকে তার নতুন পরিচয়ে সম্মান করতে লাগল।

এই বুড়োর ভাই মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা ছিল একেবারে বিপরীত ধরনের মানুষ। তার ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে তার নাম, চেহারা এবং তার অনেকগুলো গুণ পেয়েছিল। তার মেয়েই ছিল হেনরি শ্যাটিলনের ইণ্ডিয়ান স্ত্রী, এবং এর ফলে আমাদের কিছু সুবিধাও হয়েছিল, কারণ এই সম্পর্কের দৌলতেই ওগিল্লাল্লা গোষ্ঠীর সম্ভবত বিশিষ্টতম এবং সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা ছিল তার নিজস্ব ধরনে বীরপুরুষ; যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতিতে অথবা তার গোষ্ঠীর লোকদের ওপর প্রভাবে তার সঙ্গে অন্য কোনো সর্দারের তুলনা হতো না। তার ছিল অদম্য সাহস আর একগুঁয়ে, অদম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তার ইচ্ছাই ছিল আইন। লোকটি বেশ চালাক আর সুবিবেচকও ছিল, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সে সর্বদাই বন্ধুত্ব বজায় রাখত, কারণ তাহলে তার নিজের এবং তার অনুচরদের প্রচুর সুবিধা হবে, এ তার জানা ছিল। যখনই সে কোনো কিছু করা ঠিক করত, তখনই যোদ্ধাদের খুশি করবার জন্য তাদের পরামর্শ-বৈঠকে ডাকত, তারপর তাদের তর্ক-বিতর্ক শেষ হয়ে গেলে সর্বশেষে নিজের মতটা বেশ শান্তভাবে জানিয়ে দিত। তার মতটাই

নির্বিবাদে গৃহীত হতো। সে যাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতো তাদের বড় দুর্দশা হতো। সে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিটতে শুরু করত বা ছোরা মারত। অন্য কোনো সর্দার এমন করলে তাকে প্রাণ হারাতে হতো, কিন্তু মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা বার বার এই একই ব্যাপার করলেও তার কোনো বিপদ ঘটত না, গোষ্ঠীর সবাই তাকে এমনি ভয় আর শ্রদ্ধার চোখে দেখত। যে সমাজের প্রত্যেকেই যে যার নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো আইন মানে না, তাতে মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা যে ক্ষমতা অর্জন করেছিল তা প্রায় স্বৈরশাসন বা একনায়কত্বের কাছাকাছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার পতন ঘটল। তার অনেক শত্রু শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিল; বিশেষ করে আমাদের পুরাতন বন্ধু স্মোক আর তার আত্মীয়-স্বজন সবাই ভীষণ ঘৃণা করত মাহ্‌তো-তাতোঙ্কাকে। স্মোক একদিন তার নিজের তাঁবুতে বসে আছে তার গ্রামের মাঝখানে, এমন সময় মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা একা এসে উঁচু গলায় চীৎকার করে তার শত্রু স্মোককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল। স্মোক অগ্রসর হলো না। এতে মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা তাকে কাপুরুষ এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলে ঘোষণা করে তার তাঁবুর প্রবেশদ্বারের কাছে এগিয়ে এসে সেখানে বেঁধে রাখা সর্দারের সেরা ঘোড়াটাকে ছোরা মেরে বসল। স্মোক ভয় পেয়েছিল, কাজেই এই অপমানেও সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো না। মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা তখন দাম্ভিক পদক্ষেপে ফেরৎ রওনা হলো, সবাই তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল। কিন্তু তার দিন ঘনিয়ে আসছিল।

তারপর এক গরম দিনে—এখন থেকে পাঁচ কি ছয় বছর আগে—স্মোকের আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর থেকে কয়েক পরিবারের লোক ফার-কোম্পানির কয়েকজন লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যারা বেচবার জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে এসেছিল, হুইস্কি তাদের অন্যতম। সেখানে মাহ্‌তো-তাতোঙ্কাও ছিল তার দলের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। সে তার নিজের তাঁবুতে শুয়ে আছে, এমন সময় তার অনুচরদের সঙ্গে তার শত্রুর আত্মীয়দের মারামারি শুরু হলো। রণহুঙ্কার উঠল, বন্দুকের গুলী আর তীর ছুটতে লাগল, শুরু হলো ভীষণ তাণ্ডব। সর্দার মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা ভীষণ ক্ষেপে লাফিয়ে উঠে বাইরে ছুটে এসে চীৎকার করে দুই পক্ষকেই লড়াই থামাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে—কারণ আক্রমণটা আকস্মিক নয়, পূর্ব-পরিকল্পিত—ছুটে এলো দু-তিনটি বন্দুকের গুলী আর ডজনখানেক তীর, আর সঙ্গে সঙ্গে বর্বর বীর মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা মারাত্মক আহত হয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। রুলো সেখানে উপস্থিত ছিল; তারই মুখে আমি বিবরণ শুনেছি। ঝগড়াটা ভালোভাবেই বাধল; দু'পক্ষেরই কয়েকজন ঘায়েল না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামল না।

এইভাবে মৃত্যু হলো মাহ্তো-তাতোঙ্কার। কিন্তু সে পিছনে রেখে গেল বহুসংখ্যক বংশধর, যারা তার স্মৃতিরক্ষা করবে আর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। কন্যা ছাড়াও তার পুত্র ছিল ত্রিশটি। ইণ্ডিয়ানদের সামাজিক রীতিনীতি যাঁদের জানা আছে, তাঁরা এতে বিস্ময় বোধ করবেন না। আমরা তাদের অনেককে দেখেছিলাম, তাদের প্রত্যেকেরই একইরকম কালো গায়ের রং আর একই ধরনের চেহারা। এদের ভেতর যেটি আমাদের তাঁবুতে এসেছিল, তরুণ মাহ্তো-তাতোঙ্কা, সে-ই ছেলেদের ভেতর বয়সে সবচেয়ে বড়। কেউ কেউ বলত সে বাপের সম্মান-প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হবে। তাকে দেখে একুশবছর বয়সের বেশী মনে হয় না, কিন্তু শত্রুদের ওপর আঘাত হেনেছে সেই সবচেয়ে বেশী, আর ঘোড়া আর স্ত্রীলোক চুরিতেও গ্রামের অন্যান্য তরুণদের সে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। প্রেয়ারি অঞ্চলে ঘোড়া-চুরি হচ্ছে মর্যাদা অর্জন করার একটা মস্ত উপায়, স্ত্রীলোক-চুরিও তার চাইতে কম নয়। অবশ্য শুধু স্ত্রীলোক চুরি করলেই খ্যাতি অর্জন করা যাবে তা নয়। যে-কেউ ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক চুরি করতে পারে, তারপর সে যদি স্ত্রীলোকটির যথার্থ মালিককে যথাযোগ্য উপহার দেয় তাহলে স্বামী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাতেই সন্তুষ্ট হয়, প্রতিশোধ-স্পৃহাটা ঘুমিয়ে পড়ে, অতএব তারপর আর সেদিক থেকে বিপদ আসবার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু এধরনের লেন-দেন অত্যন্ত শোচনীয় এবং হীন। এতে বিপদটা কেটে যায় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে অর্জনের গৌরবটাও নষ্ট হয়। মাহ্তো-তাতোঙ্কার অভিযান ছিল আরো দুঃসাহসিক। সে কয়েক ডজন স্ত্রীলোককে চুরি করেছিল তাদের স্বামীদের মুখের ওপর তুড়ি মেরে, আর একটি স্ত্রীলোকের জন্যও দাম না দিয়ে, এ কথা সে গর্ব করেই বলতে পারত। স্বামীগুলো তার ওপর মনে-মনে যতই ক্ষেপে উঠুক, তার গায়ে টোকাটুকু পর্যন্ত মারতে সাহস পেতো না। এবিষয়ে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করত। ইণ্ডিয়ান যুবক আর যুবতীরা তাকে যে যার নিজের মতে বেশ পছন্দই করত। যুবকরা তার পিছু পিছু যুদ্ধে যেতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল, আর যুবতীদের কাছে সে ছিল একটি বিরাট আকর্ষণ। সে কি করে সবরকম বিপদ থেকে মুক্ত থাকত, সে এক বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হতে পারে। কোনো একটি গুহার আড়ালে থেকে তাকে তীরবিদ্ধ করা অথবা অন্ধকারে পিছন থেকে ছুরি মারা এমন কিছু সাহসের কথা নয়, এবং ইণ্ডিয়ান চরিত্রের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী ; কিন্তু মাহ্তো-তাতোঙ্কার ছিল একটি আশ্চর্য রক্ষা-কবচ। সে যে ইণ্ডিয়ানদের সমাজে এমন বেপরোয়াভাবে তুড়ি মেরে চলতে পারত তার কারণ শুধু তার সাহস আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি নয়। তার শত্রুরা

একথাটা ভুলত না যে সে ত্রিশজন রণকুশলী ভাইদের একজন, আর তার ভাইয়েরা সবাই রীতিমতো জোয়ান সাবালক পুরুষ হয়ে উঠেছে। তাই মাহ্‌তো-তাতোঙ্কার ওপর তারা হিংসার ঝাল মেটাতে গেলেই তাদের ওপর শ্যেনদৃষ্টি পড়বে অনেক-জোড়া চোখের, আর অনেকগুলো হিংস্র হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকবে তাদের রক্তের জন্য, তাদের পিছনে পিছনে সর্বত্র ঘুরবে প্রতিশোধকামীর পদক্ষেপ। অর্থাৎ মাহ্‌তো-তাতোঙ্কাকে হত্যা করা হবে আত্মহত্যারই সামিল।

মেয়েদের চোখে আকর্ষণীয় হলেও সে কিন্তু ফুলবাবু ছিল না। তার সঙ্গীদের জঁাকালো সাজসজ্জা আর অলঙ্কারের প্রতি তার ছিল ঔদাসীন্যের ভাব; জীবনে সাফল্যের জন্য সে নির্ভর করত সম্পূর্ণরূপে তার নিজের যোদ্ধাসুলভ গুণাবলীর ওপর। নিজেকে সে কখনো রংচঙে কম্বল বা ঝক্‌ঝকে কণ্ঠহারে সাজাত না; হৃদয় জয় করবার জন্য সে সুযোগ নিত শুধু তার সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মূর্তির মতো তার সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠবের। তার কণ্ঠস্বর ছিল আশ্চর্যরকম গভীর আর জোরালো, অর্গ্যানের আওয়াজের মতো বেরিয়ে আসতো তার বুকের ভেতর থেকে। তা যাই হোক, তবু সে ছিল একজন ইণ্ডিয়ান-ই। একদিন যখন আমাদের তাঁবুর সামনে রোদে শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে পা ছুঁড়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মশগুল মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা, তখন তাকে দেখে মস্ত একটি বীর বলে মনে হয়নি। কিন্তু এক সূর্যাস্তবেলায় সারাটা গ্রাম ভেঙে পড়ল বীর যোদ্ধার সাজে তাকে দেখতে, কারণ পরদিন ভোরেই সারা গ্রামের প্রিয়তম যুবক বীর যাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে। তার শিরস্ত্রাণের ওপর যুদ্ধের ঈগলপাখির পাখার চূড়া; পাখাগুলো তার কপালের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে পিছনদিকে চলে গেছে। তার বুকের সামনে ঝুলছে সাদা গোল ঢাল, ঢালের মাঝখান থেকে অনেকগুলো পাখা তারার আকারে চারিদিকে ছড়ানো। পিঠে ঝুলছে তীর-ভরা তূণ; হাতে তার লম্বা বল্লম, যার লোহার তৈরী ফলাটা অস্তগামী সূর্যের আলোয় মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে, আর নিহত শত্রুদের মাথার খুলিসহ লম্বা চুলের গোছা লম্বা বল্লমের ডাণ্ডা থেকে ঝুলে হাওয়ায় উড়ছে। এভাবে পূর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে যাবার দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে সুন্দর সহজ দক্ষতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে রাখতে সে চারদিকে বৃত্তাকারে তাঁবু দিয়ে ঘেরা এলাকায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত, ভক্তিপূর্ণ ভাবে গান গাইতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের মহাদেবতার উদ্দেশে। গোষ্ঠীর অন্য যুবক যোদ্ধারা তার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল; গালে সিঁদুর-মাখানো যুবতীরা তাকাতে লাগাল মুগ্ধ অনুরাগের দৃষ্টিতে, বালকের দল আনন্দের উল্লাসে হুল্লোড়ে মেতে উঠল, আর বৃদ্ধা

স্ত্রীলোকেরা তাঁবুতে তাঁবুতে উঁচু গলায় তার নাম উচ্চারণ করতে করতে তার গুণগান করতে লাগল।

আমাদের ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের ভেতর মাহ্‌তো-তাতোস্কাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। নানা বয়সের নানা চরিত্রের বর্বরেরা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের তাঁবু ঘিরে ফেলেছিল, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাহ্‌তো-তাতোস্কা আমাদের তাঁবুতে শুয়ে থাকত, আমাদের কোনো জিনিস যেন চুরি না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

'ঘূর্ণি-হাওয়া' একদিন আমাদের তার তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করল। ভোজের শেষে পাইপ ঘুরতে শুরু করল হাতে হাতে। পাইপটা অসাধারণ বড় আর চমৎকার; আমি ওটার খুব তারিফ করলাম।

আমার মুখে পাইপটির প্রশংসা শুনে 'ঘূর্ণি-হাওয়া' বলল, "পাইপটা যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ওটা আপনি রেখেই দিন না কেন?"

ওগিল্লাল্লাদের ভেতর ওরকম একটি পাইপের দাম একটি ঘোড়ার সমান। এমন একটি দামী জিনিস উপহার দেওয়া এক যোদ্ধা-সর্দারের যোগ্য বলেই মনে হলো; কিন্তু 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র বদান্যতা অত উঁচু পর্যায়ে ওঠেনি। আমাকে সে পাইপটা দিল মনে মনে এই আশা করে, যে বিনিময়ে আমি তাকে ওটার সমান দামের বা ওটার চাইতে বেশী দামের কোনো উপহার দেবো। ইণ্ডিয়ানরা যখনি কাউকে কোনো উপহার দেয় তখনই তারা এইরকম কিছু আশা করে, এবং প্রতিদান না পেলে উপহারটি ফেরৎ চেয়ে নেয়। সুতরাং আমি একটা রংচঙে ক্যালিকোর রুমালের ওপর কিছু সিঁদুর, তামাক, ছুরি আর বারুদ সাজিয়ে দিয়ে সর্দারকে আমাদের তাঁবুতে ডাকিয়ে এনে তাকে আমার বন্ধুত্ব জানিয়ে সামান্য প্রীতিচিহ্নস্বরূপ এই জিনিসগুলো গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালাম। খুশির আওয়াজ করতে করতে সে আমার উপহারগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে তার নিজের তাঁবুতে চলে গেল।

একদিন অপরাহ্ণের শেষের দিকে নদীর ধারের কতকগুলো ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে একদল ঘোড়সওয়ার ইণ্ডিয়ান হঠাৎ আমাদের দৃষ্টিপথে এলো। তারা সঙ্গে যে একটা অশ্বতরকে টেনে নিয়ে আসছিল, তার পিঠে দু'দিকে উঁচু জিনের ওপর চেপে বসে ছিল এক ছন্নছাড়া চেহারার নিগ্রো। তার গাল দুটি তোব্‌ড়ানো, তার দুটি চোখই অস্বাভাবিক-রকম বিস্ফারিত, এবং তার ঠোঁট দুটোই মৃতদেহের ঠোঁটের মতো কুঁকড়ে যাওয়ার দরুন দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে। ওরা যখন লোকটিকে আমাদের তাঁবুর সামনে নিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নামাল, বেচারা তখন হাঁটতে বা দাঁড়াতে পারল না, কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এসে অত্যন্ত যন্ত্রণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুগুলোর ভেতর থেকে ছেলেমেয়েরা আর স্ত্রীলোকেরা বেরিয়ে এসে নানারকম চীৎকার করতে করতে লোকটিকে ঘিরে ফেলল ; লোকটি দু'হাতের ওপর ভর করে বসে ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এই অভাগা অনাহারে মরতে চলেছিল। তেত্রিশ দিন সে একা, নিরস্ত্র অবস্থায়, খালি পায়ে প্রেয়ারির বুকে ঘুরে বেরিয়েছে ; পরনের পুরোনো জ্যাকেট আর প্যাণ্ট ছাড়া আর কোনো পোশাক তার সঙ্গে ছিল না, কোন্‌দিকে যাবে সেটা বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি অথবা প্রেয়ারিতে কী কী জিনিস জন্মায় সেবিষয়েও তার কোনো জ্ঞান ছিল না। এসময়ের দিনগুলিতে সে জীবনধারণ করেছে ঝিঁঝিপোকা আর গিরগিটি, জংলি পিঁয়াজ, প্রেয়ারির একটি বন-কপোতের বাসায় পাওয়া তিনটি ডিম—এইসব খেয়ে। একটি মানুষও এর ভেতর তার চোখে পড়েনি। চারদিকে সীমাহীন, আশাহীন মরুর বিস্তার দেখে হতভম্ব হয়ে সে নিরাশভাবে হেঁটে চলেছিল ; শেষপর্যন্ত হাঁটবার শক্তি হারিয়ে ফেলে সে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিল। ফলে তার প্রায় হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। সে রাত্রিতে ভ্রমণ করত আর দিনের প্রখর রোদে শুয়ে শুয়ে মিজুরিতে তার পুরোনো মনিবের ঘরে যে সুরুয়া আর পিঠে খেতো সেইসব কথা তার বার বার মনে পড়ত। শ্বেতাঙ্গ এবং রেড ইণ্ডিয়ান নির্বিশেষে তাঁবুর সবাই ভেবে বিস্মিত হলাম লোকটি কী করে বেঁচে রইল অনাহারে মৃত্যুর হাতে থেকে, এ অঞ্চলে সঞ্চরমাণ বিরাটকায় লোমশ ভালুকের হাত থেকে এবং নিশাচর হিংস্র নেকড়েদের হাত থেকে, যারা প্রত্যেক রাতে তাকে ঘিরে ঘেউ-ঘেউ করত।

ইণ্ডিয়ানরা এই লোকটিকে কাছে নিয়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই রেনাল তাকে চিনে ফেলল। লোকটি বছরখানেক আগে তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যোগ দিয়েছিল রিচার্ডের দলে ; রিচার্ড তখন সীমান্ত ছেড়ে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে রওনা হচ্ছে। রিচার্ডের দলে কিছুদিন থাকার পর গত মে মাসের শেষে সে রেনাল এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে গিয়েছিল কয়েকটা হারিয়ে-যাওয়া ঘোড়ার খোঁজে ; সেই সময় এক ঝড়ে সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারপর আর তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ওর অনভিজ্ঞতা আর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে কেউ ভাবতেই পারেনি সে বেঁচে আছে। ইণ্ডিয়ানরা তাকে একজায়গায় মাটির ওপর অবসন্নভাবে পড়ে থাকতে দেখে নিয়ে এসেছে।

ইণ্ডিয়ানদের নীরব দৃষ্টির সামনে বসে ছিল লোকটি ; তার বীভৎস মুখ আর জলজ্বলে চোখের দিকে তাকাতেও বিশ্রী লাগছিল। ডেস্‌লরিয়ার্স তাকে এক পাত্র লপ্‌সি তৈরি করে দিল, কিন্তু সামনে সেই খাদ্য দেখেও সে কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়েই

বসে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে দুর্বল হাতে এক চামচ লপ্‌সি তুলে মুখে দিল, তারপর আরেক চামচ, তারপর আরো এক চামচ। অবশেষে যেন হঠাৎ ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে তাকে পাগল করে তুলল, লোকটি দু'হাতে পাত্রটিকে তুলে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পাত্রটি খালি করে ফেলে আকুলভাবে মাংসের দাবি জানাল। মাংস দিতে আমরা অস্বীকার করলাম, ওকে বললাম ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু সে এমন কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগল যে আমরা ওকে একটা ছোট টুকরো দিলাম; সেটাই সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো। খেয়ে বলল আরো চাই। আমরা বললাম দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথমেই এত বেশী খেলে তার জীবন বিপন্ন হবে। কথাটা সে সত্যি বলে মেনে নিল, স্বীকার করল নিজের বোকামি সে বুঝতে পারছে, তবু মাংস তার চাই-ই। আমরা তাকে আর মাংস দিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলাম। নির্বোধ ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকগুলো এতে আমাদের ওপর খুব রাগ করল, আর আমাদের নজর ঐ লোকটির দিক থেকে অন্যদিকে গেলেই সেই ফাঁকে চুপিচুপি এসে ওর সামনে মাটির ওপর শুকনো মাংস আর সাদা আপেল রেখে দিতে লাগল। লোকটির আশ তাতেও মিটল না। অন্ধকার হতেই সে আমাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে হামাগুড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে আশ মিটিয়ে পেট বোঝাই করে খেল। পরদিন ভোরবেলা ফাঁদপাতা-শিকারী গিংগ্রাস তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে কেল্লায় নিয়ে গেল। এই পেটুকপনার জের সামলেও লোকটা বেঁচে উঠল। আমরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে যাবার সময় তার মস্তিষ্কে সামান্য খানিকটা বিকৃতি থাকলেও অন্যদিক দিয়ে সে মোটামুটি সুস্থই ছিল, আর এই দৃঢ় বিশ্বাস সে জোর গলায় প্রকাশ করেছিল যে কোনো কিছুই তার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না।

সূর্য অস্ত যাবার যখন ঘণ্টাখানেক বাকি, তখন গ্রামে একটি বেশ জমকালো দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। যোদ্ধারা তাঁবুর আঙিনায় বা নদীর তীর বেয়ে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে চলাফেরা করতে লাগল, অথবা প্রেয়ারিতে ঘাস খাচ্ছিল যে ঘোড়াগুলো, তাদের দেখতে চলে গেল। গুমোট-গরম তাঁবুগুলো ছেড়ে আদ্ধেক লোক চলে গেল জলের ধারে; বালক-বালিকারা আর যুবতী বধূরা হাসির হল্লোড়ে মেতে জলে সাঁতার কাটতে, ঝাঁপ দিতে আর দাপাদাপি করতে লাগল। কিন্তু সূর্য যখন অস্তাচলে ঢলে পড়বার আগে দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলোর ওপর বিশ্রাম করছিল, আর বেগুনী-রঙা পাহাড়গুলোর ছায়া এসে পড়েছিল কয়েক মাইল ধরে প্রেয়ারির ওপর, যখন আমাদের পুরোনো গাছটা সূর্যের তির্যক্‌ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং প্রেয়ারির

বুকে এলোমেলো ছড়ানো ঝোপঝাড়গুলোও এক নয়নাভিরাম প্রশান্ত শোভায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল—তখন আমাদের তাঁবুর চারদিকের দৃশ্য দেখে উঁচুদরের শিল্পী আশ্চর্য সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। বিরাট চেহারার কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান তূণ, বন্দুক, বল্লম বা কুড়াল হাতে নিয়ে মূর্তির মতো অচল হয়ে ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে ছিল বুকের ওপর দুটি হাত আড়াআড়িভাবে রেখে আর আমাদের দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অন্যান্যরা কতক মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহিষ-চর্মের সাদা পোশাক পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কতক ঘাসের ওপর বসে ছিল ঘোড়ার গলায় বাঁধা দড়ি হাতের মুঠোয় ধরে ; তাদের পোশাক কাঁধ থেকে খসে পড়ায় তাদের কালো শরীরের ঊর্ধ্বভাগ দেখা যাচ্ছিল। এছাড়া কতক দাঁড়িয়ে ছিল পরম নিরুদ্বেগে এই অনেক মানুষের ভিড়ে ; তাদের অসাধারণ সুসমঞ্জস দেহসৌষ্ঠব আড়াল করছিল না কোনো আবরণ। এদের মধ্যে একজন, ভয়ঙ্কর লোক, নাম 'পাগল নেকড়ে', হাতে ধনুর্বাণ আর পিঠে তূণ নিয়ে দাঁড়ালে তাকে স্বয়ং সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মতোই মনে হতো, অবশ্য ওর ঐ বিশ্রী মুখটার কথা ভুলে থাকতে পারলে। এমনি একখানা চেহারাই দেখা দিয়েছিল ওয়েস্টের মনে, যখন ভাটিকান নগরীতে প্রথম বেলভিডিয়ার দেখে তিনি বলে উঠেছিলেন : "কি আশ্চর্য ! এ যে একটি মোহক দেখছি !"

প্রেয়ারি যখন অন্ধকার হয়ে এলো, তখন বাইরে থেকে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি বেঁধে রাখলাম। ভিড়ও কমে কমে যেতে লাগল। চারধারের তাঁবুতে তাঁবুতে আগুন জ্বালানো হলো, তারই আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল কাঠখোট্টা চেহারার ফাঁদপাতা শিকারীদের আর সুঠাম ইণ্ডিয়ানদের। আমাদের কাছাকাছি একটি পরিবারের সবাই দেখলাম তাদের তাঁবুর ভেতরদিকে একটি অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে রয়েছে ; শীর্ণকায়, ডাইনীর মতো চেহারার কতকগুলো বুড়ী আগুনের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; এই আগুনের চারদিকেই গোল হয়ে বসে ক্ষুদে শিশুরা আর যুবতীরা হাসি-তামাসায় কথাবার্তায় মেতে আছে, আর আগুনের লাল আলোয় তাদের মুখগুলোও রঙীন হয়ে উঠেছে। দূরে ইণ্ডিয়ান তাঁবুগুলোতে ঢোলকের একঘেয়ে বাজনা শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধের গানের সঙ্গে সঙ্গে, দূরে বলেই কিছুটা অস্পষ্ট। ওদের সবচেয়ে বড় তাঁবু থেকে সমবেত কণ্ঠের কম্পনশীল চীৎকার ভেসে আসছিল। সেখানে চলেছিল ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধনৃত্য। এছাড়া ক্রমান্বয়ে কয়েক রাত্রি আমরা শুনলাম নেকড়ের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরের মতো শোকের কান্নার ওঠানামা—হেনরির ইণ্ডিয়ান স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মৃতার ভগ্নীরা এবং মাহ্‌তো-তাতোঙ্কার অন্যান্য আত্মীয়ারা ছুরির ঘায়ে নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করতে করতে আর্তনাদ করছিল, এ তারই সমবেত

আওয়াজ। রাত্রে আমাদের তাঁবুতে সবার শুতে যেতে যেতে বেশ দেরী হয়ে যেতো। তারপর যখন আগুনের কুণ্ডে আগুন জ্বলতে জ্বলতে তার তেজ কমে আসত ততক্ষণে সবাই মাটিতে কম্বলের ওপর নীরবে শায়িত, একসঙ্গে ভিড় করে রাখা ঘোড়াগুলোর ছট্‌ফটানি ছাড়া আর কোনো আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না।

এই দৃশ্যগুলোর স্মৃতি-রোমন্থনে আমার মনে যুগপৎ জেগে ওঠে আনন্দ আর বেদনা। সেসময়ে অসুখে ভুগে আমি এমন রোগা হয়ে গিয়েছিলাম যে হাঁটতে গেলেই মাতালের মতো মাথা ঘুরত, আর মাটিতে বসা অবস্থা থেকে যখন উঠে দাঁড়াতাম তখন চারিদিকের দৃশ্য আমার চোখে হঠাৎ ঝাপ্‌সা হয়ে যেতো, গাছ আর তাঁবুগুলো এপাশে ওপাশে দুলতে থাকত, আর প্রেয়ারির সমতলভূমি যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করত। এহেন অবস্থা কোনো জায়গাতেই খুব সুখকর নয়। যেদেশে যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাহুবলের ওপর অথবা পায়ের শক্তির ওপর জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে, সেখানে শরীরের এই অবস্থা তো আরো বেশী অসুবিধাজনক। এবং স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর শোয়া আর মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভেজাও শরীরের এ অবস্থায় খুব উপকারী নয়। মাঝে মাঝে আমি এত বেশী অবসন্ন হয়ে পড়তাম যে মনে হতো প্রেয়ারি-প্রেমের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়তো আমাকে এখানেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হতে হবে।

বিশ্রাম এবং পথ্য-সংযম করে দেখলাম। বেশ কিছুদিন আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই, অথবা বড়জোর আস্তে আস্তে ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে গিয়ে ওদের তাঁবুর উঠোনেই একটু পায়চারি করতাম। এতে সুবিধা হলো না ; আমি তখন ঠিক করলাম অনাহার পন্থা। পাঁচদিন আমি দৈনিক একটিমাত্র ছোট বিস্কিট খেয়ে রইলাম। ফলে তারপর আমি আগেকার চাইতে দুর্বল হয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু আমার অসুখটাও তেমনি বেশ একটু দুর্বল হয়েছে ; ফলে ক্রমে ক্রমে আমি পথ্যের কড়াকড়ি কমিয়ে দিলাম।

আমি আমাদের তাঁবুর সামনে অলসভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে স্বপ্নভরা চোখে শুয়ে থাকতাম অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে। অলস বিশ্রাম-সুখটা বেশ জমে এলে আমার দৃষ্টি চলে যেত সুদূর কালো পাহাড়ের দিকে। পর্বতমালায় নিহিত আছে কর্মশক্তির প্রেরণা, তাদের কাছে যারা চায় তারা পায়। সেসময় আমি জানতাম না ঐ কালো পাহাড়ের সারির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ানদের কত গভীর কুসংস্কার, কত কিংবদন্তী ; কিন্তু আমার মনে ঐকান্তিক কামনা জেগেছিল ঐ পাহাড়-গুলোর গভীর গহনে প্রবেশ করে ওদের রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হবার।

দ্বাদশ অধ্যায়

দুর্ভাগ্য

লারামি কেল্লা থেকে একজন ক্যানাডিয়ান এলো অদ্ভুত এক খবর নিয়ে। পাহাড় অঞ্চল থেকে সদ্য-প্রত্যাগত এক ফাঁদপাতা শিকারী মিজুরি অঞ্চলের এক পরিবারের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। এই পরিবারটি কেল্লার কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছিল অন্যান্য দেশান্তর-যাত্রীদের সঙ্গে।

সাহস যদি সুন্দরীর হৃদয়-জয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে রকি পাহাড় অঞ্চলের ফাঁদপাতা শিকারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য কোনো প্রেমিকের পেরে ওঠা শক্ত। এক্ষেত্রে প্রেমিকের প্রেম-নিবেদন ব্যর্থ হয়নি। প্রেমিকযুগল একটি ফন্দি বার করল, আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি কার্যকরী করবার চেষ্টাও করল। দেশান্তর-যাত্রী দলটি কেল্লা ছেড়ে গিয়ে এক রাতে একজায়গায় তাঁবু ফেলে যথারীতি পাহারাও রেখেছে ; মাঝরাতের কিছু পরে প্রেমিক শিকারীটি তাঁবুর কাছে এলো একটি জোয়ান ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে লাগাম ধরে আরেকটি ঘোড়া নিয়ে। দুটি ঘোড়াকেই একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে চুপিসাড়ে এমনভাবে ওয়াগনগুলোর দিকে এগিয়ে গেল যেন একদল মহিষের দিকে এগিয়ে চলেছে। পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে (তারা সম্ভবতঃ তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল) সে পূর্ব-বন্দোবস্ত অনুযায়ী তাঁবুর এলাকার ঠিক বাইরে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হলো, তারপর দু'নম্বর ঘোড়াটার পিঠে তাকে তুলে বসিয়ে দিল। তারপর তাকে নিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল। এ কাহিনীর পরবর্তী অংশ আমাদের কানে আসেনি ; আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি বাসগৃহরূপে ইণ্ডিয়ান তাঁবু আর স্বামিরূপে সেই ফাঁদপাতা শিকারীকে সেই সুন্দরী মেয়েটির কেমন লেগেছিল।

অবশেষে 'ঘূর্ণি-হাওয়া' এবং তার যোদ্ধারা এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করল। তাদের সমস্ত প্রস্তুতির পর তারা ঠিক করেছিল তারা লা বন্টি-র তাঁবুর মিলন-ক্ষেত্রে না গিয়ে কালো পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে যাবে এবং ওধারে পৌঁছে কয়েক সপ্তাহ মহিষ-শিকারে কাটিয়ে দেবে, যেপর্যন্ত না আগামী ঋতুতে থাকবার বাসগৃহ তৈরি করার, এবং বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করবার মতো যথেষ্ট মহিষ মারা হবে। এরপর তারা স্বতন্ত্র ছোট একটি যোদ্ধাদল পাঠাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে। তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

আমাদের একটু বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিল। ভাবলাম, আমরা যদি না বন্টি-র তাঁবুতে যাই, তাহলে এও অসম্ভব নয় যে অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র গ্রামের লোকদের মতো মত বদলে ফেলবে, ফলে ইণ্ডিয়ানদের যে সম্মেলন হবার কথা ছিল সেটি হবে না। আমাদের পুরাতন সঙ্গী রেনাল আমাদের বেশ পছন্দ করে ফেলেছিল, বিশেষ করে আমাদের দেওয়া বিস্কিট, কফি এবং অন্যান্য উপহারগুলোর জন্য। তার খুবই আগ্রহ ছিল যেন সে যে গ্রামের লোকদের সঙ্গে যাবে, আমরাও ঐ সঙ্গেই যাই। নির্ধারিত মিলন-কেন্দ্রে কোনো ইণ্ডিয়ান যাবে না, এবিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল। সে আরো বলল আমাদের গাড়ি আর মালপত্র কালো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। প্রকৃতপক্ষে আসল ব্যাপারের সে কিছুই জানত না। যে শক্ত আর গোপন পথ বেয়ে ইণ্ডিয়ানরা যাবে বলে ঠিক করেছিল, সে অথবা আমাদের সঙ্গের কোনো শ্বেতাঙ্গ কখনো সেই পথ দেখেনি। ঐ পথ দিয়েই আমি যখন পরে গিয়েছিলাম, তখন সরু গিরিপথের মধ্য দিয়ে—কখনো বা সে-পথে দিনের বেলাও আলো ঢোকে না—আমার ঘোড়া বেচারাকে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের গাড়িটা সহজেই 'পাইকের চূড়া'-র ওপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যেতো, কিন্তু আমরা সেটা জানতাম না, এবং মিলন-কেন্দ্রে পৌছবার চেষ্টা করতে গেলে অনেক অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কাজেই ঝোপের দুটো পাখির চাইতে যে-পাখিটা হাতেই রয়েছে সেটাই ভালো, প্রবাদোক্ত এই নীতিরই কথা মনে রেখে আমরা ঠিক করলাম গ্রামের লোকদেরই সঙ্গে যাবো।

১লা জুলাই দুটি তাঁবু—একটা ইণ্ডিয়ানদের, একটা আমাদের—ভোরবেলাই তুলে ফেলা হলো। আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এক চামচ করে হুইস্কি পান করেই আমি যাত্রাপথে দুর্বল শরীর নিয়েও ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পেরেছিলাম। আমাদের সামনে আধা মাইল আর পিছনদিকে আধা মাইল প্রেয়ারি অঞ্চল জুড়ে চলেছিল ইণ্ডিয়ানদের মিছিল। ডাইনে বাঁয়ে অনুর্বর সমতল-ভূমি, আর সামনে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে খাড়া, উঁচু, কালো পাহাড়। আমরা আমাদের সামনের ইণ্ডিয়ানদের বিচ্ছিন্ন সারির একেবারে প্রথমদিকে এগিয়ে গেলাম; যাবার পথে অতিক্রম করে গেলাম অনেক বোঝাই-করা ডুলি, পিঠে বোঝা নিয়ে মালবাহী ঘোড়া, পায়ে-চলা পথে শীর্ণকায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, আর ঘোড়ার পিঠে বসা হাসিমুখ ইণ্ডিয়ান যুবতী। তাছাড়া ছোট ছোট অনেক ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছিল সেই মিছিলের ভিড়ে, বুড়োরা তাদের সাদা মহিষ-চর্মের পোশাক পরে হেঁটে চলেছিল, আর তরুণ যোদ্ধারা চলেছিল তাদের সবচেয়ে ভালো ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে।

হেনরি শ্যাটিলন পিছনদিকে প্রেয়ারির এক সুদূর অংশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল একজন ঘোড়সওয়ার আসছে সেই দূর থেকে। সত্যিই লক্ষ্য করলাম সুদূরে একটি উঁচু জায়গায় একটি ছোট্ট বিন্দু ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে দেয়ালের ওপর একটা মাছির চলার মতো। কাছে আসতে আসতে সেটা ক্রমেই বড় হতে লাগল।

হেনরি বলল, "শ্বেতাঙ্গ বলেই মনে হচ্ছে ওর ঘোড়ায় চড়বার ভঙ্গিটা দেখে। ইণ্ডিয়ানরা কখনো ওভাবে ঘোড়ায় চড়ে না। হ্যাঁ, ওর বন্দুকটা রয়েছে জিনের সামনের দিকে।"

ঘোড়সওয়ারটি প্রেয়ারির একটি খাদে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কিছুক্ষণ পরেই তাকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। লোকটি ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তার লম্বা চুল হাওয়ায় উড়ছিল তার পিছন-দিকে, মুখখানা লাল, পরনে তার পুরোনো হরিণের চামড়ার জামা। লোকটিকে ফাঁদপাতা শিকারী গিংগ্রাস বলে চিনতে পারলাম। সে সদ্য এসেছে লারামি কেল্লা থেকে, আমাদের জন্য একটি বার্তা নিয়ে। বাইসনেট নামে এক ব্যবসাদার—হেনরির অন্যতম বন্ধু—সম্প্রতি উপনিবেশ থেকে এসেছে ; তার ইচ্ছা সে কোনো পুরুষ-দলের সঙ্গে লা বন্টি-র শিবিরে যেতে চায়। গিংগ্রাস বলল সেখানে দশ-বারোটি গ্রামের ইণ্ডিয়ান গিয়ে নিশ্চয়ই একত্রিত হবে। বাইসনেট ইচ্ছা জানিয়েছে আমরা যেন সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হই, আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমরা যখন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাবো, তখন তার লোকেরা আমাদের ঘোড়া আর মালপত্রগুলো পাহারা দেবে। শ আর আমি আমাদের ঘোড়া থামিয়ে পরামর্শ করলাম, তারপর এক কুক্ষণে ঠিক করলাম আমরা যাবো।

বাকি দিনটা আমরা আর ইণ্ডিয়ানরা এক পথেই চললাম। এক ঘণ্টার ভেতরেই আমরা এলাম এমন জায়গায় যেখানে অনুর্বর, উঁচু প্রেয়ারি শেষ হয়ে গিয়ে হঠাৎ খাড়া উৎরাই শুরু হয়েছে। এই খাড়াইয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাদের নীচে দেখতে পেলাম এক মস্ত ময়দান। ময়দানের বাঁ দিকে লারামি খাঁড়ি বয়ে চলেছে অগভীর খরস্রোতে ঠিক আমাদের নীচের ছায়ায় ছায়ায়। আমরা ঘোড়ার পিঠে বসে দেখতে লাগলাম, আর ইণ্ডিয়ানদের ঐ বিরাট মিছিল উৎরাই বেয়ে নেমে গিয়ে নীচের ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল। উৎরাই যেখানে শুরু হয়েছে, সেই কিনারায় বসে কয়েকজন প্রবীণ বয়স্ক যোদ্ধা গম্ভীরভাবে ধূমপান করতে করতে সেই বিরাট, জীবন-চঞ্চল দৃশ্য দেখছিল, কিন্তু তাতে তাদের মুখের ভাবে কোনোরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল না।

স্রোতের কিনারায় বৃত্তাকারে ইণ্ডিয়ানদের কতকগুলো তাঁবু খাটানো হয়ে গেল। আমরা একটু নিরালায় থাকবার জন্য আধ মাইল দূরে কতকগুলো গাছের আড়ালে আমাদের তাঁবু ফেললাম। বিকালবেলা আমরা ছিলাম ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। দিনটা ছিল চমৎকার, ইণ্ডিয়ানরা সবাই উজ্জ্বল দিনের প্রাণশক্তির পরশ পেয়ে আনন্দরসে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর যুবতীরা তাঁবুগুলোর বাইরে হাসির হুল্লোড়ে মেতে ছিল। যার যার ঘরের সামনে লম্বা ত্রিপদ থেকে ঝুলানো ঢাল, বল্লম আর ধনুকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। যোদ্ধারা যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে একজন একজন করে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে রওনা হয়ে গেল আশে-পাশের পাহাড়গুলোর দিকে।

শ আর আমি বসে ছিলাম রেনালের তাঁবু-ঘরের সামনে ঘাসের ওপর। এক বৃদ্ধা খাঁটি ইণ্ডিয়ান আতিথেয়তার সঙ্গে একপাত্র সেদ্ধ-করা হরিণের মাংস এনে আমাদের সামনে রাখল। কয়েকটি ইণ্ডিয়ান তরুণী বধূ একটি তাঁবুর ভেতরে বাইরে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলছিল, সে দৃশ্য আমরা বেশ উপভোগ করলাম। হঠাৎ পাহাড়ের দিক থেকে এক বিকট রণহুঙ্কার ভেসে এলো আমাদের কানে। পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুতবেগে নেমে একদল ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর দিকে; তাদের লম্বা চুলগুলো চলন্ত জাহাজের নিশানের মতো তাদের পিছনদিকে হাওয়ায় উড়ছিল। কাছাকাছি এসেই তাদের এলোমেলো ভিড় শৃঙ্খলাবদ্ধ হলো; দুজন দুজন করে এসে তারা এলাকাটাকে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল। ঘোড়ায় চড়ে এগোতে এগোতে তারা সবাই যে যার যুদ্ধের গান গাইছিল। এদের সাজসজ্জার কয়েকটি জিনিস ছিল অপরূপ। তাদের মাথায় ছিল পালকের চূড়া, আর পরনে কৃষ্ণসার-চর্মের আঁটসাঁট জামা, সেই জামা থেকে ঝালরের মতো ঝুলছিল তাদের শত্রুদের মাথার খুলি-সংলগ্ন চুলের গোছা। তাদের ঢালগুলোর ভেতরও অনেকগুলিতে যুদ্ধ-ঈগলের পালক লাগানো। প্রত্যেকের পিঠে ঝুলানো ছিল তীর আর ধনুক; কারও কারও হাতে ছিল লম্বা বল্লম। অল্প কয়েকজনের হাতে বন্দুকও ছিল। আগন্তুকদের নেতা, 'সাদা ঢাল', ছিল সবার আগে, একটা সাদা-কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে। এই মিছিলে যোগ দিল না মাহ্‌তো-তাতোঙ্কা আর তার ভায়েরা, কারণ তখন তাদের ভগ্নীর মৃত্যু শোকের মেয়াদ চলছে। তারা বসে ছিল তাদের ঘরে ঘরে; প্রত্যেকের দেহে আপাদমস্তক সাদা কাদার প্রলেপ-বুলানো, আর প্রত্যেকের কপাল থেকে একগুচ্ছ চুল কেটে নেওয়া হয়েছে।

যোদ্ধারা ইণ্ডিয়ানদের 'গ্রাম'টিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। একজন একজন

করে নামকরা বীর পাশ দিয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীরা উচ্চস্বরে তার নাম বলে তার সাহসের প্রশংসা করে নবীন যোদ্ধাদের উৎসাহিত করছিল এই বীরদের আদর্শ অনুসরণ করতে। ছোট্ট শিশুগুলো—বয়স দু'বছরেরও কম—সগর্ব শ্রদ্ধাভরা চোখে তাদের গোষ্ঠীর বীরপুরুষদের এই সামরিক কুচকাওয়াজ দেখছিল।

যোদ্ধাদের এই মিছিল গ্রামের ভেতর যেমন প্রবেশ করেছিল তেমনিভাবেই বেরিয়ে গেল গ্রামের বাইরে। তারপর আধ ঘণ্টার ভেতর প্রত্যেকটি যোদ্ধাই আবার ফিরে এলো এককভাবে, অথবা দুজন-তিনজন করে।

এরপর আমরা ইণ্ডিয়ান ঘরোয়া জীবনের একটি বিচিত্র নমুনা দেখে কৌতুক উপভোগ করলাম। একটি দজ্জাল চেহারার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক রেগে আগুন হয়ে তার স্বামীকে ধম্‌কেই চলেছিল, আর স্বামীটি সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে আসনপিঁড়ি হয়ে ঘরের মাঝখানে বসে চুপচাপ পাইপের ধূমপান করছিল। পতি-দেবতার এই পরম নির্লিপ্ততা দেখে স্ত্রীলোকটি ক্ষেপে উঠে তাঁবুর দিকে ছুটে গিয়ে তাঁবুটি যে-খুঁটিগুলির ওপর খাড়া ছিল সেগুলোর একটির পর একটিকে ধরে এমন জোরে টান মারল যে গোটা তাঁবুটাই হুড়মুড় করে স্বামী বেচারার মাথার ওপরে নেমে এলো, সবকিছুর স্তূপের তলায় চাপা পড়ল বেচারা। লোকটি তাঁবুর চামড়ার ছাউনি দু'হাতে ঠেলে তার ফাঁক দিয়ে এমনভাবে মুখ বার করল যেন একটা কচ্ছপ তার খোলার মধ্য থেকে মুখ বার করেছে। এরপরও সে আগের মতোই গম্ভীরভাবে বসে বসে ধূমপান করতে লাগল; শুধু তার দু'চোখের আগুনঝরা দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে সে কী ভীষণ রাগ চেপে রয়েছে। স্ত্রীলোকটি সারাক্ষণ স্বামীকে ধম্‌কাতে-ধম্‌কাতেই নিজের ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে তার ওপর চড়ে বসল আর টগ্‌বগ্‌ করে ঘোড়া ছুটিয়ে শিবিরের বাইরে চলে গেল; মনে হলো সে তার বাপের বাড়ি যাবার মতলব করেছে। যোদ্ধা লোকটি এতক্ষণ এই স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়েও দেখেনি; এইবার সে ধীরে ধীরে খুলে-পড়া তাঁবুর বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে পড়ল, তার মহিষ-শিকারের ঘোড়াটার মুখে লাগামের মতো করে একগাছা চুলের দড়ি পরিয়ে নিল, তাঁবুর একটা খুঁটি চট্ করে ভেঙে চার ফুট লম্বা একটা লাঠি বানিয়ে নিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে চলল অপরাধিনী গৃহিণীকে শায়েস্তা করতে।

পরদিন ভোরে সূর্য উঠতেই মাঠের ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম ইণ্ডিয়ানরা তাদের তাঁবুগুলো খুলে ফেলে চলে যাবার তোড়জোড় করছে। তারা যাত্রা করল পশ্চিম দিকে। আমরা আমাদের তিনজন লোক নিয়ে উত্তর দিকে রওনা

হলাম, আমাদের পিছনে পিছনে এলো সেই চারজন ফাঁদপাতা শিকারী, মোরিনের ইণ্ডিয়ান পরিবারের সঙ্গে। আমরা রাত পর্যন্ত ভ্রমণ করলাম, তারপর কতকগুলো গাছের মধ্যে একটি ছোট্ট নদীর ধারে তাঁবু ফেললাম। এই তাঁবুতে পরের দিনটা পুরোপুরি আমরা অপেক্ষা করে রইলাম বাইসনেটের জন্য ; কিন্তু বাইসনেট এলো না। এখান থেকে দুজন ফাঁদপাতা শিকারী আমাদের ছেড়ে রওনা হয়ে গেল রকি পর্বতমালার দিকে। এরপর দ্বিতীয় ভোরবেলায় বাইসনেটের আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে আমরা আবার চলা শুরু করলাম, এগিয়ে চললাম এক জনহীন, নিরানন্দ, একঘেয়ে, রৌদ্রদগ্ধ সমতলভূমির ওপর দিয়ে, যেখানে অন্য কোনো জীবিত প্রাণী দেখতে পাওয়া গেল না, শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ-ছুটে-আসা কৃষ্ণসার ছাড়া। দুপুরবেলা আমরা একটি অভিনব নয়নমোহন দৃশ্য দেখতে পেলাম: 'ঘোড়ার-নাল খাঁড়ি' (Horseshoe Creek) নামে একটি ছোট্ট নদীর তীরে তীরে সুন্দর একসারি গাছ। তারা একটির থেকে আরেকটি বেশ দূরে দূরে ; তাদের ঘন-সন্নিবিষ্ট ডালপালাগুলো চারদিকে ছড়ানো, আর নীচে লম্বা লম্বা ঘাসের ঐশ্বর্য। স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতটি বনস্থলীর মধ্য দিয়ে সাদা বালুর বিছানার ওপর দিয়ে উজ্জ্বলভাবেই বয়ে চলেছিল, তারপর পাতায় ঢাকা গভীর খাদের মধ্য দিয়ে যাবার সময় অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছিল। আমি বিশ্রী-রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই মাটিতে দেহ এলিয়ে দিলাম অবসন্নভাবে। আমার তখন নড়াচড়া করবার শক্তি নেই।

ভোরবেলা অপূর্ব রূপ নিয়ে সূর্য উঠে চারিদিকের বন্য পরিবেশটিকে আমোদিত করে তুলল। আমরা এগিয়ে গেলাম, অচিরেই আমাদের ঘিরে ফেলল আমাদের চারধারে উঁচু, নগ্নশীর্ষ পাহাড়ের সারি। তাদের চূড়া থেকে গোড়া পর্যন্ত নানা-রকমের ক্যাক্টাস গাছ দেখে দূর থেকে মনে হচ্ছিল ওরা যেন পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে-থাকা সরীসৃপ। আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ ভূমি, সমতল আর শক্ত, তার বুকে একটু ঘাসের চিহ্নও নেই। একসারি উঁচু কদাকার গাছ আমাদের সম্মুখ-দৃষ্টিকে সীমিত করে দিয়েছিল। কোনো মানুষ বা মানবেতর প্রাণীর চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঐ গাছের পিছনেই ছিল আমাদের পরম-বাঞ্ছিত মিলন-কেন্দ্র, যেখানে হাজার হাজার ইণ্ডিয়ান এসে সমবেত হয়েছে দেখতে পাব বলে আশা করেছিলাম। চোখ আর কান সম্পূর্ণ সজাগ রেখে আমরা যথাসাধ্য দ্রুতবেগে এগিয়ে চললাম, আর ঘোড়াগুলোকে জোর করে গাছের সারির ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিলাম। গাছের সারির ওধারে কতকগুলি ছোট ছোট জঙ্গল ছিল ; তাদের মধ্য দিয়ে একটি সরু, অগভীর স্রোত বয়ে চলেছিল। আমরা গাছের

ডালপালা সরিয়ে পথ করে এগিয়ে চললাম, আর মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে হরিণ লাফিয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে আমরা আরেকটি প্রেয়ারি সামনে দেখতে পেলাম। এ প্রেয়ারির বুকে তাঁবু ছিল না, লোকজন ছিল না, আমাদের সম্মুখে শুধু এক ধুধু প্রান্তর দূর—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার ওপর গাছ নেই, ঝোপঝাড় নেই, জীবনের কোনো সাড়া নেই। আমরা রাশ টেনে ঘোড়া থামালাম, আর আমেরিকার সমগ্র আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে আমাদের মনের ভাবটা হাওয়াকেই শুনিয়ে মনের ঝাল মেটালাম। আমাদের এই ভ্রমণ একেবারেই ব্যর্থ হলো ; ব্যর্থ বললেও কম বলা হয়। আমি তো ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম, কারণ এটা বেশ ভালো করেই জানতাম আমার অসুখটা একটু বেড়ে উঠলেই আমার এই ভুলটুকু শুধরে নেওয়া অসম্ভব হবে, আর তারই ফলে আমি যে উদ্দেশ্যে এই তিন-চার হাজার মাইল এত কষ্ট সহ্য করে অতিক্রম করে এলাম তা ব্যর্থ হবে।

ইণ্ডিয়ানরা তখন কোথায় ছিল? তারা তখন বহু সংখ্যায় একসঙ্গে জড়ো হয়ে ছিল প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একজায়গায়, আর সেখানে একটানা চলেছিল তাদের রণ-নৃত্য। লা বণ্টি-র তাঁবুর আশেপাশে মহিষ খুব কম দেখা যায়, অতএব খাদ্যসংগ্রহ সেখানে কঠিন হবে ভেবেই বোধ হয় তারা সেখানে জড়ো হয়নি ; কিন্তু এসব আমরা জানতে পেরেছিলাম কয়েক সপ্তাহ পরে।

শ তার ঘোড়াকে চাবুক মেরে দ্রুতবেগে ছুটিয়ে এগিয়ে চলল। তার চাইতে আমি চটেছিলাম অনেক বেশী, কিন্তু ওভাবে মেজাজ দেখাবার মতো শরীরের অবস্থা আমার ছিল না, আমি একটু ধীর গতিতেই তার পিছনে পিছনে চললাম। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একটি নিরালা বুড়ো গাছের কাছে, একমাত্র সে-জায়গাটাই তাঁবু ফেলবার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হলো। সে-গাছের ডালগুলোর ভেতর আদ্ধেকই মরা, আর বাকিগুলোতেও পাতা এত অল্প যে গাছের তলায় ছায়া পড়ছিল অতি সামান্য। গাছের গুঁড়ির যে একফালি ছায়া পড়েছিল তাইতে আমাদের জিনগুলো ফেলে তার ওপর আমরা বসে পড়লাম। মনের রাগ মনেই চেপে রেখে আমরা এক ঘণ্টা কিংবা তারও বেশী সময় বসে বসে ধূমপান করতে লাগলাম, ছায়ার জায়গা বদলের সঙ্গে সঙ্গে জিনগুলিরও জায়গা বদল করে করে, কারণ রোদের ঝাঁজটা তখন অসহ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিকারী ইণ্ডিয়ানদের কথা

অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম লা বন্টি-র শিবিরে, যার দিকে এতদিন ধরে আমাদের লক্ষ্য ছিল। দিনের ভেতর যতগুলো বিশ্রী সময় ছিল, তাদের ভেতর সেদিন সবচেয়ে অসহ্য ছিল দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টা। আমি সেই গাছটির তলায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এরপর কী করা উচিত। দেখলাম ছায়াগুলোও যেন অচল হয়ে রয়েছে, সূর্যও যেন আকাশের একজায়গায় এসে আটকে গেছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগলাম বন থেকে বাইসনেট আর তার লোকদের বেরিয়ে আসতে দেখব। শ আর হেনরি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিল এখানকার আশেপাশের জায়গাগুলো ভালো করে দেখেশুনে আসতে; তারা যখন ফিরে এলো তখন সূর্য অস্ত যায়-যায়। তাদের মুখে খুব আনন্দের ভাব দেখলাম না, যে খবর তারা দিল তাও খুব আনন্দদায়ক নয়।

শ বলল, "আমরা এখান থেকে দশ মাইল দূরে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে উঁচু জায়গা-গুলোতে উঠেও একটিও মহিষ বা একটিও ইণ্ডিয়ানের দেখা পেলাম না। আমাদের চারদিকে কুড়ি মাইল জুড়ে শুধু একটানা প্রেয়ারিভূমি।"

গিরিপথের চড়াই উৎরাই বেয়ে ওঠানামা করে হেনরির ঘোড়া খোঁড়া হয়ে পড়েছিল, শ-ও দেখলাম খুবই শ্রান্ত।

সেই সন্ধ্যায় খাওয়ার পর যখন আগুন ঘিরে বসলাম, আমি প্রস্তাব করলাম বাইসনেট এসে পৌঁছায় কিনা দেখবার জন্য আরো একটা দিন অপেক্ষা করা যাক, আর সে যদি না আসে তাহলে গাড়ি আর মালপত্র সহ ডেস্‌লরিয়ার্সকে লারামি কেল্লায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, আর আমরা 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র গ্রামের লোকেদের ধরতে চেষ্টা করব ওরা যখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে আমার যে উৎসাহ ছিল, শ-র তা ছিল না, আমার এই পরিকল্পনা তাই তার মনঃপুত হলো না। আমি তাই একাই যাওয়া ঠিক করলাম। এ সিদ্ধান্তটা করলাম একটু অনিচ্ছুক ভাবেই, কারণ জানতাম আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে আমার এই একক যাত্রা বেশ কষ্টদায়ক আর বিপজ্জনক হবে। আশা করতে লাগলাম পরদিনই বাইসনেট এসে পড়বে, আর সঙ্গে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করে আনবে

যা থেকে আমরা পথ-নির্দেশ পাবো, ফলে আমার উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সহজেই সিদ্ধ হয়ে যাবে।

আমার অনুপস্থিতিতে দলের লোকদের খাদ্যসংগ্রহের জন্য হেনরি শ্যাটিলনের বন্দুক দরকার ছিল। আমি তাই রেমণ্ডকে ডাকলাম, ডেকে তাকে বললাম আমার সঙ্গে রওনা হবার জন্য তৈরি হতে। রেমণ্ড শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গাড়ির তলায় তার বিছানায় চলে গেল। মোটাসোটা ভারী শরীর এই লোকটির চওড়া মুখে নিরেট বোকামি আর নিজের বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থার ভাব। ওর ভেতর কয়েকটি ভালো গুণও ছিল; 'লোকটি ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত, বিপদকে একেবারেই ভয় করত না, আর ওর একটা অদ্ভুত সহজ ক্ষমতা ছিল যার ফলে অনেক পাকা মাথা যেখানে হার মেনে যেতো সেখানে ওর সিদ্ধান্তটাই ঠিক হতো। এছাড়াও লোকটি বন্দুক ব্যবহার করতে আর ঘোড়া বেঁধে রাখতে খুব ভালো পারত।

পরদিন সারাক্ষণ ভীষণ রোদে জ্বালাতন হলাম। সেই রোদের তাপে মনে হতে লাগল দূরে নীল প্রেয়ারি অঞ্চল যেন কাঁপছে। আমাদের ইণ্ডিয়ান সহযোগীদের তাঁবু যেন সূর্যের প্রখর তাপে ভাজা-ভাজা হতে লাগল, আর গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আমাদের বন্দুকগুলিও গরম হয়ে উঠল। সারা শিবির জুড়ে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল, সে-নীরবতা মাঝে মাঝে ভঙ্গ করল শুধু মশাদের ভন্‌ভন্‌। পুরুষেরা গাড়ির তলায় উপুড় হয়ে বাহুর ওপর কপাল রেখে ঘুমোচ্ছিল। ইণ্ডিয়ানরা জড়ো হয়ে ছিল তাদের তাঁবুর ভেতরদিকে; শুধু এক নববিবাহিত দম্পতি একসঙ্গে বসে ছিল মহিষ-চর্মের পোশাকের চাঁদোয়ার তলায়, আর এক বুড়ো, রোগা, হাড্ডিসার ভেল্‌কি-ওয়ালা একটা উঁচু মাচানের ওপর বসে ছিল যেমন করে শিকারী পাখি কোনো পুরোনো গাছের মরা ডালের ভেতর বসে ওৎ পেতে থাকে তার শত্রুদের জন্য। আমাদের খাওয়া শেষ হলে পর শ তার ঘোড়ায় জিন পরাল। বলল, "আমি এখন হর্স-শু খাঁড়িতে ফিরে যাবো। গিয়ে দেখে আসব বাইসনেট সেখানে আছে কিনা।"

আমি বললাম, "আমি তোমার সঙ্গে যেতাম। কিন্তু আমার শক্তি যা আছে যথাসম্ভব সঞ্চয় করে রাখতে হবে।"

শেষ হয়ে গেল অপরাহ্ণবেলা। আমি আমার বন্দুক আর পিস্তলগুলো পরিষ্কার আর যাত্রা শুরু করার জন্য অন্যান্য কাজগুলো সেরে রাখতে লাগলাম। রাত গভীর হতে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে আমি সে-রাতের মতো শুয়ে পড়লাম ঘোড়ার জিনের ওপর মাথা রেখে। শ তখনো ফিরে আসেনি, কিন্তু তাতে আমরা কোনোরকম অস্বস্তি

বোধ করলাম না, ধরে নিলাম সে বাইসনেটের সঙ্গে জমে গেছে, রাতটা ওখানেই কাটিয়ে আসবে। গত দু-একদিনের ভেতর আমার স্বাস্থ্য আর শক্তির খানিকটা উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু মধ্যরাতের কাছাকাছি একটা ব্যথা উঠে আমার ঘুম ভেঙে গেল, তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে পারলাম না। প্লাট নদীর প্রশস্ত বুকে কাঁপছিল চাঁদের প্রতিবিম্ব ; রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল শুধু একরকম মৃদু, রহস্যময় শব্দ, অনেকটা ফিস্‌ফিস্ কথা আর পদশব্দের মতো—যারা মরুভূমিতে বা অরণ্যে একা রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা এ শব্দের সঙ্গে পরিচিত। আমি যখন আবার ঘুমিয়ে পড়বার মুখে, তখন কিছুদূর থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে আবার জেগে উঠলাম। দ্রুত পদধ্বনি এগিয়ে এলো তাঁবুর দিকে, তারপর দ্রুতবেগে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করল শ, তার হাতে বন্দুক।

কনুইয়ের ওপর ভর করে উঠে বললাম, "তোমার ঘোড়া কোথায় ?"

শ বলল, "হারিয়ে গেছে। ডেস্‌লরিয়ার্স কোথায় ?"

কম্বল আর মহিষ-চর্মের পোশাকের একটা স্তূপের দিকে দেখিয়ে বললাম, "ঐ যে।"

শ তখন বন্দুকের কুঁদা দিয়ে ঐ স্তূপে একটু ঠেলতেই আমাদের বিশ্বস্ত ক্যানা-ডিয়ানটি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল।

শ বলল, "ডেস্‌লরিয়ার্স, আগুনটাকে নাড়া দিয়ে একটু চাঙ্গা করে তোলো। আমাকে কিছু খেতে দাও।"

প্রশ্ন করলাম, "বাইসনেট কোথায় ?"

"ভগবান জানেন। হর্স-শু খাঁড়িতে কেউ নেই।"

আমরা দু'দিন আগে যেখানে তাঁবু ফেলেছিলাম, শ চলে গিয়েছিল সেইখানে। সেখানে আমাদের অগ্নিকুণ্ডের ছাই ছাড়া আর কিছু না পেয়ে সে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নদীর জলে নাইতে নেমেছিল। হঠাৎ কিসে ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠে ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে পালাল, দু'ঘণ্টা চেষ্টা করেও শ ঘোড়াটাকে আর ধরতে পারল না। অগত্যা সেই বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে শ পায়ে হেঁটে আবার আমাদের দিকে রওনা হলো। তার বিপদসঙ্কুল পথের বেশীর ভাগই ছিল অন্ধকারে ঢাকা, আর পায়ের জুতো-জোড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে পা-দুটিরও বিশ্রীরকম ছাল উঠে গিয়েছিল। যাই হোক, সে বেশ অবিচলিতভাবেই খেতে বসল, তার স্বাভাবিক প্রশান্ত মেজাজ এই সাম্প্রতিক দুর্গতিতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি ; আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে শ-র শেষ যে ছবিটি মনে আছে, তাতে শ আগুনের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পাইপ টানছে।

আবার যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন হাওয়ায় একটা নতুন ভেজা-ভেজা গন্ধ, প্রেয়ারির বুকে ধূসর গোধূলির রং ছড়ানো, আর তার পশ্চিম সীমান্তে দিগন্তরেখার ওপর আকাশ অল্প অল্প লাল হয়ে উঠেছে। আমি আমাদের দলের লোকদের ডাকলাম, তারপর ভোরের অস্পষ্ট আলোয় আগুন ধরানো হলো আর কিছুক্ষণর মধ্যেই তৈরি হলো আমাদের ভোরের খাবার। আমরা একসঙ্গে খেতে বসে গেলাম সবুজ ঘাসের ওপর ; বেশ কিছুদিনের জন্য সেই খাওয়াই রেমণ্ডের আর আমার সর্বশেষ সভ্যজগতের খাবার খাওয়া।

"এইবারে ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো।"

আমার ছোট্ট ঘুড়ী, পলিন, কিছুক্ষণের ভেতর এসে খাড়া হলো আগুনের ধারে। সে যেমন দ্রুত তেমনি শক্ত অথচ ভদ্র। আমার পন্টিয়াক ঘোড়াটার বিনিময়ে এই ঘুড়ীটিকে পেয়েছিলাম পল ডোরিয়নের কাছ থেকে। সেই পলের নামানুসারেই ঘুড়ীটির নাম হয়েছিল পলিন। তার সাজটা ভোরবেলা প্রমোদ-ভ্রমণে যাবার মতো নয়। কালো, উঁচু জিনের সামনে ঝুলানো ছিল ভারী পিস্তল সমেত দুটি খাপ। এক-জোড়া জিনের থলে, শক্ত করে গুটানো একটি কম্বল, মহিষের চামড়ায় বাঁধা ইণ্ডিয়ানদের উপহারের একটি ছোট্ট পুঁটুলি, ময়দা-ভরা একটি চামড়ার থলি আর তার চেয়ে ছোট চামড়ারই তৈরী একটি চায়ের থলি—এসবই ছিল আমার ঘুড়ীটির জিনের পিছন-দিকে বাঁধা, আর তার গলার সঙ্গে বাঁধা একটি লম্বা টানা দড়ি। রেমণ্ডের ছিল একটা শক্তসমর্থ কালো অশ্বতর, তারও সাজসজ্জা ঐ একই রকম। আমরা আমাদের বারুদের খাপগুলোতে বারুদ ঠেসে নিয়ে যে যার বাহনের ওপর চড়ে বসলাম।

শ-কে বললাম, "১লা অগাস্টে তোমার সঙ্গে লারামি কেল্লায় দেখা করব।"

সে জবাব দিল—"অর্থাৎ যদি তার আগেই আমাদের দেখা না হয়। আমার মনে হয় দু-একদিনের মধ্যে আমি তোমাদের পিছু নেবো।"

শ ঠিক এই চেষ্টাই করেছিল। আর এ চেষ্টায় সে সফলও হতো, যদি তার এমন কতকগুলো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে না হতো, যার বিরুদ্ধে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তিও ব্যর্থ। আমি তাকে ছেড়ে যাবার দু'দিন বাদে সে গাড়ি আর মালপত্র সহ ডেস্‌লরিয়ার্সকে কেল্লায় পাঠিয়ে দিল, আর হেনরি শ্যাটিলনের সঙ্গে পর্বত অঞ্চলে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তার আগে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল প্রেয়ারির বুকের ওপর দিয়ে, তার ফলে প্রায় মুছে গিয়েছিল আমাদের চলার পথের চিহ্ন আর ইণ্ডিয়ানদেরও পথ-চিহ্ন। তারা পাহাড়ের পায়ের কাছে তাঁবু ফেলেছিল, কোন্‌দিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে। ভোরবেলা শ টের পেল 'বিষাক্ত আইভি' গাছের বিষক্রিয়া শুরু

হয়েছে এমনভাবে, যে ভ্রমণ করা তার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। সুতরাং তারা অনিচ্ছার সঙ্গে চলে গেল আবার লারামি কেল্লার দিকে। শ একটি সপ্তাহ ভীষণ অসুস্থ হয়ে রইল, তারপর আমি গিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন বাদে যোগ দিলাম।

এইবার আমার নিজের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। রেমণ্ড আর আমি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন করলাম, করে ঘোড়ায় চড়ে প্রেয়ারির ওপর পড়লাম, তারপর পাহাড়ের গায়ে বালুর খাদগুলো পেরিয়ে উঠে উঁচু সমতলভূমির ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। মনে হলো এইসমস্ত এলাকার ওপর যদি একটা বিরাট অভিসম্পাত থাকত, তাহলেও বোধ হয় এর চাইতে ছন্নছাড়া চেহারা এর হতে পারতো না। ভাঙা-ভাঙা হঠাৎ-উঁচু হঠাৎ-নীচু পাহাড়, গভীর খাদ, বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—সবকিছুই অগ্নি-ঝরানো সূর্যের তলায় অসহ্য একঘেয়ে সাদা রঙে চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছিল। গোটা দেশটাই এই ভীষণ উত্তাপে অসংখ্য ফাটলে ছেয়ে গেছে, সেই ফাটলগুলো আমাদের অগ্রগতিতে বিশ্রী বাধা সৃষ্টি করছিল। গিরিপথের দু'ধারে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালগুলি সাদা আর বিশ্রী, আর তার তলায় অনেকবার দেখতে পেলাম পদচিহ্ন এঁকে গেছে লোমশ ভালুকেরা, এ অঞ্চলে যাদের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী। পাহাড়ের মাথাগুলো ভীষণ শক্ত, আর তার ওপর ছোট ছোট অগুন্‌তি পাথরের টুকরো ছড়ানো। এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মরুভূমির একঘেয়েমির দিকে তাকিয়েও চোখকে একটু স্বস্তি দেবার মতোও কিছু ছিল না, এখানে সেখানে গিরিপথের ধারে দু-একটা পাইন গাছ ছাড়া। এদের এলোমেলো ডালপালাগুলো আগুনী-হল্‌কা-ভরা হাওয়ায় ছড়ানো ; তা থেকে ছড়ানো সুরভি নিউ ইংল্যাণ্ডের পাইন-শোভিত পর্বতমালার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তৃষ্ণায় আকুল হয়ে আমি কামনা করছিলাম সেই স্ফটিক-স্বচ্ছ তৃষ্ণার জল, যার উচ্ছল প্রাচুর্য উৎসারিত হয় আমাদের বহু পাহাড়ের বুক থেকে। কল্পনায় আমি যেন শুনতে পেলাম ছায়াঘন পাহাড়ের আড়ালে জলের কলকল ধ্বনি, দেখতে পেলাম পাহাড়ের গভীর গহনে সেই জল যেন চিক্‌চিক্ করছে, ফোঁটা-ফোঁটা পড়ছে পাহাড়ী ফাটলের গায়ের সবুজ শ্যাওলা বেয়ে।

দুপুরবেলা আমরা পেলাম একটি ছোট্ট স্রোতস্বিনীর তীরে কয়েকটি গাছ আর ঝোপ। এখানে আমরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলাম। তারপর সূর্য দেখে পথ চিনে-চিনে আমরা এগিয়ে চললাম ; সূর্যাস্তের ঠিক আগে আমরা এসে পৌছলাম আরেকটি স্রোতস্বিনীতে, এর নাম বিটার কটন-উড খাঁড়ি। এর তীরে কিছু কিছু ব্যবধানে কয়েকটি ঘন ঝোপ আর ঝড়-ঝাপ্‌টা-সওয়া গাছ। এরই একটি গাছের তলায় আমরা আমাদের ঘোড়ার জিনগুলো ফেলে রেখে ঘোড়াগুলোর সামনের পা দুটো ওজন-সুদ্ধ একসঙ্গে

বেঁধে ওদের মাঠে ছেড়ে দিলাম ঘাস খেতে। ছোট্ট স্রোতস্বিনীটি, যেমন পরিষ্কার তেমনি দ্রুত, সাদা বালুর ওপর দিয়ে যেন গান গেয়ে গেয়ে ছুটে চলতো। এরই অগভীর অংশগুলোতে ছোট ছোট পাখিগুলো জলে ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে তাদের পাখার আওয়াজে আর কণ্ঠের কলধ্বনিতে বাতাস ভরে তুলেছিল। সূর্য তখন লারামি পাহাড়ের পিছনে সোনালী আর লাল মেঘপুঞ্জের মধ্যে ডুবে যেতে শুরু করেছিল। আমি জলের কিনারায় একটা লম্বা কাঠের খণ্ডের ওপর শুয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে জলে ছোট ছোট মাছের চঞ্চল চলাফেরা দেখছিলাম। বলতেও অদ্ভুত লাগছে, ভোরের তুলনায় এখন নিজেকে অনেক বেশী সতেজ বলে মনে হলো, প্রায় বিশ্বাস হলো আমার আগেকার জোর যেন আমি ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছি।

আমরা আগুন জাললাম। রাত্রি এলো, সেই সঙ্গে ডাক শুরু করল নেকড়েরা। প্রথমে শুরু হলো একটি গভীর কণ্ঠস্বর, তার বিকট জবাব এলো চারিদিকের পাহাড়, সমতলভূমি আর বন থেকে। প্রেয়ারিতে এসব আওয়াজ কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না। আমরা আমাদের ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোকে বেঁধে রেখে ঘুম লাগালাম, পরদিন ভোরের আগে আর উঠলাম না। ভোরে উঠে জানোয়ারগুলোকে আবার ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম, প্রত্যেকের সামনের পা দুটি তেমনি একসঙ্গে বাঁধা। আমরা প্রাতরাশ খাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় রেমণ্ড আধ মাইল দূরে একটা কৃষ্ণসার দেখে বলল সে গিয়ে ওটাকে বন্দুক দিয়ে শিকার করবে।

আমি বললাম, "তোমার কাজ হচ্ছে আমাদের জানোয়ারগুলোর তদারক করা। আমি এত দুর্বল, যে ওদের কোনো কিছু হলে আমি কিছুই করতে পারব না। তোমাকে অতদূরে যেতে দেওয়া চলবে না; এই তাঁবুর আশেপাশেই তোমাকে থাকতে হবে।"

রেমণ্ড শপথ করল সে জানোয়ারদের তদারক নিশ্চয়ই করবে, তারপর বন্দুক হাতে নিয়ে রওনা হলো। আমার ঘুড়ী আর রেমণ্ডের অশ্বতরটি তার আগেই স্রোত পেরিয়ে ওপারে গিয়ে লম্বা ঘাসের ভেতর চরে বেড়িয়ে ঘাস খেতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে সবুজ মাথাওয়ালা বড় বড় মাছি তাদের বড় জ্বালাতন করছিল। তাদের দিকে নজর রাখতে রাখতে দেখলাম তারা একটা খাদে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট চলে গেল, তবু তাদের দেখা নেই। আমি তখন পায়ে হেঁটে স্রোত পেরিয়ে তাদের খুঁজতে গেলাম। বিরক্তি আর আতঙ্কভরা চোখে দেখলাম ওরা অনেক দূরে বেশ দ্রুতবেগেই ছুটে চলেছে। আগে আগে ছুটছে পলিন, তার পায়ের বেড়িগুলো ভেঙে গেছে, আর অশ্বতরটি বেড়ি দিয়ে আট্‌কানো পা নিয়েই অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে চলছে তার পিছনে পিছনে। আমি একবার বন্দুকের আওয়াজ করে

চীৎকার করে রেমণ্ডকে বললাম ফিরে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে রেমণ্ড স্রোত পেরিয়ে ছুটে এলো, তার মাথায় একটা লাল রুমাল জড়ানো। আমি পলাতকদের দিকে দেখিয়ে ওকে বললাম ওদের পিছনে ছুটতে। দাঁতে দাঁত চেপে একটা শক্ত দিব্বি দিয়ে বন্দুকটা হাতে দোলাতে-দোলাতেই রেমণ্ড ছুটে চলল যথাসাধ্য দ্রুতবেগে। আমি পায়ে হেঁটে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম, সেখান থেকে দূর প্রেয়ারির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পলাতক জানোয়ার দুটি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। তারপর আগুনের কাছে ফিরে গিয়ে আমি গাছতলায় বসে পড়লাম। ক্লান্তিতে আর উদ্বেগে কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার পিছনের গাছের গুঁড়ি থেকে গাছের একফালি ছাল আল্‌গা হয়ে হাওয়ায় দুলতে লাগল পাখির ডানা-ঝাপ্‌টানোর মতো, আর মশার দলও একঘেয়ে সুরে ভনভন করেই চলল; কিন্তু এছাড়া সেই সমগ্র জ্বলন্ত এলাকায় আর কিছু দেখতে বা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। সূর্য ক্রমেই উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগল, তারপর একসময় মনে হলো নিশ্চয় দুপুর হয়েছে। জানোয়ার-গুলোকে ফিরে পাওয়া যাবে বলে মনে হলো না। ভাবলাম ফিরে পাওয়া না গেলে আমার সমূহ বিপদ। শ-কে যখন ছেড়ে এসেছিলাম তখন সে ঠিক করেছিল সেই ভোরেই সে রওনা হবে, কিন্তু কোন্‌দিকে যাবে তা সে তখনো ঠিক করেনি। ওর খোঁজ করা সুতরাং বৃথা হবে। লারামি কেল্লা চল্লিশ মাইল দূর, আর এক মাইল হাঁটাও আমার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু তখনও দুঃসাধ্য বাধার কাছে নতিস্বীকার করতে শিখিনি, তাই প্রতিজ্ঞা করলাম, যা থাকে বরাতে, আমি ইণ্ডিয়ানদের অনুসরণই করতে থাকব। এছাড়া শুধু একটি মতলবই আমার মাথায় এলো যে রেমণ্ডকে কেল্লায় পাঠিয়ে দেবো আরো ঘোড়ার জন্য ফরমায়েশ সহ, আর আমি এখানেই থাকব তার ফিরে আসা পর্যন্ত; ফিরে আসতে তার হয়তো তিনদিন লাগবে। কিন্তু বিপজ্জনক ইণ্ডিয়ানে ভরা এলাকায় কোথাও একই জায়গায় একা তিনদিন থাকাটাও খুব সুবিধার ব্যাপার বলে মনে হলো না। তাছাড়া, এভাবে এখানে দেরি হয়ে গেলে ইণ্ডিয়ানদের যে জমায়েত দেখবার জন্য ছুটছি, আমার সেই প্রচেষ্টার ফলাফল কী হবে বলা শক্ত। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলাম। এদিকে আমাদের খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচ পাউণ্ড ময়দায়; কাজেই আমাকে শিকারের খোঁজে বেরোতে হলো তাঁবু ছেড়ে। চার-পাঁচটি কার্লিউ পাখি শুধু মাথার ওপর ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে প্রেয়ারির ওপর নেমে আসছিল; এছাড়া শিকার করবার আর কিছু চোখে পড়ল না। আমি তাদের দুটিকে গুলী করে বধ করলাম; তাদের নিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

একটি ছোট্ট কালো জিনিস, একটি মানুষের মাথার মতো, নীচে স্রোতের জলে ঘন ঝোপের মধ্য থেকে হঠাৎ একটু বেরিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সে-অঞ্চলে প্রত্যেক অপরিচিতই সম্ভাব্য শত্রু; আমি তাই সঙ্গে-সঙ্গেই ঐদিকে লক্ষ্য করে বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম। পরের মুহূর্তেই ঝোপটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল, আর দুটি মাথা বেরিয়ে এলো। সে দুটো মাথা মানুষের নয়; আমি মহা আনন্দে চিনে ফেললাম অশ্বতরের কালো মুখ আর পলিনের হল্‌দে মুখ। অশ্বতরটির সঙ্গে সঙ্গে এলো রেমণ্ড; তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চেহারা হয়েছে ঝোড়ো কাকের মতো আর তার বুকের ভেতরটা নাকি জলে যাচ্ছে। আমি জানোয়ার দুটির ভার নিলাম, রেমণ্ড স্রোতের ধারে হাঁটু গেড়ে বসল জল পান করবার জন্য। সে লারামি খাঁড়ির কোণ পর্যন্ত পিছু নিয়ে পলাতকদের চোখে চোখে রেখেছিল—সেই দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী। সেখানে গিয়ে বেশ কষ্ট করেই রেমণ্ড তাদের পাকড়াও করেছিল। তাকে নিরস্ত্র দেখে প্রশ্ন করলাম, "বন্দুক গেল কোথায়?" জানোয়ার দুটোর পিছনে ধাওয়া করতে বাধা জন্মাচ্ছিল বলে বন্দুকটা সে প্রেয়ারিতে একজায়গায় ফেলে রেখেছিল, ভেবেছিল ফিরবার পথে তুলে নিয়ে আসবে। কিন্তু ফিরবার পথে তা সম্ভব হয়নি। বন্দুকটা হারাবার ফল ভীষণ হতে পারত। যাই হোক, জানোয়ার দুটো ফিরে পাওয়ায় আমি ভীষণ খুশি হলাম, আর রেমণ্ডের বিশ্বস্ততার কথা ভেবেও। সে তো জানোয়ার দুটিকে নিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারত। আমাদের সঙ্গে যে একটি টিনের পাত্র নিয়ে এসেছিলাম তাইতে তাকে একটু চা তৈরি করে দিলাম, তারপর বললাম আবার যাত্রা শুরু করবার আগে বিশ্রাম করে নেবার জন্য তাকে দু'ঘণ্টা সময় দেবো। সেদিন সে কিছুই খায়নি; কিন্তু ক্ষুধাবোধ না থাকায় সে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বেছে বেছে সবচেয়ে ভালো ঘাসের জায়গায় জানোয়ার দুটিকে বাঁধলাম, আর কাঁচা কাঠে আগুন জ্বালালাম তাদের মাছির জ্বালাতন থেকে বাঁচাতে। তারপর আবার গাছের ধারে বসে দেখতে লাগলাম সূর্যের অতি মন্থর গতি, আর প্রতিমুহূর্তে বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম।

দু'ঘণ্টা হয়ে যেতেই রেমণ্ডকে জাগালাম। দুটি জানোয়ারের ওপর জিন চাপিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম। প্রথমেই গেলাম হারানো বন্দুকটির খোঁজে। ভাগ্য ভালো ছিল, ঘণ্টাখানেক খোঁজ করে বন্দুকটা পেয়ে গেলাম। তারপর চললাম পশ্চিম দিকে, অনেক চড়াই আর খাদ পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম কালো পাহাড় অভিমুখে। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ায় তাপটা একটু কম ছিল। হাওয়াটা অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধকর আর ঠাণ্ডা হয়ে উঠল, দূরের পাহাড়গুলোর চেহারা হলো বিষণ্ণতর, মৃদু

বজ্রনির্ঘোষ শোনা যেতে লাগল, আর ভাঙা-ভাঙা পাহাড়ের চূড়াগুলোর পিছনে জমে উঠতে লাগল পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘ। প্রথমে এই কালো মেঘের শাড়িতে রুপোলী পাড় যুগিয়েছিল বিকেলবেলার সূর্য, কিন্তু অচিরেই ঘন কালোয় সারা আকাশ ছেয়ে গেল, আমাদের চারিদিকে ধুধু-করা প্রান্তর ছেয়ে গেল বিষণ্ণ ধূসর অন্ধকারে। মেঘের গুরুগুরু গর্জনে এবং পাহাড় আর সমতলভূমির ওপর ছড়িয়ে-পড়া ছায়ায় ছিল আসাধারণ গভীর মর্মস্পর্শী গাম্ভীর্য। হঠাৎ আঁকাবাঁকা বিজলী-চমক আর বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় শুরু হলো। ঝড়টি যেন চীৎকার করতে করতে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে বয়ে চলল, আমাদের গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগিয়ে। চারদিকে তাকিয়ে রেমণ্ড প্রাকৃতিক নির্মম শক্তিগুলোকে অভিশাপ দিতে লাগল। কাছাকাছি কোনো আশ্রয় দেখা গেল না, কিন্তু অবশেষে আমরা দেখলাম প্রেয়ারির সমতলভূমি থেকে কেটে নেওয়া একটি গভীর খাত, আর উৎরাই বেয়ে নামবার সময় আদ্ধেক পথ নেমেই একটি পুরোনো পাইন গাছ, যার ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ডালপালাগুলির তলায় আমরা ঝড়ের দাপট এড়াবার একরকমের আশ্রয় পেলাম। চলনসই গোছের একটা রাস্তা পেয়ে আমরা সেই পথে আমাদের জানোয়ারগুলিকে নামিয়ে দিয়ে তলায় কয়েকটি বড় পাথরের খণ্ডের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখলাম। তারপর উঠে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে বুড়ো গাছটার তলায় জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলাম। আমার সময়ের হিসেব হয়তো তেমন ভালো নয়, কিন্তু আমার মনে হলো আমরা সেখানে পুরো একঘণ্টা বসেছিলাম, আর আমাদের চারধারে ঝরছিল বৃষ্টির বন্যা, যার মধ্য দিয়ে খাদের উল্টোদিকের পাথরগুলো অত্যন্ত ঝাপ্সা দেখাচ্ছিল। ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টা শীগ্গীরই কেটে গেল, কিন্তু বৃষ্টির ধারা ঝরতেই লাগল অবিরাম। শেষকালে রেমণ্ড অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, আর খাদ বেয়ে বেয়ে বেশ কষ্ট করেই উঠে গেল প্রেয়ারির সমতলে।

"আবহাওয়াটা কেমন দেখা যাচ্ছে?" গাছের তলা থেকে ওপরদিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম আমি।

রেমণ্ড বলল, "খুবই খারাপ। চারদিক অন্ধকার।" তারপর ধীরে ধীরে নেমে এসে আমার পাশে বসল। দশ মিনিট গেল।

আমি বললাম, "আরেকবার উঠে দেখে এসো।" সে আবার উঠে গেল। বললাম, "এখন কেমন দেখছ?"

সে বলল, "আগেকারই মতো। কেবল পাহাড়ের মাথায় একটু যেন আলোর আভাস।"

ইতিমধ্যে বৃষ্টির জোর কিছুটা কমেছে। খাদের তলায় গিয়ে আমরা জানোয়ার দুটিকে মুক্ত করলাম। ওরা তখন দাঁড়িয়ে ছিল হাঁটু-পর্যন্ত জলে। খাদের গা বেয়ে উঠে ওদের নিয়ে আমরা খাদের মুখ থেকে খোলা জায়গায় প্রেয়ারির ওপর এসে পড়লাম। আমাদের চারদিক ঝাপ্‌সা; কিন্তু পাহাড়ের ওপরকার আলোটা ক্রমশ আরো ছড়াতে আর আরো লাল হতে লাগল। অবশেষে মেঘগুলো ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এলো সূর্যালোকের বন্যা, খাড়া পাহাড়গুলোকে পাতলা নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে, যেমন রং দেখা যায় অ্যাপেনাইন পাহাড়ে কোনো বসন্তের অপরাহ্লবেলায়। মেঘগুলো দ্রুত ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কোনো যাদুকরের তাড়ায় পলায়মান অপদেবতাদের মতো। আমাদের চারদিকের সমতলভূমি যেন সূর্যের আলোয় হাসতে লাগল। সেই মরু অঞ্চলের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এক রামধনু, আর আমাদের সামনে অনেক দূরে একসারি গাছ যেন আমাদের জানাতে লাগল বিশ্রামের আমন্ত্রণ। আমরা গেলাম সেখানে, গিয়ে দেখি গাছ-গুলোতে ঝিক্‌মিক্‌ করছে রামধনু-রঙা বৃষ্টির বিন্দুগুলো, আর শোনা যাচ্ছে সংগীত-মুখর অনেক পাখির ডানা-ঝাপ্‌টানোর শব্দ। অদ্ভুত পাখাবিশিষ্ট কতকগুলো পতঙ্গ যেন বৃষ্টিতে আড়ষ্ট হয়ে গাছের পাতা আর ছালের সঙ্গে লেপ্‌টে ছিল।

রেমণ্ড অনেক কষ্টে একটু আগুন জ্বালল। জানোয়ার দুটো পরম আগ্রহে গিয়ে নরম সবুজ ঘাস খেতে শুরু করল। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে চারপাশের সান্ধ্য প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম। যে পাহাড়গুলোকে দূর থেকে বিষাদপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল, এখন দেখে মনে হলো তারা যেন স্নিগ্ধ প্রীতির হাসি হাসছে, আর সমতলের সবুজ ঢেউগুলি উষ্ণ সূর্যালোকে আনন্দে উদ্ভাসিত। সিক্ত, পীড়িত, ক্লান্ত আমি, তবু এ দৃশ্য দেখে আমার মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল, এই দৃশ্য থেকে আমি শুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম।

ভোর হতেই রেমণ্ড জেগে উঠল ভীষণ কাশতে কাশতে, যদিও সে কোনোরকম চোট পেয়েছে বলে মনে হয়নি। আমরা যে যার বাহনের পিঠে চেপে স্রোত পার হলাম, গাছের সারির মধ্য দিয়ে গেলাম, তারপর ওপরের সমতলভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হলাম। এবারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে আমরা লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম ইণ্ডিয়ানদের যাত্রার চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কিনা। এরই কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে ইণ্ডিয়ানরা গেছে, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু স্বল্প আর সঙ্কুচিত ঘাসগুলো মাত্র তিন-চার ইঞ্চি উঁচু, আর মাটিও এত শক্ত, যে বিরাট একটি কাহিনী এ পথ দিয়ে চলে গেলেও তাদের যাত্রার

কোনো চিহ্ন এখানে নাও থাকতে পারে। চড়াই উৎরাই বেয়ে, গিরিপথের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। একটি পাহাড়ের তলার দিক ঘেঁষে যেতে যেতে দেখলাম আমার কিছুদূর সামনে রেমণ্ড হঠাৎ লাগাম টেনে তার বাহনটিকে থামিয়ে নেমে পড়ল, আর একটা খাদের পথে ওপরদিকে ছুটে গেল। একটু পরেই শুনলাম বন্দুকের গুলীর আওয়াজ। পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা আহত কৃষ্ণসার এলো তিন-পায়ে ছুটতে ছুটতে। পলিনকে চাবুক মেরে আমি ঐ আহত কৃষ্ণসারটির পিছু নিলাম। আমার দ্রুতগামী ছোট্ট ঘুড়ীটা অচিরেই আমাকে ওর পাশে নিয়ে গেল। সে বেচারা আরো কয়েক মুহূর্ত পালাবার বৃথা চেষ্টা করে হতাশ হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। চক্‌চকে চোখ দুটি দিয়ে বেচারা আমার দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকাল যে আমি অসীম করুণা-মিশ্রিত মর্মযন্ত্রণার সঙ্গে তার মাথা ভেদ করে পিস্তলের গুলী চালালাম। রেমণ্ড তার ছাল ছাড়িয়ে দেহটাকে চার টুকরো করল, আমরা সেগুলোকে আমাদের জিনের দু'পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে চললাম। আমাদের খাদ্যসংগ্রহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এত তাড়াতাড়ি নতুন খাদ্য যোগাড় হয়ে যাওয়ায় আমরা দুজনেই আনন্দে উৎফুল্ল।

একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে আমরা আমাদের সামনের প্রেয়ারির দিকে তাকিয়ে দূরে ঝাপ্‌সা দেখতে পেলাম সারি সারি গাছ আর ছায়ায় ভরা ঝোপ, যারা লারামি খাঁড়ির গতিপথ চিহ্নিত করছে। দুপুরের আগেই আমরা সেই খাঁড়ির তীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, আর খুঁজতে লাগলাম ইণ্ডিয়ানদের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কয়েক মাইল পথ আমরা এই স্রোতের ধার দিয়ে অগ্রসর হলাম, কখনো ডাঙায়, কখনো বা জলের ওপর দিয়ে, প্রতিটি বালুচর আর কর্দমাক্ত নদী-তীরের ওপর নজর রাখতে রাখতে। এই সন্ধানী যাত্রায় আমরা এতদূর এগিয়ে গেলাম যে আমাদের সন্দেহ হতে লাগল হয়তো পদচিহ্ন পিছনে ফেলে এসেছি। অবশেষে শুনলাম রেমণ্ডের চীৎকার। দেখলাম সে তার অশ্বতরের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে স্রোতের ধারে মাটির ওপর কী যেন পরীক্ষা করছে। আমি চলে গেলাম তার পাশে। গিয়ে দেখলাম সে যা পরীক্ষা করছে সেটি হচ্ছে একটি ইণ্ডিয়ান জুতোর ('মোকাসিন') ছাপ। এতে উৎসাহিত হয়ে আমরা আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে গেলাম। অবশেষে একজায়গায় স্রোতের অনতিদূরে এক-জায়গার নরম মাটির ওপর কতকগুলো পদচিহ্ন পেলাম, তাদের কিছু কিছু বড় পায়ের, কিছু কিছু ছোট শিশুদের পায়ের। ঠিক সেইসময় রেমণ্ড দেখতে পেল স্রোতের ওধারে আরেকটি নদীর মুখ এসে মিশেছে দক্ষিণ দিক থেকে। সে

স্রোত পেরিয়ে ঐ মিলন-স্থানটিতে উপস্থিত হয়ে আবার চীৎকার করে উঠল। আমিও তখন স্রোত পেরিয়ে চলে গেলাম ওর পাশে। ঐ নতুন নদীটি ক্ষীণস্রোতা হলেও প্রশস্ত, আর তার দুই তীরে ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যায় না। দেখলাম রেমণ্ড মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তিন-চারটি ঘোড়ার পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে। আরেকটু এগিয়ে আমরা পূর্ণবয়স্ক লোকের, শিশুর এবং ঘোড়ার পায়ের ছাপ আরো দেখতে পেলাম। অবশেষে দেখলাম দু'পাশের ঝোপগুলোকে আঘাত করে করে ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করা হয়েছে, আর বালুর ওপরও অনেক পায়ের চিহ্ন। বালুর ওপর দিয়ে তাঁবুর বাঁশ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও রয়েছে। এবার নিশ্চিত হলাম ইণ্ডিয়ানদের যাত্রাপথটি ধরতে পেরেছি। দু'পাশে ঝোপ, তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম। একটু দূরেই প্রেয়ারির বুকে শ'-দেড়েক অগ্নিকুণ্ডের ছাই দেখতে পেলাম, আর ছড়ানো দেখলাম হাড়, মহিষ-চর্মের পোশাকের ছেঁড়া অংশ, ঘোড়া বেঁধে রাখবার খুঁটি ইত্যাদি। এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে আমরা সুবিধাজনক একটি গাছ বেছে নিলাম, তারপর আমাদের বাহন দুটিকে ঘাস খাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণসারের মাংসের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থায় লেগে গেলাম।

শরীরের ওপর দিয়ে এইসব ঝড়-ঝাপ্‌টা যাওয়ার ফলে আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোই হলো। লা বণ্টি-র শিবির ছেড়ে আসার পর আমার স্বাস্থ্য আর শক্তি দুয়েরই উন্নতি হয়েছিল। রেমণ্ড আর আমি পরমানন্দে একসঙ্গে আহার করলাম; আমরা একটু অসঙ্গতভাবেই ধরে নিলাম ইণ্ডিয়ানদের যাত্রাপথের এক মাথা যখন পেয়েছি, তখন অন্য মাথায় পৌঁছনো তেমন কঠিন হবে না। কিন্তু আমাদের জানোয়ার দুটিকে যখন ঘাস খাবার মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হলো, তখন বুঝলাম দুর্ভাগ্য তখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি। পলিনের পিঠে যখন জিন পরাচ্ছিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম তার চোখ-দুটি সীসার মতো নিষ্প্রভ, আর তার চামড়ার হল্‌দে রং বেশ লক্ষণীয়ভাবে কাল্‌চে হয়ে গেছে। আমি রেকাবে পা দিয়ে ওর পিঠে চড়বার চেষ্টা করতেই বেচারা মাথা ঘুরে কাত হয়ে পড়ে গেল। বেশ চেষ্টা করে উঠে সে আগুনের ধারে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে সাপে কামড়েছে, না, সে কোনো বিষাক্ত কিছু খেয়েছে, না, ওর হঠাৎ কোনোরকম অসুখ হয়েছে, বলা শক্ত ছিল; কিন্তু যাই হোক, ওর এই অসুস্থতাটা হলো ভারি খারাপ সময়ে, আর আমার পক্ষে সেটা একটা মস্ত দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমি তার পিঠে উঠতে পারলাম; তারপর খুব আস্তে আস্তে ইণ্ডিয়ানদের যাত্রাপথ ধরে আমরা অগ্রসর হলাম। ওদের যাবার চিহ্ন ধরে ধরে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠে তারপর এক বিষণ্ণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোতে

লাগলাম। এখানে এসেই ইণ্ডিয়ানদের রেখে-যাওয়া কোনো চিহ্নই আর দেখতে পেলাম না। এখানকার মাটি ভীষণ শক্ত ; এই শক্ত মাটির পাথুরে বুকে ইণ্ডিয়ানদের পায়ের বা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন যদি পড়েও থেকে থাকে, সেগুলো কালকের বৃষ্টি-বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে। ইণ্ডিয়ান গ্রামের লোকেরা তাদের বিশৃঙ্খল যাত্রার মিছিলে প্রেয়ারির ওপর প্রায় আধ-মাইল চওড়া জায়গায় ছড়িয়ে অগ্রসর হয়, কাজেই এদের ফেলে-যাওয়া চিহ্ন দেখে এদের গতিপথ অনুসরণ করা যেমন ক্লান্তিকর, তেমনি কঠিন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এক গজ বা তারও বেশী ব্যাস-বিশিষ্ট অনেকগুলো উইটিপি সমতলভূমির ওপর ইতস্তত ছড়ানো ছিল। তাদের অনেকগুলোই দেখলাম ভাঙা, আর তার ওপর পায়ের বা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন রয়েছে, কখনো বা তাঁবুর খুঁটির চিহ্ন। ঐভাবেই আঘাত-চিহ্নিত মনসাকাঁটার রসালো পাতাগুলোও আমাদের পথের নির্দেশ দিয়ে কিছু কিছু সাহায্য করতে লাগল। এইভাবে একটু একটু করে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম—কখনো পথের নিশানা হারিয়ে ফেলি, কখনো ফিরে পাই। সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পথের কোনো নিশানা নেই, কোন্দিকে যাব? আমাদের চারদিকে মাইলের পর মাইল সমতলভূমি, সামনে উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত ধূসর পাহাড়ের সারি। আমাদের ডান ধারে লারামি পাহাড় অন্যান্য পাহাড়ের চাইতে অনেক উঁচু। এই পাহাড়েরই একটি উপত্যকা থেকে ধীরে ধীরে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী উঠছে দেখতে পেলাম।

রেমণ্ড বলল, "আমার মনে হয় কিছু ইণ্ডিয়ান নিশ্চয় ওখানে আছে। আমরা গেলেই বোধহয় ভালো হয়।" কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা চট্ করে মেনে নেওয়ার মতো নয়, আমরা তাই ঠিক করলাম হারিয়ে-যাওয়া পথ-চিহ্নের সন্ধান আবার শুরু করব। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা এই শেষের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করেছিলাম কারণ এরপরে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে যে খবর পেয়েছিলাম তা থেকে এই বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ঐ ধোঁয়ার ফাঁদ পেতেছিল ক্রো-সম্প্রদায়ের যোদ্ধা-দল ; আমরা গেলে বিপদে পড়তাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, এবং ঐ পাহাড়ের তলার কাছাকাছি ছাড়া বন বা জল ছিল না। সুতরাং আমরা ঐদিকেই চললাম, লারামি খাঁড়ি যেখানটায় প্রেয়ারি অঞ্চলে এসে পড়েছে সেই স্থানটি লক্ষ্য করে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম পাহাড়ের তরুগুল্মহীন মাথাগুলিতে তখনো সূর্যের আলো লেগে আছে। ছোট নদীটি যেন তার অন্ধকার কারাগার ভেঙে ক্রুদ্ধ তরঙ্গে বেরিয়ে আসছিল। পাহাড়গুলির সান্নিধ্য আর খরস্রোতের এই কলনাদে ছিল বিস্ময়কর আনন্দ-শিহরন আর উৎসাহ-দায়িনী

শক্তি। নদীর ধারে ছিল একটি সবুজ ঘাসের মাঠ, নীচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা ; এই পাহাড়গুলোই ভ্রাম্যমাণ ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি থেকে আমাদের আর আমাদের জ্বালানো আগুনকে আড়াল করে রাখবে। এইখানে ঘাসের ভেতর লক্ষ্য করলাম বড় বড় পাথরের টুকরো অনেকগুলো বৃত্তের আকারে সাজানো ; বুঝলাম এখানে শীতকালে আস্তানা হয়েছিল ডাকোটাদের। আমরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, যখন উঠলাম তখন সূর্যও উঠেছে। একটা মস্ত পাথর তীর থেকে বেরিয়ে ছিল জলের ভেতর। আর তারই পিছনে গভীর জল ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছিল। দেখে লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বেশবাস ছেড়ে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ঘূর্ণী স্রোতে দেহ এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেলাম, তারপর একটি জলজ গাছের শক্ত শিকড় ধরে তীরে উঠে পড়লাম। এই স্নানের ফলে শরীরটা এত স্নিগ্ধ হলো যে এটা স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার লক্ষণ বলে ভুল করলাম। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই সেই সাময়িক স্নিগ্ধভাবটা চলে গেল। জিনের ওপর বসে বসে আমি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লাম আগেকার মতো, কিছুতেই মাথা খাড়া রাখতে পারলাম না।

রেমণ্ড বলল, "ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন। ঐ-যে মস্ত খাদটা দেখছেন, ইণ্ডিয়ানরা যদি এ তল্লাটে আদৌ এসে থাকে তো নিশ্চয় ওখান দিয়েই গেছে।"

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেই খাদে। সেখানে একটা উই-ঢিপিতে দেখতে পেলাম তাঁবুর খুঁটির চিহ্ন। এতেই যথেষ্ট হলো ; এবার আর সন্দেহ রইল না। আমরা যতই এগিয়ে চললাম, খাদ ততই সরু হতে লাগল। এই সরু পথ দিয়ে যেতে ইণ্ডিয়ানদের স্বভাবতই খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোতে হয়েছে। এখানটায় তাই তাদের চিহ্নগুলোও সংখ্যায় বেশী, আর বেশ স্পষ্ট। এই খাদের শেষে দুটি খাড়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি সরু গিরিপথ প্রায় খাড়া উঠে গেছে। এখানে ঘাস আর আগাছা-গুলো ইণ্ডিয়ান যাত্রীদের পায়ের তলায় পিষে থেঁৎলে গেছে। আমরা ধীরে ধীরে পাথরের ওপর দিয়ে উঠতে লাগলাম বেশ কষ্ট করেই। এই কষ্টকর যাত্রা চলল ঘণ্টা-দুই ধরে। মাঝে মাঝে দেখতে লাগলাম আমাদের দু'ধারে কয়েকশো ফুট উঁচু অনেক খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। রেমণ্ড তার অশ্বতরের পিঠে চড়ে এগোচ্ছিল আমার কিছু আগে আগে। আমরা এসে পড়লাম এমন এক চড়াইতে যেটি আগেকার চড়াইগুলোর চাইতে অনেক বেশী খাড়া। আমার মনে হলো এটাই হয়তো সবচেয়ে উঁচুও হবে। পলিন খুব কষ্ট করে কয়েক গজ পর্যন্ত ওপরদিকে উঠল গোঙাতে গোঙাতে আর হোঁচট খেতে খেতে, তারপরে আর চলতে না পেরে একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি নেমে ওকে টেনে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার দুর্বল

শরীরে আমি চট্ করে হাঁপিয়ে পড়লাম ; সুতরাং টানা দাড়িটা তার গলা থেকে আল্‌গা করে নিয়ে আমার হাতে জড়িয়ে বাঁধলাম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ওপরে যখন উঠলাম তখন আমি একেবারে সম্পূর্ণ অবসন্ন, কপাল থেকে ঘাম পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। পলিন আমার পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর ছায়াটা পড়েছিল গরম পাথরের ওপর, তাছাড়া আর কোনো ছায়া ছিল না। আমি কিছুক্ষণ এই ছায়ায় শুয়ে রইলাম। তখন আমি এত ক্লান্ত যে হাত-পা নাড়াবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। আমার চারধারে ছুঁচোলো মাথাওয়ালা পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন রোদে ভাজা-ভাজা হচ্ছিল, তাদের নগ্নতা ঢাকবার জন্য একটি গাছ, ঝোপ বা একফালি ঘাসও নেই। চোখের সামনে সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই যেন নির্মম, দুঃসহ রোদে পুড়ছিল।

কিছুক্ষণ বাদে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠতে পেরে চলা শুরু করলাম ; উৎরাই বেয়ে পশ্চিম দিকে নেমে গেলাম। পরিস্থিতিটাই ছিল হাস্যকর। ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়া, দুয়েরই অবস্থা কাহিল। পলিন আর আমি, দুয়ের কেউই লড়াই করবার বা ছুটবার লায়েক ছিলাম না।

রেমণ্ডের জিনের বাঁধনটা খুলে গেল। রেমণ্ড নেমে সেটা ঠিক করতে লাগল, কিন্তু আমি এগিয়েই চললাম। আমি একটা উৎরাইয়ের মুখে আসতেই একটি দৃশ্য দেখে মন খুশি হয়ে উঠল। দেখলাম সারি সারি পাহাড়ের চূড়ার মাঝখানে খানিকটা জায়গায় সবুজ ঘাস, একদিকে সূর্যালোকিত কয়েকটি ঝোপ, অন্যদিকে পুরাতন পাইন গাছগুলো পাহাড় থেকে যেন বাইরের দিকে ঝুঁকে আছে। একটি তীক্ষ্ণ পরিচিত স্বর আমার কানে আবেদন জানাল আর বাল্যজীবনে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল—সে-স্বর একরকম পতঙ্গের, যাকে নিউ ইংল্যাণ্ডে স্কুলের ছাত্ররা বলে 'পঙ্গপাল'। এরা পুরোনো পাইন গাছের তপ্ত ডালের গায়ে লেগে ছিল। তারপর আমি ঝোপগুলির পাশ দিয়ে যখন গেলাম, তখন জল পড়বার মৃদু আওয়াজ আমার কানে এলো। পলিন নিজের থেকেই ঘুরে দাঁড়াল ; তারপর আমরা গাছের ডাল-পালাগুলো ঠেলে সরিয়ে এগোতে লাগলাম। এগিয়ে একটি কালো পাথর দেখতে পেলাম, তার ওপরে ঠাণ্ডা, সবুজ আবরণ। এর পাশ থেকে একটি ঠাণ্ডা জলস্রোত বয়ে এসে পড়ছিল একটি প্রশস্ত সাদা বালুর চৌবাচ্চার ভেতর, আর তারই তলা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির নীচে চলে যাচ্ছিল। আমি যখন এই ঝরনার জলে একটি টিনের বাটি ভরে নিলাম, পলিন তখন জলাশয়ের ভেতর মাথা ডুবিয়ে দিয়ে জল পান করছিল। আমাদের চারদিকে নরম মাটিতে পায়ের ছাপ ছিল নানারকম হরিণের

আর রকি-পাহাড়ের ভেড়ার ; লোমশ ভালুকও খুবই সম্প্রতি চওড়া পা আর ভীষণ নখের চিহ্ন রেখে গিয়েছিল। তার বাস এই পাহাড়ী অঞ্চলেই।

এই ঝরনা ছাড়িয়ে অল্প দূর গিয়েই আমরা একটি ছোট তৃণাচ্ছাদিত ময়দান পেলাম, পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখলাম ইণ্ডিয়ান শিবিরের সবরকম চিহ্নই রয়ে গেছে এই ময়দানে। রেমণ্ডের অভ্যস্ত চোখ কতকগুলো চিহ্ন দেখতে পেলো, যা থেকে সে বুঝতে পারল কোন্‌খানটায় ছিল রেনালের ঘর আর কোথায় তার ঘোড়া বাঁধা হতো। আমি এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখতে লাগলাম। রেনাল আর আমার ভেতরে ভাবের মিল ছিল না বললেই চলে, তাই একথাটা ভেবে পেলাম না, কেন তার আগুনের ছাই অত মনোযোগ দিয়ে দেখলাম ; ওর সঙ্গে সহানুভূতির সামান্য যেটুকু সূত্র ছিল তা হচ্ছে আমরা দুজন দুটি জ্ঞাতি-সম্পর্কিত গোষ্ঠীর মানুষ।

আধ ঘণ্টা বাদে আমরা পাহাড় ছাড়িয়ে এলাম। আমাদের সামনে তখন একটি সমতল উষর প্রান্তর। এ প্রান্তরের অনেক অংশে প্রেয়ারির কুকুরদের ঘন বসতি। এরা এদের গর্তের মুখের সামনে বসে থাকত আর আমরা পাশ দিয়ে গেলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘেউ-ঘেউ করত। প্রান্তরটি মাইল ছয়েক চওড়া, কিন্তু সেটি অতিক্রম করতে আমাদের দুটি ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর আমাদের সামনে দেখতে পেলাম আরেকটি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। সেই পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠতে প্রথম একহাজার ফুট পর্যন্ত ঘন ঝোপগুলোর মধ্য থেকে কালো-কালো পাথরের মাথা বেরিয়ে ছিল, সেগুলো সবই একদিকে ঝুঁকে রয়েছে। ঝড়ের দাপটে আর বজ্রাঘাতের ফলে সেগুলো বীভৎস আকার ধারণ করেছে। আমরা যখন ইণ্ডিয়ানদের যাত্রার চিহ্ন ধরে একটি সরু পথ বেয়ে অগ্রসর হলাম, তখন এগুলো আমাদের মাথার ওপর যেন ঝুলে আমাদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে রাখল।

আমাদের পথ এগিয়ে চলল ছায়াঘন বনের মধ্য দিয়ে ; মাথার ওপরে বিস্তৃত ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে নেমে আসছিল সূর্যের আলো। সামনের বাধা এড়াতে আমরা যখন পথের এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিলাম তখন ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম দূরের ভীষণাকৃতি বিরাট পাহাড়ের চূড়াগুলো। মনে হচ্ছিল যেন ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে।

উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ইণ্ডিয়ানদের দুটি চতুষ্কোণ কেল্লা, সেগুলো লাঠি আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে কোনোরকমে তৈরি। সেগুলো সম্ভবতঃ গতবছরের তৈরি, তাই প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে। প্রত্যেকটি কেল্লায় জন কুড়ি লোক ধরতে পারত বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এই নিরানন্দ

জায়গাটিতে একটি দল শত্রুবেষ্টিত হয়েছিল এবং তার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ভ্রূকুটিপূর্ণ পাহাড় আর জীর্ণ গাছগুলি ওপর থেকে তাকিয়ে দেখেছিল দুই দলের সংঘর্ষ, যার কাহিনী অলিখিত এবং অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তবু, রক্তপাতের কোনো চিহ্ন থেকে থাকলেও সেগুলো ঢাকা পড়ে গেছে ঝোপ আর লম্বা আগাছার আড়ালে।

ক্রমশ পাহাড়গুলি ফাঁক হয়ে দূরে দূরে সরে যেতে লাগল, আর আমাদের সরু পথটা প্রশস্ত হয়ে গিয়ে পড়ল এক সমতল প্রান্তরে, যেখানে আমরা আবার দেখতে পেলাম ইণ্ডিয়ান শিবিরের চিহ্ন। আমাদের ঠিক সামনে ছিল অনেক গাছ আর ঝোপ; আমরা এইখানে থামলাম ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম আর জলযোগের উদ্দেশ্যে। আমাদের জলযোগ শেষ হতে রেমণ্ড আগুন জ্বালাল, আর তার পাইপটি ধরিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল ধূমপান করতে। দেখলাম কিছুক্ষণ ধরে সে অসাধারণ গম্ভীর মুখে পাইপ টেনে চলল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে সে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল এখন আর না এগোলেই ভালো হয়।

আমি শুধালাম, "কেন?"

সে বলল এ অঞ্চলটা ভারি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, কারণ আমরা প্রবেশ করছি স্নেক, আরাপাহো আর গ্রস্‌ভেন্‌টার ব্ল্যাকফুটদের এলাকায়, আর এদের যে-কোনো একটি গোষ্ঠীর ভ্রাম্যমাণ দল আমাদের মুখোমুখী পড়লে আমরা মারা পড়ব; কিন্তু এর পরও সে সোজাসুজি বলে দিল আমার খুশিমতো সে যে-কোনো জায়গায় যাবে। আমি তাকে বললাম জানোয়ারগুলিকে নিয়ে আসতে। ওদের পিঠে চড়ে আমরা দুজনে আবার অগ্রসর হলাম। খোলাখুলি স্বীকার করছি যে এগোতে এগোতে মনে হলো আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই অনিশ্চিত। আমার দেহ-মনের স্বাভাবিক সচল অবস্থা আর আমাদের এই ভ্রমণ-অভিযানের জন্য যেমন দরকার তেমন শক্তি আর মেজাজের ঘোড়ার বিনিময়ে আমি আদ্ধেক পৃথিবী দিয়ে দিতে রাজি ছিলাম।

পাহাড়গুলো আমাদের চারদিকে যেন আরো ঘন, আরো উঁচু, আরো খাড়া হয়ে আমাদের ঘিরে ফেলতে লাগল, এসে পড়তে লাগল আমাদের পথের ওপর। অবশেষে আমরা এমন একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে এসে প্রবেশ করলাম যেমনটি আর কখনো আমার চোখে পড়েনি। পাহাড়টা উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত ফাটা, আর আমরা এই ফাটলের তলার দিকের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার বেয়ে বেয়ে কোনোরকমে জড়োসড়ো হয়ে এগিয়ে চলেছিলাম। আল্‌গা টুক্‌রো-টুক্‌রো পাথরের ওপর খুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ হচ্ছিল, সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল আমাদের সমান্তরাল সহযাত্রী একটি ছোট্ট নদীর অধীর কলধ্বনি। নদীটির জল কখনো কখনো পাথরখণ্ডগুলোর ওপর ফেনা ছড়িয়ে

আমাদের সরু পথের সমস্তটাই ছেয়ে ফেলতে লাগল, কখনো বা একধারে সরে গিয়ে আমাদের শুকনো জুতো পায়ে এগোবার জায়গা করে দিল। ওপরদিকে তাকিয়ে তু'দিকের কালো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম সরু লম্বা ফিতের মতো একফালি উজ্জ্বল আকাশ। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। পথটা অচিরেই প্রশস্ততর হলো, সূর্যের আলোও আরো ছড়িয়ে নেমে এসে ঝলমল করতে লাগল কালো জলের ওপর। প্রশস্ততর পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ছোট্ট নদীর ধারে ধারে অনেক ঝোপ, গাছ আর ফুল ; পাহাড়ের ওপর খাঁজে খাঁজে নানারকম লতাগুল্ম ভিড় করে রয়েছে। তারপর আবার কিছুক্ষণ অন্ধকারে এগিয়ে চলা। এই পথটা প্রায় চার মাইল লম্বা বলে মনে হলো। এই পথের শেষে পৌঁছবার আগেই আমাদের বাহন তুটির নাল-ছাড়া খুরগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, ধারালো পাথরের ঘষা লেগে পা-ও কেটে গেল। পাহাড় থেকে বেরিয়ে আমরা আরেকটি সমতল প্রান্তর পেলাম, যার চারধারে বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে খাড়া পাহাড়, নির্জনতা আর নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্তি যেন। এখানেও ইণ্ডিয়ানরা শিবির স্থাপন করেছিল, আমাদের পিছনের খাদের মধ্য দিয়ে তাদের স্ত্রীলোক, শিশু আর ঘোড়াগুলো নিয়ে পার হয়ে এসে। ওরা যে পথ তিনদিনে অতিক্রম করেছিল, আমরা তা একদিনে অতিক্রম করলাম।

এই ঘেরাও-করা গোল জায়গা থেকে বেরোবার একমাত্র পথ ছিল শ'-তুই ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে। আমরা বেশ কষ্ট করে এই চড়াই বেয়ে উঠলাম। একেবারে ওপরে উঠে সেখান থেকে তাকিয়ে দেখলাম শেষপর্যন্ত আমরা পাহাড়-ঘেরা এলাকা ছাড়িয়ে এসেছি। আমাদের সামনে বিস্তৃত প্রেয়ারিভূমি, কিন্তু এত জংলা এবং ভাঙাচোরা যে, দৃষ্টি বার বার বাধা পাচ্ছিল। আমাদের বাঁ দিকে অনেক দূরে একটি আকাশচুম্বী উঁচু পাহাড় ; তার সবুজ গায়ের ওপর চারটি কালো বিন্দু আস্তে আস্তে চলাফেরা করছিল দেখতে পাচ্ছিলাম। ভাবলাম ওগুলো নিশ্চয়ই মহিষ, আর ওদের এই আবির্ভাবটা বিশেষ শুভলক্ষণ, কারণ মহিষ যেখানে আছে, ইণ্ডিয়ানদের তার কাছাকাছি থাকার খুবই সম্ভাবনা। আমরা সে-রাতেই ঐ গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হবো আশা করলাম। ওখানে পৌঁছবার জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহী ছিলাম তুটি কারণে— আমাদের ভ্রমণ শেষ করবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম, আর এটা জানা ছিল যে যদিও দিনের আলোয় গাঁয়ে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ, তবু ওর কাছাকাছি শিবির স্থাপন করা বিপজ্জনক হবে। কিন্তু আমরা যখন এগিয়ে চললাম তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল ; আর আধঘণ্টার মধ্যেই দিগন্তে ঢলে পড়বে। আমরা একটা উঁচু জায়গায় উঠে চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কোথায় তাঁবু ফেলা যেতে পারে। প্রেয়ারি-

ভূমিটি যেন এক চঞ্চল সমুদ্র, ঢেউগুলি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেই যেন জমাট বেঁধে গেছে। প্রেয়ারির বুকে তাই সোনার-বরণ সূর্যকিরণে চলেছে আলোছায়ার খেলা। জংলী 'সেজ'-এর ঝোপ খাড়া হয়ে উঠেছে এখানে ওখানে, হাল্‌কা সবুজ রঙের বাহার ছড়িয়ে। আর আমাদের সামনে কিছু দূরে উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের পথ আঁকা-বাঁকা গতিতে চলে গেছে বহুদূর, আর তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাদে জমা জল ঝিক্‌মিক্‌ করছে। আমরা নেমে গেলাম নীচে, আগুন জ্বাললাম, আর ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম চরে খাবার জন্য। দেখলাম ঘাসের পথের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ জলস্রোত, দুই তীরের কয়েক গজ পর্যন্ত মাটিকে সরস আর উর্বর করতে করতে। এই স্রোতের জলই কোথাও কোথাও জমা হয়ে ছোট ছোট ডোবার সৃষ্টি করছে, যেখানে যেখানে বীভারগুলো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জমিয়ে স্রোতের গতি আটকে দিয়েছে।

আমরা আমাদের সেই কৃষ্ণসারটির মাংসের শেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই আগুনের সামনে রেখে উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবতে লাগলাম আমাদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত হলো। ঠিক এমনি সময়, এই প্রেয়ারি অঞ্চলেই শুধু দেখা যায় এরকম ধূসর-রঙা একটি খরগোশ লাফিয়ে এসে পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্যে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বসে পড়ল। আমি চিন্তা বিচার না করেই ওকে গুলী করবার জন্য বন্দুক তুললাম, কিন্তু রেমণ্ড আমাকে ডেকে মানা করল, পাছে গুলীর আওয়াজ ইণ্ডিয়ানদের কানে গিয়ে পৌঁছয়। সে-রাত্রেই প্রথম খেয়াল করলাম যে আমরা যে বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছি তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁদের কাছে এ ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগতে পারে যে ঠিক যাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমরা যাচ্ছি, তাদের সান্নিধ্যকেই আমরা সবচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছি। আমাদের এই বিশ্বস্ত বন্ধুদের কোনো একটি বিচ্ছিন্ন দল যদি পাহাড়ের মাথা থেকে আমাদের দেখতে পেতো, তারা খুব সম্ভব রাত্রে ফিরে আসত আমাদের ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে নিতে, হয়তো বা সেইসঙ্গে আমাদের মাথার খুলিও। কিন্তু প্রেয়ারি অঞ্চল ঘাব্‌ড়ে যাবার অনুকূল জায়গা নয়; আমার মনে হয় সেই সন্ধ্যায় ও-বিষয়ে রেমণ্ড বা আমি আর দ্বিতীয়বার মাথা ঘামাইনি।

আমাদের জিনের ওপর মাথা রেখে আট ঘণ্টা আমরা তন্দ্রার মতো পড়ে থেকে ঘুমোলাম। জেগে দেখি পলিনের হল্‌দে মাথাটা আমার ওপর ঝুঁকে আছে। আমি উঠে তাকে পরীক্ষা করলাম। বেচারার পা-গুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফুলে উঠেছে কালকের নানা দুর্ঘটনায়, কিন্তু ওর চোখ দুটি উজ্জ্বলতর, চলাফেরা আরো জীবন্ত,

আর তার অদ্ভুত রোগটাও যে কমে গেছে তাও পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা এগিয়ে চললাম, আশা করলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই ইণ্ডিয়ানদের গাঁয়ে পৌঁছে যাব ; কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হলো। ওদের যাত্রাপথের চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে গেল একটি শক্ত, পাথরময় সমতলভূমিতে এসে। রেমণ্ড আর আমি একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত প্রতিটি গজ জায়গা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে করে এগোতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত একটি ছোট্ট পাহাড়ের পাশে তাঁবুর খুঁটির কয়েকটি চিহ্ন পেলাম। আমরা সেই চিহ্ন ধরেই আবার এগিয়ে চললাম।

"ঐ দূরে প্রেয়ারির ওপর কালো ওটা কী পড়ে রয়েছে ?"

এই প্রশ্নের জবাবে রেমণ্ড বলল, "একটা মরা মহিষের মতো দেখাচ্ছে।"

আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ওটা একটা ষাঁড়ের বিরাট মৃতদেহ ; শিকারীরা এদিক দিয়ে যেতে যেতে ষাঁড়টাকে মেরে রেখে গেছে। জট-পাকানো লোম আর চামড়ার টুকরো ছড়িয়ে আছে চারদিকে, কারণ নেকড়েরা এর ওপর ভোজের মহোৎসব চালিয়ে, ভেতরটা খালি করে শুধু বাইরের খোলসটা রেখে গেছে। এই খোলসটার ওপর ভিড় করে রয়েছে অগুন্তি বড় কালো ঝিঁঝিপোকা। মৃতদেহটার অবস্থা দেখে মনে হলো চার-পাঁচ দিন ধরে ঐভাবে পড়ে আছে। দৃশ্যটা খুব মনোরম নয়। আমি রেমণ্ডকে বললাম ইণ্ডিয়ানরা হয়তো তখনো পঞ্চাশ কি ষাট মাইল দূরে রয়েছে। রেমণ্ড মাথা নেড়ে বলল ওদের শত্রু স্নেকদের ভয়েই ওরা অতদূর যেতে সাহস পাবে না।

এর কিছু পরেই আমরা আবার পথের নিশানা হারিয়ে ফেললাম, এবং চিন্তিত হয়ে কাছের একটি পাহাড়ের ওপর উঠলাম। আমাদের সামনে একটি সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তর ডাইনে বাঁয়ে যেন সীমাহীন দূরে চলে গেছে, সামনে দশ-বারো মাইল দূরে একসারি পাহাড়। সম্পূর্ণ প্রান্তরটাই দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার, কিন্তু মহিষ বা ইণ্ডিয়ান একটিও চোখে পড়েনি।

রেমণ্ড বলল, "দেখলেন তো ? এখন উল্টো দিকে ফেরা ভালো নয় কি ?"

কিন্তু আমি তা ভালো ভাবলাম না, তাই পাহাড় বেয়ে নেমে ঐ প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। আমরা তখন এতদূর চলে এসেছি যে পলিনের আর আমার শরীরের এ অবস্থায় লারামি কেল্লায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ভেবে দেখলাম এ অবস্থায় যা কর্তব্য তার সঙ্গে আমার মনের বাসনাটা চমৎকার মিলে গেছে, সুতরাং সবচেয়ে ভালো বুদ্ধির কাজ হবে এগিয়ে চলা। আমাদের সামনেই মাটির ওপর ছড়িয়ে ছিল অনেক মহিষের মাথার খুলি আর হাড়, কারণ দু-এক বছর আগে

ইণ্ডিয়ানরা এই প্রান্তরেরই চারদিক ঘিরে তাঁবু ফেলেছিল। কিন্তু কোনো জ্যান্ত জানোয়ার চোখে পড়ছিল না। অবশেষে একটি কৃষ্ণসার লাফিয়ে এসে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। আমরা একসঙ্গে গুলী চালালাম। জানোয়ারটা মাত্র আশি গজের ভেতরে সহজ লক্ষ্যের মধ্যেই ছিল; তবু দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। এর কারণ সম্ভবতঃ আমাদের অত্যধিক ব্যগ্রতা, কারণ আমাদের হাতে তখন সামান্য একটু ময়দা ছাড়া অন্য কোনোরকম খাদ্যদ্রব্য ছিল না। দেখতে পাচ্ছিলাম কয়েকটি ছোট ছোট জলাশয় দূরে চিকচিক করছে। আমরা অগ্রসর হতেই লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে একাধিক নেকড়ে আর কৃষ্ণসার লাফিয়ে চলে যেতে লাগল, আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা প্লোভার পাখি। কৃষ্ণসার-শিকারে ব্যর্থ হয়ে রেমণ্ড এবার পাখি-শিকারে হাত লাগাল, কিন্তু এবারেও ব্যর্থ হলো। জলও আমাদের হতাশ করল। জলাশয়গুলোর কিনারা মহিষদের পায়ের চাপে চাপে এমন কর্দমাক্ত হয়েছিল যে আমাদের ভীরু জানোয়ার দুটি ওদিকে পা বাড়াতে ভয় পেল। আমরা তাই ফিরে এসে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম। মস্ত ঘাসগুলো যেখানে মহিষদের দ্বারা পদদলিত হয়নি, সেখানে এত উঁচু যে আমাদের ঘোড়াগুলোর কাঁধের ওপর এসে লাগতে লাগল।

আবার সেই জঘন্য অনুর্বর প্রেয়ারি, কোন্‌দিকে যাবো তার কোনো নির্দেশ-চিহ্ন নেই কোথাও তার বুকে। আমরা পাহাড়ের সারির কাছে গিয়ে একটি গিরিপথ দেখতে পেলাম; এদিক দিয়ে ইণ্ডিয়ানরা গিয়ে থাকলে এর মধ্য দিয়েই তাদের যেতে হয়েছে। আমরা সেই গিরিপথ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেলাম। মনে হতে লাগল সাফল্য মিলবে না; তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম খুরের চিহ্ন, পায়ের চিহ্ন, খুঁটির চিহ্ন কিছুই কোথাও নেই, যদিও মহিষের মাথার খুলি ছড়িয়ে আছে অনেক। বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পেলাম; আরেকটি ঝড়ের সূচনা।

গিরিপথটির মাথায় উঠতেই সামনের দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রথমে দেখলাম দূর-দিগন্তে লম্বা একসারি এলোমেলো কালো মেঘ, তাদের ওপর রকি পর্বতমালার অগ্রদূত 'মেড্‌সিন বো' পাহাড়ের সারি; তারপর ধীরে ধীরে সমতল প্রান্তরটি দৃষ্টিপথে এলো—বিরাট একঘেয়ে সবুজের মেলা, কিন্তু বাসিন্দা কেউ নেই এখানে, যদিও এরই ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লারামি খাঁড়ি, একটিও ঝোপ বা গাছ নেই এর তীরে। দৃষ্টিপথে খানিকটা বাধা দিল পাহাড়ের বাইরে-বাড়ানো অংশটি। আমি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে চললাম। হঠাৎ স্রোতস্বিনীর তীরের ওপর কয়েকটি কালো বিন্দু দেখলাম।

বললাম, "মহিষ!"

রেমণ্ড চীৎকার করে বলল, "কি আশ্চর্য! ওগুলো যে ঘোড়া।" বলে অশ্বতরটিকে চাবুক মেরে সে ঐদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

আমরা এগিয়ে যেতেই ধীরে ধীরে প্রেয়ারিভূমির নতুন নতুন অংশ দৃষ্টিপথে পড়তে লাগল, আরো অনেক ঘোড়া দেখতে পেলাম নদীর ধারে ছড়িয়ে রয়েছে অথবা দল বেঁধে প্রেয়ারির বুকে ঘাস খাচ্ছে। তারপর দেখতে পেলাম মাইলখানেক দূরে ওগিল্লাল্লা ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুগুলো নদীর ধারে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিতে বর্বর বাসিন্দারা কিল্‌বিল্‌ করছে। সেই ইণ্ডিয়ান শিবির দেখে প্রাণে যে আনন্দ বোধ করেছিলাম, কোনো পর্যটকের বিদেশ ঘুরে এসে নিজের বাড়ি দেখেও তার চাইতে বেশী আনন্দে মন নেচে ওঠে না।

চতুর্দশ অধ্যায়

ওগিল্লাল্লা গ্রাম

এ ঠিক ইণ্ডিয়ানদের মনের চেহারা বর্ণনা করবার জায়গা নয়। একই ছবি সামান্য একটু রঙের অদলবদল করে দু-চারটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া মেক্‌সিকো অঞ্চলের উত্তরে যত গোষ্ঠীর ইণ্ডিয়ান আছে তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর পক্ষে সত্য হতে পারে। কিন্তু তাদের চিন্তাধারার এরকম সাদৃশ্য থাকলেও হ্রদ এবং সমুদ্রের ধারে যারা থাকে, তাদের জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে বনে আর সমতলভূমিতে যারা থাকে, তাদের জীবনধারার অনেক তফাৎ। সুদূর প্রেয়ারি অঞ্চলে যেসব জংলী দল ঘুরে বেড়ায়, তাদের সবচেয়ে বেশী জংলী দলগুলোর একটির সঙ্গে বেশ কয়েক সপ্তাহ ঘরোয়া অন্তরঙ্গভাবে থেকে আমার বহু অসাধারণ সুযোগ হয়েছিল তাদের পর্যবেক্ষণ করবার। এবং আমার মনে হয় যেসব দৃশ্য প্রতিদিনই আমার চোখের সামনে পড়ত, তার কিছু বর্ণনা লিখলে তা কম চিত্তাকর্ষক হবে না। এরা ছিল পুরোপুরি অসভ্য; সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও এদের আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি একটুও বদলায়নি। সাদা মানুষের ক্ষমতা এবং আসল চরিত্র সম্বন্ধেও তারা কিছুই জানে না; আর আমাকে দেখলে তাদের শিশুরা ভীষণ ভয়ে চীৎকার করতে থাকত। তাদের ধর্ম, কুসংস্কার এবং নানা বিষয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল ধারণা বহু যুগ ধরে বংশানুক্রমিক-ভাবে চলে আসছে। তাদের পূর্বপুরুষরা যে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করত, তারাও সেই

অস্ত্র দিয়েই লড়াই করে, আর তেমনই চামড়ার তৈরী পোশাক পরে। তারা 'প্রস্তর-যুগ'-এর জীবন্ত প্রতিনিধি, কারণ তাদের বল্লম আর তীরের ডগায় ব্যবসাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত লোহা থাকলেও, তারা পৃথিবীর আদিম যুগের মানুষের মতোই পাথরের তৈরী হাতুড়ি ব্যবহার করত।

সেই অঞ্চলে অনেক বিরাট পরিবর্তন আসন্ন। দেশান্তর-যাত্রীদের স্রোত অরিগন আর ক্যালিফর্নিয়ার দিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মহিষ লোপ পেয়ে যাবে, এবং মহিষের ওপরই যেসব যাযাবর সম্প্রদায়ের নির্ভর, তারাও ভেঙে পড়ে ছড়িয়ে পড়বে। অচিরেই ইণ্ডিয়ানরা হুইস্কির নেশায় বিহ্বল হবে, ভয়ে অভিভূত হবে সামরিক ঘাঁটি দেখে; ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই এদের দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকারীরা একরকম নিরাপদেই ভ্রমণ করতে পারবে। এদেশের বিপদ এবং আকর্ষণ চলে যাবে একই সঙ্গে।

পাহাড়ের ফাঁক থেকে রেমণ্ড আর আমি যেমন ইণ্ডিয়ানদের গ্রামটি দেখতে পেলাম, আমরাও তেমনি ওদের নজরে পড়ে গেলাম; ওদের প্রহরীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল। আমরা যখন সমতলে নেমে গেলাম তখন গ্রামের যেদিকটা আমাদের সবচেয়ে কাছে, সেদিকটা কালো হয়ে গেছে নগ্নদেহ মানুষের ভিড়ে। গ্রামের কতকগুলো পুরুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাদের ভেতর দেখতে পেলাম সবুজ কম্বল গায়ে জড়ানো ফরাসী মানুষ রেনালকে। কাছাকাছি হতেই যথারীতি করমর্দনের পালা সারতে হলো; তারপর দেখলাম আমাদের দলের বাকি লোকদের কী হলো তা জানতে ওরা সবাই ব্যস্ত। সে-খবর বলে ওদের খুশি করে তারপর সবাই গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম।

রেনাল বলল, "একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেলে না। পরশু যদি আসতে তাহলে দেখতে পেতে ঐ প্রেয়ারিভূমিটার সর্বত্র মহিষের ছড়াছড়ি; যতদূর চোখ যায় শুধু কালো মহিষ আর কালো মহিষ। একটাও মাদী নয়, সব মদ্দা। গতকাল পর্যন্ত আমরা রোজই 'ঘেরাও' করতাম একবার করে। তাকিয়ে দেখ ঐ গ্রামের দিকে; অবস্থা বেশ ভালো বলে মনে হয় না?"

সত্যিই এই দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁবু থেকে তাঁবুতে টাঙানো লম্বা দড়ি থেকে রোদে শুকোবার জন্য ঝুলছে মাংস, ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের দ্বারা লম্বা লম্বা ফালি করে কাটা। গতবার এই গোষ্ঠীতে যত লোক দেখেছিলাম, এবার দেখলাম তার চাইতে কিছু কম। রেনালকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। রেনাল বলল বুড়ো লে বর্নিয়ে দুর্বল শরীর নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসতে পারবে না বলে তার

সমস্ত আত্মীয়-স্বজন নিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে, মাহ্তো-তাতোঙ্কা আর তার ভাইরাও আছে তাদের মধ্যে। 'ঘূর্ণি-হাওয়া'ও এতদূর আসতে চায়নি, তার কারণ—ভয়। শুধু আধা-ডজন পরিবার তার অনুগত হয়ে তার সঙ্গে থেকে গেল, কিন্তু তার গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই সর্দারের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে তাদের যা ভালো লেগেছে ঠিক তাই করেছে, অর্থাৎ চলে এসেছে।

"এখন তাহলে এ গাঁয়ে সর্দার কে কে আছে?" প্রশ্ন করলাম আমি।

রেনাল বলল, "আছে বুড়ো রেড-ওয়াটার (লাল জল), ঈগ্ল্-ফেদার (ঈগলের পাখা), বিগ ক্রো (বড় কাক), ম্যাড উল্ফ্ (পাগল নেকড়ে), হোয়াইট শীল্ড্ (সাদা ঢাল), আর—কী যেন ওর নামটা?—শীয়েন। লোকটি বর্ণসঙ্কর।"

কথা বলতে বলতে আমরা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। দেখলাম বেশির ভাগ তাঁবুই বেশ বড় আর ছিমছাম হলেও একধারে একসঙ্গে রয়েছে কতকগুলো নোংরা, দুরবস্থাপন্ন চেহারার কুটির। ওদিকে তাকিয়ে আমি ওদের বিশ্রী চেহারা সম্পর্কে মন্তব্য করলাম। জানতাম না একটি কোমল জায়গায় আঘাত করেছি।

রেনাল আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠল—"ঐ ঘরগুলোতে থাকে আমার ইণ্ডিয়ান স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন। ওদের মতো ভালো লোক সারা গাঁয়ের ভেতর আর নেই।"

"ওদের মধ্যেও কি সর্দার আছে?"

"সর্দার? আছে বইকি। অনেক।" বলল রেনাল।

"তাদের নাম?"

"তাদের নাম? এই ধরো, অ্যারো-হেড (তীরের ফলা) রয়েছে। সে যদি সর্দার নাও হয়ে থাকে, তার সর্দার হওয়া উচিত। আর আছে হেইল-স্টর্ম (শিলা-বৃষ্টি)। সে এখন বালক মাত্র, কিন্তু শীগ্গীরই একদিন সে সর্দার হবেই হবে।"

ঠিক তখনই আমরা দুটি কুটিরের মধ্য দিয়ে গ্রামের বিরাট এলাকায় প্রবেশ করলাম। চমৎকার গড়নের নগ্নদেহধারী কতকগুলো লোক আমাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

রেনালকে শুধালাম, " 'ব্যাড উণ্ড'-এর তাঁবু কোথায়?"

রেনাল বলল, "আরেকবার বঞ্চিত হলে। 'ব্যাড উণ্ড' যে 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র সঙ্গেই থেকে গেছে। সে যদি এখানে থাকত আর তুমি তার বাড়িতে থাকতে আসতে, এ গাঁয়ের যে-কোনো লোকের চাইতে সে তোমাকে ভালোভাবে রাখত। কিন্তু ঐ যে 'বিগ ক্রো'-র তাঁবু, বুড়ো 'রেড-ওয়াটার'-এর তাঁবুর পরেই। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে

'বিগ ক্রো' খুব ভালো ইণ্ডিয়ান। আমার পরামর্শ যদি মানো তো, তোমরা গিয়ে ওর সঙ্গেই থাকো।"

"ওর তাঁবুতে কি স্ত্রীলোক আর শিশুদের সংখ্যা খুব বেশী?"

"না। একটিমাত্র স্ত্রীলোক, আর দু-তিনটি বাচ্চা। বাকিদের সে একসঙ্গে একটা আলাদা তাঁবুতে রাখে।"

রেমণ্ড আর আমি 'বিগ ক্রো'-র তাঁবুর প্রবেশদ্বারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম; তখনো আমাদের পিছনে পিছনে একদল ইণ্ডিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আমাদের বাহন দুটির ভার নিল। নীচু প্রবেশপথের চামড়ার তৈরী পর্দা সরিয়ে নত হয়ে আমরা 'বিগ ক্রো'-র বাসগৃহে প্রবেশ করলাম। দেখলাম ভেতরের অতি মৃদু আলোয় একপাশে বসে আছে সর্দার, একরাশ মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর। আমাকে সে অদ্ভুত উচ্চারণে সম্ভাষণ জানাল। রেনালকে অনুরোধ করলাম আমরা ওর সঙ্গে থাকতে এসেছি, এইটে ওকে বুঝিয়ে দিতে। রেনালের কথা শুনে সর্দার মৃদুস্বরে আরেকবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। বললে একটু বাড়াবাড়ি শোনাতে পারে, কিন্তু এটা সত্যি যে কোনো শ্বেতাঙ্গ আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য তাকেই বেছে নিয়ে তার কাছে এসেছে, একথা জানলে গ্রামের যে-কোনো ইণ্ডিয়ান বিশেষ সম্মানিত বোধ করত।

তাঁবুর একেবারে মাথার দিকে সম্মানিত অতিথিদের স্থান। স্ত্রীলোকটি সেখানে আমাদের জন্য মহিষ-চর্মের পোশাক পেতে দিল। আমাদের জিনগুলো ভেতরে নিয়ে আসা হলো। আমরা তাদের ওপর বসতে-না-বসতেই ইণ্ডিয়ানদের ভিড় জমে গেল সেখানে, ওরা সবাই আমাদের দেখতে ব্যস্ত। 'বিগ ক্রো' তার ধূমপানের পাইপ বার করে তার ভেতর তামাক আর 'শোংসাশা' (অর্থাৎ লাল উইলো গাছের ছাল) মিশিয়ে ভরে দিল। সে-পাইপ ধরানো হয়ে হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, আর কথাবার্তা বেশ জীবন্ত হয়ে উঠল। একটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক একটি কাঠের পাত্রে মহিষের মাংস এনে আমাদের সামনে রাখল; দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের ওপর ভোজ্যের বোঝা চাপানো এইখানেই শেষ হলো না। একটির পর একটি ইণ্ডিয়ান বালক বা বালিকা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ গাঁয়ের বিভিন্ন অংশে আমাদের ভোজের নিমন্ত্রণ করতে আসতে লাগল। আধ ঘণ্টা কি তারও বেশীক্ষণ ধরে আমরা ইণ্ডিয়ানদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জায়গায় একটু করে মাংস চেখে আর বাড়ির কর্তার পাইপে ধূমপান করে বেড়াতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ধরেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। এবার তা রীতিমতো

শুরু হয়ে গেল। আমরা খোলা জায়গা অতিক্রম করে রেনালের বাড়িতে গেলাম, যদিও সেটিকে বাড়ি বলা চলে কিনা সন্দেহ; শুধু কয়েকটা খুঁটির মাথায় কয়েকটি পুরোনো মহিষ-চর্মের পোশাক টাঙানো, আর একটা দিক একেবারে ফাঁকা। এমনি 'বাড়ি'তেই গিয়ে আমরা বসলাম, আর ইণ্ডিয়ানরা জড়ো হলো আমাদের চারদিকে।

আমি বললাম, "বজ্রের আওয়াজ কি করে হয়?"

রেনাল বলল, "আমার বিশ্বাস, আকাশের ওপর দিয়ে একটা মস্ত পাথর গড়াতে থাকে।"

আমি বললাম, "সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ ইণ্ডিয়ানরা এ সম্বন্ধে কী ভাবে?"

এই প্রশ্ন থেকে শুরু হলো বিতর্ক। দেখা দিল মতভেদ। বুড়ো মেনে-সীলা (লাল জল) একপাশে চুপচাপ একা বসে ছিল। সে এইবার তার শীর্ণ মুখটি তুলে বলল বজ্র কী জিনিস তা সে অনেকদিন ধরেই জানে। ও হচ্ছে মস্তবড় একটা কালো পাখি। বুড়ো বলল, "একদিন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম ঐ মস্ত পাখিটা হুস্ করে নেমে এলো কালো পাহাড় থেকে, পাখায় গুরুগুরু আওয়াজ করতে করতে। সে যখন হ্রদের জলে পাখা ঝাপ্‌টাতে লাগল, তখন জল থেকে ঠিক্‌রে বেরোতে লাগল বিদ্যুৎ।"

আরেকটি বুড়ো ইণ্ডিয়ান চামড়ার পোশাকে নিজেকে ভালো করে জড়িয়ে বসে ছিল। সে বলল, "বজ্র বড় খারাপ। গত গ্রীষ্মে আমার ভাইটাকে মেরে ফেলেছে।"

আমার অনুরোধে রেনাল বুড়োকে সেই ঘটনার বিবরণ শোনাতে বলল; কিন্তু বুড়ো যেন গোঁ ধরেই চুপ করে বসে রইল, মুখ তুলে তাকাতেও রাজি হলো না। কিছুকাল পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা কী হয়েছিল। নিহত লোকটি ছিল একটি সমিতির সভ্য, যে সমিতির সবাই দাবি করত তাদের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাদের ভেতর একটি হচ্ছে বজ্রের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা। যখনই আকাশে ঝড় উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিত, এই বজ্র-যোদ্ধার দল তাদের তীর-ধনুক, বন্দুক, ঐন্দ্রজালিক ঢোল, যুদ্ধ-ঈগলের পাখার হাড়ের তৈরী একরকমের সিটি দেবার বাঁশি, ইত্যাদি নিয়ে চীৎকার আর সিটি দিতে দিতে আর ঢোল বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে গিয়ে মেঘের দিকে লক্ষ্য করে গুলী চালাত, ঝড়টা যেন ভয় পেয়ে আকাশ থেকে নেমে পড়ে। একদিন বিকেলে যখন কালো মেঘ দেখা দিল আকাশে, এরা একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে ওদের ইন্দ্রজালের যতরকম অস্ত্র সব ঝাড়তে লাগল ঐ মেঘকে লক্ষ্য করে। বেপরোয়া বজ্র কিন্তু ভয় পেতে রাজি

হলো না, দলের একটি লোক বল্লম উঁচিয়ে লম্ফঝম্প করতে আর শাসাতে শুরু করেছে, এই অবস্থায় তাকে এক আঘাতেই মেরে ফেলল। বাকি সবাই কুসংস্কার-মিশ্রিত ভীষণ আতঙ্কে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল যে যার বাড়ির দিকে।

আমার গৃহস্বামী কোংরা-টোঙ্গা অর্থাৎ 'বিগ ক্রো' (বড় কাক)। তার গৃহ অর্থাৎ তাঁবুটিতে সে-সন্ধ্যায় যে দৃশ্য হয়েছিল তা সত্যিই দেখবার মতো। এক কুড়ি কিংবা তার চাইতেও বেশী ইণ্ডিয়ান ঘরের চারদিকে গোল হয়ে বসেছিল; ঘরের মাঝখানে যে আগুন মিটমিট করে জ্বলছে, তার ক্ষীণ আলোয় তাদের নগ্ন দেহগুলি কোনো-রকমে একটু একটু দেখা যাচ্ছে মাত্র। পাইপটা হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে তার মুখের আগুনটা জ্বল্‌জ্বল্ করছিল ঘরের ভেতরকার ঝাপ্‌সা অন্ধকারে। মাঝে মাঝে অনুজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডে একজন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক মহিষের চর্বি ফেলে দিতে লাগল আগুনটাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই একটি উজ্জ্বল আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠতে লাগল প্রায় ঘরের ছুঁচোলো ছাদ পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে একসঙ্গে মিশেছে সরু সরু লম্বা খুঁটিগুলো, যাদের ওপর মহিষ-চর্মের ছাউনি চাপানো। ঐ লাফিয়ে-ওঠা আগুনের সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে ছড়িয়ে বসা ইণ্ডিয়ানদের ওপর, আর তারা আগুনের চারধারে বসে বসে অনর্গল বলে যাচ্ছিল লড়াই আর শিকারের গল্প। সেই হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে আরো দেখা যাচ্ছিল ঘরের চার-দিকে ঝুলানো চামড়ার তৈরী পোশাক; সর্দারের বিশ্রাম-স্থানের ওপর ঝুলানো তীর, ধনুক আর বল্লম, এবং দুটি শ্বেত অতিথির বন্দুক আর বারুদের তূণ। একমুহূর্তের জন্যে দিনের আলোর উজ্জ্বলতা, তারপরেই আগুন ক্ষীণ হয়ে আসতো; এরপরও কাঠগুলোর দগ্ধাবশেষ থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ একটু ঝলক উঠে ঘর একটু আলো করত, তারপরেই আবার অন্ধকার। তারপর আগুনের সম্পূর্ণ নির্বাণ, আর ঘরময় পূর্ণ অন্ধকার।

পরদিন ভোরে যখন এই আশ্রয় ছেড়ে চললাম, তখন আমাকে যেন বিচিত্র অভিনন্দন জানাল গ্রামের চারধারে বিচিত্র চীৎকার। সেই এলাকার আদ্ধেক কুকুর এই হামলায় যোগ দিয়েছে বলে মনে হলো। কুকুরগুলো যত মুখর, ঠিক সেই পরিমাণে ভীরু, তাই তাদের যত কিছু আস্ফালন সবই কয়েক গজ দূরত্ব বজায় রেখে। ওদের মধ্যে শুধু একটিমাত্র কুকুরের বাচ্চা, ইঞ্চি দশেক লম্বা, ভরসা করে সামনে এসে হামলা করল। ডাকোটাদের ভেতর যেমন চালু, তেমনি আমার পায়ের 'মোকাসিন' জুতোর পিছনদিকে সংলগ্ন একটা চামড়ার ফিতা আমার জুতোর পিছনে পিছনে মাটিতে লুটোতে লুটোতে আসছিল। বীর কুকুরছানাটি এই ফিতার মাথাটি

কামড়ে ধরে রইল, আর আমি সামনের দিকে পা টানতেই মাটির ওপর প্রায় উল্‌টে-উল্‌টে পড়তে লাগল। আমি জানতাম সারা গ্রামের ইণ্ডিয়ানদের নজর রয়েছে আমার ওপর, আমি ভয় পাই কিনা তাই দেখতে। আমি তাই ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম; নাছোড়বান্দা কুকুরগুলোও সর্বদাই আমাকে ঘিরে রইল। রেনালের তাঁবুতে এসে যখন তার ধারে বসলাম, তখন কুকুরগুলো যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। রয়ে গেল শুধু একটা বড় সাদারঙের কুকুর; সেটা আমার সামনে ছুটোছুটি করতে করতে আমাকে দাঁত দেখাতে লাগল। ওকে ডাকলাম, কিন্তু তাতে ও আমার দিকে তাকিয়ে আরো বিশ্রীরকম ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম কুকুরটার দিকে। দিব্বি মোটাসোটা গড়ন; ঠিক এমনি একটি কুকুরই আমি চেয়েছিলাম। ভাবলাম, "দোস্ত, আমার সঙ্গে যা করলে, তার দাম তোমাকে দিতে হবে। আজ ভোরেই যেন তোমাকে খাওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা করব।"

আমার চরিত্র এবং মর্যাদা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ানদের ভালো ধারণা জন্মাবার জন্য আমি ঠিক করলাম সেদিনই ওদের একটি ভোজে আপ্যায়িত করব; আর ডাকোটাদের রীতিনীতি অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অনুষ্ঠানে বা উৎসবে সাদা কুকুরের মাংস খাওয়ানোই রেওয়াজ। আমি রেনালের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে শীগ্‌গীরই খোঁজ করে বার করে ফেলল ওধারের তাঁবুর এক বুড়ী এই সাদা কুকুরটার মালিক। আমি একটা বেশ রংচঙে সুতী-কাপড়ের রুমাল মাটির ওপর পেতে তার ওপর কিছু সিঁদুর, গুটি এবং অন্যান্য ছোটখাটো শখের জিনিস সাজিয়ে রেখে সেই ইণ্ডিয়ান বুড়ীকে ডাকালাম। বুড়ী এলে, কুকুরটার দিকে আর রুমালটার দিকে ইসারা করে দেখালাম। ইঙ্গিতটা বুঝে বুড়ী উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, তারপর তার লোভের জিনিসটি চট্‌ করে তুলে নিয়ে তার তাঁবুর দিকে ছুট্‌ লাগাল। আরো কিছু কিছু ছোটখাটো জিনিস দিয়ে খুশি করে দুটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোককে কাজে লাগালাম। তারা দুজনে দু'ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে কুকুরটাকে তাঁবুর পিছনে নিয়ে হত্যা করে তার মৃতদেহটাকে ঝল্‌সে নেবার জন্য আগুনে ফেলে দিল, তারপর সেটাকে টুকরো টুকরো করে দুটো কেট্‌লির ভেতর ফেলে সিদ্ধ করতে লাগল। এদিকে রেমণ্ডকে বললাম আমাদের ভাণ্ডারে যেটুকু ময়দা বাকি ছিল তা মহিষের চর্বিতে ভেজে নিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় ফাউ হিসেবে এক কেট্‌লি চা-ও বানাতে।

আসন্ন ভোজের উপযোগী করবার জন্য 'বিগ ক্রো'-র স্ত্রী ঝাঁট দিয়ে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। ভুলে কেউ বাদ পড়ে গেলে বা অবহেলিত বোধ করলে

যেন ভুল বা অবহেলার দোষ আমার ওপর না চাপে, এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য অতিথিদের নিমন্ত্রণ করার ভারটা দিলাম গৃহস্বামীর ওপরই চাপিয়ে।

ভোজ-উৎসবের জন্য ইণ্ডিয়ানদের কাছে দিনের যে-কোনো সময়ই প্রশস্ত। আমার নিমন্ত্রণের সময় হলো বেলা এগারোটার কাছাকাছি। সেসময়ে রেনাল আর রেমণ্ড হেঁটে এলো গাঁয়ের ওপর দিয়ে, গাঁয়ের লোকদের সানন্দ উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে; একটি বাঁশ থেকে কুকুরের মাংস-সুদ্ধ দুটি কেট্‌লি ঝুলছিল, আর বাঁশটির দু'মাথা ধরা ছিল ওদের দুজনের হাতে। এগুলো তাঁবুর মাঝখানে নামিয়ে রেখে ওরা ফিরে গেল রুটি আর চা নিয়ে আসতে। ইতিমধ্যে আমি পায়ে পরে নিয়েছিলাম চমৎকার চকচকে একজোড়া মোকাসিন, আর হরিণের চামড়ার তৈরী আটপৌরে জামাটা খুলে ফেলে পরে নিলাম এই ধরনের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পরবার জন্য যে জামা সঙ্গে এনেছিলাম সেটি। দাড়ি-গোঁফ ভালো করে কামিয়েও নিলাম ক্ষুরের সদ্ব্যবহার করে; ইণ্ডিয়ানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হলে এ ব্যাপারটিকে অবহেলা করলে চলবে না। এভাবে সুসজ্জিত ছিমছাম হয়ে আমি তাঁবুর ভেতরে শেষ মাথায় বসলাম রেনাল আর রেমণ্ডের মাঝখানে। কয়েক মিনিটের ভেতরেই অতিথিরা সবাই এসে বেশ গাদাগাদি করেই গোল হয়ে বসল। প্রত্যেকেই ভোজের অংশ নেবার জন্য সঙ্গে করে একটি কাঠের তৈরী পাত্র নিয়ে এসেছিল। রকি পর্বত অঞ্চলের ভেড়ার শিঙের তৈরী হাতা দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হতে লাগল, অন্যান্যদের তুলনায় বুড়োরা আর সর্দাররা পেল দ্বিগুণ। কুকুরের মাংস চট্‌পট্‌ উড়ে গেল, অতিথিরা পাত্র উপুড় করে দেখাতে লাগল পাত্র খালি। মাংসের পর এলো রুটি, আর সবার শেষে চা। কিন্তু চা যখন পাত্রে পাত্রে ঢালা হতে লাগল তখন তার অদ্ভুত আর বিশ্রী রং দেখে আমার কেমন-কেমন মনে হলো।

রেনাল আমাকে বলল, "ও কিছু নয়। চা যথেষ্ট ছিল না, তাই রং যাতে বেশ কড়া হয় সেইজন্যে কেট্‌লির ভেতর কিছু ভুসা গুলে দিয়েছি।"

ভাগ্য ভালো যে ইণ্ডিয়ানদের রসনা খুব বেশী খুঁতখুতে নয়, ওদের স্বাদবোধটা কিঞ্চিৎ কম। চায়ে মিষ্টি ঠিকমতো ছিল, তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ভোজের পরে এল বক্তৃতার পালা। 'বিগ ক্রো' চ্যাপ্‌টা একফালি কাঠ এনে তার ওপর তামাক আর 'শোংসাশা' (লাল উইলো গাছের ছাল) কুচিয়ে কেটে ঠিক অনুপাতে মেশালো। তাই ভরা হলো পাইপে, আর পাইপ ধরানো হয়ে ঘুরতে লাগল হাতে হাতে। তারপর আমি আমার বক্তৃতা শুরু করলাম, আমার প্রতিটি বাক্য বলার সঙ্গে-সঙ্গেই রেনাল দোভাষীর ভূমিকা গ্রহণ করে তা তর্জমা করে শোনাতে

লাগল সবাইকে, আর তাই শুনে শ্রোতারাও যথারীতি খুশির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল। আমার বক্তৃতা এবং রেনাল-কৃত অনুবাদের প্রতিক্রিয়ার কিঞ্চিৎ নমুনা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে নীচে দেওয়া গেল :

"আমি এতদূরের দেশ থেকে এসেছি, যে তোমাদের মতো বেগে ভ্রমণ করলে সেখানে একবছরেও গিয়ে পৌছানো যাবে না।"

"হাউ! হাউ!"

"সেখানকার মেনিয়াস্কাদের সংখ্যা প্রেয়ারি অঞ্চলের ঘাসের ফলার চাইতেও বেশী। ওদের পুরুষরা ভীষণ সাহসী যোদ্ধা, আর ওদের স্ত্রীলোকদের মতো রূপসী তোমরা দেখনি।"

"হাউ! হাউ! হাউ!"

শেষের কথাগুলো বলে আমি বিবেকের দংশন অনুভব করতে শুরু করেছিলাম মনের ভেতর। কিন্তু তা সাময়িক। সামলে নিয়েই আমি আবার আরম্ভ করলাম :

"আমি যখন মেনিয়াস্কাদের অতিথি হয়ে তাদের গৃহে বাস করতাম, তখন শুনেছিলাম ওগিল্লাল্লাদের নাম, তারা কী মহান এবং বীর জাতির মানুষ, শ্বেতাঙ্গদের তারা কত ভালবাসে, মহিষ-শিকারে আর শত্রুর ওপর আঘাত হানতে তাদের কী আশ্চর্য দক্ষতা! আমি দেখতে এসেছি যা-যা শুনেছিলাম তা সবই সত্য কিনা।"

"হাউ! হাউ! হাউ! হাউ!"

"পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। এইজন্যেই আমি তোমাদের জন্য উপহার খুব বেশী আনতে পারিনি। যা আনতে পেরেছি তা সামান্য।"

"হাউ!"

"কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই একটু একটু করে দেবার মতো যথেষ্ট তামাক আমার কাছে আছে। তোমরা এই তামাকের ধূমপান করে দেখতে পারো ব্যবসাদারদের কাছ থেকে যে তামাক পাও, তার চাইতে এ তামাক কত বেশী ভালো।"

"হাউ! হাউ! হাউ!"

"আমার সঙ্গে প্রচুর বারুদ, সীসা, ছুরি আর তামাক ছিল লারামি কেল্লায়। এগুলো তোমাদের দেবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। আমি চলে যাবার আগে

তোমাদের কেউ কেউ যদি আমার সঙ্গে লারামি কেল্লায় আস, তাহলে খুব সুন্দর উপহার দেবো তাদের।"

"হাউ! হাউ! হাউ! হাউ!"

রেমণ্ড তখন দু-তিন পাউণ্ড তামাক কেটে কেটে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। তারপর বুড়ো মেনে-সীলা (লাল জল) আমাকে আমার বক্তৃতার উত্তর দিতে শুরু করল। সে এক লম্বা বক্তৃতা, তার সারমর্ম এইরকম:

"আমি সর্বদাই শ্বেতাঙ্গদের ভালবেসে এসেছি। পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান জাত। আমার বিশ্বাস তারা সবকিছুই করতে পারে। কোনো শ্বেতাঙ্গ ওগিল্লাল্লা-শিবিরে থাকতে এলে আমি সর্বদাই খুশি হই। আপনি আমাদের অনেক উপহার দেননি একথা সত্যি, কিন্তু তার কারণটাও তো আমরা পরিষ্কার বুঝলাম। আপনি যে আমাদের পছন্দ করেন তা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তা নইলে আমাদের গাঁ খুঁজে খুঁজে এতদূর কষ্ট করে আসবেন কেন?"

এই ধরনেরই আরো বক্তৃতা এরপর শোনা গেল। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি শেষ হলে শুরু হলো ধূমপান, হাসি-তামাসা, কথোপকথন।

বুড়ো মেনে-সীলা হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল: "বুড়োরা আর সর্দাররা সবাই এখানে হাজির আছে। এইতো আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করার উপযুক্ত সময়। আমরা অনেক পাহাড় পেরিয়ে এসেছি আগামী বছরের জন্য ঘর বাঁধব বলে। আমাদের পুরোনো ঘরগুলো অকেজো হয়ে গেছে, পচে আর ক্ষয়ে গিয়ে। কিন্তু (ঘর-তৈরির নতুন মাল সংগ্রহের ব্যাপারে) আমরা বড় নিরাশ হয়েছি। মদ্দা-মহিষ আমরা অনেক মেরেছি, কিন্তু মেয়ে-মহিষের খোঁজ পাইনি। অথচ মদ্দা-মহিষের চামড়া এত পুরু আর ভারী, যে তাই দিয়ে ঘর তৈরি করা আমাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। 'মেড্‌সিন বো' পাহাড়ে নিশ্চয় অনেক মহিষী রয়েছে। আমাদের সেইখানে যাওয়া উচিত। অবশ্য অত পশ্চিমে আমরা কখনো যাইনি, স্নেকরা হয়তো আমাদের আক্রমণও করবে, কারণ ঐ শিকারের জায়গাগুলো হচ্ছে ওদের এলাকা। কিন্তু নতুন ঘর আমাদের চাই-ই, পুরোনোগুলো দিয়ে আরেকটা বছর চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব। স্নেকদের ভয়ে আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। আমাদের যোদ্ধারা সাহসী, তারা লড়াই করবার জন্যে সবাই প্রস্তুতও আছে। তাছাড়া আমরা পেয়েছি তিনজন শ্বেতাঙ্গকে, যাঁরা তাঁদের বন্দুক নিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।"

এই বক্তৃতার ফলে জোর বিতর্ক শুরু হলো। বিতর্কের মর্ম রেনাল আমাকে তর্জমা

করে শোনায়নি, কাজেই বক্তাদের ভাবভঙ্গি থেকে তাদের বক্তব্য আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। শেষপর্যন্ত মনে হলো মেনে-সীলার সঙ্গেই সভার বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান একমত হয়েছে। কিছুক্ষণ সবাই নীরব। তারপর সেই বুড়ো হঠাৎ বিশ্রী আওয়াজ করে কী কতকগুলো কথা আউড়ে গেল। পরে শুনতে পেলাম আমার আতিথেয়তার জন্য বুড়ো আমাকে ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল। তারপর সে বলল, "এইবারে এসো আমরা বিদায় নিই, আমাদের শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের একটু হাঁপ ছাড়বার অবকাশ দিয়ে।"

অতিথিরা সবাই বেরিয়ে গেল খোলা জায়গায়, আর কিছুক্ষণ ধরে বুড়ো গাঁয়ের চারধারে ঘুরে ঘুরে আমার দেওয়া ভোজের গুণগান করে বেড়াল। ইণ্ডিয়ানদের সমাজে ঐরকম করাটাই রেওয়াজ।

দিবা অবসান হয়ে এল। সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিম দিগন্তে। চারদিকের সমতল-ভূমি থেকে ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে এনে যার যার মালিকের ঘরের পাশে বেঁধে রাখা হলো। তাঁবুগুলোর বৃত্ত ঘিরে চঞ্চল ঘোড়াগুলোর একটি বৃত্ত তৈরি হলো। অন্ধকারের মধ্যে এখানে ওখানে জ্বালানো আগুন জ্বলতে লাগল মৃদু-মৃদু, তাতে তাদের চারপাশের মানুষগুলোকে অস্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল। আমি গিয়ে বসলাম রেনালের তাঁবুর পাশে। সেখানে আগে থেকেই বসে ছিল মেনে-সীলার পুত্র এবং আমার গৃহস্বামী 'বিগ ক্রো'-র ভ্রাতা 'ঈগলের পালক'। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইণ্ডিয়ানরা এখান থেকে ডেরা তুলে কাল ভোরে রওনা হবে কিনা। সে মাথা নেড়ে বলল তা কেউ বলতে পারে না, কারণ বুড়ো মাহ্‌তো-তাতোঙ্কার মৃত্যুর পরে এ গোষ্ঠীর সবাই হয়ে গেছে শিশুর মতো, তারা নিজেদের মন নিজেরাই জানে না। মাথা খসে গেলে দেহের যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও তাই হয়েছে। সুতরাং ইণ্ডিয়ানদের মতো আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম কাল ভোরে স্নেকদের এলাকার দিকে রওনা হবো কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত কিছু না জেনেই।

পরদিন সকালে যখন প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নদীর ধার থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন বুঝলাম ডেরা তুলে রওনা হওয়ারই মতলব চলছে। কতকগুলো তাঁবুর শুধু খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, আর কতকগুলোর চামড়ার আচ্ছাদন আল্‌গা অবস্থায় হাওয়ায় দুলছে। দেখে মনে হলো দু-একজন বিশিষ্ট সর্দার এ জায়গা ছেড়ে রওনা হওয়া ঠিক করায় তাদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরা তাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁবু খুলতে শুরু করেছিল, তারপর তাদের দেখাদেখি গ্রামের বাকি তাঁবুগুলোও খোলা শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু দ্রুতবেগে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ফলে কিছুক্ষণ আগেই

যেখানে ছিল অনেকগুলো তাঁবু মিলিয়ে একটি ইণ্ডিয়ান গ্রাম, সে-জায়গায় দেখা যেতে লাগল কতকগুলো ঘোড়া আর কতকগুলো ইণ্ডিয়ান বিশৃঙ্খলভাবে ভিড় করে রয়েছে। খোলা তাঁবুগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে ছিল এখানে ওখানে মাটির ওপর, আর সেইসঙ্গে অনেক কেট্‌লি, পাথরের তৈরী হাতুড়ি, শিঙের তৈরী হাতা, মহিষ-চর্মের পোশাক আর শুকনো মাংসে ভরা রংকরা চামড়ার তৈরী থলে। ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরা ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, বুড়ীগুলোও নিজেদের ভেতর ভীষণ চেঁচামেচি করে কথা বলছে। লোমশ ঘোড়াগুলো সহিষ্ণুভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁবুর খুঁটিগুলো তাদের দু'পাশের সঙ্গে আটকে দেওয়া হচ্ছিল, আর নানারকমের মালপত্র চাপানো হচ্ছিল তাদের পিঠের ওপর। কুকুর-গুলো জিভ বার করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যাত্রা শুরু করবার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকটি যোদ্ধা বসে ছিল মাটির ওপর তার নিবু-নিবু আগুনের ধারে, তার ঘোড়ার-টানা-দড়ি হাতের মুঠোয় ধরে, এই হট্টগোলের ভেতরেও নির্বিকার।

প্রত্যেকটি পরিবারই প্রস্তুতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চলা শুরু করল। ফলে ভিড় কমে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। দেখলাম তারা নদী পার হচ্ছে, তারপর ওপারে পৌঁছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলছে। সবাই যখন চলে গেল তখন আমিও ঘোড়ায় চড়ে তাদের পিছনে পিছনে রওনা হলাম, আমার সঙ্গে চলল রেমণ্ড। পাহাড়ের মাথায় উঠতেই সেই সম্পূর্ণ ইণ্ডিয়ান দলটি একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হলো। আমাদের সামনের অনুর্বর প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাইলখানেক লম্বা লাইনে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। তাদের বল্লমের লোহার তৈরী ছুঁচোলো ডগাগুলি রোদে ঝিকমিক করে উঠছে। সূর্য এর চাইতে অদ্ভুত কোনো মানুষের মিছিলের ওপর কিরণ দেয়নি। কোথাও কতকগুলো বুড়ী দু-তিনটি বাচ্চা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে কতকগুলো ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথাও বা একটি ইণ্ডিয়ান তরুণী চমৎকার জমকালো সাজে সজ্জিত ঘোড়া বা অশ্বতরের পিঠে চড়ে এগিয়ে চলেছে আর প্রেমিকের চোখে চোখ পড়তেই সলজ্জ মধুর হাসি হাসছে। ছোট ছেলেরা ক্ষুদে তীরধনুক হাতে এগিয়ে চলেছে, নগ্ন শিশুরা চলেছে ছুটোছুটি করতে করতে, আর অসংখ্য কুকুর এগিয়ে চলেছে ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে ফাঁকে। তরুণ বীরেরা রং আর পালকের সাহায্যে জমকালো সাজসজ্জা করে কয়েকজন মিলে একসঙ্গে চলেছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কখনো বা দু-তিনজন মিলে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘোড়ার গতি পরীক্ষা করছে। কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার পদযাত্রীও এগিয়ে

চলেছিল সাদা চামড়ার পোশাক পরে বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে। এরা ছিল গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বুড়ো আর যোদ্ধা, যাদের বয়স আর অভিজ্ঞতার প্রতি এই ভ্রাম্যমাণ গণতান্ত্রিকেরা নীরবে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করত। এবড়ো-খেবড়ো প্রেয়ারিভূমি আর ভাঙাচোরা পাহাড়ের পটভূমিকায় এই প্রাণচঞ্চল দৃশ্যটি যে কী মনোরম লাগছিল তা বলে বুঝানো যায় না। কিছু দিন, কিছু সপ্তাহ ওদের পিছনে পিছনে চলে চলে এ দৃশ্যের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়ে গেলাম, কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এর মাধুর্য আমার কাছে কমল না।

আমরা যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম, ইণ্ডিয়ানদের অগ্রগামী মিছিল যেন ততই অগোছালো, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। তারপর যখন একটি পাহাড়ের গোড়ার কাছে এসে পৌছলাম, তখন দেখলাম সেই বুড়োরা দলের বাকি সকলের আগে এসে মাটির ওপর একসারিতে বসে আছে। তারা একটা পাইপ ধরিয়ে বসে বসে ধূমপান, হাসি-তামাসা আর গল্প বলাবলিতে মেতে উঠল আর বাকি ইণ্ডিয়ানরা পর পর এসেই এখানে থেমে ঐ বুড়োদের পিছনে একটা ভিড় জমিয়ে ফেলল। বুড়োরা তখন উঠল, মহিষ-চর্মের পোশাক আবার গায়ে পরে নিল, আর আগের মতোই চলতে শুরু করল। পাহাড়ের ডগায় উঠে সামনেই পেলাম একটি প্রায়-খাড়া উৎরাই। কিন্তু আমরা একমুহূর্তও থামলাম না। ধুলো উড়িয়ে আর হৈ-হৈ করতে করতে আমরা সবাই একসঙ্গে নেমে চললাম। ঘোড়াগুলি খাড়াই বেয়ে নামবার সময় হুঁশিয়ার হয়ে চেপে চেপে পা ফেলতে লাগল, স্ত্রীলোক আর শিশুরা চীৎকার করতে লাগল, কুকুরগুলো পায়ের তলায় চাপা পড়ে চেঁচাতে লাগল, আর টুকরো-টুকরো পাথর আর মাটি খসে খসে গড়িয়ে পড়তে লাগল পাহাড়ের পায়ের তলায়। অল্প কিছুক্ষণ বাদেই পাহাড়ের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম নীচেকার সমতলভূমিতে সারা গাঁয়ের লোক অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

সেদিন অপরাহ্ণে আমাদের নতুন শিবিরে আমার সেই পুরোনো ব্যামো এসে আমাকে আক্রমণ করল। গত এক হপ্তা ধরে যে শারীরিক উন্নতি হয়েছিল, যে শক্তি লাভ করেছিলাম, তা যেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই হারিয়ে ফেললাম ; মনে হলো যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমি 'বিগ ক্রো'-র তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়লাম, আর ঘুমে বেহুঁশ হয়ে রইলাম পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত। জেগে উঠলাম মাথার ওপর কিসের যেন পৎপৎ আওয়াজ শুনে আর চোখে হঠাৎ আলো এসে পড়ায়। তাঁবু ভেঙে ফেলা হচ্ছিল ; পরিবারের স্ত্রীলোকেরা তাঁবুর আচ্ছাদনগুলো খুলে ফেলছিল। আমি উঠে বসে গা থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ সুস্থ অনুভব

করলাম; কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের অসহায় অবস্থাটা অনুভব করলাম, দেখলাম আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। রেমণ্ড পলিনকে আর অশ্বতরটিকে নিয়ে এসেছিল। আমি সামনের দিকে ঝুয়ে মাটি থেকে আমার জিনটাকে তুলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। রেমণ্ডকে বললাম, "জিনটা তুমিই পরাও।" বলে আবার একরাশ মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর বসে পড়লাম। রেমণ্ড পলিনের ওপর জিন এঁটে দিল, আর আমি অনেক কষ্টে তার ওপর উঠে বসলাম। তারপর আমরা যখন সমতলভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাঙা-ভাঙা পাহাড় চারপাশে দেখতে দেখতে, আমি আস্তে আস্তে চলে গেলাম ইণ্ডিয়ানদের কিছু আগে, আর আমার মনও তখন চলে গেছে স্থান আর কাল ছাড়িয়ে বহুদূর। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এলো আর বজ্রের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। পাহাড়গুলোর মাথা ছাড়িয়ে মেঘ উঠছিল আকাশে, কালো রঙে যেন আসন্ন আপদের আগাম ইঙ্গিত দিয়ে; তারপর দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি পিছনদিকে তাকালাম। ইণ্ডিয়ানরা আর আসন্ন ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে দাঁড়াচ্ছে না, ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে ডাইনে বাঁয়ে অনেকদূর পর্যন্ত। আমার অসুখের প্রথম আক্রমণের পর থেকেই বৃষ্টির প্রভাব আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর হয়েছিল। আমার একটুও অতিরিক্ত শক্তি অবশিষ্ট ছিল না; ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে থাকাই আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই সময় সর্বপ্রথম আমার মনে এই ভাবটি জোর করে এলো যে এই মরুভূমি ছেড়ে আমি কোনোদিনই হয়তো যেতে পারব না।

ভাবলাম: "বেশ তো। এই প্রেয়ারিতে যা হবার চট্‌পট্ হয়ে যাক। এখানে শেষপর্যন্ত জিনের ওপর বসে মৃত্যু হওয়া—ঘরের ভেতরের গরমে রোগশয্যায় অসহায়-ভাবে শুয়ে শুয়ে অসুখে ভুগতে ভুগতে জীবন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে হাজারগুণ ভালো।"

এই ভেবে, যে পোশাকটির ওপর বসে ছিলাম সেটিকে মাথার ওপর তুলে নিয়ে আমি ঝড়ের প্রতীক্ষায় রইলাম। অবশেষে হঠাৎ রুদ্ররূপে ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিল, কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল, রেখে গেল পরিষ্কার আকাশ। আমার আগেকার চিন্তাগুলো শুধু বিচিত্র স্মৃতির খোরাকই যোগাল মাত্র, কারণ বৃষ্টির যে কুফল আমার ওপর দেখা দেবে তার কিছুই দেখা দিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা শিবির স্থাপন করলাম। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় না থাকায় আমি রেনালের কাছ থেকে এক বিচিত্র ধরনের পোশাক ধার করে নিলাম। তারপর বাড়ি—অর্থাৎ 'বিগ ক্রো'-র তাঁবুতে—ফিরলাম, সেখান থেকে আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে।

সেই তাঁবুতে তখন ছিল আধা-ডজন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক। তাদের একজন আমার একটি বাহু তার নিজের বাহুর পাশে ধরে হেসে হেসে সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল দুজনের চামড়ার রঙের তফাৎ দেখে।

সেই বিকেলে আমাদের তাঁবুর অল্প দূরেই ছিল অনেক ফার গাছে ঢাকা কালো পাহাড়, আমাদের ডানদিকে দু-এক মাইল দূরে। শিকারক্ষেত্রে যেন আরো ক্ষিপ্রভাবে চলাফেরা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ানরা ঠিক করল তাদের শুকনো মাংসের ভাণ্ডার আর অন্যান্য বাড়তি জিনিসপত্র এখানেই রেখে যাবে। এদের ভেতর অনেকে তাদের ঘরগুলো পর্যন্ত খাড়া রেখে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার জন্য কিছু চামড়া। গাঁয়ের আদ্ধেক বাসিন্দারা রওনা হলো বিকেলবেলা, মালবাহী ঘোড়াগুলোর পিঠে বোঝা চাপিয়ে, পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ে পৌছে তারা সঙ্গে আনা শুকনো মাংসখণ্ডগুলো গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রাখল নেকড়ে আর ভালুকদের নাগালের বাইরে। সবাই ফিরে এলো সন্ধ্যাবেলায়। এই ইণ্ডিয়ান যুবকদের কয়েকজন বলল পুবদিকের পাহাড় অঞ্চলে তারা বন্দুকের গুলীর আওয়াজ শুনেছে। সেই আওয়াজের উৎস সম্বন্ধে নানারকম অনুমান করা হতে লাগল। আমি আশা করলাম শ আর হেনরি শ্যাটিলন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে ফিরে আসছে। তখন ভাবতেও পারিনি যে আমার দুর্ভাগা বন্ধুটি ঠিক সেই সময় লারামি কেল্লায় আইভি-লতার বিষক্রিয়ায় জ্বরাক্রান্ত হয়ে মহিষ-চর্মের ওপর শুয়ে পাইপের ধোঁয়া আর শেকৃস্‌পীয়ারের নাটকের মাধুর্যে দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে।

পরদিন ভোরে যখন আবার সমতলভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম তখন কয়েকজন যুবক এই এলাকার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করতে লাগল। অবশেষে আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পেতে লাগলাম পাহাড়ের চূড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে তারা তাদের মহিষ-চর্মের পোশাকগুলো দোলাচ্ছে। তাদের ইঙ্গিতটা হচ্ছে তারা মহিষ দেখতে পেয়েছে। এর অল্প পরেই মহিষও দৃষ্টি-গোচর হলো। ঘোড়সওয়াররা অমনি ছুটল মহিষের পিছনে। দূর থেকে দেখলাম দু-একটা মহিষ মারাও পড়ল। দেখে রেমণ্ড হঠাৎ ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সে বলল, "এই হচ্ছে আমার মনের মতো দেশ। এক মাসে এখানে যত মহিষ মারা হয় সব যদি সেণ্ট লুইস শহরে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে এক শীতেই বড়লোক হয়ে যেতে পারতাম, বুড়ো পেপিন বা ম্যাকেঞ্জির মতো। একেই বলি গরীবের পক্ষে আদর্শ বাজার। পেটে আগুন জ্বললে একটিবার বন্দুক নিয়ে বেরোলেই যে মাংস মুফৎ মিলবে, নীচের সমতল দেশে বড়লোকগুলো যা ওদের সব টাকা খরচা

করলেও পায় না। আর কোনো শীতকালে আমাকে সেণ্ট লুইস শহরে দেখতে পাবে না।"

রেনাল বলল, "ঠিকই বলেছ। ঐখানে তুমি আর তোমার সেই স্পেনদেশী স্ত্রীলোকটি তো না খেয়ে মরতে বসেছিলে। এমন আহাম্মুক তুমি, যে ওকে নিয়ে গিয়েছিলে উপনিবেশে।"

আমি বললাম, "স্পেনদেশের স্ত্রীলোক? আমি এর কথা এর আগে কখনো শুনিনি। তুমি কি তাকে বিবাহ করেছ?"

রেমণ্ড জবাব দিল, "না। পুরুতরা তো তাদের স্ত্রীলোকদের বিয়ে করে না। আমিই বা করতে যাব কেন?"

মেক্সিকোর ধর্মযাজকদের এই সশ্রদ্ধ উল্লেখের ফলে ধর্মপ্রসঙ্গও এসে পড়ল। আমি দেখলাম আমার সঙ্গী দুজন এদেশের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদেরই মতো তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ সম্বন্ধে ঠিক তেমনি উদাসীন, যাদের সর্বদাই প্রাণ হাতে নিয়ে থাকতে হয় তারা যেমন হয়ে থাকে। রেমণ্ড কখনো পোপের নামই শোনেনি। টাওস না সাণ্টা-ফে, কোথায় যেন এক বিশপ ছিলেন, ধর্মজগতের গুরুজন হিসেবে রেমণ্ডের কাছে তিনিই ছিলেন একেবারে চরম। রেনাল বলল দু'বছর আগে লারামি কেল্লায় একজন পুরোহিত এসেছিলেন নেজ পার্সে-তে যাবার পথে, তিনি সেখানে সবাইকে তাদের 'অপরাধ স্বীকার' করিয়ে তাদের 'পাপ-মুক্তি' করিয়ে দিয়ে গেছেন। রেনাল বলল, "সেবারে আমাকে উনি বেশ পরিষ্কার করে রেখে গেছেন। আবার উপনিবেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমার এতেই বেশ কাজ চলে যাবে।"

এই বলতে-বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে তারপর সে চীৎকার করে উঠল, "ঐ দেখ দেখ, 'চিতাবাঘ' একটা কৃষ্ণসারকে তাড়া করেছে।"

'চিতাবাঘ' তার কালো-সাদা ঘোড়ায় চড়ে—এটিই সারা গাঁয়ের সেরা ঘোড়াগুলোর অন্যতম—পূর্ণবেগে একটা কৃষ্ণসারকে তাড়া করে এলো, আর কৃষ্ণসারটি তার সম্মুখ দিয়ে বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে পালালো। 'চিতাবাঘ'-এর এই চেষ্টা নিছক বাহাদুরি আর তামাসা মাত্র, কারণ ঐ ছোট জানোয়ারটির সঙ্গে দ্রুতগতিতে পাল্লা দিতে পারে এমন ঘোড়া কমই দেখা যায়। কৃষ্ণসারটা পাহাড় বেয়ে নেমে ছুটে গেল ইণ্ডিয়ানদের আসল জমায়েতের দিকে, যারা নীচেকার সমতলভূমিতে চলাফেরা করছিল। তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল কতকগুলো, আর ঘোড়সওয়ারেরা কৃষ্ণসারটির পালাবার রাস্তা আটকাবার জন্য ছুটে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসারটি হঠাৎ

বাঁ দিকে ঘুরে এত দ্রুতবেগে পালিয়ে গেল যে তার পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সবাই হার মেনে গেল, এমনকি 'চিতাবাঘ'-এর বহুপ্রশংসিত ঘোড়াটি পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যাকে বলে সত্যিকারের শিকার। একটা লোমশ মহিষ নিকটবর্তী একটি গুহা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো, আর তার পিছে পিছে এলো একটি ছিপ্‌ছিপে ইণ্ডিয়ান বালক, জিন বা রেকাব ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চড়ে, আরো জোরে ছোটাবার জন্য ঘোড়াটাকে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে। একটু একটু করে বালকটি তার বিরাটকায় শিকারের নিকটবর্তী হতে লাগল, যদিও মহিষটি তার ছোট্ট লেজটি উর্ধ্বে তুলে বিরাট বপু নিয়ে প্রাণপণে ছুটছিল; তার ফেনায়-ভরা চোয়াল থেকে প্রায় এক ফুট লম্বা জিভটা ঝুলে পড়েছিল। একটু পরেই ছোকরা মহিষটির পাশাপাশি এসে গেল। তখন দেখলাম সে আমাদের বন্ধু 'শিলাবৃষ্টি'। সে লাগামটা ঘোড়ার পিঠের ওপর ফেলে বিদ্যুদ্‌বেগে কাঁধের তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিল।

রেনাল বলল, "আমি বলে দিচ্ছি এ-ছেলে একবছরের ভেতর এ-গাঁয়ের সেরা শিকারী হবে। এই যে, একটা তীর গেঁথে ফেলেছে। আর এই আরেকটা। কেমন হে বুড়ো মহিষ বাবাজি? দু-দুটো তীর বিঁধে বেশ ভালোই লাগছে। তাই না? এই আবার আরেকখানা। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে 'শিলাবৃষ্টি' কিরকম চেঁচায় শোনো। হাঁ হাঁ, খুব লম্ফঝম্প কর, আরেকবার চেষ্টা করে ছাখ বুড়ো। সারাদিন লাফিয়ে মরলেও ওর ঐ টাট্টুঘোড়ার গায়ে শিং বেঁধাতে পারবে না।"

মহিষটা বার বার লাফিয়ে তার আততায়ীকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল, প্রতিবারই ঘোড়াটা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার আক্রমণ এড়িয়ে সরে যেতে লাগল। অবশেষে মহিষটা তার সমস্ত শক্তি এবং আক্রোশ একত্রিত করে ভীষণভাবে এগিয়ে এলো; 'শিলাবৃষ্টি' পালাতে লাগল, আর লোমশ দৈত্যটি ছুটল তাকে তাড়া করে। 'শিলাবৃষ্টি' ছোকরা ঘোড়াটার পিঠে লেপ্‌টে রইল জোঁকের মতো আর আমাদের দিকে পিছু তাকিয়ে হেসে উঠল। পরের মুহূর্তে আবার তাকে দেখলাম মহিষটার পাশে। মহিষটা তখন ক্ষেপে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার চোখ দুটো জলজল করছে, রক্ত ঝরছে মুখ আর নাক থেকে। এইভাবে লড়াই করতে করতে শিকারী আর শিকার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐদিক লক্ষ্য করে অনেকগুলো ইণ্ডিয়ান চলে গেল দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে। আমরা ধীরবেগে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মহিষটা পাহাড়ের ধারে মরে পড়ে আছে, ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়িয়েছে তাকে ঘিরে, আর ছুরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ছোট্ট অস্ত্রগুলো এমন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছিল যে জড়ানো শিরা-উপশিরাগুলো

চটপট্ কাটা হয়ে হাড়গুলো যেন যাদুমন্ত্রে আল্‌গা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, আর দেখতে-দেখতে বিরাট দেহটি পরিণত হলো একটি রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপে। সেই স্তূপ ঘিরে ঐ বর্বর লোকগুলো কোনো সভ্য চোখের পক্ষে দেখবার মতো দৃশ্য ছিল না। তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক বিরাট জঙ্ঘার হাড় মট্‌মট্ করে ভেঙে তার ভেতরকার মজ্জা শুষে গিলে ফেলছিল; কেউ কেউ বা যকৃৎ বা অন্যান্য অংশ কেটে কেটে নেকড়ের মতো ক্ষুধার্তভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল। ওদের রক্তাক্ত মুখগুলো অসহ্য-রকম বীভৎস দেখাচ্ছিল। আমার বন্ধু 'সাদা ঢাল' আমাকে মজ্জাযুক্ত একটুকরো হাড় বেছে দিল; সেটি এমন নিপুণভাবে খোলা যে ভেতরের মজ্জাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আরেকটি ইণ্ডিয়ান আমার সামনে তুলে ধরল মহিষটির পেটের একটি নরম অংশ; কিন্তু এই সৌজন্যের উপহারগুলি আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। লক্ষ্য করলাম একটি ছোট ছেলে মহিষটির চোয়াল আর গলার ওপর ব্যস্তভাবে ছুরি চালিয়ে কয়েকটি উপাদেয় অংশ কেটে বার করে নিল। এটা না বললে অন্যায় হবে যে এই ধরনের বিনা-প্রস্তুতিতে 'যখন তখন' ভোজে মৃত জানোয়ারের দেহের কয়েকটি বিশেষ অংশমাত্র ব্যবহৃত হয়।

আমরা সে-রাতে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করলাম। পরবর্তী দিনের বেশীর ভাগ সময় পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলাম। আমার নোট-বই ভুল করে না থাকলে, তারিখটা ছিল ১৭ই জুলাই। দুপুরে আমরা বৃষ্টির জল জমে তৈরী কয়েকটি জলাশয়ের ধারে বিশ্রাম করে বিকেলবেলায় আবার চলা শুরু করলাম। একদিনে এভাবে দু'বার যাত্রা-শুরু ইণ্ডিয়ানদের সাধারণ নিয়মের বিপরীত। কিন্তু ওরা সবাই শিকারের ক্ষেত্রে যাবার জন্য ভীষণ উৎসুক; সেখানে গিয়ে প্রয়োজনমতো সংখ্যায় মহিষ মেরে বিপজ্জনক এলাকা থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। পর পর এই যাত্রা আর বিশ্রামের সময় যেসব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো এখনকার মতো বাদ দিয়ে যাচ্ছি। শেষোক্ত অপরাহ্নের শেষদিকে আমরা একটি ছোট বালুকাময় নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম; গ্রামবাসীরা এ নদীর নাম বলতে পারল না, কারণ দেশের এ অঞ্চলটির সঙ্গে এদের তেমন পরিচয় নেই। চারধারের প্রেয়ারিগুলো এমন অনুর্বর আর রোদে-পোড়া, যে ঘোড়াদের খাবার মতো যথেষ্ট ঘাস এখানে নেই। আমরা কাজেই বাধ্য হলাম তাঁবু ফেলবার জন্য নদীর তীর বেয়ে তার উৎসের দিকে এগিয়ে চলতে। এ অঞ্চলটা আগেকার চাইতে অনেক বেশী জংলা। সমতলভূমির এখানে ওখানে খাদ আর গর্ত। কোথাও বা মাটি খাড়া হয়ে হঠাৎ নেমে গেছে। মেনে-সীলা এক অদ্ভুত অলৌকিক প্রত্যাদেশের সাহায্য নিল মহিষ কোথায় পাওয়া

যাবে সেই খবর জানতে। অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে ঘাসের ওপর বসে ধূমপান করতে করতে আর কথা বলতে বলতে বুড়ো হঠাৎ একটা মস্ত কালো-সবুজ ঝিঁঝিপোকা হাতে তুলে নিল। এই পোকাগুলোকে ডাকোটারা যে নামে ডাকে তার মানে হচ্ছে 'যারা মহিষ দেখিয়ে দেয়'।

এই মোটাসোটা পতঙ্গটিকে হাতের পাঁচ আঙুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরে বুড়ো খুব মনোযোগী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শুধাল, "বলো তো বাবা, কাল মহিষ পেতে হলে কোন্‌দিকে আমাদের যেতে হবে?" ঝিঁঝিপোকাটা অস্বস্তিতে তার লম্বা শিংগুলোকে নাড়াতে লাগল। ঐ শিং নেড়েই সে দেখিয়ে দিল—অথবা দেখিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করে নেওয়া গেল—পশ্চিম দিকে। মেনে-সীলা তখন আস্তে আস্তে পোকাটিকে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিয়ে মহা আনন্দে হেসে বলল কাল পশ্চিম দিকে গেলেই আমরা নিশ্চয় অনেক মহিষ মারতে পারব।

সন্ধ্যার দিকে আমরা বেশ একটি সতেজ সবুজ মাঠে এসে পড়লাম। এই মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে অগভীর নদীটি, তার পাড়গুলো উঁচু আর খাড়া। ইণ্ডিয়ানরা খাড়া পাড় বেয়ে নেমে গেল; আমি ছিলাম পিছনে, তাই পাড়ে পৌঁছলাম সবার শেষে। পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বল্লমের ঝিক্‌মিক্ আর হাওয়ায় দোলানো পালক। নীচের স্রোত পার হচ্ছিল অনেক মানুষ আর ঘোড়া, স্রোতের ওপারে মাঠের ওপর দেখলাম চঞ্চল ইণ্ডিয়ানদের ভিড়। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, তার মৃদু আলো এসে পড়ছিল পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে।

আমি রেনালকে বললাম, "অবশেষে তাঁবু ফেলবার একটি ভালো জায়গা পাওয়া গেছে।"

রেনাল শ্লেষের স্বরে বলল, "হ্যাঁ, ভালো জায়গা তো বটেই। বিশেষ করে স্নেক-যোদ্ধাদের একটি দল যদি কাছাকাছি থাকে আর ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের ওপর তীর হানবার মতলব করে। এই গর্তের ভেতরে তাঁবু ফেলার বুদ্ধি কিন্তু আমার নয়।"

ইণ্ডিয়ানদেরও উদ্বিগ্ন মনে হলো। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর অস্তগামী সূর্যের আলোয় দেখা যাচ্ছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক নগ্নদেহ যোদ্ধা অদূরবর্তী এলাকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রেমণ্ড আমাকে বলল যুবকদের ভেতর অনেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে আশেপাশের জায়গাগুলো পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে।

সন্ধ্যার ছায়া যখন উঁচু পাড় পর্যন্ত পৌঁছল তখন তাঁবু খাটানো শুরু হলো, গ্রামে স্তব্ধতা এবং শৃঙ্খলা দেখা দিল। হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল; পুরুষ, স্ত্রীলোক আর

শিশুরা কৌতূহলী মুখে ছুটে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে তাকাল—ঐ দিকের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকেই চীৎকারটা এসেছিল। আমি অনেকদূরে দেখতে পাচ্ছিলাম নীচু পাহাড়ের গা বেয়ে কতকগুলো বিরাট কালো দেহ এগিয়ে চলেছে। সেগুলো চলে যেতেই আরো কতকগুলো এলো। এগুলো মহিষীর ঝাঁক। শিকারের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত পৌছানো গেছে, লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে কালকের শিকারটা ভালোই জমবে। শ্রান্ত ও অবসন্ন বোধ করে আমি কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতেই শুয়ে পড়লাম। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে রেমণ্ড আমাকে একটা মজার খেলা দেখতে ডেকে নিয়ে গেল। কতকগুলো ইণ্ডিয়ান গ্রামের পশ্চিম ধারে কতকগুলো তাঁবুর ধারে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল, আর সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা অন্ধকারে দেখলাম কিছুদূরে দুটি মস্ত কালো জানোয়ার ভারী দেহ নিয়ে গম্ভীরভাবে হেলেদুলে ঠিক আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ও-দুটি মহিষ। হাওয়া বয়ে আসছিল ওদের দিক থেকে গ্রামের দিকে, আর ওরা এমনই অন্ধ আর নির্বোধ যে শত্রুর দিকেই এগিয়ে আসছিল শত্রুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতনভাবে। রেমণ্ড আমাকে বলল দুটি যুবক দুটি বন্দুক হাতে আমাদের বিশ গজ সামনে একটা গিরিপথে লুকিয়ে আছে। মহিষ দুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, বিরাট ওজনের দেহ দুটিকে যেন দেমাক করেই এদিকে ওদিকে ভারিক্কি চালে দুলিয়ে। ইণ্ডিয়ান যুবক দুটি যে গুহায় ওৎ পেতে লুকিয়ে ছিল, তারই অল্প দূরে এসে যেন তাদের মনে একটু সন্দেহ উদিত হলো কোথায় যেন কী একটা গোলমাল রয়েছে। দুটিই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল; একটু নড়ছে না, ডাইনে-বাঁয়েও তাকাচ্ছে না। অবশেষে দুটোর মধ্যে যেটার বুদ্ধি বেশী, তার বোধহয় মনে হলো এবার সরে পড়ার সময় এসেছে। এই ভেবে সে খুব আস্তে আস্তে, যেন খুব গভীরভাবে বিবেচনা করে ঘুরতে শুরু করল এমনভাবে যেন একটি কেন্দ্রবিন্দুর ওপর ভর করে ওর দেহটা ঘুরছে। আস্তে আস্তে ওর কুৎসিত বাদামী রঙের দেহের একটা পাশ দেখতে পাওয়া গেল। হঠাৎ, যেন মাটির তলা থেকেই উঠে এলো একরাশ সাদা ধোঁয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা জোরালো আওয়াজ। বুড়ো মহিষটা ভারি অমার্জিত ভঙ্গিতে একটা লাফ দিল আর ছুট্ লাগাল। এই দেখে ওর সঙ্গীটাও খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে যেতেই অন্য ইণ্ডিয়ানটি গুহার ভেতর থেকে ওর ওপর গুলী চালাল। দুটো মহিষই তখন পুর্ণবেগে ছুটে পালাতে লাগল, আর গ্রামের আদ্ধেক ছেলেমেয়ে চীৎকার করতে করতে তাদের পিছু নিল। প্রথম মহিষটা শীগ্‌গীরই থেমে পড়ল, তারপর তার অনুসরণকারীরা দূর থেকে দেখল বেচারা ঘুরে একপাশে

কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। অন্য মহিষটি তেমন মারাত্মকভাবে আহত হয়নি, সে দৌড়ে পাহাড়ের আড়ালে পালিয়ে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে নেমে এলো পুরো অন্ধকার। আমি শয্যাগ্রহণ করে ঘুমের প্রতীক্ষায় রইলাম। দেহ অসুস্থ থাকলেও আগামীকালের শিকার-অভিযানের কথা ভেবে মনটা উৎসাহে ভরে রইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিকার-শিবির

ভোর হবার অনেক আগেই ইণ্ডিয়ানরা তাদের তাঁবু ভেঙে ফেলল। মেনে-সীলার তাঁবুর স্ত্রীলোকরাই যথারীতি অন্যান্য সকলের আগে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো। দেখলাম বুড়ো নিজেও নিবু-নিবু আগুনের ধারে বসে বসে ঐ আগুনের ওপর হাত গরম করছিল, কারণ ভোরটা বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে ছিল। অন্যান্যবারের চাইতে এবারকার যাত্রার প্রস্তুতি যেন অনেক বেশী বিশৃঙ্খল। কতকগুলো পরিবার যখন জায়গা ছেড়ে রওনা হচ্ছে, তখনও অনেক পরিবারের তাঁবুতে হাতই লাগানো হয়নি। এই দেখে বুড়ো মেনে-সীলা ধৈর্য হারিয়ে ফেলল; গাঁয়ের মাঝখানে গিয়ে পোশাকটাকে আঁটসাঁট করে গায়ে জড়িয়ে সে গাঁয়ের লোকদের উদ্দেশে একটি বক্তৃতা ঝাড়ল। সে বলল, "এখন আমরা রয়েছি শত্রুপক্ষের শিকার-ভূমিতে। এটা ছেলে-খেলার সময় নয়। আমাদের এখন আরো চটপটে, আরো একতাবদ্ধ হতে হবে।"

বুড়োর বক্তৃতায় কিছু কাজ হলো। কর্তব্যে যারা অবহেলা করছিল তারা তাড়াতাড়ি তাদের তাঁবু খুলে ফেলল আর মালবাহী ঘোড়াগুলোর ওপর বোঝা চাপাল। তারপর যখন সূর্য উঠল, ততক্ষণে এখানকার ডেরা তুলে ইণ্ডিয়ানরা সবাই রওনা হয়ে গেছে।

এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এখানকার চাইতে আরো ভালো এবং আরো নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেওয়া। আমরা তাই নদীতীর বেয়ে স্রোতের বিপরীত দিকে তিন-চার মাইল এগিয়ে গেলাম। সেখানে থেমে আবার গ্রাম-পত্তনের কাজ শুরু হলো। স্ত্রীলোকেরা তাঁবু খাটাবার কাজে লেগে গেল। কিন্তু একটি যোদ্ধাও নিজের ঘোড়া থেকে নামল না। প্রত্যেকটি পুরুষ তখন নিকৃষ্ট ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেরা ঘোড়াগুলোকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলছিল, অথবা বালকদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছিল। ছোট্ট

ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এই যোদ্ধারা সমতলভূমির ওপর দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেল। আমি তখনও কিছু খাইনি, এবং আহারে আরো সংযম পালন করবার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও পোষণ করছিলাম না, তাই আমার গৃহস্বামীর তাঁবুতে —তার পরিবারের স্ত্রীলোকেরা আশ্চর্য দক্ষতায় অতি দ্রুতবেগে এ তাঁবু খাড়া করে ফেলেছিল—ঢুকে তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় বসে ইসারায় জানালাম আমি ক্ষুধার্ত। ফলে অনতিবিলম্বেই আমার সামনে এসে গেল একটি কাঠের পাত্র, তাতে শুকনো মাংসের তৈরী পুষ্টিকর খাদ্য, যাকে উত্তরাঞ্চলের পর্যটকরা বলে 'পেমিক্যান' আর ডাকোটারা বলে 'ওয়াস্না'। উপবাস ভঙ্গ করবার জন্য এই খাবার একমুঠো খেয়ে নিয়ে আমি তাঁবু থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলাম শিকারীদের শেষ দলটি অদূরের পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি পলিনের পিঠে চড়ে তাদের অনুসরণ করলাম। আমি যে তখন ঘোড়ায় চড়ছিলাম তা গায়ের জোরে নয়, ভারসাম্য বজায় রেখে। পাহাড়ের মাথা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেই বিরাট বিস্তৃত প্রেয়ারি অঞ্চল, যার ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছিল কয়েকদল নগ্নদেহ ঘোড়সওয়ার। সবচেয়ে কাছে যে দলটি ছিল আমি গিয়ে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হলাম। এক মাইল যেতে-যেতেই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলগুলো একত্রিত হয়ে আমরা একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ বড় দল হয়ে গেলাম। সবাই অতি আগ্রহে ছট্‌ফট্‌ করছে। প্রত্যেক শিকারী তার ঘোড়াকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে দিল, সবাই যেন ভাবছে কে কার আগে শিকারের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে। ইণ্ডিয়ানদের এইজাতীয় অভিযানে সাধারণতঃ এইরকমই হয়ে থাকে; এক্ষেত্রে আরো বেশী, তার কারণ গ্রামের প্রধান সর্দার অনুপস্থিত, এবং উপস্থিত 'যোদ্ধা'দের সংখ্যাও ছিল খুবই কম; এই 'যোদ্ধা'রাই ইণ্ডিয়ানদের ভেতর পুলিশের কাজ করে, এরাই মহিষ-শিকার পরিচালনা করে। কেউই ডান দিকে বা বাঁ দিকে গেল না। আমরা দ্রুতবেগে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললাম অনেক চড়াই উৎরাই বেয়ে, অনেক ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে। দেড় ঘণ্টা ধরে একই লাল ঘাড়গুলো আর লম্বা কালো চুলগুলো আমার সামনের ঘোড়াগুলোর এগিয়ে চলার ছন্দে ছন্দে উঠতে নামতে লাগল। কারো মুখেই প্রায় কথা ছিল না, শুধু একবার দেখেছিলাম একটি বৃদ্ধ লোক রেমণ্ডকে খুব ধমকাচ্ছে কারণ রেমণ্ড এমন সময় তার বন্দুকটা ফেলে রেখে চলে এসেছে যখন হয়তো ঠিক সেদিনই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা সেজ-ঝোপের প্রাচুর্যে ভরা একটি সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় আগের ঘোড়সওয়াররা হঠাৎ যেন থেকে তালে ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। উষর শুষ্ক মাটি ফেটে ঝুরঝুর করে পড়ে গেল

একটি গভীর খাদে, আমরাও পর পর এই খাদেই পড়ে গেলাম, আর সেই খাদের তলা বেয়েই এগিয়ে চললাম। শেষকালে এমন জায়গায় এলাম, যেখানে একটি একটি করে ঘোড়াগুলো বেরিয়ে আসতে পাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটি প্রশস্ত অগভীর নদীতে। এ নদীর তলার শক্ত বালুর ওপর দিয়ে স্বল্প জলের স্রোত পেরিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, তখন বর্বর ঘোড়সওয়ারগুলোর মধ্যে অনেকেই নেমে পড়ল, বালুর ওপর হাঁটু গেড়ে বসল, চট্ করে স্রোতের জল পান করে নিল, তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুট্।

ইতিমধ্যে আমাদের স্কাউটরা আমাদের দল ছাড়িয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল। তাদের আমরা এখন দেখতে লাগলাম পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায়। তারা তাদের পোশাকগুলো দুলিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে মহিষ দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারা গেল ওগুলো শুধু দল থেকে ছিটকে-পড়া কতকগুলো মহিষ মাত্র। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু দেখেই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিল। শেষকালে আমরা দেখলাম এই সন্ধানী 'স্কাউট'দের অনেকে একসঙ্গে ইসারা করছে, সাহসের সঙ্গে পাহাড়ের মাথায় না দাঁড়িয়ে একটু নীচে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেন পাহাড়ের ওধার থেকে তাদের দেখা না যায়। পরিষ্কার বোঝা গেল ভালো শিকার দেখতে পাওয়া গেছে। আগ্রহে অধীর ইণ্ডিয়ানরা এখন তাদের শ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিয়ে আরো জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। আমার ঘোড়া পলিন তখনো অসুস্থ এবং দুর্বল, ভয়ানকভাবে গোঙাতে লাগল ; তার হল্দে দেহটা ঘামে চট্চটে হয়ে উঠল। আমরা মাঝখানে একটা নীচু পাহাড়ের ওপর ভিড় করে রয়েছি, এমন সময় শুনলাম রেনাল আর রেমণ্ড বাঁ দিক থেকে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। ঐদিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা জন কুড়ি বিশ্রী চেহারার ইণ্ডিয়ানদের একটা দলের পিছনে পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলেছে। এই ইণ্ডিয়ানরা রেনালের ইণ্ডিয়ান স্ত্রী মার্গটের আত্মীয়-স্বজন ; এরা এই সবে মিলে শিকারে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে দূরের একটা ফাঁকা জায়গার দিকে যাচ্ছিল। সেখানে তারা কিছু মহিষ দেখতে পেয়েছে, যাদের মেরে ওরা নিজেরাই আত্মসাৎ করবে ঠিক করেছে। ওদের ডাকের জবাবে আমি রেমণ্ডকে হুকুম করলাম ফিরে এসে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে। রেমণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার হুকুম মানল। রেনাল আশা করে ছিল সে তার দল নিয়ে যেসব মহিষ মারবে তাদের ছাল ছাড়ানো, কেটে খণ্ড খণ্ড করা আর তাঁবুতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রেমণ্ডের সহায়তার ওপর নির্ভর করবে। সে এবার চেঁচিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়ে বলল বাকি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে গেলে আমরা শিকারে

মতো শিকার কিছুই দেখতে পাব না। যাই হোক, রেমণ্ড আমার সঙ্গেই এলো; আমরা দুজন বড় দলটারই অনুসরণ করলাম। তাই দেখে ভীষণ রেগে রেনাল তার ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে দিল ওর ঐ নোংরা আত্মীয়গুলোর পিছনে।

এদিকে ইণ্ডিয়ান শিকারী দল, সংখ্যায় প্রায় একশো, আমাদের বেশ কিছু আগে আগে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের ধারে তারা সবাই গিয়ে থামল যেখানে সন্ধানী স্কাউটরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরা তখন গিয়ে তাদের ধরতে পারলাম। এখানে প্রত্যেকটি শিকারী তার শ্রান্ত বাহনটির পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, আর সঙ্গে নিয়ে আসা তাজা ঘোড়াটির পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠল। সারা দলের ভেতর একটিও লাগাম বা জিন ছিল না। মহিষ-চর্মের পোশাক ঘোড়ার পিঠের ওপর চাপানো হয়ে সেটাই জিনের কাজ করল, আর দড়ির মতো করে পাকানো চুলের গোছা ঘোড়ার চোয়ালে এঁটে ওটাকেই লাগাম বানানো হলো। প্রত্যেক ঘোড়ার মাথায় আর লেজে ঝুলানো হলো ঈগলপাখির পালক, সাহস আর দ্রুতগতির চিহ্ন হিসেবে। ঘোড়সওয়ারের পরনে পোশাক বলতে ছিল শুধু কোমরে জড়ানো একটি হাল্‌কা কোমরবন্ধ আর পায়ে একজোড়া মোকাসিন। তার হাতে ছিল একটি ভারী চাবুক, তার হাতলটা এল্‌ক্‌-হরিণের নিরেট শিং দিয়ে তৈরি আর বাকি অংশটা গেরো-দেওয়া মহিষের চামড়া একফালি। এই চাবুক একটি বন্ধনীর সাহায্যে শিকারীর কব্‌জির সঙ্গে আট্‌কানো। তার হাতে ধনুক, পিঠে ঝুলছে চিতাবাঘ বা ভোঁদড়ের চামড়ার তৈরী তূণ। এইভাবে সজ্জিত হয়ে শিকারীদের মধ্য থেকে জন ত্রিশেক বাঁ দিকে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে, পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ঘুরে ওদিকে চলে যাবে বলে, যেন মহিষগুলোকে একই সময়ে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা যায়। অবশিষ্ট শিকারীরা অধীরচিত্তে অপেক্ষা করে রইল কতক্ষণে তাদের বন্ধুরা ঠিক জায়গামতো গিয়ে পৌঁছবে। তারপর আমরা একসঙ্গে চড়াই বেয়ে উঠে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছলাম। তখনই প্রথম ওধারের সমতলভূমিতে মহিষ দেখতে পেলাম।

এগুলো একঝাঁক মহিষী, সংখ্যায় চার-পাঁচশো। ওরা ভিড় করে রয়েছে উপত্যকার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরিঝিরি বয়ে চলা একটি প্রশস্ত স্রোতস্বিনীর ধারে। এই উপত্যকাটি বেশ বড় আর বৃত্তাকার, রোদে পুড়ে পুড়ে মাটি ফেটে গেছে মাঝে মাঝে, বুকে সবুজের চিহ্ন খুবই অল্প, আর চারদিকে উঁচু সবুজ-চিহ্নহীন পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। এদেরই একটির ফাঁক দিয়ে আমরা দেখলাম আমাদের বন্ধু শিকারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পড়ছে সমতলভূমির ওপর। বাতাস বয়ে আসছিল ঐ দিক থেকে। মহিষগুলো শিকারীদের আসার আওয়াজ পেয়ে চলে যেতে শুরু করেছিল,

কিন্তু খুব আস্তে আস্তে, আর একসঙ্গে ঘন হয়ে। তারপর পাহাড় বেয়ে নামতে-নামতে অন্যান্য জিনিসের দিকে এত বেশী নজর পড়েছিল যে নীচে গিয়ে শিকারীদের সঙ্গে মিলবার আগে পর্যন্ত মহিষগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিনা মনে নেই। অনেকগুলো বুড়ো মহিষ আমাদের আসবার সাড়া পেয়েই তাদের রক্ষণাধীনে যে জানোয়ারগুলো ছিল—নিতান্ত অশোভন কাপুরুষোচিত ভাবেই তাদের ফেলে রেখে সেই স্রোতস্বিনীর বালু পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাতে শুরু করল। একটা বুড়ো পড়ে রইল পিছনে। কোনো এক দুর্ঘটনায় তার সামনের একটি পা ভেঙে গিয়ে থাকবে, সেই পা-টাই অকেজো হয়ে ঝুলছিল। ওর সেই তিন ঠ্যাঙে চলার ভঙ্গি এমন হাস্যকর যে আমি থেমে ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে না থেকে পারলাম না। আমি কাছে যেতেই সে প্রত্যেকবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই প্রায় উল্‌টে পড়তে লাগল। ওদিকে ইণ্ডিয়ান শিকারী দলের সবাই আমার পুরো একশো গজ আগে এগিয়ে গেছে। আমি চাবুক মেরে পলিনকে জোর কদমে ছুটিয়ে ঠিক সময়মতোই গিয়ে ওদের ধরে ফেললাম, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে প্রত্যেকটি শিকারী তার ঘোড়াটাকে খুব জোরে আঘাত করতেই ঘোড়াটা তীরবেগে সামনের দিকে ছুটল। তারপর সবগুলো মহিষকে একসঙ্গে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যেই আমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একসঙ্গে মহিষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পায়ের আওয়াজ আর চীৎকার শুনতে শুনতে দেখলাম কালো কালো জানোয়ারগুলো পায়ে পায়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ইতস্ততঃ ছুটছে আর ঘোড়সওয়ার শিকারীরা ছুটছে তাদের তাড়া করে। আমরা এদিক থেকে তাড়া করছিলাম, আর ওদিক থেকে আমাদের সঙ্গীরা ঠিক সেইসময় বিভ্রান্ত আর আতঙ্কগ্রস্ত জানোয়ারগুলোকে একসঙ্গে আক্রমণ করছিল। হৈহৈ আর বিশৃঙ্খলা অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হলো। ধুলোর মেঘ কেটে গেল, মহিষগুলো যেন একটি সাধারণ কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছুটেছে একক আলাদা ভাবে অথবা সারি বেঁধে, আর ইণ্ডিয়ানরা ভীষণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চীৎকার করতে করতে মহিষগুলোর গায়ে তীরের পর তীর হানতে লাগল। মৃতদেহের ভিড় জমে গেল মাটির ওপর। এখানে সেখানে দেখতে লাগলাম আহত মহিষ দাঁড়িয়ে, তাদের সারা দেহ রক্তাক্ত, গায়ে বেঁধা তীরের পালক-গুলো হাওয়ায় উড়ছে। আমি তাদের ভেতরে যেতেই তাদের চোখগুলো জ্বলে উঠতে লাগল আর তেড়ে এসে আমার ঘোড়াটাকে আহত করবার ক্ষীণ চেষ্টা করতে লাগল।

সেই ভোরে আমি একটি দার্শনিকোচিত শপথ গ্রহণ করে তাঁবু ত্যাগ করেছিলাম।

আমার বা আমার ঘোড়াটির স্বাস্থ্য তখন এই শিকারের ধকল সইবার উপযুক্ত ছিল না, আমি তাই ঠিক করেছিলাম এই শিকারে আমি শুধু দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করব মাত্র। কিন্তু ঘোড়া আর মহিষগুলোর ছুটোছুটি, হৈহুল্লোড় আর ঐ ধুলোর ঝড় দেখে আমি চুপচাপ নির্লিপ্ত বসে থাকতে পারলাম না ; চার-পাঁচটা মহিষকে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখেই আমি পলিনকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে ওদের পিছু নিলাম। আমরা ছুটে চললাম জল আর বালুর ওপর দিয়ে, তারপর চড়াই বেয়ে পাড়ে উঠে ওধারের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়েই ওদের তাড়া করে ছুটলাম। কিন্তু মনের ভেতরের তেজ আর বাইরের চাবুক, এ দুয়ে মিলেও পলিনের হারানো শক্তির লোকসান পুরিয়ে দিতে পারল না। আমরা পলাতকদের দূরত্ব এক ইঞ্চিও কমাতে পারলাম না। অবশেষে তারা এমন একটা খাদের ধারে এসে পড়ল যা লাফিয়ে পার হওয়া যায় না, তাই হঠাৎ তাদের বাধ্য হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে যেতে হলো। তখন সবচেয়ে পিছনে যে মহিষীটা ছিল, আমি তার দশ কি বারো গজের মধ্যে এসে পড়লাম। মহিষীটা তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ভীষণ রাগে এমনভাবে ফুঁসে উঠল যেন এখ্খুনি তেড়ে আসবে। আমি গুলী চালালাম ; ঘাড়ে আহত হয়ে সে উল্‌টে খাদের ভেতর পড়ে গেল, যেখানে তার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা তার আগে নেমে গিয়েছিল। তারা খাদের তলা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল, আমি তাদের কালো পিঠগুলোর ওঠা-নামা দেখতে পাচ্ছিলাম। একটি একটি করে তারা খাদ ছাড়িয়ে উঠে ওধারে গিয়েই আবার ছুট লাগাল, আহত মহিষীটা সবার পিছনে।

পিছন ফিরে দেখলাম অশ্বতরের পিঠে চড়ে রেমণ্ড আসছে আমার দিকে। আমরা মাঠের ওপর দিয়ে একসঙ্গে ঘুরে গুনে দেখলাম কয়েক ঝুড়ি মৃতদেহ পড়ে আছে সমতলভূমির ওপর, খাদগুলোর তলায় আর নদীর গতিপথের বালুর ওপর। অনেক দূরে তখনো দেখতে পাচ্ছিলাম ঘোড়সওয়ারদের আর মহিষ-মহিষীদের দৌড় চলছে, তাদের পিছনে উড়ছে ধুলো, আর পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠে সারি সারি ভীত জানোয়ার দ্রুতবেগে পালাবার চেষ্টা করছে। শিকারীরা ফিরে আসতে লাগল। পাহাড়ের পিছনে যারা ঘোড়াগুলোকে ধরে রেখেছিল, সেই ছোকরারাও এসে হাজির হলো। তারপর মরা জানোয়ারগুলোর ছাল-ছাড়ানো আর দেহগুলোকে কেটে খণ্ড খণ্ড করার কাজ শুরু হলো সারা মাঠ জুড়ে। আমি দেখলাম আমার গৃহস্বামী কোংরা-টোঙ্গা ('বড় কাক') নদীর ওধারে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে একটা মহিষীর সামনে ; একটু আগে এই জানোয়ারটিকে সে হত্যা করেছে। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে যখন গেলাম, সে তখন মৃতদেহ থেকে একটা তীর টেনে

বার করে আনল ; তীরটি প্রায় পুরোপুরি জানোয়ারটির দেহের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, বাইরে বেরিয়ে ছিল শুধু এ-মাথার একটুখানি খাঁজকাটা অংশ। আমি ওটা ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। ইণ্ডিয়ানরা কী আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে আর কী ভীষণ জোরে তীর ছোঁড়ে, তার একটা মোটামুটি নিদর্শন হিসেবে তীরটা এখনো আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে।

জানোয়ারগুলোর চামড়া আর মাংস ঘোড়াগুলোর ওপর চাপানো হলো, তারপর শিকারীরা রওনা হলো। রেমণ্ড আর আমিও, এই দৃশ্য দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠে, গ্রামের দিকে রওনা হলাম, মাঝখানের মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে। আমাদের চোখে কোনো তৈরী পথ পড়ল না, এমন কোনো চিহ্নও দেখলাম না যা আমাদের পথের নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু মনে হলো দূরের দিগন্তরেখার ঠিক কোন্ জায়গাটা লক্ষ্য করে আমাদের এগোতে হবে এবিষয়ে রেমণ্ডের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তাকে নির্দেশ দিচ্ছে। আমাদের চারদিকেই কৃষ্ণসার লাফালাফি করছিল, মহিষ কাছাকাছি থাকলেই ওরা যেমন করে ; ওরা যেন ওদের স্বাভাবিক ভয়ভাবটা ভুলে গিয়েছিল। ওরা দলে দলে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গিয়ে পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে আমাদের তাকিয়ে দেখতে লাগল। অবশেষে আমরা চিনতে পারলাম সাদা উঁচু পাহাড় আর বুড়ো পাইন গাছ, যেগুলো—আমাদের পরিষ্কার মনে পড়ল—আমাদের তাঁবুর জায়গার ঠিক ওপরে। তাঁবুটা অবশ্য তখনো চোখে পড়ছিল না। তারপর ঘাসে ঢাকা একটা উঁচু জায়গায় উঠতেই দেখতে পেলাম আমাদের পায়ের তলায় সমতলভূমির ওপর ইণ্ডিয়ান তাঁবুগুলো দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে, ঝড়বৃষ্টিতে আর ধোঁয়ায় মলিন।

আমি আমার আশ্রয়দাতা কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতে প্রবেশ করলাম। তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খাদ্য আর জল এনে দিল, আর শোবার জন্য মেঝের ওপর মহিষ-চর্মের একটা পোশাক পেতে দিল। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলাম, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক বাদে কনুই পর্যন্ত রক্তে রাঙা হাতে কোংরা-টোঙ্গা ঢুকতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘরের বাঁ ধারে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল। তার স্ত্রী তাকে হাত-মুখ ধোবার জন্য একপাত্র জল দিয়ে তার সামনে ধরে দিল একপাত্র সিদ্ধ মাংস ; আর সে যখন খেতে শুরু করল তখন তার পা থেকে রক্তাক্ত মোকাসিন-জোড়া খুলে নিয়ে নতুন একজোড়া মোকাসিন পরিয়ে দিল। তারপর কোংরা-টোঙ্গা লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর শিকারীরা দু-তিনজন করে ফিরে এসে ঘোড়াগুলোকে তাদের স্ত্রীদের

হাতে সঁপে দিয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল, সেদিনের মতো তাদের কর্তব্য পুরোপুরিভাবে করে এসেছে, প্রত্যেকের মুখে এই ভাব। তাদের স্ত্রীরা তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর থেকে বোঝাগুলো নামিয়ে ফেলল ; প্রত্যেকটি তাঁবুর সামনে জমা হলো মাংস আর চামড়ার স্তূপ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল দ্রুতবেগে, সারা গ্রাম আলোকিত হয়ে উঠল এখানে ওখানে জ্বালা আগুনের আলোয়। মাংসের স্তূপগুলোকে ঘিরে বসে স্ত্রীলোক আর শিশুরা মাংসের ভালো ভালো অংশগুলো বেছে বার করতে লাগল। তারপর সেগুলোর কতক কতক শিকে গেঁথে নিয়ে আগুনে সেঁকতে লাগল, মাঝে মাঝে সেটুকুও অনাবশ্যক ভেবে কাঁচাই খেতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের ধারে বসে ওরা এই বর্বর ভোজে মেতে রইল।

কয়েকজন শিকারী কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুর অগ্নিকুণ্ড ঘিরে সেদিনকার শিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। বাকিদের মধ্যে এলো মেনে-সীলা। বুড়োর বয়স তখন আশিবছর পুরো হয়ে গেছে, তবু সে সেদিনের শিকারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। সে বড়াই করে বলল সেই ভোরে সে দুটি মহিষী মেরেছে ; আরেকটিও মারতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে এমনভাবে চোখে ঢুকেছিল যে হাতের তীর-ধনুক ফেলে দিয়ে তাকে চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। বুড়ো যখন বসে বসে তার এই বাহাদুরির গল্প বলছিল তখন আগুনের আলো এসে পড়ছিল তার বলি-চিহ্নিত মুখে আর শীর্ণ দেহের ওপর। বুড়োর গল্প বলার অদ্ভুত ভঙ্গি দেখে তাঁবুর সবাই হেসে উঠল।

বুড়ো মেনে-সীলা ছিল সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একজন, যাদের সঙ্গে নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে আমি একা থাকতে পারতাম ; আর সে-ই ছিল একমাত্র ইণ্ডিয়ান, যার কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে নিশ্চিত ধরে নিতাম না যে এই উপহার দেবার পিছনে কোনো বিশেষ মতলব আছে। সে ছিল শ্বেতাঙ্গদের মস্ত বন্ধু ; শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গ সে পছন্দ করত, আর অত্যন্ত গর্বিত হতো তাদের কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে। একদিন তার ছেলের তাঁবুতে সে আর আমি একসঙ্গে বসে আছি, এমন সময় সে আমাকে বলল তার মতে বীভাররা আর শ্বেতাঙ্গ মানুষেরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ; তার নিশ্চিত ধারণা এরা একই—এ ধারণা তার হয়েছে অনেকদিন আগেকার একটি অভিজ্ঞতা থেকে। এই বলে সে নিম্নলিখিত কাহিনীটি শোনাতে শুরু করল। পাইপটা হাত ঘুরতে ঘুরতে পালাক্রমে তার হাতে এলে সে সেই সুযোগে—বুড়ো যখন পাইপ টানতে ব্যস্ত—রেনাল তার ঠিক আগে যেটুকু বলা হয়েছে, কাহিনীর সেই অংশটুকু আমাকে তর্জমা করে শোনাতে লাগল।

কিন্তু বুড়ো এমনভাবে অভিনয় করে করে ভাব ফুটিয়ে কাহিনী বলল যে, তর্জমা ছাড়াও কাহিনী বুঝতে খুব অসুবিধা হতো না।

বুড়ো বলল তার বয়স যখন খুব কম, আর তখন পর্যন্ত একটি শ্বেতাঙ্গ মানুষও সে ছাখেনি, সে তিন-চারজন সঙ্গী নিয়ে বীভার-শিকারে বেরিয়েছিল। সে হামাগুড়ি দিয়ে একটা বড় বীভার-গহ্বরে ঢুকে গিয়েছিল, ভিতরে কী আছে দেখবার জন্য। কখনো হাতে আর হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো সাঁতার কেটে, কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে শরীর টেনে টেনে তাকে এগোতে হলো। এইভাবে সে মাটির তলায় অনেকটা এগিয়ে গেল। সেখানে যেমন অন্ধকার তেমন ঠাণ্ডা, হাওয়া-চলাচলও কম; ক্রমে তার যেন দম-বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল, সে কোনোরকমে শুনতে পেল তার বাইরের সঙ্গীদের কণ্ঠস্বর। তারা তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়ে তার মৃত্যু-গীতি গাইতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রথমে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, একটু পরেই সে যেন সাদা কী জিনিস দেখতে পেলো চোখের সামনে। ক্রমে সে পরিষ্কার দেখতে পেলো কালো জলের পুকুরের কিনারায় বসে আছে একটি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর ছুটি শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীলোক। আতঙ্কিত হয়ে সে ভাবল এইবার বিদায় নিয়ে পালাবার সময় হয়েছে। অনেক কষ্টে পিছিয়ে এসে বাইরের আলোয় বেরিয়েই সে মাটির ওপর ঠিক সেই জায়গায় চলে গেল যার নীচে মাটির তলায় পুকুরের ধারে সে তিনটি রহস্যময় সাদা মানুষ দেখতে পেয়েছিল। এইখানে সে তার লড়াই করবার অস্ত্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে চুপচাপ বসে দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো একটা পুরুষ বীভারের নাক। মেনে-সীলা সেটাকে চট্ করে ধরে বাইরে টেনে আনতেই ছুটো স্ত্রী-বীভার গর্ত থেকে মুখ বার করল। মেনে-সীলা তাদেরও তেমনি খপ্ করে ধরে টেনে বার করে আনল। কাহিনীটির আসল ভিত্তি বোধহয় স্বপ্ন, কিন্তু কাহিনী শেষ করে বুড়ো বলল, "এই তিনটি বীভার নিশ্চয় ঐ তিনটি সাদা মানুষ, যাদের আমি জলের কিনারায় বসে থাকতে দেখেছিলাম।"

এ গ্রামের কিংবদন্তী আর রূপকথার ভাণ্ডারী ছিল এই বুড়ো মেনে-সীলা। আমি কিন্তু তার কাছ থেকে কয়েকটি টুকরো কাহিনী মাত্র আদায় করতে পেরেছিলাম। সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মতোই সেও ভীষণ কুসংস্কারগ্রস্ত; কাহিনী না শোনানোর নানা অজুহাত বার করত সে। বলতো: "গ্রীষ্মকালে গল্প-বলা খুব খারাপ। আগামী শীতকাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমি যা জানি সব শোনাবো আপনাকে।

এখন আমাদের যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে বেরিয়ে যাচ্ছে ; তুষারপাত শুরু হবার আগে যদি আমি গল্প বলতে বসি তাহলে আমাদের যুবকেরা সবাই নিহত হবে।"

কিন্তু থাক্ এসব অবান্তর কথা। আমরা এইখানেই রইলাম পাঁচদিন। এর ভেতর তিনদিন শিকারীরা প্রায় সারাদিনই শিকারে ব্যস্ত রইল ; প্রচুর পরিমাণে মাংস আর চামড়া সংগৃহীত হলো। কিন্তু সারাটা গ্রামে আতঙ্ক জেগে রইল, সবাই সর্বদা সতর্ক। যুবকেরা এ অঞ্চলের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা আর তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত রইল, বুড়োরা খুব মনোযোগ দিতে লাগল নানারকম চিহ্ন আর লক্ষণাদির ওপর, বিশেষ করে তাদের স্বপ্নের ওপর। শত্রুরা কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের উপস্থিতির খবর পেয়েছে, এই ভেবে আমরা আমাদের চারদিকের পাহাড়ের মাথার ওপর এখানে সেখানে লাঠি আর পাথরের খণ্ড এমনভাবে জড়ো করে রেখে দিলাম যেন দূর থেকে সেগুলোকে প্রহরীর মতোই দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আমরা খুব কড়া পাহারা রেখেছি, এবং সারাক্ষণ হুঁশিয়ার আছি। আজ এতদিন পরেও সেই দৃশ্য যেন প্রায় বাস্তবের মতোই চোখের সামনে দেখতে পাই : সেই উঁচু সাদা পাহাড়গুলো, তাদের মাথার ওপর বুড়ো পাইন গাছের সারি ; বালুর ওপর দিয়ে ঝিরিঝিরি অগভীর স্রোত অর্ধবৃত্তাকারে বয়ে চলেছে গ্রামের পাশ দিয়ে ; আর পাহাড়ের গায়ে জংলী সেজের সবুজ ঝোপগুলো হাওয়ায় গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে পাওয়া যেতো জল আনতে ঐ স্রোতের দিকে জলের পাত্র নিয়ে চলেছে, অথবা জল নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসছে ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকরা। বেশীর ভাগ সময় দেখা যেতো তাঁবুতে রয়েছে শুধু স্ত্রীলোক, শিশু, দু'-তিনজন অকর্মণ্য অথর্ব বুড়ো আর কয়েকটি অলস অপদার্থ যুবক ; এরা, আর তাঁবুর প্রাচুর্যের ফলে বেশ মোটাসোটা আর খুশ-মেজাজ কুকুর—শুধু এরাই এখন তাঁবুর বাসিন্দা। তবু এদের নিয়েও গড়ে উঠত প্রাণচঞ্চল, কর্মব্যস্ত আবহাওয়া। চামড়ার দড়ি থেকে ঝুলানো মাংস রোদে শুকাতে থাকত ; তাঁবু-ঘরের চারদিকে তরুণী আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাটির ওপর বিছানো টাট্‌কা চামড়ার একদিক থেকে লোম আর অন্যদিক থেকে মাংসের অবশিষ্ট ছাড়িয়ে নিত, আর চামড়া নরম করবার জন্য তার ওপর মহিষের মাথার ঘিলু ঘষে দিত।

আমার নিজের আর আমার ঘোড়াটার অবস্থা বিবেচনা করেই আমি প্রথম দিনের পর আর শিকারীদের সঙ্গে শিকারে যাইনি। কিন্তু সম্প্রতি যেন আমি খুব তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম, আমার অসুখ কমলে সর্বদাই যেমন হয়ে থাকে। শীগ্‌গীরই আমি বেশ সহজেই হাঁটতে সক্ষম হলাম। রেমণ্ড আর আমি আশেপাশের প্রেয়ারিগুলোতে চলে যেতে লাগলাম কৃষ্ণসার শিকার করতে, কখনো বা কোনো

দলছাড়া মহিষ দেখতে পেলে পায়ে হেঁটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে, যদিও এতে খুব যে সাফল্য লাভ করতাম তা নয়।

একদিন ভোরবেলা কোংরা-টোঙ্গার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছি, এমন সময় রেনাল গাঁয়ের উল্‌টো দিক থেকে ডেকে আমাকে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ জানালো। গিয়ে দেখলাম প্রচুর ব্যবস্থা হয়েছে—মহিষীর কুঁজের উপাদেয় মাংস, ইণ্ডিয়ানদের লোভনীয় খাদ্য। একটি লাঠিতে গাঁথা অবস্থায় এ মাংস আগুনে ঝল্‌সানো হচ্ছিল। রেনাল এই লাঠিটা নিয়ে তার তাঁবুর সামনে মাটিতে গেঁথে ফেলল। তারপর সে, রেমণ্ড আর আমি সেটিকে ঘিরে বসে যে যার খাপ থেকে ছুরি বার করে নিয়ে প্রাণের আনন্দে ঐ ঝল্‌সানো মাংসের ওপর আক্রমণ চালালাম। ডাক্তারী অভিজ্ঞতা যাই বলুক না কেন, রুটি বা নুন ছাড়া এই ঝল্‌সানো মাংস আমার উপাদেয়ই মনে হলো আর বেশ সয়েও গেল।

রেনাল বলল, "আজ রাতের আগেই আমাদের এখানে নূতন আগন্তুকের আগমন হবে।"

আমি বললাম, "কি করে জানলে?"

রেনাল বলল, "স্বপ্ন দেখেছি। ইণ্ডিয়ানদের মতো আমিও স্বপ্ন দেখতে ওস্তাদ। তাছাড়া 'শিলাবৃষ্টি'ও ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছে। সে আর তার বন্ধু 'খরগোশ' দুজনে মিলে সন্ধানে বেরিয়েছে।"

আমি রেনালের এই অদ্ভুত বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য মনে মনে হাসলাম। তারপর আমার আশ্রয়দাতা কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতে গিয়ে আমার বন্দুকটা নিয়ে এক মাইল কি দু'মাইল প্রেয়ারির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম। একটা বুড়ো মহিষকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা গিরিখাত বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে মহিষটাকে লক্ষ্য করে গুলী করলাম। মহিষটা পালিয়ে গেল। শ্রান্তদেহে বিশ্রী মেজাজ নিয়ে গ্রামে ফিরে গেলাম। অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে রেনালের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো। কারণ ফেরার পথে সর্বপ্রথম যাদের দেখলাম তারা দুজন ফাঁদপাতা শিকারী, রুলো আর সারাফিন, ওরা আসছিল আমারই কাছে। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, এরা একপক্ষকাল আগে আমাদের দল ছেড়ে গিয়েছিল। তারা কালো-পাহাড়ে ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে এবার চলেছিল রকি পর্বত অভিমুখে; তাদের ইচ্ছা দু-একদিনের ভেতর রওনা হবে অদূরবর্তী মেড্‌সিন বো পাহাড়ে। সঙ্গী হিসেবে তারা খুব মার্জিত নয়, তবু এ গ্রামে সঙ্গীর এত অভাব যে এদের আর্বিভাবে মনটা খুশিই হয়ে উঠল। বাকি দিনটা আমরা রেনালের ঘরে শুয়ে শুয়ে

ধূমপান করে আর কথা বলে কাটালাম। রেনালের এই ঘরটা কোনোরকমে মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা—খুঁটির মাথায় চামড়ার আবরণ ছড়িয়ে তৈরি, সামনের দিকে সম্পূর্ণ খোলা। মেঝের ওপর অবশ্য গালিচার মতো করে মহিষের নরম চামড়ার তৈরী পোশাক বিছানো। এই ঘরে আমরা রোদ থেকে আড়ালে রইলাম, আমাদের চারধারে শ্রীমতী মার্গটের গৃহস্থালির জিনিসপত্র ছড়ানো। সারা গ্রাম জুড়ে তখন স্তব্ধতা। শিকারীরা সেদিন শিকারে বেরোয়নি বটে, কিন্তু সবাই যে যার তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিল; আর অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা তাদের ভারি ভারি কাজে ব্যস্ত ছিল। কয়েকটি যুবক একজায়গায় অলসভাবে বল খেলছিল; তারা শ্রান্ত হয়ে পড়লে কতকগুলো বালিকা এসে আরো প্রাণচঞ্চল খেলায় মাতল। কিছুদূরে তাঁবুগুলোর মধ্যে একদল ছেলেমেয়ে একটা মহিষ-চর্মের পোশাকের চারদিক ধরে তাদেরি ভেতর একজনকে ঐ পোশাকের ওপর লোফালুফি করছিল—এ হলো সেই বহু প্রাচীন তামাসার খেলা যা ডন্‌কুইক্‌সোটের সহচর স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে বেশ ভুগিয়েছিল। বাইরে প্রেয়ারির ওপর একদল ছোট ছেলে নগ্নদেহে ঘুরে ঘুরে নানারকম হুড়োহুড়ির খেলা খেলছিল অথবা তাদের তীরধনুক নিয়ে পাখী আর কাঠবিড়ালীদের তাড়া করছিল। ছোট ছোট যেসব হতভাগ্য প্রাণী তাদের নিষ্ঠুর, নির্যাতন-প্রিয় হাতে পড়ত, তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

পাশের তাঁবুর একটি স্ত্রীলোক, বেশ নামকরা গৃহিণী, নাম উইয়া ওয়াশ্‌তে অর্থাৎ 'ভালো স্ত্রীলোক', আমাদের বেশ বড় একপাত্র 'ওয়াস্না' এনে খেতে দিল। আমি তাকে একটা সবুজ কাঁচের আংটি উপহার দিতেই সে আহ্লাদে আটখানা।

সূর্য ডুবে গেল, আকাশের আধখানা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল, তারই প্রতিবিম্ব পড়ল ছোট্ট নদীর বুকে। কয়েকজন যুবক গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনতিবিলম্বেই ফিরে এলো, তাদের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে এলো সবগুলো ঘোড়া, বিভিন্ন বয়স, রং আর আয়তনের, সংখ্যায় কয়েকশো। শিকারীরা বেরিয়ে এসে যে যার নিজের ঘোড়াগুলোকে বেছে নিয়ে তাদের অবস্থা পরীক্ষা করল, তারপর নিজের তাঁবুর সামনে খুঁটির সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল। আধ ঘণ্টার ভেতর গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ইতিমধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল চারিদিক। আগুনের ওপর ঝুলানো কেট্‌লির চারধারে ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে কথাবার্তা বলছিল। অন্য ধরনের গোল বৈঠক বসেছিল গ্রামের মাঝখানে। এতে ছিল গ্রামের বুড়োরা আর নামকরা যোদ্ধারা। তারা বসেছিল তাদের

পোশাকগুলো গায়ে জড়িয়ে; পাইপটা ঘুরছিল এক হাত থেকে অন্য হাতে। ইণ্ডিয়ানদের কথাবার্তায় সাধারণতঃ যে গাম্ভীর্য থাকে, এই বৈঠকের কথাবার্তায় তা একেবারেই ছিল না। আমি যথারীতি তাদের সঙ্গে বসলাম। আমার হাতে ছিল আধা-ডজন হাউই আর সাপ-বাজি; লারামি খাঁড়ির ধারের তাঁবুতে বসে বসে একদিন এগুলো তৈরি করেছিলাম বন্দুকের বারুদ আর কাঠকয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে 'ফ্রেমণ্টের অভিযান' বইখানার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে একটা মোটা পেন্সিলের ওপর পাকিয়ে বারুদের খোল বানিয়ে। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুযোগমতো একটুকরো শুকনো মহিষের চর্বি তুলে নিলাম; ইণ্ডিয়ানরা পাইপ ধরাবার জন্য এ জিনিস তাদের পাশে রেখে দেয়। এর সাহায্যে আমি একসঙ্গে সবগুলো বাজিতে আগুন ধরিয়ে বৈঠকের সবার মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। বাজিগুলো হুস্ করে আর পটাপট্ আওয়াজ করতে করতে কিছুদূর উঠে গেল। ইণ্ডিয়ানরা ভীষণ চম্‌কে লাফিয়ে উঠে কিছুদূর ছুটে চলে গেল। তারপর সাহস করে একজন একজন করে ফিরে আসতে লাগল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহসী যারা, তারা আধপোড়া কাগজের খোলগুলো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল গুপ্তরহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। সেই থেকে 'আগুনের ডাক্তার' নামে আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম।

সমগ্র ইণ্ডিয়ান শিবির বহু পুলকিত কণ্ঠের সমবেত মৃদুগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু অন্য ধরনের আওয়াজও ছিল, কারণ একটা বিরাট লণ্ঠনের মতো ভেতরের আগুনে আলোকিত একটি বড় তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে এলো কতকগুলো কণ্ঠের সমবেত বিকট ক্রন্দন আর আর্তনাদ একটানা কিছুক্ষণ ধরে, নেকড়েদের চীৎকারের মতো, এবং একটি নগ্নপ্রায় স্ত্রীলোক তাঁবুর বাইরে কাছাকাছি নত হয়ে বসে ভীষণভাবে কাঁদছিল আর নিজের পা-দুটো ছুরি দিয়ে কেটে রক্তাক্ত করছিল। ঠিক একবছর আগে এই পরিবারেরই একটি যুবক শত্রুর হাতে নিহত হয়েছিল, তার আত্মীয়রা এইভাবে তার জন্য শোক প্রকাশ করছিল। এছাড়া আরো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূর থেকে। গ্রামের কয়েকটি যুবক কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধে যাবে, তাই তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তাদের যুদ্ধ-অভিযানে সহায়তা করবার জন্য 'মহান দেবতা' বা 'মহান আত্মা'র কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল। আমি যখন এইসব আওয়াজ শুনছিলাম, তখন রুলো চিন্তালেশহীন মুখে হাসতে হাসতে অন্যদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উইয়া ওয়াশ্‌তে ('ভালো স্ত্রীলোক') নাম্নী স্ত্রীলোকটি যে তাঁবুতে থাকত, দেখা গেল তারই সামনে

আরেকটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক খুব রাগান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি বৃদ্ধ হল্‌দে কুকুরকে খুব ধমকাচ্ছে। কুকুরটা নাকের ছ'পাশে ছুই থাবা রেখে ঘুমন্ত চোখ-ছুটি স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তুলে যেন সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এরপর গোল মিটে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলছিল—"তোর লজ্জিত হওয়া উচিত। তোকে ভালো খাইয়েছি, তুই যখন ছিলি এই এতটুকু আর অন্ধ, যখন মাত্র কোনোরকমে হামাগুড়ি দিতে আর একটু চীৎকার করতে পারতিস, এখনকার মতো জোর ঘেউ-ঘেউ করতে তখনো শিখিসনি, তখন থেকেই। তুই যখন বড় হ'লি, আমি বললাম তুই ভালো কুকুর। তোর পিঠের ওপর যখন বোঝা চাপানো হতো, তখন তুই বেশ শক্ত আর বেশ ভদ্র থাকতিস। যখন প্রেয়ারির ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলতাম, তুই কখনো ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটোছুটি করিসনি। কিন্তু তোর হৃদয়টা বড় খারাপ ছিল। যখনই কোনো খরগোশ কোনো ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত, তুই সকলের আগে ওর দিকে ছুটে যেতিস, অন্য কুকুরগুলিকেও টেনে নিয়ে যেতিস তোর পিছু পিছু। তোর জানা উচিত ছিল যে অমন করলে বিপদ হতে পারে। প্রেয়ারির ওপর যখন অনেকদূর চলে গিয়েছিলি, তোকে সাহায্য করবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না, তখন কোনো গুহার ভেতর থেকে ধর্ যদি একটা নেকড়েই তোর ওপর লাফিয়ে পড়তো, তখন তুই কী করতে পারতিস? নেকড়ের হাতে তখন নির্ঘাত তোকে মারাই পড়তে হতো, কারণ পিঠে বোঝা নিয়ে কোনো কুকুরের পক্ষেই লড়াই করা সম্ভব নয়। মাত্র তিন দিন আগে তুই ওভাবে পালিয়েছিলি, যা দিয়ে আমি তাঁবুর সামনের দিকটা আট্‌কাই সেই কাঠের গজালের থলেটা উল্‌টে ফেলে দিয়ে। ঐদিকে তাকিয়ে ছাখ্, তাঁবুর সামনের দিকটা এখনো আল্‌গা হয়ে ঝুলছে। আর আজ রাত্রে আমার ছেলেমেয়েগুলোর জন্য মস্ত একটুকরো চর্বিওয়ালা মাংস আগুনে ঝল্‌সানো হচ্ছিল, তা তুই চুরি করেছিস। তাই বলছি, তোর বড় খারাপ মন, আর সেইজন্যে তোকে মরতেই হবে।"

এই বলে স্ত্রীলোকটি তাঁবুর ভেতর ঢুকে একটা মস্ত পাথরের হাতুড়ি নিয়ে এলো আর তার এক ঘায়ে বেচারা কুকুরটাকে হত্যা করল। স্ত্রীলোকটির এই লম্বা বক্তৃতাটি লক্ষ্য করার মতো। এ থেকে বোঝা যাবে ইণ্ডিয়ানরা কিভাবে মনে করে ইতর প্রাণীরাও বুদ্ধি রাখে আর কথা বুঝতে পারে। ইণ্ডিয়ান বহু কিংবদন্তী অনুযায়ী ইতর প্রাণীদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের অনেক মিল আছে, এমনকি অনেক ইণ্ডিয়ান সগর্বে নিজেদের ভালুক, নেকড়ে, হরিণ এবং কচ্ছপের বংশধর বলে দাবি করে।

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি গাঁয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে আমার আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতে চলে গেলাম। ঢুকেই ঘরের মাঝখানে যে আগুন জলছিল, তারই আলোয় দেখতে পেলাম কোংরা-টোঙ্গা তার নিজের জায়গায় আধ-ঘুমন্তভাবে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার শয্যাটি মোটের ওপর আরামদায়কই ছিল বলা চলে—একসঙ্গে কয়েকটি মহিষ-চর্মের পোশাক মাটির ওপর পাতা, সাদা-রং-করা হরিণের চামড়ার তৈরী শিয়রের বালিশ, পালক দিয়ে ঠাসা আর গুটি দিয়ে কারুকার্য-করা। ওর পিছনে খুঁটি আর নরম নলখাগড়ার তৈরী একটি হাল্‌কা কাঠামো, যার ওপর বসা অবস্থায় সে আরাম করে হেলান দিয়ে থাকতে পারে। এটার ওপরে ঝুলছে তার তীর আর ধনুক। তার স্ত্রী, হাসিখুশী চওড়ামুখী স্ত্রীলোক, তখনো তার ঘরোয়া কাজকর্ম শেষ করে উঠতে পারেনি বলেই মনে হলো, কারণ সে তাঁবুর ভেতর এধারে ওধারে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছিল, বাসন-কোসন আর তার চারপাশে সাজিয়ে রাখা শুক্‌নো মাংসের খণ্ডগুলো উল্‌টে-পাল্‌টে। দুঃখের বিষয়, সে আর তার স্বামীই সেই তাঁবুর একমাত্র বাসিন্দা নয়, কারণ আধা-ডজন ছোট্ট ছেলেমেয়ে এখানে সেখানে নানা-রকম বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছিল। আমার জিনটা ছিল তার জায়গামতো তাঁবুর মাথার দিকে, আর তার সামনে একটা মহিষ-চর্মের পোশাক মাটির ওপর বিছানো ছিল। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম; কিন্তু ভীষণ অবসন্ন না হলে ওপাশের তাঁবুর আওয়াজে আমার ঘুম হতো না। ও-ঘরে চলেছিল একটানা একঘেয়ে ঢোলক-বাজানো, মাঝে মাঝে হঠাৎ উৎকট চীৎকার, আর কুড়িটি কণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত। যথোচিত আইন-কানুন-মাফিক জুয়োখেলার একটি চমৎকার দৃশ্য চলছিল সেখানে। খেলোয়াড়রা খেলায় বাজি রাখছিল তাদের অলঙ্কার আর ঘোড়া, আর খেলার উত্তেজনা বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোশাক, এমনকি অস্ত্র পর্যন্ত; কারণ বেপরোয়া জুয়াখেলা শুধু পারী নগরীর নরকেই সীমাবদ্ধ নয়। সমতলভূমি আর অরণ্য অঞ্চলের পুরুষরা তাদের জীবনযাত্রার একঘেয়েমি থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য জুয়াখেলার শরণ নিয়ে থাকে, কারণ তাদের জীবনে ভীষণ উত্তেজনা আর উদাস নিষ্ক্রিয়তা, এই দুই বিপরীতের পালাক্রম চলে। ওদের ঢোলকের নীরস একঘেয়ে বাজনা শুনতে-শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম; কিন্তু ওদের ঐ উৎসব অবিরাম চলল পরদিন ভোর পর্যন্ত। বাচ্চাদের ভেতর একটা গড়াতে গড়াতে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, ওর চাইতে বড় আরেকটা ছেলে এসে আমার কম্বল ধরে টানাটানি করতে করতে এত কাছে এসে পড়ল যে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। আমি এই ক্ষুদে বর্বর দুটিকে একটি ছোট্ট ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় খোঁচা মেরে

দূরে সরিয়ে দিলাম ; ডাণ্ডাটি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই সর্বদা সঙ্গে রাখতাম। আর আদ্ধেক দিন ঘুমিয়ে আর অতিভোজন করার ফলে এরা রাত্রে এত বেশী অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করত যে, প্রতি রাত্রে চার-পাঁচবার আমাকে এইভাবে ডাণ্ডাটির সদ্ব্যবহার করতে হতো। গৃহকর্তা স্বয়ং ছিল আরেকরকম জ্বালাতনের কারণ। অন্যান্য সব ইণ্ডিয়ানের মতোই তারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ, প্রেম, শিকার প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে তাকে বরাবর কতকগুলো বিশেষ প্রক্রিয়া করে যেতে হবে। এগুলোকে এরা বলতো 'দাওয়াই,' আর এই দাওয়াইগুলো তারা পেতো সাধারণতঃ স্বপ্নের মাধ্যমে, আর এগুলো প্রায়ই হতো ভারি অদ্ভুত। কতক ইণ্ডিয়ান প্রতিবার ধূমপান করবার সময় বন্দুকের বাঁটটা একবার মাটিতে ঠুকে দেয় ; আর অনেক ইণ্ডিয়ানের এই জিদ যে তারা যা বলবে তার উল্‌টো বুঝতে হবে। শ একবার এমন এক ইণ্ডিয়ান বুড়োর পাল্লায় পড়েছিল যার বিশ্বাস ছিল শ্বেতাঙ্গ দেখলেই তাকে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল পান করাতে না পারলে সর্বনাশ ঘটবে। আমার গৃহকর্তা বেচারার ওপর স্বপ্নাদেশটি হয়েছিল বিশেষরকমের অসুবিধাজনক। অশরীরী আত্মারা তাকে স্বপ্নে হুকুম করেছিল তাকে রোজ মাঝরাতে উঠে একটা বিশেষ গান গাইতেই হবে। আর রোজ নিয়মিতভাবে রাত বারোটা নাগাদ ওর বিশ্রী একঘেয়ে গান শুনে আমার ঘুম ভেঙে যেতো ; তাকিয়ে দেখতাম সে সোজা হয়ে তার আসনে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার মর্মান্তিক গানের বেগার দিচ্ছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন কণ্ঠস্বর রাত্রে শুনতে পেতাম, সেগুলো আরো বেসুরো বেছন্দ। সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের ভেতর দু'-তিনবার গ্রামের সবগুলো কুকুর—সংখ্যায় তারা কয়েকশো হবে —একসঙ্গে অদ্ভুত আওয়াজ করে চীৎকার করত। ঐ দুঃসহ বিশ্রী আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন আওয়াজ জীবনে বোধকরি একমাত্র শুনেছিলাম জেনারেল কিয়ার্নির সৈন্যদলের যাত্রাপথ ধরে ধরে আর্ক্যানসাস পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে, মাঝে মাঝে যখন নেকড়ের দল সমবেত চীৎকারের উল্লাসে মেতে উঠত। কিন্তু এই কুকুরগুলোর সমবেত চীৎকার সম্ভবতঃ নেকড়েদের চীৎকারের চাইতেও অসহ্য গোলমেলে আর বেসুরো ছিল। রাত্রিতে যখন দূরে ঐ বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠত তখন এমন একটা অপার্থিব ভূতুড়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি হতো যা ভীতু স্বভাবের যে-কোনো লোককে ভীষণ দুঃস্বপ্নের মতো আতঙ্কে অভিভূত করে ফেলতো। আর ঘুমের মাঝখানে হঠাৎ এর মাঝখানে জেগে উঠলে, এ আওয়াজ তো আরো ভয়ঙ্কর। প্রথমে শুরু হয় একটি কণ্ঠের চড়া সুরে একটানা আর্তনাদের মতো চীৎকার। তারপর একটি একটি করে অনেক কণ্ঠ এই

আওয়াজের ধুয়ো ধরে ; একে একে গ্রামের সবগুলো কুকুরই এই চীৎকারে কণ্ঠ মেলায়। আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে বহু বিচিত্র বেসুরো চীৎকারে, সে-চীৎকার যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। এই বীভৎস হল্লা কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয়, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নীরবতায় বিলীন হয়ে যায়।

ভোর হলো। কোংরা-টোঙ্গা ঘোড়ায় চড়ে শিকারীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এখানে স্বামী এবং পিতা রূপে তার চরিত্রের একটু বর্ণনা হয়তো একেবারে অবান্তর হবে না। অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানই যেমন হয়ে থাকে, তেমনি সে আর তার স্ত্রী তাদের সন্তানদের খুব ভালবাসত আর বেশীরকম আদর দিত ; খুব বেশীরকম দুষ্টুমি করলে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া ছাড়া কোনোরকম শাসন করত না। এধরনের আদুরে বানিয়ে তোলার ফলে ছেলেমেয়েগুলো বেশীরকম অবাধ্য এবং কর্তব্যবোধহীন হয়ে উঠেছিল। ছোটদের এই ধরনের লাই দেওয়ার ফলেই ইণ্ডিয়ানরা ছেলেবেলা থেকেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, কোনোরকম নিয়ম, শৃঙ্খলা, আদেশ বা নির্দেশ মানতে চায় না। কোংরা-টোঙ্গার চাইতে সন্তানবৎসল বাপ অনেক খুঁজেও পাওয়া শক্ত হবে। সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত তার ছোট্ট একটি বাচ্চাকে, লম্বায় যে দু'ফুট'ও ছিল না। কোংরা-টোঙ্গা মাঝে মাঝে মহিষ-চর্মের পোশাক পেতে তার ওপর বসে সামনে বাচ্চাটাকে দাঁড় করিয়ে দিত, তারপর খুব নীচু গলায় সুর করে আবৃত্তি করত রণনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গাইবার জন্যে তৈরী গানের কথাগুলো। বাচ্চা ছেলেটা তখন দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে কোনোরকমে খাড়া থাকতে শিখেছে ; সে বাপের গানের তালে তালে ঘুরে-ঘুরে নাচতে থাকত, তাই দেখে কোংরা-টোঙ্গা আনন্দে হেসে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত তার ঐটুকু বাচ্চার অমন আশ্চর্য নাচের আমি তারিফ করছি কিনা। স্বামী হিসেবে কিন্তু সে অমন কোমল ছিল না। তার এই স্ত্রীটি তার সঙ্গে ছিল অনেক বছর ধরে, তার সন্তানদের আর গৃহস্থালির দেখাশোনা করত খুব যত্ন করে। স্ত্রীকে কোংরা-টোঙ্গা মোটামুটি পছন্দই করত, আর—অন্ততঃ আমি যতদূর বুঝতে পারতাম—ওদের ভেতর ঝগড়া কখনো হতো না। কিন্তু কোংরা-টোঙ্গার বেশী আকর্ষণ ছিল আরো অল্পবয়সী আর নতুন প্রিয়াদের ওপর। যেসময়ের কথা লিখছি তখন তার অল্পবয়সী নতুন প্রিয়া ছিল একটি, সে কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতে না থেকে আলাদা একটি তাঁবুতে থাকত। একদিন এই তাঁবুতে এসে কোংরা-টোঙ্গা নবীনা প্রিয়ার ওপর বিরূপ হয়ে তাকে তাঁবু থেকে বার করে দিয়ে তার অলঙ্কারগুলো, সাজ-পোশাক আর অন্যান্য সবকিছুই তার পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে বলল পিতৃগৃহে ফিরে যেতে। এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'তালাক' দিয়ে—অবশ্য এই তালাক দেবার

ভালো কারণও সে দেখাতে পারত—তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে বসে পরম প্রশান্ত আর নির্লিপ্ত ভাবে ধূমপান করতে লাগল।

আমি সেদিন বিকেলেই তার তাঁবুতে তার সঙ্গে বসে ছিলাম, এমন সময় তার গায়ে অনেকগুলো ক্ষতের দাগ দেখে আমার কৌতূহল হলো এগুলোর ইতিহাস জানতে। কতকগুলো চিহ্ন সম্বন্ধে অবশ্য প্রশ্ন করলাম না, কারণ ওগুলো কি করে হয়েছিল তা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তার দুটি বাহুতেই প্রায় সমান সমান তফাতে ছুরির গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল, তার পিঠে আর বুকের ওপর ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই একটু অন্যধরনের ক্ষতচিহ্ন ছিল; পিঠেও তাই। এগুলো হচ্ছে দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করার চিহ্ন, যে যন্ত্রণা ইণ্ডিয়ান পুরুষেরা, আরো কয়েকটি গোষ্ঠীর পুরুষদের মতো, কোনো কোনো ঋতুতে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। এর আংশিক উদ্দেশ্য হয়তো সাহস আর সহ্যশক্তির গৌরব লাভ করা, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আত্মত্যাগ বা আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে দেবতাদের কৃপা লাভ করা। বুকের আর পিঠের ক্ষতের দাগগুলির উৎপত্তি হয়েছিল চামড়া ভেদ করে মাংসের ভেতর দিয়ে কতকগুলো শক্ত কাঠের তৈরী ছুঁচোলো ফলা ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে। এই ফলাগুলির অপর মাথা চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল ভারী মহিষের মাথার খুলির সঙ্গে।

এই অবস্থায় যুবক ব্রতধারী তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণে সামনের দিকে ছুটে যায়; দুটি বন্ধু তাকে সহায়তা করবার জন্য দু'দিক থেকে তার দু'হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে, যেপর্যন্ত না ব্রতধারী যুবকের বুকের মাংস ছিঁড়ে কাঠের ফলাগুলো বেরিয়ে এসে মহিষের মাথার খুলি দুটো মাটিতে পড়ে যায়।

কোংরা-টোঙ্গার অন্য ক্ষতচিহ্নগুলি কিছু কিছু দুর্ঘটনার ফল, কিছু কিছু যুদ্ধে আহত হওয়ার। কোংরা-টোঙ্গা ছিল গাঁয়ের সেরা যোদ্ধাদের অন্যতম। সে আমার কাছে বড়াই করে বলেছিল জীবনে সে চোদ্দটি লোককে হত্যা করেছে; অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মতোই সেও বড়াইবাজ মিথ্যাবাদী হলেও, ওর এই কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলাম আরো অনেকের কাছ থেকে কথাটা শুনে। আমার প্রশ্নে গর্ব-বোধ করে সে যুদ্ধক্ষেত্রে তার নিজের সত্য বা মিথ্যা অনেক বীরত্বের কাহিনী শুনিয়ে-ছিল; তাদের ভেতর একটিতে ইণ্ডিয়ান চরিত্রের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যগুলোর একটির এমন ভালো নমুনা মেলে যে কাহিনীটি আমি না বলে পারছি না। মেড্‌সিন বো পাহাড় সেখান থেকে খুব বেশী মাইল দূরে নয়। তাবু থেকে ঐদিকে দেখিয়ে সে আমাকে বলল কয়েক বছর আগে সে ওখানে গিয়েছিল তাদের গোষ্ঠীর একদল যুবক-

যোদ্ধার সঙ্গে। সেখানে তারা দেখল দুটি স্নেক ইণ্ডিয়ান শিকার করছে। তারা ওদের একজনকে তীরবিদ্ধ করে অন্যটির পিছনে পিছনে ছুটে তাকে ঘেরাও করে ফেলল। কোংরা-টোঙ্গা লাফিয়ে পড়ে তাকে পাকড়াও করল। তার দলের দুটি যুবক ছুটে এসে বন্দীকে ধরে রইল আর কোংরা-টোঙ্গা ঐ জ্যান্ত লোকটার মাথার খুলির ছাল চুলসুদ্ধ ছাড়িয়ে নিল। তারপর একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে বন্দীর হাত আর পায়ের শিরা কেটে দিয়ে তাকে সেই আগুনে ফেলে, লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে চেপে রেখে লোকটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল। গল্পের বাহার বাড়াবার জন্য সে যেসব বীভৎস লোমহর্ষক বিবরণ দিতে লাগল তা বর্ণনার অযোগ্য। কোংরা-টোঙ্গার মুখের চেহারা আশ্চর্য শান্ত সরল, অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মতো ভয়ঙ্কর নয়; আর এইসব দানবিক নিষ্ঠুরতার বিস্তারিত বিবরণ শোনাবার সময় সে আমার মুখের দিকে এমনি সরল সহজ ভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন কোনো শিশু তার মাকে তার কোনো ছেলেমানুষী অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান লড়াই যে কত ভয়ঙ্কর, তার আরেকটি উদাহরণ পেয়েছিলাম বুড়ো মেনে-সীলার তাঁবুতে। একটি উজ্জ্বল-চোখ চট্‌পটে ছোট ছেলে সেখানে থাকত। ছেলেটি ছিল গ্রস-ভেণ্টার ব্ল্যাকফুট গোষ্ঠীর গ্রামের। এ গোষ্ঠীটা ছোট, কিন্তু নিষ্ঠুর আর বিশ্বাসঘাতক, এবং আরাপাহো গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের খুব ঘনিষ্ঠতা। বছরখানেক আগে কোংরা-টোঙ্গা আর তার যোদ্ধাদল আমাদের বর্তমান শিবিরের কিছুদূরে পূবদিকে এক সমতল জায়গায় এদের প্রায় কুড়িটি তাঁবু পেয়েছিল। রাত্রে ঘেরাও করে ঐ সব-ক'টি তাঁবুর স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সবাইকে তারা হত্যা করেছিল, শুধু এই ছেলেটি বাদে। বুড়োর পরিবারে এই ছেলেটিকে গ্রহণ করা হলো, আর ছেলেটি ক্রমে ওগিল্লাল্লা গোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যেই গণ্য হয়ে গেল। এ গাঁয়ে একজন ক্রো-যোদ্ধাও ছিল; লোকটির দেহ যেমন বিরাট তেমনি সুগঠিত। অনেক বছর আগে এ লোকটি যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল, আর ওগিল্লাল্লাদের একটি পুত্রহারা স্ত্রীলোক একে তার মৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করে নিয়েছিল। লোকটি ক্রমে নিজের গোষ্ঠীর কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে ওগিল্লাল্লা বলেই ভেবে নিয়েছিল।

মনে থাকতে পারে স্নেক আর ক্রো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিরাট যোদ্ধাদল পাঠাবার পরিকল্পনার স্থির হয়েছিল এই গ্রামেই। পরিকল্পনাটা ধামা-চাপা পড়ে গেলেও সামরিক নেশার আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল অনেক মনের গহনে। এগারোটি যুবক শত্রুর সঙ্গে লড়তে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়েছিল, ঠিক হয়েছিল আমাদের এখানে অবস্থানের চতুর্থ দিনে তারা রওনা হবে। এই দলের নেতা ছিল

এক বলিষ্ঠ, চটপটে, অল্পবয়স্ক ইণ্ডিয়ান ছোকরা, তার নাম 'সাদা ঢাল'। পরিচ্ছন্ন বেশবাস আর ছিমছাম চেহারার জন্য ছোকরাকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। তার তাঁবুটা আয়তনে বড় না হলেও গাঁয়ের ভেতর সবচেয়ে ভালো তাঁবু ছিল, ওর স্ত্রীও এ গাঁয়ের সেরা সুন্দরীদের অন্যতমা ; মোটের ওপর তার গৃহস্থালি ছিল ওগিল্লাল্লা গোষ্ঠীর আদর্শস্বরূপ। আমি মাঝে মাঝে যেতাম ঐ তাঁবুতে, কারণ শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ ভক্ত ছিল 'সাদা ঢাল', তাই যখন-তখন তার ওখানে আমায় ভোজের নিমন্ত্রণ করত। একবার, যখন আপ্যায়নের প্রধান অংশগুলো সমাপ্ত হয়ে গেছে, সে আর আমি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো পালা করে পাইপ টানছি, এমন সময় সে তাঁবুর গায়ে ঝুলানো লড়াইয়ের সরঞ্জামগুলো নামিয়ে সেগুলো বিশেষ গর্বের সঙ্গে আমাকে দেখাতে লাগল। এইসব সরঞ্জামের ভেতর ছিল পালকের তৈরী চমৎকার একটি শিরস্ত্রাণ। খাপ থেকে এটা বার করে মাথায় পরে সে আমার সামনে দাঁড়াল, তার কালো মুখ আর বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ ঐ শিরোশোভার দৌলতে কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সেবিষয়ে সে সচেতন। সে বলল এই শিরস্ত্রাণে পরানো রয়েছে তিনটি যুদ্ধ-ঈগলের পালক, যাদের মূল্য তিনটি ভালো ঘোড়ার মূল্যের সমান। সে একটা ঢালও তুলে দেখাল, সেটার ওপর নানারকম রং-করা আর তার গা থেকে ঝুলছে কতকগুলো পালক। এইসব বর্বর সাজ-সজ্জায় ছোকরাকে ভালোই দেখাচ্ছিল। ওর তূণটা ছিল কালো-পাহাড়ের একটি ছোট চিতাবাঘের দাগ-যুক্ত চামড়ার তৈরি, তলার দিকে মরা জানোয়ারটার লেজ আর থাবাও ঝুলছিল। 'সাদা ঢাল' তার অতিথি-আপ্যায়ন সমাপ্ত করল বিশিষ্ট ইণ্ডিয়ান কায়দায়। আমার কাছে সে একটু বারুদ আর একটি গুলী ভিক্ষা চাইল, কারণ তীরধনুক ছাড়া তার একটা বন্দুকও ছিল। কিন্তু এই ভিক্ষা দিতে আমি রাজি হতে পারলাম না, কারণ ও-জিনিস আমার কাছে আমার নিজের ব্যবহারের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল না। যাই হোক, বিদায় নেবার আগে তাকে একপুরিয়া সিঁদুর দিলাম। তাতেই সে বেশ খুশি হলো।

পরদিন ভোরে 'সাদা ঢাল'-এর ঠাণ্ডা লাগল, গলার প্রদাহ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন সমস্ত তেজ হারিয়ে ফেলল ; এর আগে এ গাঁয়ের আর কোনো যোদ্ধারই ওর মতো অমন গর্বোন্নত ভাব দেখিনি, কিন্তু এখন সে এ-তাঁবুতে ও-তাঁবুতে ঘুরে বেড়াতে লাগল নিতান্ত বিষণ্ণ আর অসহায় ভাবে। শেষকালে সে তার পোশাকে দেহ জড়িয়ে বসে পড়ল রেনালের তাঁবুর সামনে। কিন্তু যখন দেখল রেনাল বা আমি কেউই ওর এই ব্যামোর দাওয়াই জানি না, তখন সেখান থেকে

উঠে ধীরে ধীরে চলে গেল গাঁয়ের এক ওঝার কাছে। সেই বুড়ো বুজরুক কিছুক্ষণ মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত সাদা-ঢালের দেহের ওপর দুম্‌দাম করে চালাল, নানারকম বিকট চীৎকার করল, তারপর তার কানের সামনে ঢোল বাজাতে লাগল তার ভেতর থেকে অপদেবতাটাকে তাড়াতে। চিকিৎসায় কোনো ফল না হওয়ায় সাদা-ঢাল তার নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল, গিয়ে কয়েক ঘণ্টা বিষম বেজার হয়ে শুয়ে রইল। বিকেলে আবার হাজির হয়ে আবার সে বসল রেনালের তাঁবুর সামনে মাটির ওপর, দু'হাতে গলা চেপে ধরে। কিছুক্ষণ ধরে বিষণ্ণ চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে তারপর সে মৃদুস্বরে বলতে লাগল: "আমি নির্ভীক মানুষ। যুবকেরা সবাই আমাকে বিরাট যোদ্ধা বলেই জানে, আর তাদের ভেতর দশজন আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্যে প্রস্তুত। আমি যাব আর ওদের দেখিয়ে দেবো কারা আমাদের শত্রু। গত গ্রীষ্মে স্নেকরা আমার ভাইকে হত্যা করেছে। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ না নিলে আমি বাঁচব না। কালই আমরা রওনা হবো আর তাদের চুলসুদ্ধ মাথার খুলির ছাল খুলে নেবো।"

এ সিদ্ধান্ত সে যখন প্রকাশ করছিল তখন তার দৃষ্টিতে যেন তার স্বভাবসিদ্ধ তেজ আর উৎসাহের ভাব একেবারেই অবশিষ্ট নেই। সে যেন নিরাশভাবেই মাথা নীচু করে রইল।

সেই সন্ধ্যায় আমি এক আগুনের ধারে বসে আছি, এমন সময় দেখলাম 'সাদা ঢাল' তার জমকালো রণসজ্জায় সেজে, দুই গালে সিঁদুর মেখে তার প্রিয় যুদ্ধের ঘোড়াটিকে তার তাঁবুর সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে গ্রাম প্রদক্ষিণ করল উচ্চস্বরে কর্কশকণ্ঠে তার রণগীতি গাইতে গাইতে; স্ত্রীলোকরাও তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে সে কয়েক মিনিট লম্বা উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন বিনত প্রার্থনার ভঙ্গিতে। পরদিন ভোরবেলা যোদ্ধাদের যাত্রা-শুরু দেখতে পাব বলে আশা করেছিলাম। আমার সে-আশা বিফল হলো। দুপুর পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম পরম শান্ত। তারপর সাদা-ঢাল এসে আবার বসল আমাদের সামনে। রেনাল প্রশ্ন করল শত্রুর সন্ধানে সে চলে যায়নি কেন।

সাদা-ঢাল বিষণ্ণ সুরে বলল, "যাবার উপায় নেই। আমি আমার যুদ্ধের তীরগুলো মেনিয়াস্কাকে দিয়ে দিয়েছি।"

রেনাল বলল, "তুমি তাকে তোমার দুটো তীর মাত্র দিয়েছ। তুমি চাইলেই সে ফেরৎ দিয়ে দেবে"

কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব রইল সাদা-ঢাল, তারপর বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, "আমার যুবকদের মধ্যে একজন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। মৃতব্যক্তিদের আত্মারা এসে ওর গায়ে ঢিল ছুঁড়েছে, ও যখন ঘুমিয়ে ছিল।"

এরকম স্বপ্ন সত্যিই দেখা গেলে ইণ্ডিয়ানদের যে-কোনো যুদ্ধ-অভিযানের পরিকল্পনা ভেঙে যেতো, কিন্তু রেনাল আর আমি দুজনেই তখন নিঃসন্দেহ যে, যুদ্ধে না যাবার একটা অজুহাতে দেবার জন্য এ স্বপ্নটা সাদা-ঢাল সম্পূর্ণ বানিয়ে নিয়েছে।

সাদা-ঢাল অসাধারণ বীর যোদ্ধা। সম্ভবতঃ যে-কোনো মারাত্মক আঘাত সে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন বাইরে প্রকাশ না করেই সহ্য করত, শত্রুদের অমানুষিকতম অত্যাচারও অনায়াসেই সইত। অমন ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান চরিত্রের সমস্ত শক্তি সেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য সংহত হতো; বাল্যকাল থেকে পাওয়া কঠোরতার শিক্ষা তাকে এ অভিজ্ঞতা সহ্য করবার ক্ষমতা দিত; দুঃখবরণের মহান কারণটি সর্বদাই জাগরূক থাকত তার মনের সামনে, তার অপরাজেয় পৌরুষ জেগে উঠত শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণ করে যোদ্ধা-জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করতে। কিন্তু একজন ইণ্ডিয়ান যখন অনুভব করে তাকে আক্রমণ করেছে কোনো রহস্যময় অকল্যাণ, যার আঘাতে তার পৌরুষ ক্ষয়ে যাচ্ছে, শক্তি ঝরে পড়ছে, যখন এমন কোনো প্রত্যক্ষ শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে না, যার সঙ্গে সে লড়াই করতে পারে, তখন নির্ভীকতম যোদ্ধাও সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লুটিয়ে পড়ে। তার মনে এই ধারণা জুড়ে বসে যে, কোনো এক দুষ্ট আত্মা তাকে গ্রাস করেছে অথবা তাকে কেউ 'যাদু' করেছে। কোনো ইণ্ডিয়ানের দীর্ঘকালস্থায়ী কোনো অসুখ হলেই সে সাধারণতঃ নিজেকে তার কল্পিত ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়ে চিন্তায় চিন্তায় ক্ষীণ হতে হতে মারা যায়। পর পর কতকগুলো আপদ-বিপদ এলে, অথবা দুর্ভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হলে তার ফলও অনেকসময় এইরকমই হয়। এমনও শোনা গেছে যে অনির্দিষ্টকাল বিরূপ ভাগ্যের আতঙ্কে কম্পমান থাকার যন্ত্রণা থেকে একবারে মুক্তি পাবার জন্য ইণ্ডিয়ানরা মরিয়া হয়ে শত্রুশিবিরে ঢুকে গেছে, অথবা ভীষণ ভালুকের সঙ্গে একাই লড়াই করেছে।

এমনি করেই এত উপবাস, স্বপ্নদর্শন, মহান আত্মার আবাহন ইত্যাদির পরও সাদা-ঢালের যুদ্ধযাত্রা-পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটল।

ষোড়শ অধ্যায়

ফাঁদপাতা শিকারী

ইণ্ডিয়ানদের কথা বলতে বলতে আমি অন্য একটি জাতের দুজন দুঃসাহসী বীরের কথা বলতে প্রায় ভুলেই গেছি—এরা হচ্ছে ফাঁদপাতা শিকারী রুলো আর সারাফিন। এরা একটি বিপদসঙ্কুল অভিযানে যাবার জন্য উন্মুখ ; দুজনে মিলে চলেছে যে অঞ্চলে সেখানে আরাপাহোদের বাস, আমাদের তাঁবু থেকে পশ্চিমে একদিনের পথ। এই আরাপাহোরা—এরপর শ-কে আর আমাকে যাদের এক মস্ত দলের মুখোমুখী পড়তে হয়েছিল—অত্যন্ত হিংস্র বর্বর, যারা কিছুদিন আগেই ঘোষণা করেছিল তারা শ্বেতাঙ্গদের শত্রু, এবং প্রথম যে শ্বেতাঙ্গ তাদের এলাকায় প্রবেশের দুঃসাহস করবে তাকে তারা হত্যা করবে। এই ঘোষণার উপলক্ষ্যটা এইরকম :

আগের বছর, ১৮৪৫, বসন্তকালে কর্নেল কিয়ার্নি কয়েকদল অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে লীভেনওয়ার্থ কেল্লা ছেড়ে লারামি কেল্লার দিকে রওনা হয়েছিলেন। পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে অগ্রসর হয়ে তিনি বেণ্ট-এর কেল্লায় গেলেন, তারপর সেখান থেকে আবার পুবদিকে ঘুরে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলেন সেখানেই ফিরে এলেন। লারামি কেল্লায় পৌঁছে তিনি তাঁর অধীনস্থ সেনাদলের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলেন পশ্চিম দিকে সুইটওয়াটার নামক জায়গায় ; নিজে রয়ে গেলেন লারামি কেল্লায়, আর আশেপাশের ইণ্ডিয়ানদের কাছে বার্তা পাঠালেন তারা যেন সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। আশেপাশের ইণ্ডিয়ানরা সেই প্রথম শ্বেতাঙ্গ সৈন্য দেখতে পেল, এবং—এক্ষেত্রে যেমন আশা করা যায়—এই সাদা মানুষদের শৃঙ্খলা, সুন্দর পোশাক, সামরিক সরঞ্জামের সম্পূর্ণতা, আর তাদের ঘোড়াগুলোর আয়তন এবং শক্তি দেখে তারা বিস্ময়ে আত্মহারা হলো। কিছুদিন আগেই তারা অনেকগুলি নরহত্যা করেছিল, কর্নেল কিয়ার্নি তাদের শাসিয়ে দিলেন যে তারা যদি এরপর আরো শ্বেতাঙ্গ হত্যা করে তাহলে তিনি তাদের ওপর তাঁর সৈন্যদের লেলিয়ে দেবেন এবং তাদের জাতটাকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলবেন। তাঁর বক্তব্যটাকে আরো জোরালো করবার জন্য সন্ধ্যা-বেলায় তিনি একটি হাউইট্‌জার কামান দাগালেন আর একটি হাউই বাজি ছোঁড়ালেন। আরাপাহোদের অনেকে মাটির ওপর লম্বা হয়ে পড়ে গেল, আর বাকি সবাই ভীষণ বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ছুটে পালাল। পরদিন তারা সরে গেল তাদের পাহাড়ে

পাহাড়ে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের দেখে, তাদের কামান-দাগা দেখে, আর অনেক উঁচুতে মহান আত্মার কাছে তাঁদের আগুনী দূত পাঠানো দেখে। অনেক মাস ধরে তারা বেশ শান্ত রইল, কোনোরকম শয়তানি করল না। অবশেষে, ঠিক আমরা এস্থান ছাড়বার আগে তাদের একজন জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে বুট আর মে নামে দুজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে বসল। এরা দুজন জানোয়ার ধরবার জন্য পাহাড়ে ফাঁদ পাতছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোনো উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে পারা গেল না। মনে হলো ইণ্ডিয়ানরা মাঝে মাঝে এমন আকস্মিক প্রেরণা বা খামখেয়ালের বশীভূত হয়ে পড়ে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই হত্যার পিছনেও সেই কারণ। এই হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর থেকে গোষ্ঠীর সমস্ত ইণ্ডিয়ান-ই ভীষণ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল। তারা প্রতিদিন আশঙ্কা করছিল অশ্বারোহী সৈন্যেরা প্রতিশোধ নিতে আসবে; তারা এ-কথাটা ভেবে দেখলোনা যে তাদের আর তাদের শত্রুদের মাঝখানে রয়েছে ন'শো মাইল মরুর ব্যবধান। তাদের এক মস্ত প্রতিনিধি দল এলো লারামি কেল্লায়, প্রায়শ্চিত্তরূপে সঙ্গে নিয়ে এলো অনেকগুলো ভালো ঘোড়া, উপহার দেবে বলে। লারামি কেল্লার সর্দার বর্ডো এই প্রায়শ্চিত্তের উপহার গ্রহণ করতে রাজি হলো না। তারা বলল তারা হত্যাকারীকে ধরে এনে দিলে সে তাতে সন্তুষ্ট হবে কিনা। কিন্তু বর্ডো তাও অস্বীকার করল। আরাপাহোরা এতে আরো অনেক বেশী ভয় পেয়ে ফিরে গেল। কয়েক সপ্তাহ এসে চলে গেল, কিন্তু তবু কোনো সৈনিকের দেখা নেই। ইণ্ডিয়ান চরিত্র যারা ভালো জানত, এর ফল যেমনটি হবে বলে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, হলোও ঠিক তাই। তারা ভেবে নিল যে ভয় পেয়েই বর্ডো তাদের দেওয়া উপহারগুলো নিতে রাজি হয়নি, এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির ভয়ে তাদের ভীত হবার কোনোই কারণ নেই। ভীষণ আতঙ্ক থেকে তারা চলে গেল একেবারে চরম ঔদ্ধত্যে। তারা বলতে লাগল শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা সব ভীরু আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, এবং একজন বন্ধুভাবাপন্ন ডাকোটা লারামি কেল্লায় এই খবর নিয়ে এলো যে প্রথম যে শ্বেতাঙ্গ 'কুকুর'-এর তারা নাগাল পাবে, তাকেই হত্যা করতে তারা দৃঢ়সংকল্প।

লারামি কেল্লায় যদি কোনো উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী থাকতেন, এবং আরাপাহোরা যে হত্যাকারীকে ধরে এনে দেবে বলেছিল তাতে তিনি রাজি হয়ে যেতেন, এবং আরাপাহোদের সামনেই সেই হত্যাকারী লোকটিকে গুলী করিয়ে মারাতেন, তাহলেই তারা ভয় পেয়ে শায়েস্তা হতো এবং বিপদ অনেকখানি কেটে যেতো। কিন্তু এখন 'মেড্‌সিন বো' পাহাড়ের আশেপাশের জায়গাগুলো ছিল

মারাত্মক বিপদসঙ্কুল। শ্বেতাঙ্গদের পরম বন্ধু বুড়ো মেনে-সীলা এবং আরো অনেক ইণ্ডিয়ান সেই দুজন ফাঁদপাতা শিকারীকে ঘিরে তাদের সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো; বিপদের সম্ভাবনাকে রুলো আর সারাফিন হেসেই উড়িয়ে দিল। যে ভোরে তাদের তাঁবু ছেড়ে রওনা হবার কথা, তার আগের দিনের ভোরে আমরা সবাই দেখলাম মেড্‌সিন বো পাহাড়ের অন্ধকার পাদদেশ থেকে ক্ষীণ সাদা ধোঁয়ার রাশি উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানী স্কাউটদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো; তারা ঘুরে দেখে এসে খবর দিল ঐ ধোঁয়া উঠে আসছে আরাপাহোদের একটি শিবির থেকে, যেটি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। তবুও ঐ দুজন ফাঁদপাতা শিকারী বিদায় নেবার জন্য অম্লানবদনে তৈরি হতে লাগল।

সারাফিন ছিল লম্বা, শক্তিশালী ব্যক্তি। তার মুখে কেমন একটা রুক্ষ আর অশুভ দৃষ্টি। তার বন্দুক খুব সম্ভব মহিষ এবং ইণ্ডিয়ান ছাড়া অন্য রক্তও ঝরিয়েছিল। রুলোর মুখটি ছিল চওড়া আর লাল, শিশুর মুখের মতোই চিন্তা বা উদ্বেগের কোনো চিহ্নই ঐ মুখে ছিল না। তার দেহটি বেশ চৌকো ধরনের আর বলবান, কিন্তু তার পায়ের পাতা দুটিরই সামনের অংশগুলো তুষারপাতের ঠাণ্ডায় খসে পড়ে গিয়েছিল। তার ঘোড়াটাও সম্প্রতি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে তার বুকে সে ভীষণ চোট পেয়েছিল। কিন্তু কিছুই তার আমুদে স্বভাবটা নষ্ট করতে পারেনি। সে সারাদিন তার খুঁটির মতন পা দুটোর ওপর ভর করে শিবিরময় ঘুরে বেড়াত, অনর্গল বকবক করত, গান গাইত, আর ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তামাসা করত। ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের ওপর রুলোর একটু দুর্বলতা ছিল, আর এ ব্যাপারে তার ভাগ্যটা ভালো ছিল না। একটি-না-একটি ইণ্ডিয়ান স্ত্রী তার সবসময় থাকত, তাকে সে পুঁতি, ফিতা প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান নারীদের প্রিয় সবরকম সাজ-সজ্জার জিনিস দিয়ে তুষ্ট রাখত, আর শিকার-অভিযানে যাবার সময় এই স্ত্রীটিকে একা ফেলে যেতে হলেও তাতে সে মোটেই উদ্বিগ্ন বোধ করত না। কারণ তার চরিত্র ছিল সন্দেহপরায়ণের ঠিক উল্টো। বিপজ্জনক ব্যবসা করে তার যে মুনাফা হতো, তার সবটা সে স্ত্রীর পিছনে খরচা না করলে, বাকি অংশটা উড়িয়ে দিত তার দোস্তদের ভোজ খাইয়ে। মদ না মিললে—প্রায়ই মিলত না—তার বদলে খুব কড়া কফি দেওয়া হতো আর সেদিককার লোকের চরিত্রে আত্মসংযম বা সঞ্চয়-বুদ্ধি ছিল না বললেই চলে, কাজেই এইসব ভোজ-উৎসবে তাদের সামনে যা দেওয়া হতো তা

যত দামের বা যে পরিমাণেরই হোক না কেন, এক বৈঠকেই সব সাবাড় করে দিত। অন্যান্য ফাঁদপাতা শিকারীদের মতো রুলোর জীবনও ছিল বৈপরীত্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। শিকারের কাজে সে বাইরে থাকত কয়েকটি বিশেষ মরশুমে মাত্র, আর অল্প সময়ের জন্য। বছরের বাকি সময়গুলো সে কেল্লায় আল্‌সেমি করে কাটাত, অথবা তার কাছাকাছি বন্ধুদের তাঁবুতে তাঁবুতে তাদের সঙ্গে অবসর জীবনের নানারকম আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু একবার যখন ফাঁদ পেতে বীভার ধরার কাজে লেগে যেতো তখন নানারকম কষ্ট আর বিপদ তাকে সইতে হতো, হাত পা চোখ আর কান সবসময় সতর্ক রেখে। সেসময় রাতের খাওয়া তাকে প্রায়ই কাঁচা খেয়ে খুশি থাকতে হতো, আগুন জ্বাললে পাছে তা কোনো ভ্রাম্যমাণ ইণ্ডিয়ানের চোখে পড়ে। কখনো বা কোনোমতে যা-হোক কিছু খেয়ে আগুন জ্বেলে রেখেই সে অন্ধকারে গা ঢেকে কিছু দূরে চলে যেতো, যেন তার শত্রু ঐ আগুন দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এসে ছাখে সে আর সেখানে নেই, আর অন্ধকারে তার পদচিহ্ন দেখে তার পিছু নিতে না পারে। রকি পাহাড়ে অনেক মানুষের জীবন এইভাবেই চলে। আমি একবার একজন ফাঁদপাতা শিকারীকে দেখেছিলাম, যার বুকে ছিল ছয়টি বন্দুকের গুলীর আর তীরের ক্ষতচিহ্ন, গুলীর আঘাতে একটি বাহু ভাঙা, একটি হাঁটুও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু সে নিউ ইংল্যাণ্ডের মানুষ, তার চরিত্রে নিউ ইংল্যাণ্ডের দৃঢ়তা, এরপরও সে তার এই বিপজ্জনক ব্যবসা ছাড়েনি।

এই শিবিরে আমাদের অবস্থান যেদিন শেষ হলো, সেদিন এই ফাঁদপাতা শিকারী দুজন বিদায় নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি। কালো-পাহাড়ে থাকতে তারা সাতটি বীভার ধরেছিল; সেই সাতটি বীভারের ছাল তারা রেনালের কাছে গচ্ছিত রেখে গেল, ফিরে এসে ফেরৎ নেবে। তাদের ঘোড়া দুটি বলবান আর ছিপ্‌ছিপে, মুখে মরচে-ধরা স্প্যানিশ বল্‌গা পরানো, পিঠে চাপানো মেক্‌সিকান জিন, আর তার সঙ্গে ঝুলানো কাঠের তৈরী রেকাব। জিনের পিছনদিকে একটি মহিষ-চর্মের পোশাক গুটানো, আর সামনের দিকে কয়েকটা বীভার-ধরা ফাঁদ। এগুলো আর বন্দুক, ছুরি, বারুদের চোঙা, বন্দুকের গুলীর থলে, চক্‌মকি পাথর আর ইস্পাত, এবং একটি টিনের বাটি—এই হলো তাদের সম্পূর্ণ সরঞ্জাম। তারা আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল; সারাদিন চলল আগে আগে গম্ভীর মুখে, কিন্তু রুলো দিব্বি খুশ-মেজাজে জিনের ওপর উঠে বসে গায়ে লাথি মেরে আর চাবুক চালিয়ে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যথাসাধ্য চড়া গলায় একটা ক্যানাডিয়ান গান গাইতে-গাইতে চলল। রেনাল তাদের পিছু পিছু তাকিয়ে রইল, তার মুখে ক্রূর স্বার্থপরতার

চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সে বলল, "ওরা যদি মারা পড়ে তাহলে বীভারের ছালগুলো আমারই হয়ে যাবে। কেল্লায় গিয়ে এগুলো বেচে পঞ্চাশটা ডলার তো পাবোই।"

ঐ বীভার-শিকারী দুটিকে সেই শেষ দেখলাম।

শিকার-শিবিরে আমাদের তখন পাঁচ দিন কেটে গেছে। এই পাঁচ দিনের রোদে শুকানো মাংস এখন স্থানান্তরে চালান দেবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। মহিষের চামড়াও যে পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছিল তা আগামী ঋতুতে তাঁবু তৈরি করবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এখন বাকি রইল যথেষ্ট পরিমাণে লম্বা খুঁটি সংগ্রহ করা, যেগুলোর ওপর ঐ চামড়া বিছিয়ে তাঁবু তৈরি হবে। এই খুঁটির যোগাড় হবে কালো-পাহাড়ের লম্বা পরিচ্ছন্ন গাছের বন থেকে; অতএব আমাদের এবার যাত্রা করতে হবে সেই দিকে। সারা ইণ্ডিয়ান শিবিরে এসময়ে এত প্রাচুর্য যে একজনেরও অভাব ছিল না, কারণ যদিও মৃত মহিষের চামড়া আর জিহ্বাটার ওপর ঐ মহিষটিকে যে হত্যা করেছে তারই একচেটিয়া অধিকার, মহিষটার দেহের বাকি অংশ থেকে খুশিমতো নেবার সকলেরই সমান অধিকার। সেইজন্যই দুর্বল, বৃদ্ধ, এমনকি অলস অকর্মণ্যরাও শিকারের ভাগ নিতে আসে এবং ভাগ পায়; এর ফলে অনেক অসহায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যারা এ না হলে না-খেয়ে মারা যেতো, খাদ্যের এতটুকু অভাব কখনো ভোগ করে না।

২৫শে জুলাই বিকেলবেলা শিবির ভাঙা হলো, যথারীতি বিশৃঙ্খলা আর হট্টগোলের সঙ্গে। আমরা আবার প্রেয়ারিভূমির ওপর দিয়ে রওনা হলাম, কতক ঘোড়ায় চড়ে, কতক পায়ে হেঁটে। অবশ্য কয়েক মাইল মাত্র গিয়েই থামলাম। বুড়োরা দিব্বি সকলের আগে আগে পায়ে হেঁটে এগিয়ে এসেছিল; তারা এখন মাটির ওপর গোল হয়ে বসল, আর বিভিন্ন পরিবারেরা নির্ধারিত পর্যায় অনুসারে তাদের চারধারে তাঁবু খাটিয়ে যথারীতি অনেকটা জায়গা ঘিরে অনেক তাঁবুর একটি বৃত্ত তৈরি করে ফেলল। ইতিমধ্যে গাঁয়ের বুড়োরা বসে বসে ধূমপান আর কথোপকথন চালিয়ে গেল। আমি আমার ঘোড়ার লাগামটা ছুঁড়ে রেমণ্ডকে দিয়ে যথারীতি ঐ বুড়োদের সঙ্গে বসে গেলাম। ইণ্ডিয়ানরা যখনি বৈঠকে বসে তখনি একটা গাম্ভীর্যের ঠাট বজায় রাখে; তাদের অবিশ্বাসভাজন কোনো শ্বেতাঙ্গ সামনে থাকলেও তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কিছুই দেখলাম না। বরং এই বুড়োর দল খুব হাসি-তামাসাতেই মেতে রইল, এবং এদের চাইতে অনেক আলাদা জাতের সমাজের মতোই এই বৈঠকেও সূক্ষ্ম রসিকতার অভাব থাকলেও স্থূল হাসির একটুও অভাব ছিল না।

প্রথম পাইপটা ফুঁকে ফুঁকে যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন আমি আমার আশ্রয়-

দাতার তাঁবুতে চলে গেলাম। এখানে আমি সবেমাত্র সামনের দিকে ঝুঁকে আমার বারুদের চোঙা আর গুলীর থলেটা নামাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একেবারে সামনে কানে-তালা-লাগানো রণহুঙ্কার শুনতে পেলাম। কোংরা-টোঙ্গার স্ত্রী তার কোলের বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে তাঁবুর বাইরে ছুটে গেল। আমি ওর পিছনে গেলাম, গিয়ে দেখি সারাটা গ্রাম জুড়ে বিশৃঙ্খলা, চীৎকার, হৈ-হল্লা। মাঝখানে বসে যে বুড়োরা মজলিস জমিয়েছিল, তারা উধাও। যোদ্ধারা জলজ্বলে চোখে তাদের তাঁবুর নীচু-নীচু ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো আর চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল গাঁয়ের সীমান্তের দিকে। ঐদিকেই কিছুদূর এগিয়ে আমি একটি উত্তেজিত জনতা দেখতে পেলাম। ঠিক তখনই শুনতে পেলাম রেনাল আর রেমণ্ড অনেকদূর থেকে আমাকে ডাকছে। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম রেনাল তার বন্দুক হাতে আমাদের শিবিরের অদূরবর্তী একটি ছোট্ট নদীর ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, সে রেমণ্ডকে আর আমাকে ডাকছে তার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে, আর রেমণ্ড তার স্বভাবসিদ্ধ ধীরগতি আর অবিচলিত ভাব বজায় রেখে ঐদিকে এগোতে শুরু করেছে।

ইণ্ডিয়ানদের এই লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে না চাইলে এটাই ছিল নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের কাজ ; আমিও তাই ওদের দিকে রওনা হচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক এইসময় সাপের চোখের মতো একজোড়া চোখ পাশের একটি তাঁবুর ফাঁকে দেখা দিল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এলো বুড়ো মেনে-সীলা 'রণং দেহি' মূর্তিতে, তার এক হাতে তীর-ধনুক, অপর হাতে ছুরি। বেরিয়েই সে হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল আর তার অস্ত্রগুলো ছিট্‌কে পড়ল তার হাত থেকে। স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করতে করতে তাদের বাচ্চাগুলোকে বিপদের মুখ থেকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগল। লক্ষ্য করলাম ওদের কেউ কেউ হাতের সামনে যে অস্ত্র পেল তাই তুলে নিয়ে চলে গেল, পাছে এগুলো ঝামেলা বাড়ায়। এই শিবিরের কাছাকাছি একটি চড়াইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একসারি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তারা এই গোলমাল থামিয়ে দেবার জন্য একটি বিশেষ গান গাইছিল, ওদের বিশ্বাস ঐ গানে অশান্তি-নাশক যাদুশক্তি আছে। আমি নদীর দিকে অগ্রসর হতে হতে আমার পিছনে বন্দুকের গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, আর পিছনে তাকিয়ে দেখলাম জনতা দু'ভাগ হয়ে গেছে, আর কিছুটা দূরত্ব মাঝখানে রেখে দু'ধারে লম্বা দুটি সারিতে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে দু'দল নগ্ন যোদ্ধা। তারা চীৎকার করছে আর বিপরীত দিক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর আর গুলী এড়াবার জন্য এদিক ওদিক লাফাচ্ছে। ওদিক থেকে এদিকে আর এদিক থেকে ওদিকে তীর আর গুলী ছুটছে। সেই সময় আমার মাথার ওপরেও কতকগুলো তীব্র গুম্‌গুম্ আওয়াজ শুনলাম, গ্রীষ্মের

সন্ধ্যায় ঝিঁঝির ঝাঁকের সমবেত সঙ্গীতের মতোই অনেকটা। এ আওয়াজ আমাকে সাবধান করে দিল যে বিপদ শুধু লড়াইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই স্রোতের মধ্য দিয়ে হেঁটে আমি ওপারে গিয়ে রেনাল আর রেমণ্ডের সঙ্গে যোগ দিলাম। ঘাসের ওপর বসে আমরা তিনজন সশস্ত্র নিরপেক্ষতার ভঙ্গিতে বসে বসে যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আমাদের পক্ষে হয়তো ভালোই হলো, কিন্তু লড়াইটা যে প্রায় শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে, তা আশা করিনি। আবার যখন ওদিকে তাকালাম, তখন দেখলাম দু'দিকের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আবার একসঙ্গে মিশে গেছে, মাঝে মাঝে দু'-একটা চীৎকার শোনা গেলেও গুলী-চালানো একেবারেই থেমে গেছে। লক্ষ্য করলাম পাঁচ-ছয়জন লোক খুব ব্যস্তসমস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে; তারা যেন শান্তি-স্থাপন-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। গ্রামের একজন ঘোষণাকারী উচ্চকণ্ঠে কি ঘোষণা করল, আমার সঙ্গী দুজন অন্যদিকে এত ব্যস্ত ছিল যে সেটা অনুবাদ করে আমায় শোনাতে পারল না। ভিড় পাতলা হতে শুরু করল, যদিও যোদ্ধারা যে যার ঘরে ফিরে যেতেই অনেক গভীর কালো চোখ অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলে উঠল। গোলমালটা যে ভালোয়-ভালোয় থেমে গেল সেজন্য ধন্যবাদের পাত্র কয়েকটি বৃদ্ধ ইণ্ডিয়ান। এরা মেনে-সীলার মতো লড়াইপ্রিয় নয়। এরা সাহস করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মাঝখানে ছুটে গিয়েছিল, আর কতকগুলো 'সৈন্য' অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পুলিশের সহায়তায় শান্তিস্থাপনে সক্ষম হয়েছিল।

এতগুলো তীর আর গুলী ছোঁড়া হলো অথচ একজনও মরল না, এ ব্যাপারটা আমার ভারি অদ্ভুত বলে মনে হলো। এর একমাত্র এই ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম যে আক্রমণকারী আর আক্রান্ত দুইপক্ষই সবসময় লাফাচ্ছিল। গ্রামের অধিকাংশই লড়াইতে যোগ দিয়েছিল, আর সারা শিবিরে এক ডজনের বেশী বন্দুক না থাকলেও অন্ততঃ আট-দশটি গুলী চলেছিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব অপেক্ষাকৃত শান্ত। একদল যোদ্ধা আবার বসল গাঁয়ের মাঝখানে, কিন্তু এবার আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে বসতে ভরসা পেলাম না, কারণ দেখলাম ধূমপানের পাইপটা সাধারণ নিয়মে না ঘুরে উল্টো দিকে, অর্থাৎ বৃত্তাকারে একজনের বাঁ হাত থেকে অন্যের ডান হাতে যাচ্ছে। এ থেকে নিশ্চিত বোঝা গেল এ হচ্ছে তাদের ঝগড়া সাঙ্গ করে পুনর্বন্ধুত্ব-স্থাপনের দাওয়াই হিসেবে ধূমপান, এ আসরে শ্বেতাঙ্গের উপস্থিতি মানে অনধিকার-প্রবেশ। আবার যখন গ্রামের ভেতরে ফিরে গেলাম তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, উত্তেজনার জের তখনো আবহাওয়া

থেকে কেটে যায়নি, আর অনেক মেয়েলী কণ্ঠের কান্না, চীৎকার আর আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, না মেয়েরা অতীতের লড়াইতে নিহত প্রিয়জনের কথা মনে করে শোকের কান্না কাঁদছে, সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম না।

এই ঝগড়ার কারণ সম্বন্ধে খুব বেশী কৌতূহল প্রকাশ করাটা তখন মোটেই সুবুদ্ধির কাজ হতো না। আমি তাই এর উৎপত্তির কারণটা আবিষ্কার করেছিলাম কিছুদিন পরে। ডাকোটাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি সমিতি আছে—কুসংস্কারগ্রস্ত, যুদ্ধপ্রিয় অথবা মিশুক। এদের মধ্যে একটি সমিতির নাম 'বাণ-ভঙ্গকারী'—এ সমিতিটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু এই গাঁয়ে তাদের চারজন ছিল। তাদের চেনা যেতো তাদের চুলের বিন্যাস দেখে। তাদের চুলগুলো কপালের ওপর অনেকটা উঁচু আর খাড়া হয়ে থাকত, তাতে তারা সত্যি যতটা লম্বা ছিল, তার চাইতে বেশী লম্বা দেখাত, আর চেহারাও ভয়ঙ্কর দেখাত। এদের ভেতর প্রধান ছিল 'পাগলা নেকড়ে' নামে একটি যোদ্ধা। লোকটা আয়তনে বিরাট, গায়ে জোরও ছিল তার অসামান্য, তেমনি তার সাহস, আর সে যেন অপদেবতার মতোই ভয়ঙ্কর। আমি এই লোকটাকে সারা গাঁয়ের ভেতর সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করতাম ; আর লোকটা যদিও আমাকে মাঝে-মাঝেই ভোজে নিমন্ত্রণ করত, আমি কখনোই ওর কাছে নিরস্ত্র অবস্থায় যেতাম না। 'পাগলা নেকড়ে'র নজর পড়েছিল 'লম্বা ভালুক' নামক একটি ইণ্ডিয়ানের একটি চমৎকার ঘোড়ার ওপর। ঐটে নেবার জন্য সে 'লম্বা ভালুক'কে প্রায় ঐ ঘোড়াটার সমমূল্যের একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল। ডাকোটাদের রীতিনীতি অনুযায়ী এই উপহার গ্রহণ করার অর্থই প্রতিদানে কিছু দেবার দায়িত্ব মেনে নেওয়া ; 'লম্বা ভালুক'ও বুঝতে পেরেছিল 'পাগলা নেকড়ে' তার পেয়ারের মহিষ-শিকারের ঘোড়াটি নেবার মতলবে আছে। এটা বুঝেও সে কোনোরকম ধন্যবাদ না দিয়েই 'পাগলা নেকড়ে'র উপহার-দেওয়া ঘোড়াটা গ্রহণ করে নিজের তাঁবুর সামনে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর দিনের পর দিন চলে যায়, 'লম্বা ভালুক' প্রতিদান দেবার নামও করে না। 'পাগলা নেকড়ে' অধীর হয়ে উঠল ; তারপর যখন দেখল তার উপহার-দানটা মাঠে মারা যাচ্ছে, প্রতিদানে কিছু পাবার আশা দেখা যাচ্ছে না, তখন সে ঠিক করল উপহারটা ফেরৎ নেবে। এই ভেবে সেই সন্ধ্যাবেলা, যখন ইণ্ডিয়ানরা সবাই তাঁবুতে ফিরে এসেছে, ঘোড়াগুলোও ফিরেছে, সে 'লম্বা ভালুক'-এর তাঁবুতে গিয়ে তার দেওয়া ঘোড়াটা টেনে নিয়ে ফিরে চলল। এই দেখেই 'লম্বা ভালুক' ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল—এরকম হঠাৎ-ক্ষেপে-ওঠা ইণ্ডিয়ানদের

মধ্যে বিরল নয়—আর ছুটে গিয়ে সেই ঘোড়া-বেচারাকে ছুরির তিনটি আঘাতে মেরে ফেলল। 'পাগলা নেকৃড়ে' তখন বিদ্যুৎ-গতিতে ধনুকে বাণ পরিয়ে ছিলাটি পুরোপুরি টেনে বাণের ডগাটা রাখল 'লম্বা ভালুক'-এর বুকের কাছাকাছি। 'লম্বা ভালুক'—পরে আমি প্রত্যক্ষদর্শী ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনেছিলাম—রক্তাক্ত ছুরিটা হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ শান্তভাবেই তার আক্রমণকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন তার বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। বাকি তিনজন 'বাণ-ভঙ্গকারী'ও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল 'পাগলা নেকৃড়ে'র পাশে। তাদের বন্ধুরাও ছুটে এসে তাদের সঙ্গে জুটলো। এরপরই রণহুঙ্কার আর হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হলো। দ্বন্দ্বটা ব্যক্তিগত পর্যায় ছাড়িয়ে শিবিরের সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

'সৈন্যেরা'—যারা যথাসময়ে সহায়তা দিয়ে লড়াইটা থামিয়ে দিয়েছিল—ইণ্ডিয়ান গ্রামে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্মচারী। এই সৈন্যগিরির পদটা খুবই সম্মানের, এবং কেবলমাত্র সাহসী এবং সুনামযুক্ত ইণ্ডিয়ানরাই এ পদ লাভ করে। এরা ক্ষমতা পায় গ্রামের বৃদ্ধ এবং প্রধান যোদ্ধাদের কাছ থেকে। এরা এই 'সৈন্য'দের নির্বাচিত করে বিশেষ নির্বাচনী সভায়, কাজেই এই 'সৈন্য'রা যেভাবে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গ্রামের অপর কেউ তেমনটি করতে সাহস পায় না। ওগিল্লাল্লা সর্দাররা পর্যন্ত গ্রামের অতিসাধারণ লোকের গায়েও হাত তুলতে ভরসা পায় না, পাছে তাতে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন হয়; কিন্তু কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অন্যের গায়ে হাত তুলবারও পুরো অধিকার এই নির্বাচিত 'সৈন্য'দের আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

কালো-পাহাড়

আমরা দু'দিন পূবদিকে অগ্রসর হলাম, তারপর আমাদের সামনে দেখা দিল কালো-পাহাড়ের উঁচু সারি। ইণ্ডিয়ানরা মাইল কয়েক এই পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে চলল, উষর প্রেয়ারিভূমির ওপরও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে, অথবা অদ্ভুত আকারের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন, টুকরো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে। সোজা বাঁ-দিকে ঘুরে আমরা পাহাড়ের একটি চওড়া গিরিপথে প্রবেশ করলাম, যার তলা দিয়ে বঙ্কিম স্রোতে বয়ে চলেছিল একটি সরু নদী। নদীর দু'পাশে লম্বা ঘাস আর ঘন

ঝোপ, আর সেই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে ছিল অনেক বীভারের গর্ত। আমরা এগিয়ে চললাম দু'সারি উঁচু খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ; সেই পাহাড়ের গায়ে গাছ, ঝোপ তো ছিলই না, একগোছা ঘাসও নয়। চঞ্চল ইণ্ডিয়ান বালকেরা চলল এই খাড়া পাহাড়েরই উঁচুনীচু কিনারার ওপর দিয়ে ; কখনো বা তারা কোনো উঁচু চূড়ার ধারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমাদের মিছিল। আমরা যত এগোতে লাগলাম, পথ ততই সরু হয়ে আসতে লাগল, তারপর হঠাৎ সামনে দেখলাম গোলাকৃতি ফাঁকা, সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এখানে ইণ্ডিয়ান সবগুলো পরিবারই থেমে গেল, আর দেখতে দেখতে যেন যাদুমন্ত্রে ইণ্ডিয়ান শিবির গড়ে উঠল।

তাঁবুগুলো খাড়া হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই ইণ্ডিয়ানরা—যে উদ্দেশ্যে এখানে আগমন, তাদের স্বভাব অনুযায়ী সেই উদ্দেশ্যসাধনে, অর্থাৎ তাদের নতুন বছরের নতুন নতুন তাঁবুর জন্য খুঁটি-সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। শিবিরের আদ্ধেক মানুষ—পুরুষ, স্ত্রীলোক আর বালক ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের গভীরে। অশ্বারোহী আর অশ্বারোহিণীদের এক বিচিত্র মিছিল টুকরো-টুকরো পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওধারের এক গিরিপথের মুখের দিকে। আমরা চললাম যে-পথ বেয়ে, তার দু'পাশে খাড়া পাহাড়, মাথার দিকে সরু আর ভাঙাচোরা, আর ধারে ধারে সারি সারি ফার গাছ। আমাদের বাঁ ধারের পাহাড়টা যেন লম্বা দেয়ালের মতো আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে চলেছে, কিন্তু ডানদিকে পাহাড় আর আমাদের মাঝখানে রয়েছে একটি সরু নদী আর লম্বা সরু একফালি জলা জমি। নদীটির ক্ষীণস্রোত মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছিল বীভারদের গর্তখোঁড়া মাটিতে, আর প্রায়ই প্রশস্ত জলাশয়ের সৃষ্টি হচ্ছিল এখানে সেখানে। স্রোতের দু'ধারে অনেক ঘন ঝোপ আর অনেক মরা আর প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত গাছ। অনেকক্ষেত্রেই শুধু গাছের গুঁড়িটুকুই অবশিষ্ট ছিল, তার ওপর ছিল বীভারদের ধারালো দাঁতের চিহ্ন—ঐ অক্লান্ত পরিশ্রমী প্রাণীগুলো গুঁড়িগুলোকে কাটতে কাটতে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কখনো কখনো আমরা যেন সারি সারি ঘন গাছের মধ্যে ডুব মেরে কিছুক্ষণ বাদে গাছের আড়াল পেরিয়ে আবার খোলা জায়গায় পড়ে ইণ্ডিয়ানদের মতোই পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলাম। পলিন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছিল খণ্ড খণ্ড পাথরের ওপর দিয়ে, এমন সময় আমি টের পেলাম ওর জিনের বেড়টা আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে ; আমি সেটা কষে শক্ত করে দেবার জন্য একধারে সরে নেমে পড়লাম। আমার পাশ দিয়ে তখন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল জমকালো অলঙ্কারের আওয়াজ করতে করতে স্ত্রীলোকেরা, আর পুরুষগুলো হাসির

হুল্লোড়ে যেতে আর চীৎকার করে ঘোড়াদের ওপর চাবুক চালাতে চালাতে। কালো লেজওয়ালা তুটি হরিণ লাফিয়ে চলে গেল, রেমণ্ড ঘোড়ার পিঠে বসেই তাদের লক্ষ্য করে গুলী চালাল। তার গুলীর আওয়াজ তু'দিকে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হলো। সেই প্রতিধ্বনি যেন এদিকে ওদিকে ধাক্কা খেয়ে লাফাতে লাফাতে দূরে মিলিয়ে গেল।

এভাবে ছয় কি আট মাইল ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাওয়ার পর দৃশ্য বদলে গেল। তখন দেখতে পেলাম পাহাড়ের ধারগুলো ঢেকে গেছে লম্বা, সরু, পরিচ্ছন্ন গাছের অরণ্যে। ইণ্ডিয়ানরা কুড়াল আর ছুরি নিয়ে কতক ডাইনে আর কতক বাঁয়ে চলে গেল গাছ কেটে-কেটে খুঁটি সংগ্রহ করতে, যেজন্য তাদের এখানে আসা। শীগ্‌গীরই আমি প্রায় একা পড়ে গেলাম, কিন্তু বিজন পাহাড়ের এই স্তব্ধতার মধ্যে কাছ থেকে আর দূর থেকে শোনা যেতে লাগল কুড়ালের কোপের আর কথাবার্তার আওয়াজ।

রেনাল ইণ্ডিয়ানদের নানা অভ্যাসের এবং তাদের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলির অনুকরণ করত। সে নিজের আর তার স্ত্রীর জন্য একটি বেশ ভালো তাঁবু বানাবার মতোই যথেষ্ট মহিষ মেরেছিল, আর এখন সে তার তাঁবুর সরঞ্জাম সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে খুঁটি-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিল। সে আমাকে বলল তার এই কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যেন রেমণ্ডকে তার সঙ্গে যেতে দিই। আমি এতে সম্মতি দিলাম, আর ওরা তুজন অমনি সঙ্গে সঙ্গে বনের সবচেয়ে ঘন অংশের ভেতর ঢুকে গেল। আমার ঘোড়াটা রেমণ্ডের জিম্মায় রেখে আমি পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। আমি তুর্বল আর অবসন্ন ছিলাম, তাই খুব আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম করে করে। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে আমি এমন একটা উঁচু জায়গায় উঠলাম যেখান থেকে আমার ছেড়ে আসা সেই ছোট্ট উপত্যকাটিকে মনে হলো একটা গভীর অন্ধকার খাদ, যদিও পাহাড়ের তুরারোহ চূড়াটি তখনো আরো অনেকদূরে উঁচুতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমার চারদিকে তখন সেইসব জিনিস, যাদের সঙ্গে আমি বাল্যকাল থেকে পরিচিত : পাহাড়ের চূড়া, পাথর, ছায়াচ্ছন্ন যে কালো নদী কুলুকুলু করে বয়ে চলেছে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, শ্যাওলায় ঢাকা বিকৃতভাবে বেড়ে-ওঠা গাছ, আর বয়সে আর ঝড়ে এলিয়ে-পড়া গাছের যেসব গুঁড়ি ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের ওপর অথবা নদীর স্রোতের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে।

ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন এই পাহাড়গুলোতে অনেক বাসিন্দা। আমি পাহাড়ের আরেকটু উঁচুতে উঠে দেখলাম পাহাড়ের গায়ের ওপর এল্‌ক্ হরিণরা দল বেঁধে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করে চওড়া পায়ে-চলার পথ তৈরি করেছে। পাহাড়ের মাথার

ওপরকার ঘাসগুলো তাদের পায়ে পায়ে দলিত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ; নেকড়েদের পায়ের ছাপও অনেক দেখলাম। তারপর পাহাড়ের আরো উঁচু-নীচু আর খাড়া অংশে দেখলাম নতুন ধরনের পায়ের ছাপ, যা আগে কখনো দেখিনি। এগুলোকে রকি পাহাড় এলাকার ভেড়ার পায়ের ছাপ বলেই ধরে নিলাম। একটা পাথরের ওপর বসলাম। আমাকে ঘিরে পূর্ণ নীরবতা ; হাওয়া বইছে না, একটি পতঙ্গও আওয়াজ শোনাচ্ছে না। হঠাৎ খেয়াল হলো এরকম জায়গায় হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে, তাই উল্টো দিকের পাহাড়ের একটি খুব উঁচু চূড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সেটা নীচের বন থেকে খাড়া অনেক উঁচুতে উঠেছে, আর—প্রকৃতির এ এক বিস্ময়কর খামখেয়ালি—একেবারে ডগায় ধরে রেখেছে মস্ত একখণ্ড আল্‌গা পাথর। একটা সাদা নেকড়ে ঝোপের মধ্য থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো, আর একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমার ভারি লোভ হলো কালো-পাহাড়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার মাথার খুলির চামড়াটা নিয়ে যাবো ; কিন্তু আমি গুলী চালাব কি, তার আগেই সে পাহাড়ের ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই শুনলাম খস্‌খস্‌ আওয়াজ আর মট্‌মট্‌ করে গাছের ছোট ছোট ডাল-ভাঙার শব্দ, আর দেখলাম উঁচু ঝোপগুলির ওপর থেকে একটি এল্‌ক্ হরিণের মস্ত ছড়ানো শিংগুলো বেরিয়ে পড়েছে। মনে হলো আমি এসে পড়েছি শিকারীর স্বর্গে।

এই হলো কালো-পাহাড় অঞ্চল, যেমনটি দেখেছিলাম জুলাই মাসে। কিন্তু শীতের শুরুতে ঐ অঞ্চলের চেহারা বদ্‌লে যায়। তখন ফার গাছের চওড়া ডালগুলো তুষারের ভারে নুয়ে পড়ে, আর কালো-পাহাড়গুলো তুষারপাতে সাদা হয়ে ওঠে। শীতকালেই ফাঁদপাতা শিকারীরা তাদের শরৎকালের শিকার-অভিযান শেষ করে ফিরে এসে অনেকসময় এই নিরালা অঞ্চলেই তাদের কুটির নির্মাণ করে এখানকার সুলভ জানোয়ার শিকার করে প্রাচুর্যে আর বিলাসে কাটায়। তাদেরই মুখে শুনেছি কী ভাবে তাদের তাম্রবর্ণা প্রেয়সীদের, এবং হয়তো বা জনকয়েক ইণ্ডিয়ান সঙ্গীরও সাহচর্যে তারা এইখানে সম্পূর্ণ নিরালাভাবে বাস করে গেছে। তারা জায়গায় জায়গায় চোরা গর্তের ফাঁদ পেতে রাখত সাদা নেকড়ে, কৃষ্ণসার, মার্টেন প্রভৃতি জানোয়ার ধরবার জন্য। সারারাত তাদের চারদিকের তুষারে ঢাকা পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হতো নেকড়েদের বীভৎস সমবেত চীৎকার, কিন্তু এই শিকারীরা কাঠের গুঁড়ির তৈরী শক্ত চার দেয়ালের ভেতর নিশ্চিন্তমনে শুয়ে থাকত আগুনের কাছে, আর ভোরে উঠে এল্‌ক্ আর হরিণ শিকার করত তাদের ঘরের দরজায় বসেই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পাহাড়ে শিকার

গাছ কেটে কেটে তৈরি-করা নতুন খুঁটিতে খুঁটিতে শিবির ভরে গিয়েছিল। কতকগুলো পুরোপুরি তৈরী অবস্থায় একসঙ্গে গাদা করে রাখা হয়েছিল, সাদা আর চক্‌চকে; রোদে শুকিয়ে সেগুলো শক্ত হচ্ছিল। অন্যগুলো পড়ে ছিল মাটির ওপর, আর স্ত্রীলোক এবং বালকদল, এমনকি যোদ্ধাদের মধ্যেও অনেকে লম্বা গাছের খুঁটিগুলোর ছাল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঠিক মাপে কেটে রাখার কাজে ব্যস্ত ছিল। গতবারের অভিযানে যেসব চামড়া পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলোকে চেঁছে মসৃণ করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হতে লাগল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে চামড়াগুলোকে পরপর জুড়ে জুড়ে জানোয়ারদের পেশীতন্তু দিয়ে সেলাই করতে লাগল, তাঁবুর আচ্ছাদনের জন্য। ইণ্ডিয়ান পুরুষগুলো শিবিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর ধারে ধারে ঝোপের মধ্যে বেড়াচ্ছিল, আর লাল উইলো গাছের ডাল কেটে কেটে লাঠি তৈরি করছিল। এই লাল উইলোর—যাকে ইণ্ডিয়ানরা তাদের ভাষায় বলে 'শোংসাশা'—ছালই তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে ওরা ধূমপানের জন্য ব্যবহার করে। রেনালের স্ত্রী তার ঘরে ছুঁচ আর মহিষের পেশীতন্তু নিয়ে চামড়া-সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল, এবং তার প্রভুটি একগাদা মাংস খেয়ে প্রাতরাশ সমাপ্ত করে রেমণ্ড আর আমাকে নিয়ে ধূমপান করে 'সামাজিকতা' করছিল। শেষকালে সে শিকারে যাবার প্রস্তাব তুলল। সে বলল " 'বিগ ক্রো'র (কোংরা-টোঙ্গার) ঘরে গিয়ে তোমার বন্দুকটা নিয়ে এসো। আমার ওয়াণ্ডট টাট্টু ঘোড়া আর তোমার ঘুড়ীর পণে তোমার সঙ্গে বাজি ধরে বলতে পারি তাঁবু ছাড়িয়ে দু'মাইল যাবার আগেই একটা এল্‌ক্ বা কালো-লেজওয়ালা হরিণের দেখা পাব, এমনকি বড-শিংওয়ালা হরিণও পেয়ে যেতে পারি। আমি আমার স্ত্রীর হলদে ঘোডাটা নেবো। এটাকে হাজার চাবুক মারলেও ঘণ্টায় চার মাইলের বেশী ছোটানো যায় না বটে, কিন্তু পাহাড়ে সে অশ্বতরের মতোই কাজ দেয়।"

রেমণ্ড সাধারণতঃ যে কালো অশ্বতরটিতে চডত, আমি তারই ওপর চড়ে বসলাম। এই জানোয়ারটি বেশ শক্তিশালী অথচ শান্ত ছিল, তাকে সহজেই ইচ্ছা-মতো চালানো যেতো; কিন্তু কিছুদিন ধরে একটি দুর্ভাগ্যের দরুন তার মেজাজটা

ভালো যাচ্ছিল না। হপ্তাখানেক আগে কোনো কারণে একটি ইণ্ডিয়ানের রাগের কারণ হয়েছিলাম, তাই সে প্রতিশোধ নেবার জন্য চুপিচুপি মাঠে গিয়ে এই অশ্বতরটিকে পিছনদিকে ছুরি মেরে ভীষণভাবে আহত করেছিল। ঘা-টা খানিকটা শুকিয়ে গেলেও তখনো তাতে ব্যথা ছিল, আর তারি ফলে সে অন্যান্য অশ্বতরদের চাইতেও বেশী মতলবী আর একগুঁয়ে হয়ে উঠেছিল।

ভোরটা ছিল চমৎকার, আর গত দু'মাসের মধ্যেও এত সুস্থ কখনো থাকিনি। আমরা ছোট্ট উপত্যকাটি ছাড়িয়ে পাহাড়ের একটি ফাঁক বেয়ে উঠতে লাগলাম। শীঘ্রই আমরা যে দূরে চলে এলাম সেখান থেকে তাঁবু চোখে পড়ে না,—মানুষ, পশু, পাখি, পতঙ্গ প্রভৃতি কোনো প্রাণীও নয়। পায়ে হেঁটে ছাড়া এমন বিশ্রী অভিশপ্ত জায়গায় আমি কখনো আসিনি, আর এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো যেন আমার না হয়। কালো অশ্বতরটা খাপ্পা হয়ে উঠল, এমনকি রেনালের শক্ত হলদে ঘোড়াটাও মুহূর্তে মুহূর্তে হোঁচট খেতে লাগল আর ধারালো পাথরে পা কেটে-কেটে যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।

স্তব্ধ নির্জনতা আমাদের চারদিকে। চোখে পড়ছিল শুধু পাহাড়ের মাথাগুলো আর সবুজ-চিহ্নহীন ধারগুলো। অবশেষে আমরা একটি বনাঞ্চলে এসে পড়লাম বটে, কিন্তু এসেই ইচ্ছে হতে লাগল আবার পাহাড়েই ফিরে যেতে, কারণ এ জায়গাটা প্রায় খাড়া উঠে গেছে, আর গাছগুলো এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে কোনো দিকেই দৃষ্টি মাত্র কয়েক হাতের বেশী দূর যায় না।

আপনার যদি বাসনা হয় এমন অবস্থায় পড়বার, যা প্রায় সমপরিমাণে বিপদ-সঙ্কুল আর হাস্যকর, তাহলে একটি দুষ্টু অশ্বতরের পিঠে চাপুন তার মুখে একটা সাদাসিধে বল্‌গা পরিয়ে নিয়ে, আর তাকে চালাতে চেষ্টা করুন বনের মধ্য দিয়ে একটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণের উৎরাই বেয়ে। আপনার হাতে নিয়ে যান একটি লম্বা বন্দুক, পরনে থাক্ লম্বা ঝালরওয়ালা একটি হরিণ-চর্মের জামা, আর মাথায় লম্বা চুল। এগুলো বার বার গাছের ছোট ছোট ডালপালায় আটকে আটকে একটু একটু করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে যাবে, সেগুলো বার বার চাবুকের মতো আপনার মুখে আঘাত করবে, আর ওপরের বড় বড় ডালগুলো আঘাত করবে আপনার মাথার ওপর। আপনার অশ্বতরটি—যদি সে খাঁটি হয়—পালাক্রমে চট্ করে থামবে, আর হঠাৎ সামনের দিকে লাফ মেরে এগোবে, ফলে ওর পিঠের ওপর বার বার আপনার জায়গা বদল হবে। কখনো ওপরের ডালের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাবার ভয়ে আপনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পরম আদরে অশ্বতরটির গলা জড়িয়ে ধরবেন; কখনো বা পিছনে সরে হাঁটু দুটো সামনের দিকে তুলে দেবেন অশ্বতরটির ঘাড়ের ওপর, নইলে পাছে

হাঁটু দুটো জানোয়ারটির পাঁজরা আর গাছের গুঁড়ির চাপে পড়ে পিষে যায়। উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে রেনাল সারাক্ষণ শাপ-শাপান্ত করছিল। কোন্‌দিকে চলেছি সেবিষয়ে আমাদের দুজনের ভেতর কারও বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। বিশ্রী জায়গায় কষ্টসাধ্য ঘোড়ায় চড়া অনেক দেখেছি, কিন্তু সেই পাঁচমিনিটের জঘন্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জেগে থাকবে।

যাই হোক, অবশেষে আমাদের দুঃখের অবসান হলো, আমরা এসে পড়লাম একটি জলস্রোতের কিনারায়, যেটি সেই উৎরাইয়ের পাদদেশ বেয়ে গোল হয়ে ঘুরে বয়ে চলেছে। এখানে নেমে পরমানন্দে বাঁ-দিকে ঘুরে আমরা খুব আরামে এগিয়ে চললাম কলোচ্ছ্বাসী জল আর সাদা উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে। চোখ-ধাঁধানো রোদ থেকে আমাদের আড়াল করে রেখেছিল আমাদের ওপর দিয়ে ঝুঁকে-পড়া গাছগুলোর স্বচ্ছ সবুজ পাতাগুলো। এই আনন্দময় মুহূর্তগুলো বেশীক্ষণ রইল না। আমাদের বন্ধু এই স্রোতস্বিনীটি হঠাৎ একপাশে ঘুরে গিয়ে সগর্জনে ফেনায়িত হয়ে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে নেমে গেল এক অতল গহ্বরে। কাজেই আবার আমাদের ঢুকতে হলো ঐ দুঃসহ বনেরই মধ্যে। এরপর যখন বনের ভেতরকার আলোছায়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম দাঁড়িয়ে আছি প্রখর সূর্যালোকে, পাহাড়ের একটি উঁচু অংশে। আমাদের সামনে বিস্তৃত একটি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত মরু উপত্যকা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে চলে গেছে। ঐদিকে কিছুক্ষণ বেশ মন দিয়ে তাকিয়ে থেকে রেনাল অবশেষে বলতে লাগল : "আমি যখন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ছিলাম, তখন অনেকসময় কালো-পাহাড়ের সারা এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছি সোনার সন্ধানে। প্রচুর সোনা আছে এখানে, এবিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হতে পারো। এবিষয়ে আমি পঞ্চাশবার স্বপ্ন দেখেছি, আর এপর্যন্ত আমার প্রত্যেকটি স্বপ্নই সত্য হয়েছে। ঐ-যে কতকগুলো কালো কালো পাথরখণ্ড ঐ বড় পাথরটার গায়ের ওপর স্তূপাকারে জমে রয়েছে, মনে হয় নাকি ওখানে কিছু থাকতে পারে? কোনো শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এইসব পাহাড়ে খুব বেশী তন্ন তন্ন করে খোঁজা ভালো নয়; ইণ্ডিয়ানরা বলে এই পাহাড়গুলোতে অনেক অপদেবতা আছে; আর আমিও বিশ্বাস করি এখানে সোনার সন্ধান করলে সৌভাগ্য হবে না। তা যাই হোক, আমার ইচ্ছে হয় নীচেকার একটা লোককে তার উইচ-হ্যাজেল গাছের ডাল হাতে নিয়ে ঐখানে সন্ধান করে বেড়াতে। আমি বলতে পারি সে নিশ্চয় শীগ্‌গীরই একটি সোনার খনির সন্ধান পাবে। যাক্‌গে, সোনার কথা আজ থাক্। ঐ নীচের ফাঁকা জায়গার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ। আমরা ঐখানে যাবো। আর আমার মনে হয় কালো লেজের একটি হরিণ ওখানে পাবোই।"

রেনালের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য কি অসত্য, তা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আমরা চললাম পাহাড়ের পর পাহাড, উপত্যকার পর উপত্যকা ছাড়িয়ে ; গভীর খাদ ঘুরে দেখলাম ; কিন্তু তবু একটিও শিকার করবার মতো প্রাণী দেখা গেল না। এতে আমার সঙ্গীটি সত্যিই বিস্মিত আর বিরক্ত হলো। অগত্যা আমরা তখন ঠিক করলাম সমতলভূমিতে বেরিয়ে পড়ব একটি কৃষ্ণসারের সন্ধানে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা একটি সরু উপত্যকা বেয়ে নীচুর দিকে এগিয়ে চললাম। এই উপত্যকার পাদদেশ শক্ত আর জংলী সেজের ঝোপে ঝোপে ভরা, আর তার ওপর চলে-চলে পায়ে-চলার পথ করে রেখে গেছে মহিষেরা, যারা কোনো ব্যাখ্যাতীত রহস্যময় কারণে লম্বা সারি বেঁধে গম্ভীরভাবে এই অনুর্বর পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে চলে আসে।

রেনালের দৃষ্টি অবিশ্রান্ত উঁচু পাহাড়ের গায়ে গায়ে আর খাড়াইয়ের কিনারায় কিনারায় ঘুরে বেড়াতে লাগল ; তার মনে আশা—দেখতে পাবে সেই অনেক উঁচু থেকে পাহাড়ী ভেড়ারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। অবশেষে আমরা দুজনেই লক্ষ্য করলাম একটি পাহাড়ের পাদদেশে কী যেন নড়ে বেড়াচ্ছে। তার একটু পরেই একখণ্ড পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে একটি কালো-লেজওয়ালা হরিণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রেনাল তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল আর ঐদিকে ছুটে গেল। আমি অসুস্থ শরীরে তার পিছনে ছুটতে পারলাম না, তার ঘোড়াটি ধরে বসে রইলাম কী হয় দেখতে। রেনাল অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের ভেতর থেকে বন্দুকের গুলী ছোঁড়ার একটা চাপা আওয়াজ কানে এলো। তারপর রেনালকে দেখলাম বিরক্তিভরা মুখে বেরিয়ে আসতে ; পরিষ্কার বোঝা গেল তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ উপত্যকা বেয়ে সামনের দিকে যেতে যেতে এসে পৌঁছলাম একটি প্রশস্ত এবং অগভীর খাতে, তলায় সাদা রঙের কাদা রোদে শুকিয়ে ফেটে-ফেটে গেছে। বাইরের এই নিরীহ চেহারার আড়ালে রেনালের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়ল বিপদের সম্ভাবনার কিছু কিছু চিহ্ন। আমাকে থামতে বলে সে নেমে একটুকরো পাথর ছুঁড়ে ফেলল ঐ খাতে। বিস্মিতনেত্রে দেখলাম পাথরখণ্ডটি মৃদু থপ্‌থপে আওয়াজ করে যেন ওপরের পাতলা সর ভেঙে তলিয়ে গেল, আর চারধারে হলদে রঙের পাতলা ক্রীমের মতো জিনিস ছিট্‌কে পড়ল। পাঁচ-ছ'ফুট একটা লাঠি মাটির ওপর পড়ে ছিল। এই লাঠিটা দিয়ে আমরা এই ছলনাভরা গহ্বরটির কিনারায় দাঁড়িয়ে গভীরতা মাপবার চেষ্টা করলাম। লাঠিটা তলা পর্যন্ত চলে গেল। এরকম

ভয়ানক মৃত্যুফাঁদ রকি পর্বতমালার পাহাড়গুলোতে বহু আছে। অন্ধ আনমনা গতিতে চলতে চলতে মহিষ মাঝে মাঝে না-জেনে এর ভেতর পড়ে যায়, পড়েই ডুবে যায়, ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ছটফট করে, নরম কাদায় তার মাথা পর্যন্ত ডুবে যায়, তারপর এই কাদার তলায় সেই বিরাট মুমূর্ষু জানোয়ারটির অন্তিম ছটফটানী চিহ্ন দেখা যায় শুধু কাদার প্রশান্ত মসৃণ বুকে মৃদু কম্পনে।

অনেক হাঙ্গামা করে এই খাতের একটা জায়গা পেলাম যেখান দিয়ে পার হওয়া যায়। ওপারে পৌঁছে দেখলাম আমাদের সামনে আদিগন্তপ্রসারিত সমতলভূমি। তারই ওপরে দূরে একটি উঁচু জায়গায় তিন-চারটি কালো বিন্দুকে নড়াচড়া করতে দেখলাম। রেনাল বলল ওরা মহিষ।

সে বলল, "চলো, ওদের ভেতর একটাকে পেতেই হবে। তাঁবুর আচ্ছাদন সেলাই করবার জন্য আমার স্ত্রীর আরো কিছু পেশীতন্তু দরকার। আমারও দরকার কিছু শিরীষের আঠার।"

এই বলে সে হলুদে ঘোড়াটাকে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটিয়ে দিল, আমিও খোঁচা মেরে অশ্বতরটিকে ছোটালাম। অশ্বতরটি দৌড়ের পাল্লায় ঘোড়াকে ছাড়িয়ে চলল। মাইলখানেক এগিয়েছি, এমন সময় দুর্ভাগ্যবশত মস্ত একটা খরগোশ লাফিয়ে এসে ঠিক তার পায়ের সামনে পড়তেই পূর্ণবেগের ওপরই আমার বাহনটি একপাশে একদিকে সরে গেল, আমি দুর্বল শরীর নিয়ে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার বন্দুকটা ছিট্‌কে আমার মাথার কাছাকাছি পড়তেই ঝাঁকানি লেগে গুলীটা আওয়াজ করে ছুটে গেল। আওয়াজটা কয়েক মুহূর্ত ধরে আমার কানের পাশে বাজতে লাগল। আকস্মিক আঘাতে খানিকটা বিহ্বল হয়ে আমি নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম অল্প কিছুক্ষণ। আমি গুলীবিদ্ধ হয়েছি ভেবে ঘোড়া ছুটিয়ে রেনাল আমার কাছে ফিরে এসে অশ্বতরটাকে গালি দিতে লাগল। আমি শীগ্‌গীরই নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে চিন্তিতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। দেখলাম বন্দুকের কুঁদাটা ফেটে গেছে, আর মেইন স্ক্রুটা ভেঙে গেছে, যার ফলে বন্দুকের ঘোড়াটাকে জায়গামতো বেঁধে রাখতে হবে। সুখের বিষয়, বন্দুকটা অকেজো হয়ে যায়নি। বন্দুকটাকে পরিষ্কার করে আবার তাতে গুলী ভরলাম, ভরে রেনালের হাতে দিলাম। রেনাল ইতিমধ্যে অশ্বতরটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমি আবার তার পিঠে চড়ে বসলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই শয়তানটা ভীষণভাবে ঝাঁকানি দিয়ে একবার পিছনে একবার সামনে লাফাতে লাগল ; কিন্তু আমি ওর সবরকম দুষ্টুমির জন্যই প্রস্তুত ছিলাম, তাছাড়া এখন বন্দুকের বোঝা থেকেও হাল্‌কা ছিলাম, কাজেই বাহনটিকে

বাগ মানাতে আমার বেশী দেরি হলো না। তারপর রেনালের কাছ থেকে বন্দুকটা ফেরৎ নিয়ে আমরা আগেকার মতোই এগিয়ে চললাম।

আমরা এখন ছিলাম পাহাড় ছাড়িয়ে মুক্ত প্রেয়ারির ওপর। মহিষগুলো তখনো মাইল দুয়েক দূরে। যখন তাদের কাছাকাছি পৌছলাম তখন একটা উঁচু টিবির আড়ালে থেমে পড়লাম। আমি রেনালের ঘোড়াটা ধরে রইলাম, রেনাল তার বন্দুক নিয়ে ছুটে এগিয়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে গুলীর আওয়াজ, তারপর ডানদিকে দেখলাম উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে মহিষের দৌড়। সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলাম শিকারী ফিরে আসছে এবারেও ব্যর্থ হয়ে। এসেই অত্যন্ত বিশ্রী মেজাজে সে ঘোড়ার পিঠে উঠল। বিষম চটে সে কালো-পাহাড় আর মহিষগুলোকে অভিশাপ দিতে লাগল, আর দিব্বি দিয়ে বলল সে একজন পাকা শিকারী—কথাটা সত্যি—আর এপর্যন্ত কোনো পাহাড়ে শিকার করতে এসে অন্তত দু'-তিনটি হরিণ শিকার না করে সে ফেরেনি।

আমরা এবার ফিরে চললাম আমাদের শিবিরের দিকে; শিবির তখন অনেক দূর। ফেরার পথে অনেক কৃষ্ণসার সমতলভূমির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করল, কিন্তু একটিও আমাদের গুলী খাবার জন্যে দাঁড়াল না। আমাদের গ্রামে পৌছবার পথের মাঝখানে যে-পাহাড়টা পড়ল, তার পাশ দিয়ে ঘুরানো রাস্তায়—সে-রাস্তা সমতল এবং সহজ হলেও—যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। অতটা ঘুরে না গিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সোজা চলে যাব ঠিক করে আমরা আমাদের শ্রান্ত বাহন দুটিকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরদিকে চালিয়ে দিলাম। এই পাহাড়ের গায়েও অনেক কৃষ্ণসারকে লাফালাফি করতে দেখলাম। একটু দূর থেকে হলেও দুজনে একই সঙ্গে গুলী ছুঁড়লাম এবং দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। অবশেষে পাহাড়টির চূড়ার অপরপ্রান্তে পৌছে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের প্রাণচঞ্চল শিবির। ব্যর্থতার অপমান নিয়ে নেমে গেলাম সেখানে। তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন ইণ্ডিয়ানরা আমাদের জিনের পিছনে নতুন মাংস দেখবার আশা করে ব্যর্থ হলো, স্ত্রীলোকরাও এমনসব চাপা মন্তব্যের ইঙ্গিত করতে লাগল যে রেনাল মনে-মনে ভয়ানক চটে গেল। আমাদের লজ্জা আরো বাড়ল যখন রেনালের তাঁবু পর্যন্ত গেলাম। এখানে দেখলাম তার তরুণ ইণ্ডিয়ান আত্মীয় 'শিলাবৃষ্টি'কে; তার হাল্‌কা স্মঠাম দেহটি সহজ ভঙ্গিতে মাটির ওপর শয়ান, আর তার বন্ধু 'খরগোশ' একটি কাঠের পাত্র থেকে তুলে তুলে গোগ্রাসে 'ওয়াস্না' খাচ্ছে। তার পাশে পড়ে আছে একটা স্ত্রীজাতীয় এল্‌ক্ হরিণের টাট্‌কা ছাল; এই হরিণটিকে সে একটু আগেই মেরেছে

দু'-এক মাইল দূরের পাহাড়ে। ছোকরার মনটা নিশ্চয়ই সাফল্যের গর্বে উল্লসিত ছিল, কিন্তু তার সেই উল্লাস সে বাইরে প্রকাশ করেনি। এমনকি আমরা যে এসেছি তাও সে একেবারেই খেয়াল করেনি বলে মনে হলো। ইণ্ডিয়ান আত্মসংযমের যে প্রশান্ত ভাব তা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল তার সুশ্রী মুখে—যে আত্মসংযম দমন করে আবেগকে নয়, আবেগের প্রকাশকে। দু'মাস ধরে 'শিলাবৃষ্টি'র সঙ্গে আমার পরিচয়, আর এই দু'মাসের মধ্যেই তার চরিত্র বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে উঠেছে। যখন প্রথম দেখি, তখন সে সবেমাত্র বালকের স্বভাব আর অনুভূতির পর্যায় ছাড়িয়ে শিকারী এবং যোদ্ধা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে উঠেছে। মাত্র কিছুদিন আগে সে তার প্রথম হরিণ মেরেছিল, আর তাইতেই তার বিশেষ সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষাটা জোরালো হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে সে বরাবর শিকারের খোঁজ করে এসেছে, এবং অন্য কোনো তরুণ শিকারী-ই তার মতো অমন কর্মঠ আর ভাগ্যবান হয়নি। এই সাফল্যের ফলে তার চরিত্রে অসামান্য পরিবর্তন এসেছে। আগে সে সবসময় ইণ্ডিয়ান তরুণীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত আর তাদের সামনে কেমন যেন লাজুক আর ভেড়া বনে যেতো, কিন্তু শিকারে সুনাম অর্জন করার পর থেকে তার হাবভাবই গেল বদ্‌লে, সে যুবক-বীরের ভাব দেখাতে শুরু করল। তখন থেকে বেশ কায়দা করে বাঁ কাঁধের ওপর লাল কম্বলটা ঝুলিয়ে দিতে লাগল, গালে রোজ সিঁদুর মাখাতে লাগল আর কানে দুল ঝোলাতে লাগল। আমি দেখে যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলে সে এসব ব্যাপারেই বেশ সাফল্যলাভ করেছিল। কিন্তু পুরোদস্তুর যোদ্ধারূপে স্বীকৃতি-লাভের আগে 'শিলাবৃষ্টি'কে অনেককিছু করতে হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে সে বেশ বীরোচিত ভাব দেখালেও সর্দারদের আর বুড়োদের সামনে সে তখনো বড় দমে যেতো, কারণ তখন পর্যন্ত সে একটি মানুষকেও হত্যা করেনি, কোনো যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কোনো মৃতদেহও স্পর্শ করেনি। এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে ঐ সুন্দর, মোলায়েম-মুখো ছোকরার ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল একটা তীব্র কামনা—কোনো মানুষের মাথার খুলির ওপর ছুরি-চালানো। আমি তাই একা তার সঙ্গে কখনো থাকতে হলেই সন্দিগ্ধচিত্তে তার প্রতিটি চলা-ফেরার ওপর লক্ষ্য রেখে হুঁশিয়ার থাকতাম।

ওর বড় ভাই 'ঘোড়া' ছিল সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের মানুষ। অলস 'ফুল-বাবু' ছাড়া সে আর কিছু নয়। সে শিকার করতে ভালোই জানত, কিন্তু অন্যের শিকারের ওপরই চালিয়ে নেওয়াটা ছিল তার বেশী পছন্দ। বিশেষ সম্মান বা খ্যাতির জন্য সে মোটেই উদ্‌গ্রীব ছিল না, তার চাইতে তার ছোট ভাই 'শিলাবৃষ্টি' খ্যাতিতে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার মুখটা ছিল কালো আর কুৎসিত; বেশীর ভাগ সময় সে মুখটাকে

সিঁদুর দিয়ে নানারকমে রাঙাতো, আর আমি তাকে যে আয়নাটা দিয়েছিলাম, সেই আয়নায় সে বার বার নিজের সিঁদুর-রাঙানো মুখখানা দেখত। দিনের বাকি সময়-গুলোতে সে খেতো, ঘুমোতো আর তাঁবুর বাইরে রোদ পোহাত। এইখানে সে অনেকসময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত তার নানারকম সৌখীন বেশভূষা অলঙ্কারাদি পরে আর একটি পুরোনো তলোয়ার হাতে নিয়ে। পরিষ্কার বোঝা যেত তার বিশ্বাস চারদিকের ইণ্ডিয়ান মেয়েরা তার দিকেই পরম আগ্রহে তাকিয়ে দেখতে ব্যস্ত। কিন্তু সে বসে বসে ভীষণ গম্ভীর মুখ করে সোজা সামনের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকত, যেন কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ; তার মনের আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ত যখন সে সুযোগ পেলেই আড়চোখে তাকাত মেয়েদের দিকে।

সে আর তার ভাই, এরা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর দুই শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি বলে মনে করা যেতে পারে। 'শিলাবৃষ্টি'র বন্ধু 'খরগোশ'-এর কথাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'শিলাবৃষ্টি' আর সে, দুজনে যেন অবিচ্ছেদ্য ছিল। তারা একসঙ্গে খেতো, ঘুমোতো আর শিকার করত, আর তাদের দুজনের যা-কিছু ছিল, সব ছিল সমানভাবে দুজনেরই। ইণ্ডিয়ান চরিত্রে যদি 'রোমান্টিক' বলে কিছু থাকে, তা মিলবে শুধু এই ধরনের বন্ধুত্বে, যা প্রেয়ারি অঞ্চলে খুবই দেখা যায়।

ধীরে ধীরে অপরাহ্ন বিদায় নিয়ে গেল। আমি রেনালের তাঁবুতেই শুয়ে পড়লাম ; সারা শিবিরে যে একটা আলস্য আর অবসাদের আবহাওয়া বিরাজ করছিল, তা আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল। দিনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, অথবা তা না হয়ে থাকলেও শিবিরের বাসিন্দারা আজ কাজ শেষ করবে না ঠিক করে সবাই যে যার তাঁবুতে নীরবে ঝিমাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কোনো তাঁবু থেকে ভেসে আসছিল মেয়েলী কণ্ঠের মৃদু হাসি অথবা চঞ্চল শিশুর হৈহল্লা। যা একটু নড়াচড়া করছিল এই শিশুরাই। স্থানীয় আবহাওয়ার মদির নেশা পেয়ে বসল আমাকে। আমি একটানা ধারাবাহিক ভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম ; রইল শুধু বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন চিন্তা আর কল্পনাবিলাস। অবশেষে আর-সকলের মতোই আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা এলো। তাঁবুগুলোকে ঘিরে ঘিরে আগুন জ্বালানো হলো। রেনালের ডেরার কাছাকাছি কয়েকজন বাছাই-করা প্রতিনিধি নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসল। এতে রইল কেবলমাত্র রেনালের ইণ্ডিয়ান স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন। এ গোষ্ঠীটা অতি দীন এবং অতি হীন, একমাত্র 'শিলাবৃষ্টি' ছাড়া এ গোষ্ঠীর আর কেউ ভবিষ্যতে কোনোরকম বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে এমন সম্ভাবনা নেই। এমনকি 'শিলাবৃষ্টি'র

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও এই গোষ্ঠীর চরিত্রের দরুন কিছুটা সন্দেহ ছিল। সে-সন্দেহ বংশ-গৌরবের অভাবের জন্য নয়, তাকে তার কোনো অভিযানে বা প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে সহায়তা করবার যোগ্য লোকের অভাবে। রেমণ্ড আর আমি তাদের সঙ্গে বসলাম। তারা আট-দশজন লোক বসে ছিল আগুনের চারধারে। তাদের সঙ্গে ছিল সমানসংখ্যক বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীলোক, যাদের মধ্যে কয়েকজনের চেহারা ছিল চলনসই-গোছের ভালো। পুরুষদের হাতে হাতে পাইপ ঘুরতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা চলল অমার্জিত হাসি-তামাশায় ভরা। তারপর দু'-তিনটি বয়স্কা স্ত্রীলোক (অল্পবয়সীরা লাজুক বলে চুপ করে ছিল) রেমণ্ডকে বেশ জোরালো রসিকতার তীরে বিদ্ধ করতে লাগল। কয়েকটি পুরুষও এই রসিকতার আক্রমণে যোগ দিল, আর সর্বশেষে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রেমণ্ডকে একটি হাস্যকর এবং অশোভন ডাকনাম দিল, আর তাই শুনে সবাই বেচারা রেমণ্ডের জব্দ হওয়া দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। রেমণ্ড জব্দ হয়ে বোকার মতো হাসতে লাগল আর পাল্টা জবাব দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল কয়েকবার। ইণ্ডিয়ানদের কাছে কোনোরকমে খেলো হওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না, এমনকি বিপদের কারণ হতে পারে, একথা ভেবে আমি একেবারে নির্লিপ্ত রইলাম, মুখের কিছুমাত্র পরিবর্তন হতে দিলাম না ; এইভাবে ওদের কৌতুকের বাণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলাম।

ভোরবেলা শুনলাম শিবির এখানে আরেকদিন থাকবে। শুনে মেজাজটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। শিবিরের অসহ্য আলস্য আর একঘেয়েমি এড়াবার জন্য আমি আশেপাশের পাহাড়গুলো ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে রইল বিশ্বস্ত বন্ধু আমার বন্দুকটি, বিপদের সময় যার দ্রুত সাহায্যের ওপর আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারতাম। গ্রামের অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানই শ্বেতাঙ্গদের প্রতি সদ্ভাব দেখাত সে-কথা সত্যি, কিন্তু অন্যান্য অনেকের অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকেই আমি শিখেছিলাম এদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা খুব বুদ্ধির কাজ নয়, এবং কোনো ইণ্ডিয়ানের অদ্ভুত, লাগাম-ছাড়া প্রবৃত্তি হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তাকে কী করিয়ে ফেলবে তা আগে থেকে বোঝা অসম্ভব। এদের সঙ্গে বাস করলে বিপদের জন্য তৈরি না থাকলেই বিপদ-সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, আর সশস্ত্র এবং সতর্ক থাকলে বিপদ-সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। এদের সামনে ভয়, দুর্বলতা বা অসাবধানতা দেখানো মানেই এদের চরিত্রের ভীষণ প্রবৃত্তিগুলোকে লোভ দেখিয়ে জাগিয়ে তোলা।

পাহাড়ের ধারগুলোতে অনেক গভীর, ছায়াচ্ছন্ন গিরিপথ, গাছে আর ঝোপে ঠাসা। ধারগুলোতেও যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে-সেখানেই বনের সবুজ।

অনেক ইণ্ডিয়ান বনের ধারে ধারে বেড়াচ্ছিল, বালকের দল পাহাড়ের ওপর হাসি আর হল্লায় মেতে ছুটোছুটি করছিল, আর চোখ আর কান কাজে লাগিয়ে ধ্বংসাত্মক নেশায় মেতে ছোট তীরধনুক নিয়ে পাখি আর ছোট ছোট জানোয়ার মেরে বেড়াতে লেগেছিল। একটি উপত্যকা দেখলাম দু'পাশের খাড়া পাহাড়ী দেয়ালের মধ্য দিয়ে উঠে পাহাড়ের ভেতরে বহুদূর চলে গেছে। আমি সেই পথ বেয়ে পাথর, গাছ আর ঝোপের নানা বাধা অতিক্রম করতে করতে ওপরে উঠতে লাগলাম। এই পথ বেয়েই টিপটিপ করে নেমে আসছে একটি অতি ক্ষীণ জলধারা; এ ধারা যে-উৎস থেকে আসছে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। কিছুদূর উঠেই নিজেকে একেবারে একা মনে হলো; কিন্তু এই উপত্যকার একটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশে এসে আমি কিছু দূরে ঝোপের ভেতরে দেখতে পেলাম একটি ইণ্ডিয়ানের কালো মাথা আর লাল কাঁধ। পাঠক এখানে কোনো চমকপ্রদ বা শিহরনমূলক অ্যাডভেঞ্চার আশা করবেন না, কারণ যার মাথা আর কাঁধ দেখেছিলাম সে ইণ্ডিয়ানদের গ্রামের ভেতর আমার সেরা বন্ধু মেনে-সীলা। আমি মোকাসিন পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে বুড়ো আমাকে টের পায়নি। আমি এমন জায়গায় গেলাম যেখান থেকে বিনা বাধায় তাকে পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলাম সে একা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো পাথর আর গাছের ভেতর, পাহাড়ের মাথায় একটা পাইন গাছের দিকে তার দৃষ্টি আবদ্ধ। পাইন গাছের মাথাটা বাতাসে দুলছিল এদিকে ওদিকে, আর তার লম্বা ডালগুলি ধীরে ধীরে এমনভাবে ওঠানামা করছিল যে গাছটিকে একটি জীবন্ত প্রাণী বলেই মনে হচ্ছিল। বুড়োর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মনে হলো সে উপাসনা বা প্রার্থনা করছে, অথবা কোনো অলৌকিক শক্তির সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ করছে। তার মনের গভীরে প্রবেশ করে তার ভাবনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা জাগল মনে, কিন্তু শুধু কল্পনা বা অনুমান করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি জানতাম যে একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিশ্বাধিপতির কল্পনা একজন ইণ্ডিয়ানের মগজের পক্ষে সম্ভব হলেও তার মন সবসময় অত বিরাট, সুদূর এবং বোধাতীত শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের উচ্চস্তরে উঠবে না; যখন বিপদ হয় আসন্ন, আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ, ঘনিয়ে আসে আতঙ্কের ছায়া, তখন সে স্বস্তি খোঁজে কোনো নিম্নতর শক্তির আশ্রয়ে, যা তার সাধারণ জীবনযাত্রার এলাকা থেকে অত বেশী দূরে নয়। প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানের একটি 'অভিভাবক আত্মা' আছে, যার ওপর সে বিপদ থেকে উদ্ধার এবং নানা বিষয়ে নির্দেশের জন্য নির্ভর করে। তার বিশ্বাস, প্রকৃতির সব-কিছুতে একটা রহস্যময় অলৌকিক প্রভাব কাজ করছে। ঐ পাহাড়গুলোতে এমন

একটি বন্য জন্তু, পাখি বা গাছের পাতা ছিল না, যা তাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিতে না পারে ; তাই জ্যোতির্বিদ্‌রা যেমন আকাশের তারা পর্যবেক্ষণ করেন, একজন ইণ্ডিয়ান তেমনি তার চারিদিকের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে। এই অলৌকিক প্রভাবের সঙ্গে সে এমনভাবে জড়িত যে তার 'অভিভাবক আত্মা' শুধু তার কল্পনায় অবাস্তব সৃষ্টি হয়েই থাকে না, বাস্তব রূপ নেয় কোনো জীবিত প্রাণীতে : একটি ভালুক, একটি নেক্‌ড়ে, একটি ঈগল পাখি, কিংবা একটি সাপ। মেনে-সীলা যে অমন একাগ্রভাবে ঐ বুড়ো পাইন গাছটাকে দেখছিল, তা বোধ হয় ঐ গাছটিকেই তার জীবনের রক্ষক আর পথনির্দেশক ভেবে।

বুড়োর মনে তখন যে-ভাবনাই থাকুক না কেন, তার একাগ্র মনোযোগে বাধা দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না ভেবে নিঃশব্দে পিছু হটে এসে নেমে এলাম সেই ফাঁকা উপত্যকার তলায় যেখান থেকে খাড়াই বেয়ে উঠে পাহাড়ের ধারে চলে যেতে পারি। ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলাম পাহাড়ের একটি লম্বা চূড়া একটি বনের গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। ওরই দিকে বেয়ে উঠবার একটি প্রবল প্রেরণা অনুভব করলাম ; বহুদিন দেহটাকে এত সবল, সতেজ আর প্রাণবন্ত মনে হয়নি। দেড় ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে, এবং মাঝে মাঝে থেমে, উঠতে উঠতে একেবারে সেই ওপরে গিয়ে পৌঁছলাম, তারপর পাথর আর পাইন গাছের কালো ছায়ার বাইরে এসে খাড়া পাহাড়ের সূর্যকরোজ্জ্বল শেষপ্রান্তের কাছাকাছি এসে বসলাম। দুটি পাহাড়-চূড়ার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম হাল্‌কা নীল প্রেয়ারিভূমি বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে সুদূর দিগন্তে, যেন একটি প্রশান্ত সমুদ্রের মতো। চারদিকের বড় বড় পাহাড়গুলিও তাদের নিজস্ব মাহাত্ম্যেই মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম, কিন্তু প্রেয়ারি আর পাহাড়ের পারস্পরিক বৈপরীত্য দুয়ের সৌন্দর্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পার্বত্য পথ

লা বন্টি-র শিবিরে শ-র কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাকে কথা দিয়েছিলাম ১লা অগাস্ট লারামি কেল্লায় আবার তার সঙ্গে মিলিত হবো। ইণ্ডিয়ানরাও ঠিক করল পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে কেল্লার দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু এখান থেকে কেল্লার

দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ যাবার কোনো রাস্তা ছিল না। রাস্তা পাবার জন্য আমাদের বারো-চোদ্দ মাইল দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। বিকেলবেলায় শিবির তুলে আমরা রওনা হলাম। আমি চললাম ঘোড়ায় চড়ে সবার পিছে তিন-চারজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে; আমার আগে আগে এগিয়ে চলল বিরাট যাত্রীদল, কখনো সূর্যাস্তের শেষ আলো গায়ে মেখে, কখনো বা পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায়, আমার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে। যে জায়গাটা শিবির-স্থাপনের জন্য বেছে নেওয়া হলো, তার সঙ্গে একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী জড়িত ছিল। একবছর আগে এরা যখন এইখানটায় এসেছিল, তখন 'ঘূর্ণি-হাওয়া'র পুত্রের নেতৃত্বে দশজন যোদ্ধা এখান থেকে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল। তাদের একজনও ফিরে আসেনি। এই দুর্ঘটনাটাই এবছরের যুদ্ধায়োজনের মুখ্য কারণ। শিবিরে এসেই আমি বিস্মিত হলাম শিবিরের ভেতর অদ্ভুত নানারকম চীৎকার শুনে। শিবিরের সমস্ত স্ত্রীলোক যোগ দিয়েছিল সেই সমবেত মিশ্র চীৎকারে; অনেক স্ত্রীলোক তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুশোক শুধুমাত্র কান্নায় প্রকাশ করে তৃপ্ত না হয়ে, ছুরি দিয়ে তাদের পা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে কাটছিল। গ্রামের একটি যোদ্ধার ভাই উক্ত অভিযানে নিহত হয়েছিল; এই যোদ্ধাটি তার শোকপ্রকাশের জন্য আরেক পন্থা বেছে নিল। ইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই লুণ্ঠনপ্রিয় হলেও জিনিসপত্রের ওপর তাদের লোভ বা আসক্তি খুব প্রবল নয়; মাঝে মাঝে শোকের সময়ে বা অনুরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণ কোনো উপলক্ষে তারা তাদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এই যোদ্ধাটি তার সবচেয়ে ভালো ঘোড়া দুটিকে গ্রামের মাঝখানে নিয়ে তার বন্ধুকে দিয়ে দিল, আর তখন তার এই বদান্যতার প্রশংসাসূচক গান আর উচ্ছ্বাস মিলিত হলো স্ত্রীলোকদের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন ভোরে আমরা পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এই পাহাড়গুলোর চেহারায় মহান বা নয়নাভিরাম কিছু ছিল না, ছিল বিষণ্ণ নির্জনতা; ওরা শুধু কতকগুলো কালো আর ভাঙা-ভাঙা পাথরের স্তূপ, তার ওপর সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। এইসব পাহাড়ের মাঝখানে একটি প্রশস্ত উপত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম রেমণ্ড একটি ইণ্ডিয়ান তরুণীর পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে আর তরুণীটিকে নানারকম মিষ্টি কথা বলে খুশি করতে চেষ্টা করছে। আশেপাশের বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা ব্যাপারটা বেশ খুশীমনে দেখছে, তরুণীটিও তাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে মাঝে মাঝে। ঠিক সেইসময় তার অশ্বতরটি যেন তার দুষ্টুমি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল আর ভীষণভাবে আগু-পিছু ঝাঁকানি শুরু করল। রেমণ্ড ছিল পাকা সওয়ার; সে প্রথমে তার জায়গায় শক্ত হয়ে বসে থাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু তারপরই দেখলাম

অশ্বতরটির পিছনের পা দুটি শূন্যে উঠে গেল আর রেমণ্ড বেচারা সামনে ঝুঁকে পড়ে মাথা-নীচু অবস্থায় কোনোরকমে ঝুলে রইল। ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকগুলো সবাই হো-হো করে হেসে উঠল, সেই হাসিতে যোগ দিল রেমণ্ডের সেই তরুণী সঙ্গিনীটিও। অশ্বতরের ঝাঁকানিতে নাস্তানাবুদ হয়ে রেমণ্ড এমনভাবে ঠাট্টার সম্মুখীন হলো যে লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাকে অশ্বতরটিকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে পালাতে হলো।

কিছুক্ষণ পরেই তার কাছাকাছি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি, এমন সময় সে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। সে আমাদের সামনের উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিচ্ছিন্ন ছোট্ট পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাচ্ছিল; ঐ পাহাড়টির পিছন থেকে লম্বা একসারি এল্‌ক্‌ হরিণ তীরবেগে বেরিয়ে ছুটে গেল বড় পাহাড়ের একটি ফাঁকের মধ্যে ঢুকে। তারা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার চারদিকে পঞ্চাশটি কণ্ঠে উল্লাস চীৎকার শোনা গেল। যুবকেরা চট্ করে ঘোড়া থেকে নেমে তাদের ভারী মহিষ-চর্মের পোশাকগুলো খুলে ফেলে কাছের পাহাড়টির দিকে দ্রুত দৌড় লাগাল। রেনাল তার অশ্বতরটিকে সেইদিকে দ্রুত ছুটিয়ে দিয়ে আমাদের ডেকে বলল, "চলে এসো। চলে এসো। দেখছো ঐ লম্বা-শিংওয়ালা ঐ হরিণগুলোকে? কম-সে-কম একশোটা তো হবেই।"

বাস্তবিকই দেখলাম পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি অনেকগুলো ছোট ছোট জিনিস পাহাড়ের ধার দিয়ে দ্রুত চলাফেরা করছে। শিকারের মজা দেখবার জন্য আমি ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম, এবং পাহাড়ের পাশে একটা রাস্তায় ঢুকে আল্‌গা পাথরের খণ্ডগুলোর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যতদূর ওঠা যায় উঠে গেলাম। তারপর একটা বুড়ো পাইন গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলাম। ঠিক এইসময় ডান দিক থেকে ডেকে রেমণ্ড আমাকে বলল ঐদিকে কাছাকাছিই একঝাঁক ভেড়া রয়েছে। আমি দৌড়ে ঐ উঁচু জায়গায় গেলাম, সেখান থেকে ওধারের গিরিগহ্বরটা পরিষ্কার পুরোপুরি দেখা যায়। ঐখানেই দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি ভেড়া রয়েছে প্রায় বন্দুকের গুলীর পাল্লার ভেতরে। ভেড়াগুলো তাদের স্বভাব অনুযায়ী পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে একেবারে ডগায় উঠে যাবার চেষ্টা করছে। নগ্ন ইণ্ডিয়ানগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটল তাদের পিছু পিছু। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানোয়ারগুলো আর শিকারীদল অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল বন্দুকের গুলীর আওয়াজ, আর পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি।

নামবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম নীচেকার উপত্যকাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে

ঘোড়ায়-চড়া আর পায়ে-হাঁটা ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ে। আরো কিছুদূরে আমাদের শিবিরে তখন রাতের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আর তাঁবুর পর তাঁবু খাটানো হচ্ছে। আমি নেমে আসবার কিছুক্ষণ পরে রেনাল আর রেমণ্ড এলো ; দুজনে মিলে একটা মৃত ভেড়া ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে তারা। এটাকে তারা দুজনে পাথর ছুঁড়ে-ছুঁড়েই মেরে ফেলেছিল। একজন একজন করে শিকারী ফিরে এলো শিবিরে। রকি পাহাড়ের ভেড়ারা এমনই চট্‌পটে যে, যদিও ষাট-সত্তরজন শিকারী তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল, ভেড়া মারা পড়েছিল মাত্র আধা ডজন, তার বেশী নয়। এদের ভেতর মাত্র একটি ছিল মদ্দা আর পূর্ণবয়স্ক। এই ভেড়াটির একজোড়া শিং, সে-দুটো আয়তনে এত বিরাট যে বিশ্বাস করা শক্ত। আমি ইণ্ডিয়ানদের ভেতর বেশ বড় হাতা দেখেছি,—তাতে এক কোয়ার্টের চাইতেও বেশী জিনিস ধরে—এইরকমের শিং দিয়ে তৈরি।

পরদিন সারা ভোরবেলাটা আমরা দু'ধারের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। পরদিন উঁচু পাহাড়গুলো আমাদের ঘিরে ফেলল, শুরু হলো সত্যিকারের পার্বত্য পথ। ইণ্ডিয়ানরা সেখান থেকে শিবির তুলে আবার যাত্রা শুরু করার আগে আমি 'ঈগলের পালক'-এর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। এই লোকটি রীতিমতো বলবান, কিন্তু ওর মুখের চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী। তার হাল্‌কা-দেহ বালক-পুত্র আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলল ; আমাদের দলে রইল আরেকটি ইণ্ডিয়ান। তার নাম 'চিতাবাঘ'। গ্রামটি আমাদের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা একটি গিরিপথ বেয়ে ঘোড়ায় চড়ে উঠে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে 'ঈগলের পালক' দূরে শিকার দেখতে পেয়ে, ছেলেকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ঐদিকে চলে গেল। আমি 'চিতাবাঘ'কে নিয়ে এগিয়ে চললাম। ওর এ নামটা ছদ্মনাম। অন্যান্য অনেক ইণ্ডিয়ানের মতো এই লোকটিও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের আসল নামটি গোপন রেখেছিল। লোকটির চেহারা দেখলে তাকে মহৎ চরিত্রের বলেই মনে হতো। অলঙ্কৃত চামড়ার পোশাকটি যখন গা থেকে খসিয়ে সে ভাঁজ করে কোমরের চারপাশে ঝুলে পড়তে দিত, তখন তার সবল সুঠাম দেহটি দেখতে পাওয়া যেতো, আর সে যখন সহজ ভঙ্গিতে তার ঘোড়ার ওপর বসে থাকত আর তার মাথায় পরা মুকুটের প্রেয়ারি-মোরগের লম্বা লম্বা পালকগুলি হাওয়ায় উড়তে থাকত, তখন তাকে বন্য প্রেয়ারি অঞ্চলের আদর্শ ঘোড়সওয়ার বলেই মনে হতো। তার মুখের আদলটা অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের ধরনের ছিল না। তার মুখের চেহারা যদি আমাকে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে না থাকে, তাহলে তার মন তাদের জাতি-সুলভ হিংসা, সন্দেহ আর শয়তানী বুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

একজন সভ্য শ্বেতাঙ্গ তার নিজের প্রকৃতির সঙ্গে একজন ইণ্ডিয়ানের প্রকৃতির সাদৃশ্য খুব কমই খুঁজে পাবেন। ইণ্ডিয়ানদের সদ্গুণগুলির প্রতি সুবিচারের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রেখেও তাঁর মনে হবে তাঁর এবং তাঁর লাল ভ্রাতাদের মাঝখানে রয়েছে একটি দুস্তর ব্যবধান। শুধু তাই নয়, নিজের থেকে এদের এত বেশী বিপরীত মনে হবে, যে প্রেয়ারির হাওয়ায় কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ থেকেই তাঁর মনে হবে ইণ্ডিয়ানরা আপজ্জনক এবং বিপজ্জনক রকমের বন্য জানোয়ার মাত্র। তবু, এই 'চিতাবাঘ'-এর চেহারা দেখে বেশ আনন্দেই আমার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে আমার অন্ততঃ কিছু কিছু মিল আছে। আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল, এবং আমরা যখন একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললাম, সে আমাকে তখন মহা উৎসাহে ডাকোটা ভাষা শেখাতে লাগল। 'চিতাবাঘ'-এর সঙ্গে এগোতে এগোতে একটা সবুজ ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম, যার একধারে ছোট্ট একটি পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি 'গুজবেরি'র (বৈঁচি-জাতীয় ফল) ঝোপ। দেখে আমার সঙ্গীর ভারি লোভ হলো। সে তখন ভাষা-শেখানো বন্ধ করে গুজবেরি-সংগ্রহে এতক্ষণ ধরে ব্যস্ত রইল যে আমরা তারপর আবার রওনা হবার আগেই আমাদের গ্রামের মিছিলের অগ্রভাগ অদূরে দৃষ্টিগোচর হলো। প্রথমে দেখলাম এক বৃদ্ধাকে ; সে তার মালবাহী ঘোড়ার পিঠে জিনিসপত্র বোঝাই করে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নেমে আসছিল। তারপর ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে আসতে লাগল, আর তাদের ভিড়ে ভরে উঠল ছোট্ট উপত্যকাটি।

সেই ভোরের ভ্রমণের কথা কোনোদিন ভুলব না। আমরা অগ্রসর হলাম জনহীন প্রান্তর, নির্জন পর্বত আর পাইন অরণ্যের মধ্য দিয়ে, নীরব প্রশান্তি যেখানে আপন মহিমায় বিরাজিত, ভীষণ মৌনতার আত্মা যেখানে ধ্যানমগ্ন। ওপরে আর নীচে শুধু সবুজ আর সবুজ। এই সবুজ ছড়িয়ে আছে উপত্যকায়, পাহাড়ে সর্বত্র। আমি একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম, যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার অনেক নীচে চলেছে অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের মিছিল।

ওরা সবাই চলে যাওয়ার পর আমি পাহাড় থেকে নামলাম। নেমে ওদের পিছু দিলাম। কিছুদূর এগিয়ে একটি ছোট মাঠ পেলাম, চারদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পুরো গ্রামের লোক এই মাঠেই তাঁবু ফেলেছে। সারা মাঠ ভরা বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্য। কতকগুলো তাঁবু খাটানোর কাজ সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেক তাঁবুরই খুঁটি, আচ্ছাদন ইত্যাদি সবকিছু মাটির ওপর এলোমেলো পড়ে ছিল চামড়ার পোশাক, মাংসের গাদা, বাসনপত্র, ঘোড়ার সাজ এবং অস্ত্রাদির

সঙ্গে। স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করে কথা বলছিল, ঘোড়াগুলো ছট্‌ফট্‌ করছিল আর কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করছিল পিঠের ওপরকার বোঝা থেকে মুক্ত হবার জন্য। বাতাসে দোলায়মান পালক আর নানারকমের অলঙ্কার এই বিচিত্র দৃশ্যটিকে আরো জীবন্ত করে তুলছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ভিড়ের ভেতর ছোটাছুটি করছিল, আর কতকগুলো বালক পাহাড়ের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর তীরধনুক হাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নীচেকার ব্যস্ততা দেখছিল। সাধারণ এই হট্টগোলের মাঝখানে ঠিক এর বিপরীতভাব দেখিয়ে মাঝামাঝি একজায়গায় জড়ো হয়ে বসেছিল একদল বুড়ো আর যোদ্ধা; এরা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে বসে বসে ধূমপান করছিল। ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলা দূর হলো। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের উপত্যকায় ঘাস খাওয়াতে, আর শিবিরে এলো প্রশান্তি। তখনো দুপুর পেরোয়নি; পূবদিকে একটা বনে আগুন লেগেছিল, তাই থেকে সাদা ধোঁয়া এসে আমাদের এ-জায়গার ওপরে যেন একটা ধোঁয়ার চাঁদোয়া বিছিয়ে সূর্যের আলোকে খানিকটা ম্লান করে দিয়েছিল। কিন্তু রোদের তাপটা তবু অসহ্য লাগছিল। অল্প জায়গার ভেতরে অনেকগুলো তাঁবু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকটি তাঁবুই যেন একটি গরম-ঘর, তার ভেতর তাঁবুর মালিক নিদ্রামগ্ন। সারা শিবিরে মৃত্যুর মতো নীরবতা। মাঝে মাঝে দু'-একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে যাচ্ছে, এছাড়া আর কোনো নড়াচড়ার চিহ্ন নেই। মেয়েরা আর যুবকরা দল বেঁধে বসেছিল চারধারের উঁচু পাহাড়ে পাইন গাছের তলায়। কুকুরগুলো মাটিতে শুয়ে হাঁফাচ্ছিল; উষ্ণ আবহাওয়ায় তারাও এমনি আলস্য বোধ করছিল যে, শ্বেতাঙ্গ দেখে ঘেউ-ঘেউ করার পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত তারা করল না। মাঠের প্রবেশপথে পাহাড়ের গায়ে একটি ঠাণ্ডা জলের ঝরনা ছিল সম্পূর্ণভাবে গাছের ছায়ায় ঢাকা। এই শীতল ছায়ায় ঢাকা আশ্রয়ে কয়েকটি মেয়ে সমবেত হয়েছিল। তারা পাথরের বা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে গ্রামের নানা মুখরোচক খোশখবর আলোচনা করছিল, আর কোনো রসিক যুবক তাদের আড্ডায় অনধিকার প্রবেশ করলে হেসে-হেসে তার গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মিনিটগুলোকে যেন ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছিল। আমি অনেকক্ষণ একটা গাছতলায় শুয়ে শুয়ে আমার বন্ধু 'চিতাবাঘ'-এর কাছে ওগিল্লাল্লা ভাষা শিখতে লাগলাম। আমরা দুজনেই যখন হয়রান হয়ে উঠলাম, তখন আমি শুয়ে পড়লাম ঝরনার জল জমে তৈরী একটি গভীর, পরিষ্কার জলের ডোবার ধারে। আলপিনের মতো লম্বা একঝাঁক ছোট্ট মাছ সেই জলে একসঙ্গে মজায় খেলায় মেতেছে বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল; আরেকটু ভালো করে নজর দিয়ে দেখলাম মজার খেলায় নয়, তারা

একে অন্যকে খাবার লড়াইতে ব্যস্ত। সবচেয়ে ছোট মাছগুলির ভেতর একটিকে দেখলাম তার চাইতে একটু বড় মাছ গিলে ফেলল। মাঝে-মাঝেই সেই ডোবার অত্যাচারী একটা বিকটচক্ষু তিন ইঞ্চি লম্বা মাছ সেই ঝাঁকের কাছাকাছি এলেই ঝাঁকের ছোট ছোট মাছগুলি এই সর্বগ্রাসী রাক্ষসের আগমনে মহা আতঙ্কে নিজেদের লড়াই ভুলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

আমি ভাবলাম: 'কোমলচিত্ত কল্পনাবিলাসী বিশ্বপ্রেমিকের দল পরম শান্তিপূর্ণ স্বর্ণযুগের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ক্ষুদে মাছ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সবারই জীবন মানেই অবিরাম লড়াই।'

অবশেষে সন্ধ্যা এলো। পাহাড়ের মাথাগুলো তখনো সূর্যালোকে উজ্জ্বল, কিন্তু আমাদের উপত্যকার গভীরে নেমেছে অন্ধকার। আমি শিবির ছেড়ে পাশের একটি পাহাড়ে উঠে গেলাম। পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপর লম্বা পাইন গাছের মধ্য দিয়ে সূর্য তখনো কিরণ ঝরাচ্ছিল। তারপরই সূর্য ডুবে গেল, অন্ধকার নেমে এলো, আমিও নেমে এসে ফিরে চললাম গ্রামের দিকে। আমি যখন নামতে লাগলাম, তখন ঝাপ্‌সা অন্ধকারে ঢাকা বনের ভেতর থেকে নেকড়ে আর শেয়ালের ডাক শোনা যেতে লাগল। শিবিরে তখন অনেক আগুন জলছে; সেই আগুন ঘিরে বসেছে যারা, তাদের বীভৎস ভুতুড়ে ছায়াগুলো নডছে চারদিকের পাহাড়ের দেয়ালে।

দেখলাম একদল ধূমপায়ী গোল হয়ে বসেছে তাদের নিয়মিত জায়গামতো, অর্থাৎ একজন যোদ্ধার তাঁবুর সামনে। এই যোদ্ধাটিকে তার সামাজিক গুণাবলীর জন্য সবাই জানে বলে মনে হলো। আমি বসে পডলাম বিদায় নেবার আগে একবার আমার বর্বর বন্ধুদের সঙ্গে ধূমপান করে যাবার উদ্দেশ্যে। সেদিনটা ছিল ১লা অগাস্ট, যে তারিখে আমি শ-র সঙ্গে লারামি কেল্লায় মিলিত হবো কথা দিয়েছিলাম। সেখান থেকে কেল্লায় যেতে দু'দিনের কম সময় লাগে। আমার জন্য বন্ধু যেন উদ্বেগের যন্ত্রণা ভোগ না করে, এই উদ্দেশ্যে আমি ঠিক করলাম যত তাড়াতাড়ি পারি রওনা হয়ে যাবো। আমি চলে গেলাম 'শিলাবৃষ্টি'র খোঁজে। তার খোঁজ পেয়ে তাকে একমুঠো বাজপাখির পায়ে বাঁধবার ঘুঙুর আর একপুরিয়া সিঁদুর দিলাম; এই সর্তে দিলাম যে, সে কাল আমাকে ভোরবেলা পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নেবে।

"হাউ!" বলে 'শিলাবৃষ্টি' আমার উপহার নিল। এরপর আর কোনো দিক থেকেই কোনো কথা বলা হলো না কিছুক্ষণ; ব্যাপারটা চুকে গিয়েছিল, আমি তাই কোংরা-টোঙ্গার তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিন হতে অনেক বাকি, তখন রেমণ্ড আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "সবকিছুই তৈরি হয়ে গেছে।"

আমি বেরিয়ে গেলাম। সেই ভোরবেলাটা ছিল ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে। সারাটা শিবির যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। 'শিলাবৃষ্টি' তার তাঁবুর সামনে ঘোড়ার পিঠে বসে ছিল, আর আমার পলিন এবং রেমণ্ডের অশ্বতরটি তার কাছাকাছিই বাঁধা রয়েছে। আমরা জানোয়ার দুটির পিঠে জিন পরালাম এবং আমাদের ভ্রমণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা করে নিলাম, কিন্তু এদিক দিয়ে আমাদের প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই শিবিরও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁবু খুলে ফেলছিল। দিনের আলো ভালো করে ফুটে উঠতেই আমরা শিবির-ভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি সরু পথ বেয়ে উঠতে লাগলাম, এই পথটি মাঠ পিছে রেখে পূবদিকে চলে গেছে। এই পথের মাথায় উঠে বসে আমি পিছনপানে আমাদের শিবিরের দিকে তাকালাম। শিবিরটি উষার ধূসর আলোয় ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছিল। সারা শিবির জুড়ে প্রস্তুতির ব্যস্ততা। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম; আমার এই অসভ্য সঙ্গীদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে আধা-অনিচ্ছা জাগল মনে।

আমরা এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন পাথর আর পাইন গাছের সারির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যে কিছুক্ষণ ধরে আমরা রাস্তাই দেখতে পাচ্ছিলাম না ভালো করে। আমাদের সামনের অঞ্চলটা জংলা আর ভাঙাচোরা, কতক পাহাড়, কতক সমতল, আর কতক অংশ পাইন আর ওক গাছের বন। চারদিকে উচ্চ পর্বতমালা। বনগুলো প্রত্যুষে বেশ স্নিগ্ধকর আর ঠাণ্ডা ছিল, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় কুয়াশার মালা, আর পাহাড়ের ধারে-ধারেও সবুজ ঝোপে ঝোপে কুয়াশা জড়ানো। অবশেষে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়াটা উদীয়মান সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল। আমার আগে আগে চলেছিল 'শিলাবৃষ্টি', সে হঠাৎ একটা মৃদু চিৎকার করে উঠল। ঝোপ থেকে একটা মস্ত এল্‌ক্ হরিণ—তার লম্বা শিংগুলো পিছন দিকে বাঁকা—লাফিয়ে বেরিয়েই পাগলের মতো আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে পাইন গাছের বনের দিকে ছুটল। রেমণ্ড চট্ করে তার বাহনের পিঠ থেকে নেমে পড়ল বটে, কিন্তু সে গুলী ছুঁড়বার আগেই জানোয়ারটা পুরো দু'শো গজ দূরে চলে গেছে। রেমণ্ডের ছোঁড়া গুলী হরিণটার এত নীচের দিকে গিয়ে লাগল যে আঘাতটা মারাত্মক হলো না। যাই হোক, এল্‌কটা ছুটতে ছুটতে গতিপথ বদ্‌লে ফেলে প্রায় সমকোণে ঘুরে পাইন গাছের আড়ালে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আমি গুলী চালিয়ে তার একটা কাঁধ ভেঙে দিলাম, তবু সে কাতরাতে-কাতরাতেই নেমে গিয়ে অদূরের একটা গাছে ঘেরা

জায়গায় ঢুকে যেতে চেষ্টা করল ; একটা যুবক ইণ্ডিয়ান তার পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করল। আমরা কাছে গিয়ে দেখি আমাদের ভুল হয়েছিল ; ওটা এল্‌ক্ নয়, একটা কালো-লেজওয়ালা হরিণ, সাধারণ হরিণের দ্বিগুণ বড়, আর পূর্বাঞ্চলে দেখাই যায় না। বন্দুকের আওয়াজগুলি ইণ্ডিয়ানদের কানে গিয়েছিল ; তারা অনেকে সেখানে ছুটে এলো। হরিণের চামড়াটা 'শিলাবৃষ্টি'কে দিয়ে, আমাদের যতটা দরকার তার মাংস আমাদের জিনের পিছনে নিয়ে, বাকি অংশ ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান শিবিরের সবাইও এই জায়গা ছেড়ে চলতে শুরু করে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হলো। যাই হোক, তাদের যাত্রাপথে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে তাদের ধরতে পারি, সেইভাবেই আমাদের যাবার পথ ঠিক করে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম ইণ্ডিয়ানরা যাচ্ছে। আবার গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলাম। ওরা সাধারণতঃ যত দ্রুত অগ্রসর হয়, এবার তাদের গতি তার চাইতে অনেক বেশী দ্রুত। পাহাড় আর পাইন গাছের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে তারা এগোচ্ছিল। আমরা তখন পাহাড়ের পূবদিকের উৎরাইয়ের ওপর। শীগ্‌গীরই আমরা এসে পড়লাম একটি এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো এবং যাতায়াতের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক গিরিপথে, এটি নেমে গেছে বড বেশী খাডাভাবে। ইণ্ডিয়ানদের পুরো ঝাঁকটাই একসঙ্গে হুড়হুড় করে এই উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল দুরন্ত পার্বত্য স্রোতের মতো। আমাদের সামনের পাহাড়গুলোতে কয়েক হপ্তা ধরেই আগুন জলছিল। সামনের অনেকটা দৃশ্য তাই অস্পষ্ট হয়ে ছিল ধোঁয়ার আড়ালে, শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলো আর উঁচু পাইন গাছের মাথাগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল ধোঁয়ার জাল ভেদ করে। দৃশ্যটি এমনিতেই মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম ; তার ওপর এই বর্বর জনতা—অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা, নগ্ন শিশু, জমকালো পোশাকে মেয়েরা—উঁচু থেকে স্রোতের মতো নেমে যাচ্ছে, এ দৃশ্য কোনো দক্ষ শিল্পীর ছবি আঁকবারই যোগ্য ছিল। আর একমাত্র ওয়াল্‌টার স্কটের কলমেই এ-দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা সম্ভব।

আমরা একটি পোড়া জায়গার ওপর দিয়ে গেলাম, যার মাটির গরম লাগছিল ঘোড়াগুলোর পায়ে। এ জায়গার দু'ধারে জলন্ত পাহাড়। অচিরেই আমরা নেমে পড়লাম একটি সুন্দর এলাকায়, যেখানে পেলাম ছোট ছোট উপত্যকার পর উপত্যকা, যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট নদী। নদীর তীরে গাছে গাছে অনেক জংলী ফল ধরে আছে। বাচ্চারা, এমনকি অনেক বড়রাও এই ফল পেড়ে পেড়ে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আরো নীচে যেতে দৃশ্য দ্রুত বদ্‌লে গেল। আমরা তখন

জলন্ত পাহাড়গুলিকে পিছনে ফেলে এসেছি, আর উপত্যকার ভেতর দিয়ে দূরে দেখতে পাচ্ছি আদিগন্তপ্রসারী প্রেয়ারি, সে যেন এক বিরাট সমুদ্র। নদীর ধার বেয়ে একসারি গাছের পাশ দিয়ে এগিয়ে ইণ্ডিয়ানরা কয়েক সারিতে বিভক্ত হয়ে সমতল-ভূমিতে গিয়ে পড়ল। আমি ছোট্ট নদীটির জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে নিলাম। আবার যখন ঘোড়ায় চড়লাম, তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন থেকে খেয়াল করলাম না যে বন্দুকটা ঘাসের ওপরই পড়ে আছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দ্রুত ঘোড়া ছোটালাম বন্দুকের খোঁজে। ইণ্ডিয়ান সারির দিকে নজর রাখতে-রাখতে একজন ইণ্ডিয়ান যোদ্ধার হাতে আমার বন্দুকটি দেখে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাবি করতেই সে বন্দুকটা আমাকে দিয়ে দিল। কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের আর কোনো উপায় না থাকাতে আমি আমার পায়ের জুতোর পেছন থেকে ঘোড়া চালাবার নাল খুলে নিয়ে ওকে দিলাম। লোকটা এতে ভীষণ অনুগৃহীত বোধ করে খুশি হয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে নালটা ওর জুতোর পিছনে পরিয়ে দেবার জন্য আমার দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল। আমি নালটা পরিয়ে দিতেই সেটার সদ্ব্যবহার করার জন্য লোকটা তার ঘোড়ার গায়ে নালের একটা খোঁচা লাগাল। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়াটা ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠল। ইণ্ডিয়ানটা হেসে উঠে আরেকটা খোঁচা লাগাল আরো জোরে। এই খোঁচা খেয়ে ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটল। তাই দেখে ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকেরা খুব মজা পেয়ে হেসে উঠল, আর পুরুষগুলো আমার দেওয়া যন্ত্রের কেরামতি দেখে বলে উঠল—"ওয়াশ্‌টে !"—অর্থাৎ 'চমৎকার !'

ঐ ইণ্ডিয়ানটির ঘোড়ার পিঠে জিন পরানো ছিল না, আর রীতিমতো লাগামের বদলে ঘোড়াটার মুখে একটা চামড়ার দড়ি কোনোরকমে পরিয়ে নিয়ে ইণ্ডিয়ানটি লাগামের কাজ চালাচ্ছিল। জানোয়ারটা তখন একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল, তার আরোহীটিকে পিঠে নিয়ে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে ছুটে দূরে একটা উঁচু টিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইণ্ডিয়ানটিকে আমি আর দেখতে পাইনি, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হয়নি বলেই আমার ধারণা। বেরালের নয়টি জীবন আছে বলে প্রবাদ আছে ; ঘোড়সওয়ার ইণ্ডিয়ানের জীবনের সংখ্যা তার চাইতে বেশী।

ইণ্ডিয়ান দল দগ্ধ প্রেয়ারির ওপর পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করল। তাপ এখানে ভয়ঙ্কর, যেন গায়ে এসে বেঁধে। তাঁবুর আচ্ছাদনগুলো একেবারে মাটি পর্যন্ত না রেখে বায়ু-চলাচলের জন্য মাটি থেকে এক ফুট উঁচু করে রাখা হলো। রেনালও ফাঁদপাতা শিকারীদের হরিণচর্মের পোশাক বর্জন করে ইণ্ডিয়ানদের মতো স্বল্প পোশাক পরে নিল, তারপর নিজের ঘরে একটা

মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে আমার সঙ্গে পালাক্রমে পাইপ টানতে লাগল আর নিদারুণ গরমকে অভিশাপ দিতে লাগল। তার কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজনও সেখানে উপস্থিত ছিল। বিদায়-ভোজে পরিবেশন করা হলো একটি ছোট্ট সেদ্ধ-করা কুকুর-ছানা, আর তার সঙ্গে চাটনি হিসেবে একটা কাঠের পাত্রে কিছু পাহাড়ী গুজবেরি ফল।

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দেখিয়ে রেনাল বলল, "পনেরো মাইল দূরে ঐ একসারি ছোট ছোট পাহাড দেখতে পাচ্ছ? বেশ, এবার দেখতে পাচ্ছ ঐ যে পাহাড়টা সবচেয়ে দূরে, যার মুখের ওপর একটা সাদা ফোঁটা? মনে হয় কি ওটা আগে কখনো দেখেছো?"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে ওটা সেই পাহাড়, যার তলায় ছয় কি আট সপ্তাহ আগে লারামি খাঁড়ির পাশে আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম।"

রেনাল বলল, "ঠিক বলেছ।"

আমি বললাম, "রেমণ্ড, আমাদের বাহন দুটিকে নিয়ে এসো। চলো, আজ রাতে ওখানেই আস্তানা গাড়ব, কেল্লার দিকে রওনা হবো কাল ভোরে।"

ঘুড়ী আর অশ্বতরটি শীগ্‌গীরই এসে দাঁড়াল তাঁবুর সামনে। আমরা তাদের জিন পরালাম। পরাতে-পরাতেই কতকগুলো ইণ্ডিয়ান এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমার পলিন ঘুড়ীটার শক্তি, দ্রুতগতি আর সহ্যগুণ এ-শিবিরে বিখ্যাত ছিল, এবং সেইজন্যেই আগন্তুক ইণ্ডিয়ানরা আমাকে ঘোড়া উপহার দেবার জন্য তাদের ভালো ভালো ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। তাদের উপহার আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম, কারণ তাদের ঘোড়া উপহার নিলেই বিনিময়ে পলিনকে এই বর্বরদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। আমি রেনালের কাছ থেকেই শুধু বিদায় নিলাম, ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে নয়, কারণ ওরা এ-ধরনের অনাবশ্যক বাহুল্যের ধার ধারে না। শিবির থেকে বেরিয়ে আমরা প্রেয়ারির ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম ঐ সাদামুখো ছোট্ট পাহাড়টির দিকে, যার ওপরের দিকটা দিগন্তরেখার ওপর মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে একজন ইণ্ডিয়ানও এলো, তার নামটা মনে নেই কিন্তু বিশ্রী চেহারা আর বীভৎস চওড়া মুখগহ্বরটি ভুলতে পারিনি। কৃষ্ণসার অনেক দেখলাম, কিন্তু ওদের দিকে নজর দিলাম না। আমরা সোজা চললাম আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে, ঊষর ভূমি আর সবুজ-হীন পাহাড় পেরিয়ে। অবশেষে সন্ধ্যার কাছাকাছি গরম, তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে অবসন্ন অবস্থায় দেখলাম নয়নাভিরাম দৃশ্য: লারামি খাঁড়ির তীর বরাবর গাছের সারি আর গভীর খাদ। খাঁড়ির পাশে বিরাট

কটন-উড গাছ অনেকগুলো ; তাদের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেলাম ঘোড়ায় চড়ে। দেখলাম অগভীর জলের সফেন স্রোতে অনেক মাছ খেলা করছে। স্রোত অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে আমাদের বাহন দুটিকে জল পান করালাম, তারপর বালুর ওপর হাঁটু গেড়ে বসে নিজেরাও স্রোতের জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিলাম। তারপর আরেকটু এগোতেই দৃশ্যগুলো খুব চেনা-চেনা লাগতে লাগল।

"বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।" বললাম আমি।

সামনেই সেই বড় গাছটি, যার তলায় তাঁবু ফেলে বেশ কিছুদিন ছিলাম ; সেই সাদা পাহাড়ের মাথাগুলো যারা খাঁড়ির বাঁকে আমাদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকত ; আর সেই মাঠ, যার ওপর আমাদের ঘোড়াগুলো হপ্তার পর হপ্তা চরে চরে ঘাস খেয়েছে। একটু এগিয়ে প্রেয়ারি-কুকুরদের বসতির এলাকা, যেখানে বহু অলস সময়ের একঘেয়েমি কাটিয়েছি ঐ এলাকার বেচারা বাসিন্দাদের গুলী করে মেরে।

চওড়া মুখটিকে আকাশের দিকে ঘুরিয়ে রেমণ্ড বলল, "এইবারে মজা টের পেতে হবে আমাদের।"

সত্যিই পাহাড়গুলো, মাঠ, নদী, ঝোপ সবই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমছিল দক্ষিণে, বজ্রনির্ঘোষও কানে আসছিল অশুভ ইঙ্গিত বহন করে।

স্রোতের আরো নীচের দিকে একটি ঘন কুঞ্জবনের দিকে দেখিয়ে আমি বললাম, "ঐখানেই আজ তাঁবু ফেলব।" রেমণ্ড আর আমি ঐদিকেই চললাম, কিন্তু বিশেষ ব্যগ্রভাবে পিছন থেকে ডাকল সেই ইণ্ডিয়ান লোকটা। আমরা যখন জানতে চাইলাম সে কী বলতে চাইছে, সে বলল ঐ গাছগুলোর মধ্যে সবসময় দুটি যোদ্ধার ভূত থাকে ; আমরা ঐখানে ঘুমোলে সেই ভূতগুলো সারারাত চেঁচাবে আর ঢিল ছুঁড়বে, হয়তো ভোর হবার আগেই ঘোড়াগুলিকে চুরি করে নিয়ে যাবে। ভাবলাম ওর মন-রাখাটা মন্দ নয়, তাই এই অসাধারণ ভূতগুলোর বাসস্থান ছেড়ে আমরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম চাগ্ওয়াটারের দিকে, কারণ এরি মধ্যে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। শীগ্গীরই ছোট ছোট পপ্লার গাছের চারা দেখতে পেলাম ছোট নদীটির মুখের দু'ধারে। আমরা লাফিয়ে নামলাম, জিনগুলো খুলে ফেললাম, ঘোড়াগুলোকে আল্গা ছেড়ে দিলাম আর ছুরি হাতে নিয়ে গাছের ছোট ছোট ডালপালা কাটতে লেগে গেলাম বৃষ্টি থেকে আশ্রয় তৈরি করবার জন্য। সবচেয়ে বেশী লম্বা গাছগুলোকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তাদের ওপর ছোট ছোট ডালের বোঝা চাপিয়ে দিলাম। এভাবে একটা ছোটখাটো আচ্ছাদন তৈরি হলো। কিন্তু এই পরিশ্রমের কোনো দরকার ছিল না। ঝড় আমাদের স্পর্শও করল না। আমাদের ডানদিকে আধ

মাইল দূরে বৃষ্টি পড়ছিল প্রবল জলপ্রপাতের মতো, আর বজ্রের গর্জন ঘন ঘন কামান-গর্জনের মতো গড়িয়ে চলল প্রেয়ারির ওপর দিয়ে। আমাদের ভাগ্য ভালো, আমাদের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে মেঘ আমাদের ওপর কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা মাত্র ফেলে গেল। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে সূর্যাস্তটা বেশ চমৎকার দেখা গেল। আমাদের পাতার ছাউনির তলায় ঘন হয়ে বসে আমরা, উইয়া ওয়াশ্‌টে নাম্নী ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকটি আমাকে যে 'ওয়াস্না' খেতে দিয়েছিল তা দুজনে বেশ পেট ভরে খেলাম। ইণ্ডিয়ান লোকটা তার পাইপ আর এক থলে শোংসাশা নিয়ে এসেছিল; ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমরা কিছুক্ষণ একসঙ্গে বসে ধূমপান করলাম। তার আগে অবশ্য আমাদের চওড়ামুখো বন্ধুটি পাশের জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে এলো। এসে, আঙুলে গুনে গুনে খবর দিল আটজন লোক—বাইসোনেট, পল ডোরিওন, আতোয়াঁ লে রুজ, রিচার্ডসন, বাকি চারজনের নাম সে বলতে পারল না—খুব সম্প্রতি ওখানে তাঁবু ফেলে থেকে গেছে। পরে তার দেওয়া এই খবর সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু কী শক্তিতে বা কি-জাতীয় অনুভূতির জোরে এমন আশ্চর্য সঠিক খবর সে সেদিন সংগ্রহ করেছিল তা আজও আমার কাছে রহস্যই হয়ে আছে।

আমি জেগে যখন রেমণ্ডকে জাগালাম, তখনো রাতের অন্ধকার শেষ হয়নি। ইণ্ডিয়ানটি আমাদের আগেই কেল্লার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা তারপরে রওনা হয়ে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অন্ধকারেই এগিয়ে চললাম। অবশেষে সূর্য যখন তামার জ্বলন্ত গোলকের মতো আকাশে উঠল, আমরা তখন কেল্লার দশ মাইলের ভেতর এসে গেছি। তারপর একটি বালুর টিলার ওপর থেকে আমরা দেখলাম আমাদের কয়েক মাইল দূরে একটি নদীর ধারে ছোট্ট বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর চারপাশে ধুধু করছে জনহীন প্রান্তর। আমি ঘোড়া থামিয়ে ঐদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। তাকিয়ে মনে হতে লাগল ঐ বিন্দুটিই যেন শান্তি আর সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। ওর কাছে পৌছতে আমাদের খুব বেশী দেরি হলো না, কারণ আমরা খুব বেগে ঘোড়া ছুটিয়েই চললাম বেশীর ভাগ পথ। তখনো আমাদের এবং কেল্লার দেয়ালগুলোর মাঝখানে ব্যবধান ছিল লারামি খাঁড়ি। খাঁড়ির জলে নেমেই ঘোড়ার পিঠের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসলাম, ফলে জুতো না ভিজিয়েই দ্রুতগামী স্রোতের মধ্য দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌছলাম। আমরা তীরে উঠতেই কেল্লার সিংদরজায় কয়েকজন লোক দেখা দিল। তাদের ভেতর তিনজন আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমে শ; তারপর পৌরুষ আর সারল্যের প্রতিমূর্তি হেনরি শ্যাটিলন; সবশেষে এলো ডেস্‌লরিয়ার্স স্বাগত

অভিনন্দনের হাসি মুখে ফুটিয়ে। দু'পক্ষের আনন্দের অভিব্যক্তিটা শুধু বাহ্যিক সৌজন্য মাত্র নয়। অন্তত আমার দিক থেকে বলতে পারি বর্বর সমাজের আবহাওয়া থেকে আমার উচ্চমনা সঙ্গী আর হৃদয়বান পথ-প্রদর্শকের সাহচর্যে নতুন আবহাওয়ায় এসে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাকে পেয়ে শ-ও ভারি খুশি হলো, কারণ আমার সম্বন্ধে তার মনে নানারকম আশঙ্কার উদয় হয়েছিল।

বর্ডো আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সম্বর্ধনা জানাল আর চীৎকার করে খবর জানাল রাঁধুনীকে। রাঁধুনীটি নতুন আমদানি; পিয়ের বন্দর থেকে সম্প্রতি এসেছে ব্যবসাদারদের ওয়াগনের সঙ্গে। রান্নায় তার যতই দক্ষতা থাকুক না কেন, এখানে তার কেরামতি দেখাবার মতো উপকরণের নিতান্তই অভাব। যাই হোক, প্রাতরাশে সে আমাকে দিল বিস্কিট, কফি আর নোন্‌তা শুয়োরের মাংস। আবার বেঞ্চের ওপর বসা, ছুরি আর কাঁটা, পিরিচ আর পেয়ালা, সামনে টেবিল-জাতীয় একটি বস্তু—এ যেন এক নতুন জীবন। কফি অতি উপাদেয় লাগল, রুটি যেন এক চমৎকার নতুন জিনিস, কারণ গত তিন হপ্তা মাংস ছাড়া কিছুই খাইনি বলা চলে, আর সেই মাংসও বেশির ভাগ সময় নুন ছাড়া। তাছাড়া এখানে পাচ্ছিলাম ভালো সঙ্গীর সঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দ, কারণ আমার মুখোমুখী বসেছিল শ, শোভনভাবে স্বল্প বেশ পরে। কেউ যদি সমরুচি সঙ্গীর মূল্য অনুভব করতে চান তাহলে তাঁকে একা একবার একটি ওগিল্লাল্লা গ্রামে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ থেকে আসতে বলি। আর সেখানে যদি এমন এক ব্যায়রাম বাধিয়ে বসতে পারেন যা দুর্বল করে দেয় এবং কিছুটা বিপজ্জনক, তাহলে এবিষয়ে তাঁর অনুভূতিটা আরো জীবন্ত হবে।

শ তখন কেল্লায় রয়েছে দু'-তিন হপ্তা ধরে। আমি তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম তার পুরোনো জায়গাতেই—যে বড় ঘরে সাধারণতঃ কেল্লার সেই সর্দারটির বাস ছিল, বর্তমানে যে কেল্লা থেকে অনুপস্থিত। ঘরের এক কোণে চমৎকার নরম মহিষ-চর্মের পোশাকের একটি স্তূপ। এখানেই আমি শুয়ে পড়লাম। শ আমাকে তিনখানা বই এনে দিল। বলল, "এই নাও শেক্‌স্‌পীয়ার, এই বায়রন, আর এই 'ওল্‌ড্‌ টেস্টামেণ্ট'। বাকি দুটিতে যা আছে, তার চাইতে বেশী কাব্য আছে এই 'ওল্‌ড্‌ টেস্টামেণ্ট'-এ।"

তিনটির ভেতরে আমি বেছে নিলাম সবচেয়ে খারাপটি। আর সেদিনের বেশির ভাগ সময়ই কাটালাম মহিষ-চর্মের পোশাকগুলোর ওপর শুয়ে শুয়ে সেই আশ্চর্য প্রতিভাবান ব্যক্তিটির সৃষ্টির বিচিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে, যাঁর প্রতিভার সবচেয়ে বড় বাহাদুরি হচ্ছে যে তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়ে স্রষ্টাকে ভুলে যেতে হয়।

বিংশ অধ্যায়

নিঃসঙ্গ যাত্রা

লারামি কেল্লায় যেদিন পৌঁছলাম, সেদিনই শ আর আমি সেই বড ঘরে মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর বসে বসে বিশ্রাম করছিলাম। হেনরি শ্যাটিলনও ছিল, ঘোড়ার সাজ আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত, আর দু'-তিনটি ইণ্ডিয়ান মেঝের ওপর বসে ছিল পলকহীন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

শ বলল, "আমি এখানে বেশ ভালোই ছিলাম, একটি ছাডা অন্য সব বিষয়ে। এখানে টাকা দিয়ে বা খাতিরে কোনোরকমেই শোংসাশা পাওয়া যায় না।"

আমি তাকে একটা থলে দিলাম, যার ভেতর ও-জিনিসটি বেশ প্রচুর পরিমাণেই ছিল। ওটা এনেছিলাম কালো-পাহাড থেকে।

শ বলল, "হেনরি, ঐ তামাক কাটবার কাঠের বোর্ডটা দাও তো আমাকে, না না, ঐ ইণ্ডিয়ানটিকেই দাও ওর ওপর রেখে শোংসাশা কুচিয়ে কাটতে। ও-কাজটা যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের চাইতে ইণ্ডিয়ানরা ভালো জানে।"

ইণ্ডিয়ান লোকটা কোনো কথা না বলে ঐ ছাল আর তামাক যথাযথ অনুপাতে মিশিয়ে পাইপে ভরে পাইপটা ধরিয়ে দিল। ঐ পাইপ টানতে টানতে শ আর আমি আমাদের ভবিষ্যৎ পন্থা সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগলাম। প্রথমে অবশ্য আমার অনুপস্থিতিকালে লারামি কেল্লায় যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তার কিছু কিছু স আমাকে শোনালো।

সপ্তাহখানেক আগে পাহাড়ের ওপার থেকে চারজন লোক এসেছিল: সাবলেট, রেডিক আর দুজন। কেল্লায় পেঁছবার ঠিক আগে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেশ বড় একদল ইণ্ডিয়ানের, সে-দলে বেশীর ভাগই যুবক। তারা সবাই আমাদের পুরোনো বন্ধু স্মোকের গ্রামের লোক। স্মোক এবং তার সমস্ত অনুচরেরাই শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ বন্ধু বলে নিজেদের ঘোষণা করত। পর্যটকেরা তাই নিঃসন্দেহে ঐ ইণ্ডিয়ানদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। হঠাৎ ইণ্ডিয়ানরা এসে তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে তাদের নামতে হুকুম করল। তারা সেই হুকুম না মেনে ঘোড়ায় চাবুক লাগিয়ে দ্রুতবেগে ওদের হাত থেকে পালিয়ে এলো। ইণ্ডিয়ানগুলো চীৎকার করতে আর বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল, কয়েকটা গুলীও

ছুঁড়ল। কেউ আহত হলো না, শুধু রেজিকের ঘোড়ার লাগামটা একটা গুলী লেগে কেটে গেল তার হাতের এক ইঞ্চি দূরে। ইণ্ডিয়ান চরিত্রের এই পরিচয় পাওয়ার পর তাদের এ ধরনের আর কোনো ঝুঁকি নেবার বাসনা নেই। তাদের ইচ্ছা, তারা পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে বেণ্ট-এর কেল্লা পর্যন্ত যাবে। আমাদের পরিকল্পনা তাদের সঙ্গে মিলে গেল, তাই ওরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরস্পরের শক্তি বাড়াতে চাইল। কিন্তু আমাকে ফিরতে না দেখে তারা চুপচাপ বসে থাকতে বিরক্তি বোধ করল এবং তাদের সাম্প্রতিক অপ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা ভুলে গিয়ে আমাদের সঙ্গ ছাড়াই রওনা হয়ে গেল, বলে গেল আমাদের জন্য বেণ্ট-এর কেল্লায় অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে আমরা উপনিবেশের দিকে লম্বা পাড়ি দেবো দল বেঁধে, কারণ ও-পথে শত্রুভাবাপন্ন পনী এবং কামাঞ্চে ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় আছে।

বেণ্ট-এর কেল্লায় পৌঁছে সেখানে দল আরো ভারি হবে আশা করলাম। কেণ্টাকি থেকে একটি যুবক পাহাড় অঞ্চলে এসেছিল রাসেলের ক্যালিফর্নিয়া-অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। তার মুখেই শুনেছিলাম তার একটি বড় সাধ একটি ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করা ; এ সাধটি সে পরে মেটাতে পেরেছিল, কিন্তু আমাদের (এবং অন্যান্য যাদেরই সেই নিহত পনী ইণ্ডিয়ানটির ক্রুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তাদেরও) বেশ একটু বিপন্ন করে। দেশান্তর-যাত্রী সঙ্গীদের ওপর বিষম বিরক্ত হয়ে সে কিছুদিন আগে একদল সহযাত্রীর সঙ্গে রওনা হয়েছিল আর্কেনসাস অভিমুখে। আমাদের জন্য সে একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছিল যে আমরা বেণ্ট-এর কেল্লায় এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে, এবং আমাদের সঙ্গেই উপনিবেশের দিকে রওনা হবে। কিন্তু কেল্লায় ফিরে এসে সে দেখল চল্লিশজন লোকের একটি দল গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে রওনা হবে, তখন বুদ্ধিমানের মতো এমন শক্তিশালী দলের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করল। সাবলেট এবং তার সঙ্গীরাও এই দলে যোগ দিল। ফলে ছয় সপ্তাহ পরে আমরা বেণ্ট-এর কেল্লায় গিয়ে দেখলাম আমাদের বন্ধুরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আবার আমাদের সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি এবং সঙ্গতির ওপর নির্ভর করতে হলো।

৪ঠা অগাস্ট বিকেলের প্রথমদিকে আমরা লারামি কেল্লা থেকে শেষ বিদায় নিলাম। শ আর আমি আবার পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চললাম প্রেয়ারির ওপর দিয়ে। প্রথম পঞ্চাশ মাইল আমাদের সঙ্গে সঙ্গী ছিল : ট্রোশি নামে একজন ফাঁদ-পাতা শিকারী ; ফার-কোম্পানির চাকুরে একজন অদ্ভুত লোক, তার নাম রুভিল।

এরা দুজন ব্যবসাদার বাইসোনেটের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছিল 'হর্স ক্রীক' নামক খাঁড়ির ধারে তার তাঁবুতে। সেই বিকেলে আমরা মাত্র ছয় কি আট মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে একটি ছোট নদীতে এসে পৌছলাম। এটি প্রেয়ারির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে, আর এর তীরে তীরে ঝোপে ঝোপে রয়েছে ফলভারানত বন্য চেরি গাছ, স্রোতটিকে প্রায় আড়াল করে। এখানেই আমরা বিশ্রামের ঘাঁটি করলাম। তাঁবু খাটাতে আলস্য বোধ হলো, তাই মাটির ওপর জিনগুলো ফেললাম, একজোড়া মহিষ-চর্মের পোশাক বিছিয়ে দিলাম, আর তার ওপর শুয়ে শুয়ে ধূমপান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ডেস্‌লরিয়ার্স তার ভাজবার কড়াই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর রেমণ্ড মাঠে ঘাস খেতে ব্যস্ত ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিতে লাগল। ডেস্‌লরিয়ার্সের বেশ ভালো সহকারী হলো রুভিল; রান্নায় তার নাকি খুব ভালো হাত। রুভিলের নিজের বিশ্বাস ছিল সে একজন সবজান্তা লোক; নিজের বহুবিধ গুণাবলীর পরিচয় দেবার সুযোগ সে কখনো হাতছাড়া করত না। সেণ্ট লুইস শহরে সে সার্কাসে ঘোড়ায় চড়ার নানারকম কায়দার খেলা দেখাতো; একবার মাথা দিয়ে ঘোডায় চডে লারামি কেল্লার চারদিকে ঘুরে ইণ্ডিয়ানদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেল্লায় সেরা রসিক বলেও তার খ্যাতি ছিল; তার ভেতরে কৌতুকরস আর স্ফূর্তির এমন প্রাচুর্য ছিল যে, সে-রাত্রে বাকি সকলের চাইতে সে একাই বেশী আসর গরম রাখল। একসময় ডেস্‌লরিয়ার্সের পাশে হাঁটু গেড়ে সে ডেস্‌লরিয়ার্সকে শিখিয়ে দিল কৃষ্ণসারের মাংস ফালি করে ভাজবার আসল পদ্ধতি, তারপরই এসে আমাদের পাশে বসে ঘোড়ার লেজে বিনুনি করার কায়দা বাতলাতে লাগল, শুধু একটা ছুরি দিয়ে কিভাবে একটা দ্রুত ধাবমান মহিষের লেজ কেটে ফেলে তারপর গোটা মহিষটাকে মেরে ফেলেছিল সেই কাহিনী (যার সত্যতা সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের মনে প্রচুর সন্দেহ ছিল), আর তারপরেই কেল্লার সর্দার পেপিন সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প শোনাতে লাগল। অবশেষে ঘাস থেকে শেক্‌স্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলীখানা তুলে নিয়ে দু'-এক লাইন হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে প্রমাণ করে দিল সে পড়তে জানে। সে দুষ্টু বানরের মতোই নেচেকুঁদে বেড়াতে লাগল; আর এ-মুহূর্তে সে যা করছিল—পরমুহূর্তে সে যে তা করবে না, সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। তার সঙ্গী ট্রোশি ঘাসের ওপর নীরবে বসে ছিল আর একটি কুশ্রী, ছোটখাটো উটা-দেশীয়া ইণ্ডিয়ান স্ত্রী-লোকের ওপর নজর রাখছিল, যার সম্বন্ধে সে ছিল একটু সন্দিগ্ধচেতা।

পরদিন আমরা আরো খানিকটা অগ্রসর হলাম 'গোশি-র কোটর' নামে একটি অনুর্বর এলাকা পেরিয়ে। রাতের দিকে আমরা নানা গিরিপথের মাঝখানে পড়লাম।

জলের খোঁজ না পাওয়ায় আমাদের অনেকক্ষণ ধরে এগোতে হলো। পরদিন ভোরে আমাদের যেতে হলো একসারি ছোট ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে, বৃষ্টি আর ঝড়ের ঝাপ্‌টায় যাদের কাঁচা ধারগুলির যে বিশ্রী সাদাটে রং হয়েছে, তা রীতিমতো দৃষ্টি-কটু। এই পাহাড়গুলোর ফাঁকে একটি খাড়াই রাস্তা বেয়ে ওপরদিকে উঠতে উঠতে রাস্তার ওপর দেখতে পেলাম রাক্ষুসে পায়ের ছাপ। ভালুকের পায়ের ছাপও দেখতে পেলাম, যা তার আগের দিনও দেখতে পেয়েছিলাম প্রচুর পরিমাণে। এরপরই আমরা পার হচ্ছিলাম একটি অনুর্বর সমতলভূমির ওপর দিয়ে। সূর্য বেশ উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিতে থাকলেও আবহাওয়ায় কেমন একটু ঝাপ্‌সা ভাব ছিল। দূরের পাহাড়গুলো সেই আবছায়ায় নানারকম অদ্ভুত রূপ ধারণ করছিল, আর দিগন্ত-রেখার রূপ ঘন ঘন বদ্‌লাচ্ছিল। শ আর আমি পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চলেছিলাম, হেনরি শ্যাটিলন চলেছিল আমাদের কিছু আগে আগে। হঠাৎ সে থেমে গেল আর উত্তেজিতভাবে আমাদের দিকে ঘুরে আমাদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে বলল। আমরা দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে চলে গেলাম তার কাছে। হেনরি প্রায় মাইলখানেক দূরে প্রেয়ারির একটি ধূসর উঁচু অংশের ওপর একটি কালো বিন্দুর দিকে দেখিয়ে বলল, "ওটা নিশ্চয় একটা ভালুক। এসো, এইবার কিছু শিকারের মতো শিকার হবে। বুড়ো মহিষের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে ভালুকের সঙ্গে লড়া অনেক ভালো। ভালুক যেমন জোয়ান তেমনি চট্‌পটে।"

আমরা একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলাম একটা ভীষণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে, কারণ এই ভালুকগুলি দেখতে ঐরকম কিম্ভূতকিমাকার হলেও অবিশ্বাস্যরকম হিংস্র এবং কর্মঠ। প্রেয়ারির একটি উঁচু অংশ ঐ কালো জিনিসটাকে আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে ফেলল। তারপরই ওটা আবার দেখা দিল। এবারে কিন্তু আমাদের খুব কাছে মনে হলো। আমরা বিস্মিতনেত্রে ওর দিকে তাকাতেই ওটা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, আর প্রত্যেকটি ভাগই পাখা মেলে উড়ে গেল। আমরা ঘোড়া থামিয়ে হেনরির মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখে তামাসা আর দুঃখের অদ্ভুত মিশ্রণ। এই অদ্ভুত আবহাওয়া তার চোখকে এমনভাবে বোকা বানিয়েছিল যে পঞ্চাশ গজ দূরের দুটি বড় কাককে এক মাইল দূরের একটি বৃহৎ ভালুক বলে মনে করেছিল।

বিকেলবেলা একটা মস্ত পাহাড়ের পাদদেশে এলাম। পথ বেয়ে উঠতে উঠতে রুভিল আমাদের অবস্থা এবং বাড়ির খবর জানবার জন্য নানা প্রশ্ন করতে লাগল, আর শ তাকে তার কাল্পনিক স্ত্রী এবং সন্তানের কাহিনী শোনাতে লাগল। রুভিল

একান্ত বিশ্বাসে তার সেই কাহিনী শুনতে লাগল। পাহাড়ের মাথায় উঠে আমরা আমাদের নীচের সমতলভূমিতে 'হর্স ক্রীক' নামক খাঁড়ি দেখতে পেলাম, আর খানিকটা দূরে বাঁ-ধারে দেখলাম স্রোতের ধারে গাছের আর ঝোপের মাঝখানে বাইসোনেটের তাঁবু। রুভিলের মুখে এইসময় হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত ফাঁকা-ফাঁকা ভাব দেখা দিল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কী। জানা গেল বাই-সোনেট তাকে এখান থেকে লারামি কেল্লায় পাঠিয়েছিল শুধু একটিমাত্র কাজের জন্য—কাজটা হচ্ছে—লারামি কেল্লা থেকে কিছু তামাক নিয়ে আসতে। আমাদের এই লঘুচিত্ত বাচাল বন্ধুটি কেল্লায় পৌছানো থেকে এখন পর্যন্ত তার কেল্লায় যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যটা ভুলেই গিয়েছিল ; অর্থাৎ প্রায় একশো মাইল বিপদসঙ্কুল রাস্তা সে বৃথাই অতিক্রম করে এসেছে। খাঁড়ির জলে নেমে আমরা পায়ে হেঁটেই স্রোতটা পার হয়ে গেলাম, সেখানে একটি গাছের নীচে একটি ইণ্ডিয়ান সম্পূর্ণ একা একটা ঘোড়ার পিঠের ওপর বসেছিল। সে কিছু বলল না, শুধু ঘুরে তাঁবুর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বাইসোনেট তাঁবুর জন্য একটি চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছিল। স্রোতটি এবং তার তীরবর্তী ঘন তরুরাজি একটি প্রশস্ত সবুজ মাঠকে তিন দিকে ঘিরে রেখেছিল। সেই মাঠে ছিল বৃত্তাকারে প্রায় চল্লিশটি ডাকোটা তাঁবু। তার অনতিদূরে বন্ধুত্বপূর্ণ শীয়েনদের কয়েকটি তাঁবু। বাইসোনেট নিজেও ইণ্ডিয়ান ধরনেই বাস করত। তার তাঁবুতে গিয়ে দেখলাম সে তাঁবুর ভিতরে মাথার দিকে বসে আছে, তার চারদিকে সুখ-সুবিধার নানা উপকরণ সাজানো, প্রেয়ারি অঞ্চলে যা বড একটা দেখা যায় না। তার কাছে ছিল তার ইণ্ডিয়ান স্ত্রী, আর গোলাপের মতো ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা ক্যালিকো কাপড়ের গাউন পরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। পল ডোরিয়নও তার ম্লান মুখ নিয়ে আর পুরোনো সাদা টুপি মাথায় তাঁবুতে বসে ছিল, সঙ্গে ছিল আতোয়াঁ লে রুজ নামে একটি বর্ণসঙ্কর পনী, সিলবিল নামে একজন ব্যবসাদার, এবং আরো কয়েকজন শেতাঙ্গ।

বাইসোনেট বলল, "আমাদের সঙ্গে দু'-একদিন থেকে গেলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তার পরে পুয়েব্লোর দিকে রওনা হলেই হবে।"

আমরা তার সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, আর একটি চডাই জায়গায় গাছের কাছাকাছি তাঁবু খাটালাম।

বাইসোনেট আমাদের একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করল। তারপর আমরা তার ইণ্ডিয়ান সহযোগীদের কাছ থেকেও এইজাতীয় মনোযোগ প্রচুর পরিমাণে পেতে লাগলাম। পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে আমি যখন কালো-পাহাড় পেরিয়ে

ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে গিয়ে যোগ দিয়েছিলাম তখন কয়েকটি পরিবার অনুপস্থিত ছিল, কারণ তারা অন্যান্য পরিবারগুলির সঙ্গে পাহাড়গুলি পার হয়ে যেতে চায়নি। বাইসোনেটের শিবিরে যোগ দিয়েছিল সেই ইণ্ডিয়ান পরিবারগুলোই। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার কাছে এলো তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের খোঁজখবর জানতে। তারা শুনে বেজার হলো যে, তারা যেমন নিজেদের ভীরুতা আর আলস্যের দোষে প্রায় অনাহারের অবস্থায় রয়েছে, তেমনি তাদের গ্রামের অন্যসবাই তাদের আগামী মরশুমের ঘর বানাবার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেলেছে, প্রচুর খাবারও সংগ্রহ করেছে, আর বেশ প্রাচুর্যের মধ্যেই আছে। বাইসোনেটের সঙ্গীরা কিছুদিন ধরে জংলী চেরি ফল খেয়ে কাটাচ্ছে। এই ফল তাদের স্ত্রীরা বীচিসহ থেঁৎলে মহিষ-চর্মের পোশাকের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল রোদে শুকোবার জন্য। ওগুলো ঐভাবেই খাওয়া হতো, অথবা অন্য কোনোরকম খাদ্যের একটি উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হতো।

পরদিন একটি নতুন আবির্ভাবে তাঁবুতে বেশ একটু সাড়া জাগল। আর্কেনসাস থেকে এসে হাজির একটি ইণ্ডিয়ান এবং তার পরিবার। তাঁবুগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে ইণ্ডিয়ানটি বেশ গুরুগাম্ভীর্যপূর্ণ হাবভাব দেখাতে লাগল, আর বলল শেতাঙ্গদের শোনাবার মতো একটি জবর খবর সে নিয়ে এসেছে। স্ত্রীলোকরা তার তাঁবুটা খাটিয়ে দেবার পর সে সব শেতাঙ্গদের এবং বাছাই-করা ইণ্ডিয়ানদের একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করল। অতিথিরা এসে তার সেই গরম, দম-বন্ধ-করা তাঁবুর ভেতরে ঠাসাঠাসি করে বসল। আমাদের নিমন্ত্রণকর্তার নাম—স্ট্যাবার। সে বলল, সে আসবার পথে একটি বুড়ো মহিষ মেরেছে। এই বুড়োর সেদ্ধ-করা নাড়িভুঁড়ি—চামড়ার চাইতেও শক্ত—ভোজের প্রধান খাদ্য হলো। এছাড়া ভোজ্য-তালিকায় ছিল বন্য চেরি ফল আর চর্বি একত্রে একটি বড় তামার কেট্‌লিতে সেদ্ধ-করা। ভোজের খাবার পরিবেশন করা হলো। একমুহূর্ত নীরব এবং আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা; তারপর দু'-একজন ছাড়া প্রত্যেক অতিথি কাঠের থালা উপুড় করে দেখিয়ে দিল সে ভোজ্যবস্তুর পুরো সদ্ব্যবহার করে ফেলেছে। স্ট্যাবার তারপরে তার তামাক কাটবার কাঠের বোর্ডটা এনে তার ওপর ধূমপানের তামাক ভালো করে মিশিয়ে কয়েকটা পাইপ ভরে ফেলল, তারপর পাইপগুলো ধরিয়ে অতিথিদের হাতে হাতে চালু করে দিল। তারপর নিজের আসনে সোজা হয়ে বসে তার গল্প শোনাতে শুরু করল। আমি তার ছেলেমানুষী ভাষার পুনরাবৃত্তি করব না। সে-ভাষা এমন জট-পাকানো, আর ইণ্ডিয়ানদের বলা অধিকাংশ গল্পের মতোই এই গল্পটিতেও এত উদ্ভট আর পরস্পরবিরোধী ব্যাপার ছিল যে তা থেকে এতটুকুও সত্য উদ্ধার করা কঠিন।

তার বলা কাহিনী থেকে অনেক কষ্টে যেটুকু উদ্ধার করতে পেরেছিলাম তা এই :

সে যখন আর্কেনসাসে ছিল তখন সেখানে দেখেছিল শ্বেতাঙ্গদের বিরাট ছয়টি যোদ্ধাদল। সারা পৃথিবীতে যে এত শ্বেতাঙ্গ আছে তা সে কখনো ভাবতে পারেনি। তাদের সকলেরই ছিল বড় বড় ঘোড়া, লম্বা লম্বা ছুরি, আর ছোট বন্দুক। তাদের মধ্যে অনেকের ছিল একইরকম সাজসজ্জা ; অমন চমৎকার যুদ্ধসাজ সে আর কখনো দেখেনি। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্যদল এবং ঘোড়সওয়ার স্বেচ্ছাসৈনিক দল আর্কেনসাসের ওপর দিয়ে চলে গেছে। স্ট্যাবার আরো দেখেছিল মেনিয়াস্কাদের অনেক সাদা তাঁবু টেনে নিয়ে চলেছে লম্বা-শিংওয়ালা মহিষ-দল। এগুলো নিশ্চয় মহিষ-টানা ঢাকা ওয়াগন, যাতে সৈন্যদের জন্য রসদ নিয়ে যাওয়া হয়। এসব দেখার পরই স্ট্যাবারের দেখা হয়েছিল একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে, যে তখন সম্প্রতি কামাঞ্চেদের ওখান থেকে এসেছে আর কামাঞ্চেরা তাকে বলেছে সব মেক্‌সিকানরা গেছে এক বিরাট মহিষ-শিকার অভিযানে, আমেরিকানরা লুকিয়ে পড়েছে একটি গিরিগুহায়, মেক্‌সিকানরা তীর ছুঁড়ে-ছুঁডে তাদের সমস্ত তীর শেষ করে ফেলার পর আমেরিকানরা ভীষণ রণহুঙ্কার ছাডতে ছাড়তে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলেছে। আমরা এ থেকে এই অনুমানই করতে পারলাম যে মেক্‌সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, আর সে-যুদ্ধে আমেরিকানরা জয়ী হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা পুয়েব্লোতে পৌঁছে শুনতে পেলাম জেনারেল কিয়ার্নির সসৈন্যে আর্কেনসাস-প্রবেশ এবং মাটামোরাসে জেনারেল টেলরের বিজয়-লাভের কথা।

সেদিন সূর্যাস্তের সময় আমাদের তাঁবুর ধারে সমতল জায়গায় কতকগুলো লোকের ভিড় হলো ; তারা এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোর দ্রুততা পরীক্ষা করতে। এই ঘোডাগুলো নানা আকারের, নানা আয়তনের, নানা রঙের। কতক এসেছে ক্যালিফর্নিয়া থেকে, কতক যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কতক পার্বত্য অঞ্চলগুলো থেকে আর কতক প্রেয়ারির বন্য দলগুলো থেকে। সাদা, কালো, লাল, ধূসর ছাড়াও নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশ তাদের গায়ে। সবগুলো ঘোড়ার মুখে একটা অদ্ভুত চকিত চঞ্চল ভাব, সযত্নপালিত সহুরে ঘোড়াদের মতো প্রশান্ত ভাব থেকে একেবারে আলাদা। যে ঘোড়াগুলো দ্রুততায় এবং তেজস্বিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হলো, সেগুলোর ঘাড়ের চুলে আর লেজে ঈগল পাখির পালক ঝুলিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হলো। পঞ্চাশ-ষাটজন ডাকোটা এই জমায়েতে উপস্থিত ছিল, আপদমস্তক তাদের বিশিষ্ট ভারী ওজনের সাদা-করা চামড়ার পোশাকে সজ্জিত হয়ে। বহুসংখ্যক শীয়েনও ছিল, তাদের

অনেকেই পরে এসেছিল মেক্সিকো-দেশীয় জমকালো 'পঞ্চো', যে পোশাক কাঁধ ঘিরে রেখে ছু'হাত সম্পূর্ণ খালি রেখে দেয়। ইণ্ডিয়ানদের ভেতর মিশে ছিল কয়েকজন ক্যানাডিয়ানও, তারা বেশির ভাগ বাইসোনেটের চাকরি করে; বনাঞ্চলই এদের ঘর-বাড়ি, তাঁবুর আগুন এদের কাছে ঘরোয়া অগ্নিকুণ্ডের চাইতে বেশী প্রিয়। কঠোর এবং বিপদসঙ্কুল জীবনই এদের পছন্দ। ছুর্বার এদের প্রাণের আনন্দ, তুড়ি মেরে জীবনের ঝড়-ঝাপ্‌টাকে তুচ্ছ করে এরাই বলতে পারে: "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস"। এছাড়া ছু'-তিনটি বর্ণসঙ্কর-জাতীয় লোকও ছিল এই ভিড়ে। এই অদ্ভুত জাতকে চল্‌তি ভাষায় বলা হতো 'আধা ইণ্ডিয়ান, আধা শ্বেতাঙ্গ, আধা শয়তান'। এদের ভেতর সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল আতোয়াঁ লে রুজ, তার পরনে ঢলঢলে প্যাণ্ট আর তেমনি ঢিলে ক্যালিকো শার্ট। তার কালো সর্পিল চুলগুলোকে ঠিক রাখবার জন্য সে মাথা জড়িয়ে একটা রুমাল বেঁধে রাখত, আর তার তলায় ঝিক্‌মিক্ করত তার ছোট্ট ছুটি ছুষ্টুমি-ভরা চোখ। তার ক্রীম রঙের চমৎকার ঘোড়াটা সে নিয়ে এসেছে, অন্য সবার সঙ্গে তার দ্রুতগতি পরীক্ষা করবে বলে। তাই সে খুলে ফেলে দিল স্থুল আর উঁচুমাথাওয়ালা জিনটা, আর তার জায়গায় একফালি মহিষের চামড়া চাপিয়ে তার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। সামনের জায়গা পরিষ্কার করে দৌড় শুরু করবার নির্দেশ দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে সে আর তার ইণ্ডিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী ছুজনেই বিছ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলল যে যার ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সজোরে চাবুক চালাতে চালাতে। একমুহূর্তের ভেতরেই যেন ছুজনে সুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল; তার অল্পক্ষণ বাদেই বিজয়ী হয়ে ফিরে এলো আতোয়াঁ, তার কম্পমান শ্রান্ত ঘোড়াটিকে বিজয়ের আনন্দে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে।

মধ্যরাতে আমি মহিষ-চর্মের পোশাক গায়ে জড়িয়ে মাটির ওপর ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় রেমণ্ড এসে আমায় জাগাল। সে বলল এমন একটি ব্যাপার হচ্ছে যা দেখলে আমি খুশি হবো। ইণ্ডিয়ান শিবিরের ভেতরদিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি অগ্নিকুণ্ড ঘিরে জড়ো হয়েছে অনেক ইণ্ডিয়ান, সেই আগুনের আলোয় এই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাদেরই মাঝখানে কে যেন বিষম জোরালো গলায় বিকট গান ধরেছে, আর সেই গানের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন কণ্ঠের সমবেত বিকটতর চীৎকার। আমি চামড়ার পোশাকটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম, কারণ রাতটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল; তারপর হেঁটে চলে গেলাম সেখানে। ইণ্ডিয়ানদের ভিড় এত বেশী ছিল যে আগুনের আলো তাদের ঘন ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে পারছিল না। আমি ঠেলে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করতেই ওদের একজন

সর্দার এসে আমাকে বাধা দিয়ে বলল তাদের এই পবিত্র উৎসবে কোনো শ্বেতাঙ্গের খুব বেশী কাছাকাছি আসা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি ঘুরে অন্যদিকে গেলাম যেদিকে ভিড়ের ভেতর একটুখানি ফাঁক দিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলাম ভেতরে কী হচ্ছে, ভেতরে অনধিকার প্রবেশ না করে এবং তাদের অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না করেই। 'দৃঢ়চিত্ত'দের সমিতির একটি বিশেষ নৃত্য চলছিল। এই 'দৃঢ়চিত্ত' সমিতির লোকেরা যুদ্ধপটু এবং যুদ্ধপ্রিয়। এদের ভেতর ডাকোটা এবং শীয়েন জাতের লোক আছে, এবং এ সমিতির সবাই অত্যন্ত সাহসী যুবক—অন্তত এদের খ্যাতি সেইরকম। এই সমিতির মূলনীতি হচ্ছে—যে-অভিযান একবার শুরু করা হবে, তা থেকে কিছুতেই পিছু হটে না আসা। এইজাতীয় প্রত্যেকটি ইণ্ডিয়ান সমিতিরই একটি করে রক্ষক শক্তি থাকে। এই 'দৃঢ়চিত্ত' সমিতির রক্ষক আত্মা মূর্ত হয়েছে শেয়ালে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গরা কখনোই এই প্রাণীটিকে বেছে নিত না, যদিও যুদ্ধে সুনীতি-দুর্নীতি, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ানদের যেরকম ধারণা, তাতে এই জানোয়ারটিকেই তাদের অভিভাবকরূপে বেছে নেওয়া ঠিকই হয়েছে। নর্তকরা আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, প্রত্যেকটি নর্তক একবার হল্‌দে আলোয় আলোকিত হয়ে পরমুহূর্তেই আবার কালো ছায়ায় পড়ে যাচ্ছিল। তারা এমন নিখুঁতভাবে তাদের অভিভাবক জানোয়ারটির ভাবভঙ্গির নকল করছিল, যা রীতিমতো হাস্যকর। আর সঙ্গে সঙ্গে উঠছিল বিকট চীৎকার-ধ্বনি। ঐ দেখে কখনো বা আরো কতকগুলো যোদ্ধা লাফিয়ে পড়ত নর্তকদের চক্রের ভেতর, আর তারাহীন আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে জোরে জোরে পা ফেলে ফেলে চীৎকার করতে করতে তারা যেন কতকগুলো অপদেবতার মতো তাদের অস্ত্রগুলো শূন্যে ঝাঁকাতে থাকত।

আমরা এখানে রইলাম পরদিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত। তারপর আমার সঙ্গী আর আমি আমাদের তিনজন অনুচর নিয়ে পুয়েব্লোর দিকে রওনা হলাম। আশা করলাম এই তিনশো মাইল পথ যেতে দিন পনেরো লাগবে। ভাবলাম এই সময়ের ভেতর পথে যেন একটিও মানুষের সঙ্গে দেখা না হয়, কারণ দেখা হলে, যাদের সঙ্গে দেখা হবে তারা খুব সম্ভব শত্রুই হবে, যাদের কাছে আমাদের একমাত্র ছাড়পত্র হবে আমাদের বন্দুক। প্রথম দু'দিন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। কিন্তু একটি দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। আমরা সমতলভূমির একটি বেশ বিস্তীর্ণ ফাঁপা অংশে একটি ছোট্ট নদীর ধারে তাঁবু ফেললাম। দিনের আলো দেখা দেবার আগেই ডেস্‌লরিয়ার্স উঠে পড়ল; আমাদের ভোরাই খানা বানাতে শুরু করবার আগে সে তার কর্তব্য অনুযায়ী ঘোড়াগুলিকে মাঠে ছেড়ে দিল।

প্রায় মাটি ঘেঁষেই শুরু হয়েছিল ঠাণ্ডা কুয়াশা, ফলে আমরা যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন আমাদের জানোয়ারগুলোকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। উদ্বিগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করে করে তাদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে আবিষ্কার করলাম তারা কোন্ দিকে গেছে। তারা সবাই রওনা হয়ে গিয়েছিল লারামি কেল্লার দিকে, একটি বয়স্ক অবাধ্য অশ্বতরের নির্দেশমতো। তাদের অনেকের পায়েই বেড়ি লাগানো ছিল তবু তাদের ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার আগেই তারা তিন মাইল দূরে চলে গিয়েছিল।

দু'-তিনদিন আমরা চললাম একটি উষর মরুর ওপর দিয়ে, যেখানে সবুজের চিহ্ন ছিল শুধু এখানে ওখানে কয়েকগুচ্ছ ছোট ঘাস, তাও রোদে শুকিয়ে সঙ্কুচিত। প্রাচুর্য ছিল অদ্ভুত অদ্ভুত পতঙ্গের আর সরীসৃপের। মস্ত মস্ত ঝিঁঝিপোকা, কালো আর গাঢ় সবুজ, আর পাখাহীন বৃহদাকার ঘাস-ফড়িং আমাদের ঘোড়াগুলির পায়ের কাছে কাছে এসে বার বার লাফিয়ে পড়ছিল, আর অগুন্তি গিরগিটি ঘাসগুচ্ছের ভেতরে বিদ্যুদ্বেগে চলাফেরা করছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল শিংওয়ালা ব্যাং। আমি এদের একটিকে ধরে সঁপে দিয়েছিলাম ডেস্লরিয়ার্সের হাতে ; সে ওটাকে একটা মোকাসিনের ভেতর বন্দী করে রেখে দিয়েছিল। মাসখানেক বাদে বন্দীটির অবস্থা পরীক্ষা করে দেখলাম সে দিব্বি বহাল তবিয়তে রয়েছে। আমি তখন তার জন্য মহিষ-চর্মের একটা খাঁচা তৈরি করে ওকে তার মধ্যে রেখে খাঁচাটা গাড়িতে ঝুলিয়ে রেখে দিলাম। এইভাবেই সে নিরাপদে পৌঁছেছিল উপনিবেশে। সেখান থেকে একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে পুরে তাকে পাঠানো হয়েছিল সুদূর বোস্টন শহরে, ভ্রমণপথে প্রত্যেক রাত্রে ট্রাঙ্কটা খুলে নিয়মিতভাবে তাকে টাট্‌কা বাতাস যোগানো হতো। গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে পর তাকে একটি কাঁচের পাত্রের তলায় রেখে দেওয়া হলো। সেখানে সে পরম প্রশান্তভাবে কয়েকমাস বসে বসে গলা ফুলিয়ে আর সঙ্কুচিত করে দেখিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিতে লাগল। অবশেষে শীতকালের মাঝামাঝি এক ভোরবেলায় সে দেহ থেকে আত্মাটাকে ছেড়ে দিল। এখন সে রয়েছে আগাসিজ যাদুঘরে একটা অ্যালকোহলের বোতলের ভেতর। তার মৃত্যু অনাহার-জনিত বলে ঘোষিত হয়েছিল। তা অসম্ভব নয়, কারণ ছ'মাস ধরে কিছুই তার পেটে পড়েনি, যদিও তার শিশু-ভক্তরা নানারকম ভালো ভালো খাবার জিনিস দেখিয়ে-দেখিয়ে তার রসনা লালায়িত করে তুলেছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাংটি ছাড়া সেই মরুভূমিতে আরো বড় প্রাণীও দেখেছিলাম। প্রেয়ারি-কুকুরের সংখ্যা ছিল বিরাট। প্রায়ই দেখতে পেতাম শক্ত শুষ্ক সমতলভূমির

ওপর মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে সারি সারি মাটির ঢিবি ; কুকুরগুলো গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে মাটিগুলো দিয়ে এইভাবে গর্তের সামনে ঢিবি বানিয়ে রাখত। আমরা এগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেতাম কুকুরছানাদের কেঁউ-কেঁউ শব্দ। গর্তের বাসিন্দাদের নাকগুলো গর্তের ভেতর থেকে একটু মাত্র বেরিয়ে থাকত। কৌতূহল নিবৃত্ত হয়ে গেলেই নাকগুলো নীচে গর্তের ভেতরে নেমে যেত। কতকগুলি কুকুর, যাদের সাহস অন্য কুকুরদের চাইতে কিছু বেশী—যদিও এরা এত ছোট, খরগোশের চাইতেও, যে এদের কুকুর বলতে একটু দ্বিধা হয়—ঢিবির মাথার ওপরে বসে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে জোরে ঘেউ-ঘেউ করত, প্রত্যেক চীৎকারের সঙ্গে জোরে লেজ নাড়িয়ে। বিপদ (অর্থাৎ আমরা) আরো কাছে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই শূন্যে পা তুলে চোখের পলকে লাফ দিয়ে তারা গর্তের ভেতরে ঢুকে যেতো। সূর্যাস্তের কাছাকাছি, বিশেষ করে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকলে, এখানকার সমগ্র কুকুর-সম্প্রদায় গর্তের আড়াল ছেড়ে মাটির ওপর উঠে এসে বসে। আমরা একবার দেখেছিলাম এরা এদের কোনো-এক বিশিষ্ট নাগরিকের বাসগর্ত ঘিরে ভিড় করে বসেছে খাড়া হয়ে মাটিতে লম্বা করে লেজ পেতে, তাদের সামনের থাবা দুটিকে উঁচু করে তাদের সাদা বুকের ওপর ঝুলিয়ে। মনে হলো তাদের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে তারা গলা ছেড়ে আলোচনা করছে। যার বাসগৃহ ঘিরে কুকুরদের এই মহতী সভা, এই কুকুর-সমাজের সেই বিশিষ্ট নাগরিকটি তখন তার নিজস্ব ঢিবির ওপর বসে নীচের দিকে পরম আত্মসন্তুষ্ট ভাবে তাকিয়ে দেখছে। আর সেই সময়েই কতকগুলো কুকুর যেন বিশেষ জরুরী কোনো খবর বয়ে নিয়েই কুকুরদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনে হয়, সাপ-ই এই প্রেয়ারি-কুকুরদের সবচেয়ে খারাপ শত্রু ; অন্ততঃ এই কুকুরদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে, তাতে আমার মনে হয় নোংরা, চট্‌চটে দেহবিশিষ্ট প্রাণীদের সঙ্গে এদের খাতির জমা সম্ভব নয়। জ্ঞানগম্ভীর চেহারাওয়ালা ছোট ছোট পেঁচারাও এই প্রেয়ারি-কুকুরদের সঙ্গে বাস করে, কিন্তু কী শর্তে তা জানতে পারিনি কখনো।

বাইসোনেটের শিবির ছাড়বার পর পঞ্চম দিনে আমরা বিকেলের শেষদিকে এক জায়গায় পৌঁছে বিষণ্ণচিত্তে দেখলাম, দূর থেকে যাকে একটি গভীর জলস্রোত বলে ভেবেছিলাম সে শুধু শুক্‌নো বালুর পর বালু লম্বা ফিতার মতো চলে গেছে, বালুর মধ্য দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে জল অদৃশ্য। আমরা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম কয়েক দলে ; এই বালুপথের ধার দিয়েই কতক গেলাম একদিকে, কতক অন্যদিকে। তবু জলের কোনো চিহ্ন পেলাম না, এমনকি কোনও বালুর ওপর পেলাম না এতটুকু

আর্দ্রতার আভাস। অনেক বড়ো কটন-উড গাছ ছিল এই বালুপথের ধারে ধারে। ঝড় আর বিদ্যুতের ঝাপ্‌টায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তার ওপর জলের অভাবে শুষ্কতার ফলে তারা মুমূর্ষু। তাদের মরা-ডালে আর এক মগডালে বসে আধা-ডজন কাক কর্কশকণ্ঠে কা-কা করছিল। চিহ্নটা অশুভ, কিন্তু আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আর উপায় ছিল না। দশ মাইল দূরে প্লাট নদীর দক্ষিণ শাখা। তার এদিকে জল পাবার সম্ভাবনা নেই। মনের রাগ মনেই চেপে রেখে মরুভূমির ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

ভোর থেকেই পাতলা কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। এখন পশ্চিমে বিরাট বিরাট মেঘখণ্ড একত্রিত হচ্ছে। মেঘগুলো দিগন্তরেখার অনেক উঁচুতে উঠে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম ওদের মধ্যে একটি মেঘখণ্ড অন্যগুলির চাইতে বেশী কালো, আর তার আকারটাও নীচে চওড়া থেকে ওপরদিকে ক্রমশঃ সরু। আবার তাকিয়েও সেই একই রকম দেখলাম, কখনো বা অস্পষ্ট, কখনো সুস্পষ্ট; কিন্তু ওর চারদিকের মেঘগুলোতে যখন নানারকম পরিবর্তন ঘটতে লাগল তখনো এই মেঘখণ্ডটি অবিচল, অপরিবর্তিত। আমি ভাবলাম এটি নিশ্চয় কোনো পাহাড়ের চূড়া, কিন্তু এর বিরাট উচ্চতা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। যাই হোক, আমার অনুমান ঠিকই হয়েছিল, কারণ ওটা মেঘখণ্ড নয়, লং-এর চূড়া। এককালে এটিই রকি পর্বতের ভেতর উচ্চতম চূড়া বলে পরিগণিত হতো, যদিও পরবর্তী আবিষ্কারে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঘনায়মান অন্ধকারে চূড়াটি মিলিয়ে গেল, আর তাকে দেখতে পেলাম না। পরদিন, এবং তারপরও কিছুকাল আবহাওয়া এমনই কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল যে, দূরের জিনিস একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদের সোজা রাস্তা ছেড়ে নদীর যে জায়গাটা আমাদের সবচেয়ে কাছে, সেদিকে এগিয়ে চললাম, যদিও ঘন অন্ধকারে পথ চিনে চলা সহজ ছিল না। আমার একদিকে রেমণ্ড, অন্যদিকে হেনরি। দুজনকেই চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম উভয়ে এক গভীর গিরিখাতে এসে পড়েছে। আমরা আন্দাজেই দু'দিকের বিপদ এড়িয়ে এড়িয়ে অগ্রসর হলাম। অচিরেই মনে হলো আমরা এমন জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে আমাদের চারিদিকে গভীর খাদ, এ থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। অন্ধকার এমন যে, কোনো দিকেই ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক, অনেক কষ্টে কোনোরকমে আমাদের গাড়িটা শুদ্ধ একটা সরু গিরিপথের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে একটি উৎরাইয়ের মুখে এলাম, এ উৎরাই বড় বেশী খাড়া হয়ে নেমে গেছে। তলায় কী আছে ভালো করে না জেনেই আমরা সেই উৎরাই

বেয়ে নেমে চললাম। গাছের অনেক শুকনো ডালপালা মট্‌মট্‌ করে ভাঙতে লাগল আমাদের অবতরণের ফলে। আমাদের মাথার ওপর কতকগুলো বড় বড় ছায়ার মতো জিনিস; আমাদের সামনে যেন জলের অস্পষ্ট ঝিক্‌মিক্‌। রেমণ্ডের ঘোড়া একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেল। হেনরি নেমে পড়ল, তারপর মাটির ওপর পা দিয়ে অনুভব করে বলল ঘোড়াদের খাবার জন্য এখানে যথেষ্ট ঘাস আছে। জিন খুলে ফেলবার আগে যে যার ঘোড়াকে আমরা খুব সাবধানে জলে নিয়ে গেলাম তার তৃষ্ণা মেটাতে। তারপর দু'-তিনটি দুষ্টু ঘোড়াকে বেঁধে রেখে বাকিগুলোকে ঘাস খেতে আল্‌গা ছেড়ে দিলাম। তারপর শুয়ে ঘুমোলাম। ভোরে উঠে বুঝলাম আমরা প্লাট নদীর দক্ষিণ শাখার কাছাকাছি একটি ঝোপ আর ঘাসবহুল জায়গায় এসে পড়েছি। গতরাত্রের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমরা ভোরাই খানাটা বেশ গুরু পরিমাণেই খেলাম, তারপর আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিছুদূর এগোবার পরই শ তার অশ্বতরটি থামিয়ে ঘাসের ভেতর যেন কি-একটা জিনিস লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল। এরপর ডেস্‌লরিয়ার্স সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল আর একটি জায়গার চারদিকে লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য শত্রুটিকে একটি চাবুক দিয়ে ভীষণভাবে পিট্টতে লাগল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে ঘাস থেকে ঘাড় ধরে টেনে তুলল একটি প্রকাণ্ড র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ, যার মাথাটা শ-র বন্দুকের গুলীতে চুরমার হয়ে গেছে। ডেস্‌লরিয়ার্স যখন হাতটা সোজা করে সাপটাকে নিজের শরীর থেকে দূরে ঝুলিয়ে ধরেছিল, তখন তার লেজটা ধীরে ধীরে মোচড় খাচ্ছিল আর প্রায় মাটি স্পর্শ করছিল। তার লেজের দিকে ছিল চোদ্দটা 'র‍্যাট্‌ল্‌' অর্থাৎ হাড়ের বালা (সাপটা চলবার সময় যেগুলোতে ঠোকাঠুকি লেগে আওয়াজ হতো), আর লেজের মাথাটা ছিল ভোঁতা। এরপর থেকে পুয়েব্লো পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা রোজ এই সাপ চার-পাঁচটা করে মারতাম। সাপগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে লেজের ঐ হাড়গুলো ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে গরম বালুর ওপর শুয়ে থাকত। শ ছিল আমাদের দলের সেণ্ট প্যাট্রিক। যখনই সে এই সাপ মারত, তখনই তার লেজটি ছিঁড়ে নিয়ে সে তার গুলীর থলীতে রেখে দিত, এর ফলে তাতে অনেক র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের অস্থিবলয় জমা হয়েছিল। ডেস্‌লরিয়ার্সও তার চাবুক দিয়ে এর দু'-একদিন পর একটা ছোট র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ মেরে এনে দেখিয়েছিল, তার লেজে তারই একটি বাচ্চা।

আমরা প্লাট নদীর দক্ষিণ শাখার স্রোতটি পার হলাম। ওপারে গিয়ে দেখলাম আরাপাহোদের একটি মস্ত শিবিরের চিহ্ন রয়ে গেছে। প্রায় তিনশোটি অগ্নিকুণ্ডের ছাই রয়ে গেছে এলোমেলো গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। জায়গায় জায়গায় তাঁবুর

চিহ্ন। এ জায়গাটি অবশ্য কয়েক মাস ধরেই পরিত্যক্ত। এখান থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে ইণ্ডিয়ানদের আরো সাম্প্রতিক চিহ্ন দেখতে পেলাম। দুটি-তিনটি তাঁবুর চিহ্ন তো খুবই টাট্কা, বোধকরি ঠিক তার আগের দিনই তারা এ জায়গা ছেড়ে গেছে। মাটির ওপর পায়ের ছাপগুলো তখনো পরিষ্কার ফুটে রয়েছে। আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম একটা মোকাসিনের ছাপ।

এসব চিহ্ন আমাদের খুব বেশী উদ্বেগের কারণ হলো না। কেননা চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলাম এই দলের যোদ্ধারা আমাদের দলের চাইতে সংখ্যায় বেশী নয়। দুপুরবেলায় আমরা বিশ্রাম নিলাম একটি বড কেল্লায়। এই কেল্লাটি কয়েক বছর আগে তৈরি করিয়েছিলেন সেণ্ট ভ্রেইন নামে এক ভদ্রলোক। কেল্লাটি তখন পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসোন্মুখ। কাঁচা ইঁটের তৈরী দেয়ালগুলো ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফেটে গেছে। অবহেলিত প্রবেশদ্বারে ভারী গেটগুলো কব্জা থেকে খসে মাটিতে পড়ে ছিল; সেই দুরবস্থার চেহারা দেখে আমাদের ঘোডাগুলো ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছিল। ভেতরের জায়গাগুলো আগাছায় ঢাকা। লম্বা সারির যে ঘরগুলো একসময় কত বিচিত্র নরনারীর ভিড়ে গমগম করত, সে-ঘরগুলোর তখন শোচনীয় অবস্থা। সেখান থেকে আরো বারো মাইল দূরে আরেকটি কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম।

পরদিন ভোরবেলা একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম। আরাপাহোদের একটি বিরাট পরিত্যক্ত শিবিরের খুব কাছাকাছি জায়গা দিয়েই আমরা গেলাম। প্রায় পঞ্চাশটি অগ্নিকুণ্ডে তখনও একটু একটু আগুন জ্বলছিল। এছাড়া আরো নানারকম চিহ্ন থেকে বোঝা গেল আমরা এখানে আসবার আগের দু'ঘণ্টার ভেতর ইণ্ডিয়ানরা এখানকার শিবির ছেড়ে চলে গেছে। তাদের যাত্রাপথ আমাদের যাত্রাপথকে সমকোণে কেটে আমাদের বাঁ-দিকে একসারি পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ওদের দলে স্ত্রীলোক এবং শিশুও ছিল, কাজেই আমরা তাদের মুখোমুখী পড়ে গেলেও আমাদের বিপদাশঙ্কা কিছুটা কম হতো। হেনরি বেশ বিজ্ঞের মতো ইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত শিবির আর চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

আমি বললাম, "আচ্ছা, হেনরি, আমরা যদি ওদের সামনা-সামনি পড়ে যেতাম?"

হেনরি বলল, "কেন, আমরা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁডাতাম আর আমাদের যা আছে সব দিয়ে দিতাম। তারা আমাদের সব কিছু নিয়ে যেতো। তাহলেই তারা আমাদের মেরে ফেলতো না।" বলে মাথা তুলে মুখের ভাব একটুও না বদ্লেই আবার বললে, "হয়তো আমরা আমাদের জিনিসগুলো ওদের কেড়ে নিতে

দিতাম না। হয়তো তারা কাছাকাছি এসে পড়ার আগেই আমরা কোনো গিরিপথে কিম্বা নদীর উঁচু পাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারতাম। আর সেখান থেকে ওদের সঙ্গে লড়াই করতাম।"

সেদিন দুপুরবেলা আমরা চেরি খাঁড়িতে পৌছলাম। এখানে বন্য চেরি, কুল, গুজবেরি আর কিস্‌মিসের প্রাচুর্য। খাঁড়ির জলস্রোতটি দেখলাম আমাদের চলার পথে দেখা অধিকাংশ স্রোতের মতোই সূর্যতাপে শুকিয়ে গেছে ; তাই আমাদের আর ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বালুতে গর্ত খুড়ে খুঁড়ে আমাদের জল বার করতে হলো। দু'দিন পরে এই খাঁড়ির তীর ছেড়ে আমরা অতিক্রম করতে লাগলাম সেই উঁচু পাহাড, যেটি প্লাট নদীর জলস্রোতকে আলাদা করেছে আর্কেনসাসের জলস্রোত থেকে। দৃশ্য একেবারে বদ্‌লে গেল। রৌদ্রদগ্ধ সমতল ভূমির পরিবর্তে আমরা অগ্রসর হলাম উঁচুনীচু, বন্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে আর পাইন গাছে ভরা পাহাড়ের ওপর দিয়ে। ১৬ই অগাস্টের রাত্রে আমরা এমনি এক নির্জন স্থানে বিশ্রাম-শিবির স্থাপন করলাম। প্রবল ঝড় আসন্ন। সূর্য ডুবে গেছে লাল-পাড়ওয়ালা পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের আড়াল দিয়ে। কিন্তু দুর্যোগের সঙ্কেত সত্ত্বেও আমরা অবহেলা করে তাঁবু খাটালাম না, এবং ক্লান্তদেহে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঝড় শুরু হলো মধ্যরাত্রির কাছাকাছি। তখন আমরা সেই অন্ধকার আর অসুবিধার মধ্যেই তাঁবু খাটালাম। ভোরবেলা আবহাওয়া আবার ভালো হয়ে গেল ; দূরে অরণ্য অঞ্চলের গাছের মাথাগুলো ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে দেখা যেতে লাগল 'পাইক-এর চূড়া' তুষারপাতে সাদা হয়ে গেছে।

আমরা একটি বহুদূরবিস্তৃত পাইন বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলাম। বড় কালো কাঠবেরালিরা গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। এই বনের ওধারের শেষপ্রান্ত ছাড়িয়ে আমরা আবার প্রেয়ারি দেখতে পেলাম, আর দেখলাম মাইল-খানেক দূরে প্রেয়ারির বুকে কালো কি-একটা জিনিস যেন নড়ে বেড়াচ্ছে। ওটা মহিষ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলেই আমাদের মনে হলো। হেনরি আবার তার বন্দুক বাগিয়ে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। জানোয়ারটার বাঁ-ধারে একটা নীচু পাথুরে টিলা ছিল, হেনরি জানোয়ারটার দিকে অগ্রসর হতে ঐ টিলাটার সাহায্য নিল। কিছুক্ষণ বাদে বন্দুকের গুলীর অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। মহিষটা প্রায় তিনশো গজ দূর থেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পাগলের মতো বৃত্তাকারে ছুটতে লাগল। শ আর আমি ওর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পাশ থেকে পিস্তলের গুলীতে ওকে আহত করলাম। দু'-একবার সে ভীষণ-

ভাবে আমাদের দিকে তাড়া করে এলো। কিন্তু ওর শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে এলো, সে হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল। একবার সে জ্বলন্ত চোখে তার শত্রুদের দিকে তাকাল, তারপর একধারে গড়িয়ে পড়ে গেল। যদিও রোগা, তবু মহিষটা যে-কোনো বড় ষাঁড়ের চাইতে বেশী বড় আর বেশী ভারী ছিল। জানোয়ারটা যখন মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করতে করতে ছটফট করছিল আর খুর দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে মাটি আর ঘাস তুলে ফেলছিল, তখন তার দুটি নাকের ছেঁদা দিয়ে ফেনা আর রক্ত একসঙ্গে ঝরে পড়ছিল। তার শরীরের দুটি ধার মস্ত হাপরের মতো ভীষণভাবে ওঠানামা করছিল। হঠাৎ তার চোখ-দুটি প্রাণহীন জেলির মতো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে মাটির ওপর নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ল। হেনরি তার ওপর ঝুঁয়ে পড়ে মৃতদেহে একবার ছুরি চালিয়েই জানিয়ে দিল এ-মাংস অত্যন্ত শক্ত আর দুর্গন্ধযুক্ত, এ খাওয়া চলবে না। সুতরাং খাদ্য-ভাণ্ডার বাড়ল না দেখে হতাশ হয়ে আমরা মৃত-দেহটাকে নেক্‌ড়েদের জন্য রেখে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললাম।

বিকেলবেলা আমাদের অদূরেই ডানধারে দেখলাম বিরাট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মস্ত দেয়ালের মতো। হঠাৎ হেনরি ভীষণ ভীতমুখে চাবুক দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, "বর্বরেরা আসছে! বর্বরেরা আসছে!" সত্যিই দেখতে পেলাম দূরে বেগে ধাবমান কতকগুলো কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওগুলো ঘোড়সওয়ার বলেই মনে হলো। হেনরি শ্যাটিলন, শ আর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ঐদিকে এগিয়ে গেলাম ভালো করে দেখে নিশ্চিত হতে। গিয়ে দেখলাম যে কালো বিন্দুগুলোকে আরাপাহো ঘোড়সওয়ার বলে ভুল করেছিলাম, ওগুলো কতকগুলো পাইন গাছের কালো মাথা মাত্র। আমরা ঘোড়ায় চড়ে ছোটার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে মনে হয়েছিল ওরাও যেন জায়গা বদল করে সরে যাচ্ছে একসারি ঘোড়-সওয়ারের মতো।

আমরা গিরিপথে আর খাদের মাঝখানে একটি ছোট নদীর ধারে তাঁবু ফেললাম। ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে তুষারাবৃত পাহাড়ের মাথাগুলো সুন্দর গোলাপী আভায় রঙীন হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। আমাদের ডানদিকে ছয় কি আট মাইল দূরে 'পাইক-এর চূড়া' এবং তার আশেপাশের কয়েকটি বিরাট সঙ্গী প্রেয়ারির সমতল থেকে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; তারা যেন বিরাট সমুদ্রের মধ্য থেকে লাফিয়ে উঠল। তাদের মাথা থেকে একেবারে প্রেয়ারির সমতল পর্যন্ত তারা যেন মেঘের পোশাক পরে আছে, আর সেই পোশাক হাওয়ায় দুলছে। মেঘের আবরণ সরে গেলেই চোখে পড়ছে কালো উঁচু পাহাড়ের চূড়া—যেন একা

দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গিহীন ভীষণ মৌন নিরালায়। মেঘগুলো একটু ফাঁক হতেই আমরা দেখতে পেলাম ঘন অরণ্য, বিরাট খাড়া পাহাড়, সাদা তুষাররাশি, অন্ধকার গহ্বর। আবার এগুলো সবই দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে লাগল।

পরের দিন আমরা পাহাড় ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলাম। একরাশ কালো মেঘ নেমে এলো সেই পাহাড়ের ওপর, শুরু হলো ভীষণ বজ্রগর্জন, সে-গর্জন প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে। কয়েক মুহূর্তের ভেতরই চারদিক কালো হয়ে গেল, আর বৃষ্টি পড়তে লাগল মুষলধারে। আমরা নদীর ধারে একটা কটন-উড গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির প্রকোপটা না কমা পর্যন্ত ঐ আশ্রয়েই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

যেখানে মেঘ ঘন হয়ে জমেছিল, সেইখানেই মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গায়ের ওপর আর চূড়ায় চূড়ায় একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল উষ্ণ সূর্যালোক। এ যেন বাস্তব নয়, কোনো প্রাচ্য রূপকথায় বর্ণিত কাল্পনিক দৃশ্য। সব-কিছুর ওপর নেপ্‌ল্‌স্‌-এর আকাশের মতো কিংবা ক্যাপ্রি দ্বীপের সূর্যকরোজ্জ্বল পাহাড়-ধোয়া স্বচ্ছ সমুদ্রের মতো স্বপ্নালু নীলিমা বুলানো। বাঁ-দিকের আকাশে তখনো কালিমা ছিল; কিন্তু দুটি এককেন্দ্রিক রামধনু সেই কালিমার বুকে যেন আরো সুন্দর হয়ে ফুটেছিল।

সেই বিকেলে আর পরদিন ভোরবেলায় আমরা এগিয়ে চলেছিলাম একটি নদীর ধার দিয়ে, যার নাম 'বয়লিং স্প্রিং' (ফুটন্ত প্রস্রবণ) খাঁড়ি। একটি ফুটন্ত প্রস্রবণের উষ্ণ জল এই খাঁড়িতে এসে পড়ে বলেই খাঁড়িটির এই নাম হয়েছে। দুপুরে যখন বিশ্রামের জন্য থামলাম, আমরা তখন পুয়েব্লো থেকে ছয় কি আট মাইলের মধ্যে। আবার রওনা হয়ে আমরা পথে নতুন চিহ্ন দেখে বুঝলাম একজন ঘোড়-সওয়ার সদ্য বেরিয়েছে আমাদের পরিদর্শন করে যেতে। সে আমাদের তাঁবুকে আধা প্রদক্ষিণ করে পূর্ণবেগে পুয়েব্লোতে ফিরে গেছে। আমাদের কাছে সে এলো না কেন, কেন দেখা না করেই পালিয়ে গেল, তা বুঝলাম না। এক ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি পাহাড়ের কিনারায় এসে একটি প্রিয় দৃশ্য দেখলাম। দেখলাম আর্কেনসাস নদী বয়ে চলেছে নীচেকার উপত্যকার পাশ দিয়ে, বন আর ঝোপের মধ্য দিয়ে, আর প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র এবং পশুচারণের সবুজ মাঠের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে পুয়েব্লো কেল্লার নীচু মাটির দেয়ালগুলো।

একবিংশ অধ্যায়

পুয়েব্লো এবং বেণ্ট-এর কেল্লা

আমরা পুয়েব্লো কেল্লার গেটের সম্মুখীন হলাম। এটি একটি বিশ্রী ধরনের কেল্লা, মান্ধাতার আমলের কায়দায় তৈরি। বড় একটি সমচতুষ্কোণ চারদিকে মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা ; দেয়ালগুলিও বিশ্রীরকম ফেটে গেছে, ভেঙে পড়ছে। গেটের দরজা যে খুঁটিগুলোর ওপর ভর করে ছিল সেগুলো আধভাঙা ; গেটটা কাঠের কব্জার ওপর এমন আল্‌গা হয়ে ঝুলছিল যেন একটু জোরে খুলতে বা বন্ধ করতে গেলেই সেটা একেবারে খুলে পড়বে। দু'-তিনজন নোংরা মেক্‌সিকান, মাথায় চওড়া টুপি আর নীচ চেহারার বিশ্রী গোঁফদাড়িওয়ালা মুখ নিয়ে কেল্লার সামনে নদীর ধারে বিশ্রাম করছিল। আমাদের আসতে দেখেই তারা সরে পড়ল, এবং আমরা যখন গেট পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম তখন একটি হাল্‌কা, চট্‌পটে, ছোট্ট মানুষ আমাদের দেখে এগিয়ে এলো। দেখলাম সে আমাদের পুরোনো বন্ধু রিচার্ড। সে লারামি কেল্লা থেকে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে টাওসে চলেছিল ; কিন্তু পুয়েব্লো কেল্লায় পৌঁছে সে দেখল যুদ্ধের জন্য সে আর অগ্রসর পারবে না। তাই সে শান্তভাবে এখানেই অপেক্ষা করছিল, দেশটা বিজিত হয়ে গেলেই আবার রওনা হতে পারবে বলে। এখানে থাকতে এখানকার কর্তব্য পালন করাই উচিত মনে করে সে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের হাত ধরে নেড়ে দিল, তারপর ভেতরে এগিয়ে নিয়ে চলল।

এখানে দেখলাম তার বড় বড় সাণ্টা-ফে ওয়াগনগুলি একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটি ইণ্ডিয়ান আর স্পেনদেশীয় স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি মেক্‌সিকান অলসভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। এই জায়গাটির মতোই তাদের চেহারাও বিশ্রী, দীনহীন। রিচার্ড আমাদের নিয়ে গেল পুয়েব্লো কেল্লার প্রধান ঘরে। ঘরটি ছোট, মাটির তৈরি ; মোটের ওপর বেশ ছিমছাম। দেয়ালে ঝুলানো একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি, একটি আয়না, কুমারী মেরীর একটি ছবি আর একটি মরচে-ধরা পিস্তল। ঘরে একটিও চেয়ার ছিল না, কিন্তু তার বদলে ছিল কতকগুলো সিন্দুক আর বাক্স সাজানো। এর পিছনে আরেকটা ঘর ছিল, সেটার সাজসজ্জা এর চাইতে কম। এখানে ছিল তিন-চারটি স্পেনদেশের মেয়ে, তাদের ভেতর একটি দেখতে বেশ সুন্দরী। এরা এক কোণে মাটির উনুনে পিঠে ভাজছিল।

তারা একটা পঞ্চো (মেক্সিকো দেশে পুরুষদের পরবার হাতাহীন জামা) বার করে মেঝের ওপর পেতে দিল—খাবার টেবিলের ওপর যেমন করে টেবিল-ক্লথ পাতা হয়। তার ওপর যে খাবার সাজানো হলো তা দেখে আমাদের বেশ উপাদেয় বলেই মনে হলো। সাজানো খাবারের চারদিকে মহিষ-চর্মের পোশাক ভাঁজ করে করে পেতে দেওয়া হলো অতিথিদের জন্য। আমরা ছাড়াও আরো দু'-তিনজন আমেরিকান ছিল অতিথিদের মধ্যে। আমরা তুর্কী ভঙ্গিতে বসলাম, আর খবর জানতে চাইলাম। রিচার্ড বলল হপ্তা তিনেক আগে জেনারেল কিয়ার্নির সৈন্যবাহিনী বেণ্ট-এর কেল্লা ছেড়ে সাণ্টা ফে-র বিরুদ্ধে রওনা হয়ে গেছে ; সর্বশেষ খবর পাওয়া গিয়েছিল সেই বাহিনী একটি গিরিপথের কাছাকাছি এসে গেছে, যে গিরিপথ বেয়ে শহরটিতে পৌছানো যায়। একজন আমেরিকান একটি নোংরা খবরের কাগজ বার করল, তাতে পালো আল্টো আর রেস্কা ডি লা পামা-র যুদ্ধের খবর ছিল। আমরা এবিষয়ে আলাপ করছি, এমন সময় টলতে টলতে দরজা জুড়ে এসে দাঁড়াল একটি লম্বা লোক, দু'হাত দু'পকেটে ঢুকিয়ে, আর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে। তার পরনে বাদামী সাদাসিধা কাপড়ের প্যাণ্ট, তা থেকে দুটো পা-ই অনেকখানি বেরিয়ে আছে, আর তার কোমরবন্ধের সঙ্গে আটকানো রয়েছে একটি পিস্তল আর একটি বড় ছুরি। একটি বিরাট কাপড়ের ব্যাণ্ডেজে ঢাকা পড়েছে তার মাথা আর একটি চোখ। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে-নেওয়া শেষ করে সে জবুথবুভাবে এসে একটা সিন্দুকের ওপর বসে পড়ল। এরপর ঐ ধরনেরই আরো আট-দশজন লোক বেশ ঠাণ্ডাভাবে এসে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল আর আমাদের দিকে নজর দিতে লাগল। ওরা যেন আমাদের জোর করেই মনে করিয়ে দিল অরিগন-অভিযাত্রীদের কথা, যদিও এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক দলের চোখে এক বিশেষ ধরনের ঝক্মকানি ছিল, আর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখবার বিশেষ ভঙ্গি, আমাদের সেই প্রেয়ারির সঙ্গীদের সঙ্গে এইখানেই এদের প্রভেদ। এরা আমাদের জেরা করতে শুরু করল—আমরা কোথা থেকে এসেছি, এরপর কী করব, আমাদের জীবনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বা কী।

মাথায়-ব্যাণ্ডেজ-করা লোকটির কয়েকদিন আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সে যাচ্ছিল নদীতে জল আনতে নীচু জমির ওপর দিয়ে কচি উইলো গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে ডালপালা দু'হাতে ঠেলে সরাতে সরাতে। হঠাৎ অজানিতে সে একটা ধূসর ভালুকের ওপরে এসে পড়েছিল। ভালুকটা সবেমাত্র একটি মহিষ ভক্ষণ করে খাওয়াটা হজম করবার জন্য শুয়ে একটু ঘুমের চেষ্টা করছিল। ভালুকটা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে

উঠে এই ঘুম-ভাঙানিয়া আগন্তুকটির মাথায় এমন একখানা চাঁটি মারল যে, বেচারার কপালের মাথার সম্মুখভাগের অনেকখানি চামড়া উঠে গেল, আর একটা চোখ একটুর জন্য বেঁচে গেল। লোকটির ভাগ্য ভালো যে, ভালুকটার পেট একটু অতিরিক্ত ভর্তি ছিল বলে তার মেজাজটা তখন খুব ঝগড়াটে ছিল না। লোকটির সঙ্গীরা ছিল অল্প পিছনে। তারা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। ভালুকটা ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল, যাবার পথে উইলো গাছগুলিকে অবহেলায় পায়ে দলে।

এই লোকগুলি মর্মনদের একটি দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য দেশান্তর-যাত্রীদের সম্পর্কে এদের মনে বিশেষ ভয় আছে, এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। এই কারণেই অন্যান্য সবাই রওনা হয়ে যাবার আগে তারা উপনিবেশ ত্যাগ করে বেরোয়নি। এই দেরির ফলেই তারা যখন লারামি কেল্লায় এসে পৌছল, তখন তাদের ক্যালিফর্নিয়া অভিমুখে আরো এগিয়ে চলার পক্ষে বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে। আর্কেনসাসের মাথায় ভালো জমি আছে শুনে তারা রিচার্ডের সঙ্গে চলে এসেছে, আর এখন পুয়েব্লো কেল্লার আধ মাইল দূরে একটি জায়গায় এই শীতকালটা কাটাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

আমরা যখন রিচার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন সূর্য প্রায় অস্তাচলে। গেট থেকে বেরিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পেলাম আর্কেনসাসের ছোট্ট উপত্যকাটি। দৃশ্যটি অপরূপ, বিশেষ করে এতদিন একটানা মরু আর পাহাড় দেখে দেখে বিরক্ত আমাদের চোখে। নদীটির ধারে ধারে উঁচু গাছের বন, দু'ধারে সবুজ মাঠ। সরু উপত্যকার কিনারায় নদীর উঁচু খাড়া পাড়ের ওপর এসে পড়ছে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভা। একজন মেক্‌সিকান ঘোড়সওয়ার একপাল গবাদি পশু তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল গেটের দিকে। মাঠে একটা গাছের তলায় আমাদের সাদা তাঁবুটাও ছিল সুন্দর দৃশ্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। আমরা তাঁবুতে পৌছে দেখলাম রিচার্ড একজন মেক্‌সিকানকে দিয়ে আমাদের জন্য যথেষ্ট কাঁচা শস্য আর শাকসব্‌জি পাঠিয়ে দিয়েছে, আর তার মারফত নিমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের যখন যেমন দরকার শস্য আর শাকসব্‌জি আমরা যেন এই কেল্লার চারদিকের ক্ষেত আর মাঠ থেকে ইচ্ছামতো তুলে নিই।

বাসিন্দারা সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকত আমাদের চাইতে দুর্দান্ত ভক্ষকদল এসে পাছে হানা দেয়। প্রত্যেক বছর যখন ফসল পাকবার সময় হয় তখনই কয়েক হাজার আরাপাহো এসে পুয়েব্লোর চারদিকে তাঁবু ফেলে। মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরা এই বর্বর বাহিনীর হাতের মুঠোয়, কাজেই তারা বাধ্য হয়ে এই বর্বরদের বেশ ভালো-ভাবেই অভ্যর্থনা করে বলে সমস্ত ফসল সম্পূর্ণ তাদেরই হাতে, ওরা এ-নিয়ে যা খুশি

করতে পারে। আরাপাহোরা এ-কথা সঙ্গে-সঙ্গেই মেনে নেয়, ফসলগুলো নিজেদের সম্পত্তি বলেই ভেঁবে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তারপর তাদের ঘোড়াগুলোকেও চরে খাবার জন্য ছেড়ে দেয় ফসলের ক্ষেতে। যাই হোক, তাদের এইটুকু দূরদৃষ্টি আছে যে ফসলের যথেষ্ট অংশ তারা শ্বেতাঙ্গদের জন্য রেখে যায় যেন তারা আবার আগামী বসন্তের জন্যেও নতুন ফসল ফলায়।

পৃথিবীর এই অংশের মানবজাতি তিন ভাগে বিভক্ত। গুণানুসারে তারা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ, ইণ্ডিয়ান এবং মেক্সিকান। শেষোক্তদের আমি 'শ্বেতাঙ্গ' বলতে কোনো-মতেই রাজী নই।

সে-সন্ধ্যার সূর্যাস্তটি চমৎকার হলেও পরদিনের ভোরবেলাটা অত্যন্ত নিরানন্দ মনে হলো। একনাগাড়ে বৃষ্টি হতে লাগল, মনে হলো মেঘগুলো যেন এসে গাছের মাথায় ঠেকেছে। আমরা স্রোত পেরিয়ে মর্মন উপনিবেশ দেখতে গেলাম। জলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় ওধার থেকে জলে নামল কয়েকজন ফাঁদপাতা শিকারী। তাদের হরিণ-চর্মের তৈরী জামাগুলো বৃষ্টিতে ভিজে চপ্‌চপে হয়ে তাদের গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে, আর ফোঁটায় ফোঁটায় জল নেমে আসছে তাদের মুখের ওপর দিয়ে, বন্দুকের ডগা থেকে, আর তাদের জিনের সঙ্গে বাঁধা ফাঁদগুলো থেকে। তাদের আর তাদের ঘোড়াগুলোর ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে আমরা হেসে ফেললাম, ভুলে গেলাম এককালে আমাদের অবস্থাও ঠিক ওদের মতোই হয়েছিল।

ঘোড়া ছুটিয়ে আধঘণ্টা বাদে আমরা দেখতে পেলাম মর্মনদের সাদা ওয়াগনগুলি গাছের ঝোপের ভেতর সারি বেঁধে রাখা হয়েছে। কুড়ুল চালাবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, গাছের পর গাছ কাটা পড়ছিল, বনের ধারে আর মাঠের ওপর খাড়া হয়ে উঠছিল কাঠের গুঁড়ির তৈরী কুটিরের পর কুটির। আমরা এসে পড়তেই মর্মনরা কাজ থামিয়ে এসে আমাদের ঘিরে বসল কাটা গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর, তারপর আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করতে শুরু করে দিল; তাদের ধর্ম যারা মানে না তাদের কাছ থেকে তারা যে দুর্ব্যবহার পেয়েছে সে-সম্বন্ধেও নালিশ জানাল; আর নাউভূ-তে তাদের মহান মন্দিরটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করল। তাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা থেকে আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। এই অন্ধ আর বেপরোয়া ধর্মান্ধ আপদগুলোর জঘন্য উপস্থিতি থেকে যে আমাদের উপনিবেশ রেহাই পেয়েছে, সেজন্য খুশী বোধ করলাম।

পরদিন ভোরবেলা আমরা পুয়েব্লো কেল্লা ছেড়ে বেণ্ট-এর কেল্লার দিকে রওনা হলাম। রেমণ্ডের আচরণ কিছুদিন ধরেই একটু কেমন-কেমন হয়ে উঠেছিল, তাই

পুয়েব্লোতে পৌছেই ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কাজেই আমাদের দলে আমরা এখন মোট চারজন হলাম। এরপর আমরা কোন্ পথ ধরব সে-বিষয়ে একটু অনিশ্চয়তা ছিল। বেণ্ট-এর কেল্লা থেকে উপনিবেশ পর্যন্ত পথ হিসেব করা হয়েছিল ছ'শো মাইল। এসময় সে-পথ ছিল ভয়ানক রকম বিপদসঙ্কুল। কারণ এ-পথ দিয়ে জেনারেল কিয়ার্নির সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর বহুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী ইণ্ডিয়ান, প্রধানতঃ পনী এবং কামাঞ্চে গোষ্ঠীর, এ পথের বিভিন্ন স্থানে জমা হয়েছিল। শীঘ্রই তারা এত বেশীসংখ্যক আর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল যে, কেল্লা আর সীমান্তের মধ্যবর্তী পথে চলাচল করতে গিয়ে কোনো একটি যাত্রীদল, সে দল যত বড়ই হোক না কেন, এই ইণ্ডিয়ানদের শত্রুতার কোনো-না-কোনো রকম নিদর্শন না পেয়ে ফেরেনি। তখনকার খবরের কাগজে এই অবস্থার অনেক বিবরণ রয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের অনেক লোক মেরেছিল, অনেক ঘোড়া আর অশ্বতর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। একজন যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যে শরৎকালে সাণ্টা ফে থেকে বেণ্ট-এর কেল্লায় এসেছিল। এসে সে দেখেছিল একটি দলে সত্তরজন লোক, তারা এত অল্পসংখ্যক বলে উপনিবেশের দিকে রওনা হতে সাহস পাচ্ছে না, অপেক্ষা করছে দলের লোকবল-বৃদ্ধির জন্য। যদিও এই ধরনের অত্যধিক ভীরুতা ওদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তবু এ থেকে বোঝা যায় ওদেশে পরিস্থিতিটা কিরকম আতঙ্কময় ছিল। অগাস্ট মাসে আমরা যখন ওখানে ছিলাম, তখনো বিপদটা এত বড় হয়ে ওঠেনি। আশেপাশে তেমন আকর্ষণীয় বা লোভনীয় কিছু ছিল না। তাছাড়া আমাদের এও মনে হয়েছিল যে শীতকালের আধাআধি ওখানে কাটালেও আমাদের সঙ্গে যাবার লোক পাওয়া যাবে না, কারণ রিচার্ডের মুখে শুনলাম, সাবলেট আর অন্যান্য যাদের ওপর ভরসা করেছিলাম তারা ইতিমধ্যেই বেণ্ট-এর কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে। এতদূর পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথে ভাগ্যদেবী বরাবরই আমাদের সহায় হয়েছেন। আমরা তাই ঠিক করলাম এবারও তাঁরই করুণার ওপর ভরসা রেখে রওনা হবো হেনরি আর ডেস্‌লরিয়ার্সকে সঙ্গে নিয়ে, আর ইণ্ডিয়ানদের মধ্য দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এগিয়ে যাবো।

বেণ্ট-এর দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে, পুয়েব্লো কেল্লার পঁচাত্তর মাইল নীচে। তৃতীয় দিনের দুপুরবেলা আমরা ঐ কেল্লার তিন কি চার মাইলের মধ্যে পৌছলাম, একটি গাছের তলায় তাঁবু ফেললাম, গাছের গুঁড়ির গায়ে আয়নাগুলোকে হেলান দিয়ে রেখে কোনোরকমে গোঁফদাড়ি কামিয়ে নিয়ে কেল্লার দিকে রওনা হলাম। শীগ্‌গীরই কেল্লাটি দৃষ্টিগোচর হলো, কারণ এ কেল্লা দেখা যায় অনেকদূর থেকে;

রৌদ্রদগ্ধ সমতলভূমির ওপর দেখা যাচ্ছে কেল্লার উঁচু মাটির দেয়ালগুলি। মনে হচ্ছিল যেন এ অঞ্চলে সম্প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল। কেল্লার চারধারে কয়েক মাইলের ভেতরকার মাঠে মাঠে ঘাসগুলো খেয়ে খেয়ে ছোট করে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল জেনারেল কিয়ার্নির সেনাবাহিনীর ঘোড়াগুলি। আমরা যখন কেল্লায় এলাম তখন দেখলাম শুধু যে ঘোড়াগুলোই সব ঘাস খেয়ে সাবাড় করে গেছে তাই নয়, তাদের মালিকরাও এই ছোট্ট ব্যবসা-ঘাঁটিটির ভাণ্ডারে যা-কিছু ছিল প্রায় সবই হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ফলে আমাদের ঘরে ফেরার পথে যে ক'টি জিনিস দরকার তাও যোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হলো। সৈন্যেরা চলে গেছে, কোলাহল চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে নীরবতা; কেল্লা বিষণ্ণ, নীরব, প্রাণহীন। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেডাচ্ছে জনাকয়েক অশক্ত, ইন্‌ভ্যালিড সেনানী ও সৈনিক। চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক কেল্লার সাদা দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে এসে কেল্লার প্রাঙ্গণটির আবহাওয়াটিকে বিশ্রী গরম করে তুলেছে। কেল্লার মালিকেরা অনুপস্থিত। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন মিস্টার হোল্ট্‌; মালিকেরা এঁর ওপরই কেল্লার দায়িত্বভার অর্পণ করে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের আহারে নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা পরমানন্দে দেখলাম চমৎকারভাবে সাদা কাপড়ে খাবার টেবিল ঢাকা হয়েছে, কয়েকটি গুঁড়ো মশলার পাত্র রাখা হয়েছে মাঝখানে, আর টেবিলের চারধারে চেয়ার সাজানো। এমন খাওয়া অনেকদিন খাইনি। তৃপ্তি নিয়ে তাঁবুতে ফিরলাম।

তাঁবুতে রাত্রের আহার সেরে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করছি, এমন সময় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখতে পেলাম তিনটি লোক কেল্লার দিক থেকে এইদিকেই আসছে। তারা ঘোডায় চডে এসে আমাদের কাছেই মাটিতে বসে পড়ল। আগে আগে যে লোকটি এলো সে বেশ লম্বা, সুগঠিতদেহ; এবং তার চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে তার ওপর আস্থা জাগে। তার মাথার ফেল্‌টের তৈরী টুপিটা তুমড়ানো, ছিন্নভিন্ন; গায়ে হরিণ-চর্মের জামা, হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার আবরণী, তার ওপরে পাহাডী হল্‌দে মাটির প্রলেপ মাখানো। তার এক পায়ের মোকাসিনের পিছনে লাগানো লোহার তৈরী একটা মস্ত নাল, তার মাথায় পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাক্তি। তার ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পিঠে একটা সাদামাটা ধরনের মেক্‌সিকান জিন, জিনের ওপর একটা লোমযুক্ত ভালুকের ছাল। জিনের দু'ধারে ঝুলানো কাঠের রেকাব দুটিও বিদ্‌ঘুটে রকমের বড়। পরের লোকটি বেশ প্রাণবন্ত, চট্‌পটে ছোটখাটো মানুষ, প্রায় সওয়া পাঁচ ফুট লম্বা; ছোটখাটো হলেও

বেশ বলবান, শক্ত শরীর তার। তার মেক্‌সিকানদের মতোই কালো মুখ জুড়ে কুঞ্চিত কালো গোঁফদাড়ি; মাথায় জড়িয়ে বাঁধা একটা পুরোনো তেল-চট্‌চটে ক্যালিকো কাপড়ের রুমাল, এবং তার আঁটসাঁট হরিণ-চর্মের পোশাক চর্বি লেগে আর রুক্ষ ব্যবহারের ফলে চক্‌চকে। সর্বশেষে যে এলো সে-লোকটা বিরাটকায় পালোয়ান, সীমান্ত এলাকার সাদাসিধে কাপড়ের তৈরী পোশাক পরা। সে তার লম্বা দেহটাকে লম্বা পা ফেলে ফেলে বয়ে নিয়ে এলো যেন পরম আলস্যভরে। তার দুটি ধূসর চোখ যেন তন্দ্রাভরা, চিবুক হ্রস্ব, মুখ খোলা, ওপরের ঠোঁটটা সামনে বাড়ানো; সব মিলিয়ে তার চেহারায় কেমন একটা পরম আলস্যে ভরা অসহায় ভাব। অস্ত্র-হিসেবে তার সঙ্গে ছিল একটি পুরোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারী বন্দুক। এই দুর্দান্ত বন্দুকটির সাহায্যে সে কখনো লক্ষ্য-ভেদ করতে না পারলেও পয়লা-নম্বরের আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে সেটি ছিল তার পরম প্রিয়।

প্রথম দুটি লোক সম্প্রতি এসেছে ক্যালিফর্নিয়া থেকে একটি দলের সঙ্গে। দলটির সঙ্গে ছিল মস্ত একদল ঘোড়া, সেগুলো তারা বেণ্ট-এর কেল্লায় বিক্রি করে এসেছে। দুজনের ভেতরে যে বেশী লম্বা, তার নাম মানরো, সে এসেছে আইওয়া থেকে। লোকটি ভারি চমৎকার, দিলখোলা, সহৃদয়, বুদ্ধিমান। খাটো লোকটির নাম জিম গার্নি। সে ছিল বোস্টনের একজন নাবিক, এসেছিল একটি বাণিজ্য-জাহাজে চড়ে ক্যালিফর্নিয়ায়। সেখানে এসে তার ঝোঁক চেপেছিল জাহাজে না ফিরে, ফিরবে স্থলপথে। এই ভ্রমণের ফলে সে পাহাড়ে চড়তে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল, আর নাবিক হয়েও ঘোড়াকে পোষ মানানো আর ইচ্ছামতো চালানোর ব্যাপারে সে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছিল। আমাদের তিন-নম্বর আগন্তুকটির নাম এলিস। সে মিজুরি-অধিবাসী। সে এসেছিল একদল অরিগন-অভিযাত্রীর সঙ্গে, কিন্তু ব্রিজারের কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছেই বাড়ির জন্য—অথবা, জিমের ভাষায়, প্রেমের জন্য—তার মন কেমন-কেমন করতে শুরু করল। ফলে সে ঠিক করল ক্যালিফর্নিয়ার লোকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গেই দেশের দিকে রওনা হবে।

তারা অনুরোধ জানাল তারা যেন আমাদের দলে যোগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে উপনিবেশের পথে যাত্রা করতে পারে। আমরা সঙ্গে-সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম, কারণ প্রথম দুজনের চেহারা দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল, এবং আমাদের দলের এমন চমৎকার শক্তিবৃদ্ধিতে আমরা খুবই খুশী হলাম। তাদের বললাম তারা যেন আগামী সন্ধ্যায় নদীর গতিপথ ধরে কেল্লার মাইল ছয়েক দূরে নদীর ধারে একটি জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আমাদের সঙ্গে ধূমপান করে আমাদের নতুন বন্ধুরা বিদায় নিল। আমরা শুয়ে পড়লাম ঘুমোতে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

লাল-মাথা স্বেচ্ছাসৈনিক

পরদিন ভোরে ডেস্‌লরিয়ার্সকে বললাম তার গাড়িটি নিয়ে আমাদের মিলিত হবার জন্য নির্ধারিত জায়গায় চলে যেতে। বলে আমরা আবার কেল্লায় এলাম ভ্রমণের জন্য কতকগুলো ব্যবস্থা করতে। এগুলো ঠিক করার পর আমরা গাড়িবারান্দা-গোছের একটি জিনিসের তলায় বসে কয়েকজন শীয়েন ইণ্ডিয়ান পেয়ে তাদের সঙ্গে ধূমপান করলাম। কয়েক মিনিটের ভেতরে আমরা দেখলাম অদ্ভুত একটি মানুষ সামরিক পোশাক পরে আমাদের কাছে এলো। তার মুখখানা ছোট আর গোল, চোখের চারদিকে কুঞ্চন-রেখা, যাকে চল্‌তি ভাষায় বলে 'কাকের পা', আর মাথায় কোঁকড়ানো লাল চুলের প্রাচুর্য, তার ওপর ছোট্ট একটি টুপি চাপানো। মোটের ওপর লোকটির চেহারা দেখে মনে হয় প্রেয়ারি অঞ্চলে কাজের ঝক্কি-ঝঞ্চাটের চাইতে সে বরং বাবুর্চীর কাজের পক্ষেই যোগ্যতর। সে এসে আমাদের মিনতি জানাল আমরা যেন তাকে আমাদের সঙ্গে উপনিবেশে নিয়ে যাই ; সেখানেই তার ঘরবাড়ি। সে বলল আমাদের সঙ্গে ফিরতে না পারলে তাকে সারা শীতটাই এই কেল্লায় কাটাতে হবে। লোকটার চেহারা আমাদের এত অপছন্দ হলো যে আমরা এক অজুহাত দিয়ে ওর আর্জি নামঞ্জুর করে দিলাম। তাতে সে এমন করুণভাবে আমাদের দয়া ভিক্ষা করতে লাগল, আর বেচারাকে এমন হতাশ আর বিমর্ষ দেখাল যে, মনের ভেতরে নানা খুঁতখুঁতি থাকলেও আমরা শেষটায় রাজী হলাম।

আমাদের দলের এই নতুন লোকটির প্রকৃত নামটা উচ্চারণ করা আমাদের ফরাসী অনুচরদের পক্ষে সম্ভব হলো না। হেনরি শ্যাটিলন কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করে একদিন বেশ ঠাণ্ডামাথায় লোকটির লাল চুলের সম্মানে তার নাম দিল 'লাল মাথা'। লোকটি বিভিন্ন সময়ে মিসিসিপি নদীর বুকে একটি স্টীমবোটে কেরানী এবং নাউভূ-তে একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট ছিল ; এছাড়াও অন্যান্য নানা রকমের কাজ সে করেছে, আর প্রত্যেক চাকরিতেই সে এত বেশী 'জীবন' দেখেছে যে অতটা তার সয়নি। বসন্তকালে সে সেণ্ট লুইসের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এই আশায় যে গ্রীষ্মকালের অভিযানটা বেশ উপভোগ্য হবে।

'লাল-মাথা বলল, "আমরা ছিলাম তিনজন—আমি, বিল স্টিফেন্‌স্ আর জন

হপ্‌কিন্‌স্‌। আমরা ভেবেছিলাম সেনাবাহিনীর সঙ্গে যাবো, তারপর দেশটা জয় করা হয়ে গেলেই ছাড়া পাবো, আর মাইনেটি পকেটে গুঁজে, বুঝলেন কিনা, সোজা মেক্‌সিকো চলে যাবো। শোনা যায় সেখানে নাকি ভারি মজা। ভেবেছিলাম সেখান থেকে ভেরা-ক্রুজ হয়ে নিউ অর্লিয়েন্‌স্‌ যাবো।"

কিন্তু অন্যান্য অনেক আরো সাহসী স্বেচ্ছাসৈনিকের মতোই, লাল-মাথা বুঝতে পারেনি কত ধানে কত চাল। মেক্‌সিকানদের সঙ্গে লড়াইটা দেখা গেল সে যত মজার ব্যাপার ভেবেছিল তত মজার নয়। তার প্রমোদ-ভ্রমণটি প্রমাদ-ভ্রমণে পরিণত হলো, সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তার মগজেরই গোলমাল দেখা দিল। তার ভ্রমণের বাকি অংশটা সে মালপত্রের ওয়াগনের ঝাঁকানি খেতে-খেতেই চলল। বাহিনী কেল্লায় এসে তাকে এখানেই রেখে চলে গেল আরো দু'-চারজন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু বেণ্ট-এর কেল্লায় অসুস্থ অশক্তদের রাখবার ভালো বন্দোবস্ত নেই। লাল-মাথাকে রোগশয্যায় যে ঘরে রাখা হলো আরেকজন রোগীর সঙ্গে, যার ব্যামোও তারই মতো, সে-ঘরটি একটি ছোট মেটে-ঘর, আর বিছানা বলতে শুধু মেঝের ওপর বিছানো মহিষ-চর্মের পোশাক। সহকারী ডাক্তারের প্রতিনিধি দিনে একবার এসে তাদের দেখে যেত, আসবার সময় নিয়ে আসত এদের প্রত্যেকের জন্য বেশ ভারী একমাত্রা ক্যালোমেল। রোগী দুটির মধ্যে যেটি বেঁচে ছিল, তার ধারণা ঐ প্রতিনিধি ডাক্তারটি পৃথিবীতে শুধু একটি ওষুধই জানতেন—ক্যালোমেল।

লাল-মাথা এক ভোরবেলায় জেগে দেখল তার সঙ্গীটি কড়িকাঠের দিকে মরা মানুষের মতো অপলক চোখে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। দেখেই সে সংজ্ঞা হারাল। যাই হোক, ঐ ডাক্তারের চিকিৎসা সত্ত্বেও সে বেঁচে উঠল, যদিও মস্তিষ্ক-জ্বর আর ক্যালোমেলের যুগ্ম-ধাক্কায় তার মনের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে অতি শোচনীয়। বেচারার অভিজ্ঞতার কাহিনী অত্যন্ত করুণ, কিন্তু ওর চেহারাটাই এমন হাস্যকর, এবং তার সামরিক পোশাকের সঙ্গে তার রীতিমতো অসামরিক আচরণ এমন বেমানান, যে আমরা না হেসে পারিনি। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তার বন্দুক আছে কিনা। সে বলল তার অসুখের সময় তার কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই বন্দুকটা তার কাছে নেই—"কিন্তু", সে বেশ মিনতি করেই বলল, "পথে যদি ইণ্ডিয়ানদের মুখোমুখী পড়ে যাই তাহলে আপনি আমায় আপনার একটা বড় পিস্তল ধারে দেবেন নিশ্চয়!" তারপর প্রশ্ন করলাম তার ঘোড়া আছে কিনা। সে বলল—হ্যাঁ, তার একটা চমৎকার ঘোড়া আছে। শ-র অনুরোধে একজন মেক্‌সিকান সেটিকে আমাদের পরীক্ষার জন্য নিয়ে এলো। দেখলাম কাঠামোটা

ভালো ঘোড়ারই বটে, কিন্তু দুটো চোখই কোটরগত আর পাঁজরের হাড়গুলো একটি একটি করে গোনা যায়। বেচারার কাঁধের কাছাকাছি কতকগুলো বিশেষ রকমের চিহ্নও ছিল। সে চিহ্নের কারণ এই হতে পারে যে লাল-মাথার অসুখের সময় তার সঙ্গীরা এই ঘোড়াটিকে ধরে আরো কয়েকটি মাল-টানা ঘোড়ার সঙ্গে একটা কামান টানবার জন্য জুড়ে দিয়েছিল। আমরা লাল-মাথাকে বললাম এই ঘোড়াটার সঙ্গে বিনিময় করে একটা অশ্বতর নিতে; শুনে লাল-মাথা একটু বিস্মিত হলো। ভাগ্যক্রমে কেল্লার লোকেরা এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এত উৎসুক ছিল যে, সেজন্য তারা কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজী। ফলে এই রুগ্ন ঘোড়াটারই বিনিময়ে লাল-মাথা একটা মোটামুটি ভালো অশ্বতর পেলো।

শীগ্‌গীরই একটি লোক দড়ি ধরে একটা অশ্বতর নিয়ে এলো গেটের সামনে। দড়িটি সে লাল-মাথার হাতে দিল। লাল-মাথা এই নতুন-পাওয়া জানোয়ারটির ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত, তাই জানোয়ারটিকে কাছে আসবার জন্য নানা কায়দায় খোসামোদ করতে লাগল। অশ্বতরটি বুঝতে পারল সে এগিয়ে আসবে এইটেই আশা করা হচ্ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের মতো অটল হয়ে, অচল দৃষ্টিতে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে। পিছন থেকে একটা ঘা খেয়ে সে এগোতে রাজী হলো বটে, কিন্তু এগোতে এগোতে একেবারে কেল্লার অপরদিকে গিয়ে থামল। যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, তাদের হাসি শুনে লাল-মাথা প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে দড়িতে বেশ জোরে টান মারল। অশ্বতরটি সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁকানি মেরে উল্‌টো দিকে ঘুরে গিয়ে গেটের দিকে ছুট লাগাল। লাল-মাথা এমন শক্ত করে দড়িটা ধরে ছিল যে দড়ির টানের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হাওয়ার ওপর লাফাতে লাফাতে কিছুদূর গিয়ে তারপর দড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে লাগল অশ্বতরটির দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে। অশ্বতরটি প্রেয়ারির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলল। একজন মেক্‌সিকান ঘোড়ায় চড়ে একটা 'ল্যাস্‌সো' (ফাঁসওয়ালা লম্বা একগাছা দড়ি) নিয়ে ওর পিছু ধাওয়া করে কিছুক্ষণের ভেতরই ওকে ধরে নিয়ে এলো।

প্রেয়ারি-ভ্রমণে তার বিস্ময়কর দক্ষতার এই পরিচয়গুলো দিয়ে তারপর লাল-মাথা ব্যস্ত হলো ভ্রমণপথের জন্য রসদ-সংগ্রহে। এই উদ্দেশ্যে সে আবেদন জানাল রসদ-সরবরাহ-বিভাগের একজন কর্মচারীর সহকারীর কাছে। এই লোকটির মুখে ছিল রুষ্ট ভাব, সেনাবাহিনী তাকে ফেলে চলে গেছে, এইজন্যে তার রাগ। যাই হোক, কেল্লার বাকি সবার মতোই সেও কেল্লা থেকে লাল-মাথাকে ভাগাতে

পারলে খুশী। তাই একটা মরচে-ধরা চাবি বার করে সে একটা নীচু দরজা খুলল, আর সেই দরজা দিয়ে সে লাল-মাথাকে নিয়ে আধা মাটির তলায় একটা ঘরে নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে তারা যখন উঠে এলো তখন চল্লিশ দিনের খোরাকের মতো বিভিন্ন রকম জিনিসের অনেকগুলো কাগজের প্যাকেট নিয়ে লাল-মাথা বিষম বিব্রত। এগুলো ডেস্‌লরিয়ার্সের জিম্মায় দিয়ে দেওয়া হলো। সে তখন আমার কথামতো আমাদের গাড়ি নিয়ে রওনা হচ্ছিল যে জায়গায় গিয়ে আমাদের মানরো এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা।

এরপর আমরা লাল-মাথাকে বললাম সম্ভব হলে একটা বন্দুক যোগাড় করে নিতে। সে তখন কেল্লার বিভিন্ন ব্যক্তির বদান্যতার কাছে আবেদন জানাতে লাগল, কিন্তু তাতে কোনো সুফল ফললো না। অবশ্য এতে আমরা বিশেষ দুঃখিত হলাম না, কারণ বন্দুক পেলেও পথে কোনো সংঘর্ষ বাধলে ঐ বন্দুক দিয়ে সে শত্রুর চাইতে খুব সম্ভব ওর নিজের বা আমাদের ক্ষতিই বেশী করত।

ব্যবস্থা সব ঠিক করা হলে পর আমরা আমাদের ঘোড়ায় জিন পরালাম। কেল্লা ছেড়ে রওনা হবো, এমন সময় দেখলাম আমাদের নতুন সঙ্গীটি আবার ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। কেল্লার মাঝামাঝি জায়গায় একটি লোক ওর জন্য অশ্বতরটিকে ধরে ছিল, আর অশ্বতরটির পিঠে লাল-মাথা জিন পরাতে চেষ্টা করছিল কিন্তু জানোয়ারটার ছট্‌ফটানিতে পরাতে না পেরে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছিল। ওকে সাহায্য করে সব ঠিক করে দেওয়া গেল। অবশেষে অনেক কায়দা করে লাল-মাথা উঠে বসল সেই কালো জিনটার ওপর, যার ওপর বসে মেক্‌সিকানদের সৈন্যদলের হৃদয়ে তার ত্রাসের সঞ্চার করার কথা ছিল। জিনের ওপর বসে অশ্বতরটাকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিল লাল-মাথা।

অশ্বতরটি ধীর পদক্ষেপে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে লাল-মাথা এমনই ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল যে, জানোয়ারটার গায়ে চাবুক এতটুকু ছোঁয়াতেও সাহস করল না লাল-মাথা। আমরা আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট সমাবেশ-স্থান অভিমুখে এগিয়ে চললাম। কিন্তু বেশিদূর যাবার আগেই আমরা দেখলাম লাল-মাথার অশ্বতরটি তার সওয়ারটিকে ঠিক চিনে ফেলেছে, এবং আর এক পা-ও না এগিয়ে পরম নির্বিকারভাবে ঘাস খাচ্ছে, লাল-মাথার কোনো প্রতিবাদেই কান দিচ্ছে না। আমরা তাই তার পিছনে চলে গিয়ে অশ্বতরটিকে তার আরোহী-সহ আমাদের আগে আগে ঠেলে নিয়ে চললাম। তারপর সন্ধ্যায় ঝাপ্‌সা অন্ধকারে দূরে দেখলাম আগুন জ্বলছে। আগুন ঘিরে রয়েছে মানরো, জিম আর এলিস। তাদের জিন,

পোঁটলা-পুঁটলি আর অস্ত্রাদি ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর, আর ঘোড়াগুলো খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে কাছাকাছি। আমাদের ছোট্ট গাড়িটা নিয়ে ডেস্‌লরিয়ার্স ও রয়েছে দেখলাম। আমরা গিয়ে আরেকটি আগুন জ্বাললাম এবং নতুন বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের সঙ্গে এসে কফি খেতে। তারপর অন্য দুজন যখন ওদের আগুনের ধারে ফিরে গেল, জিম গার্নি আমাদের আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নিজেরই মতো ছোটখাটো আর রোদ-বৃষ্টি-ঝড় ইত্যাদি সওয়া পাইপ টানতে লাগল বেশ জোরে জোরে।

সে বলল, "এখানে আমরা এই আটজন রয়েছি ; বরং ছ'জনই বলা যাক, কারণ ঐ এলিস, আর তোমার ঐ নতুন লোকটি, ও-দুজনকে বাতিলের মধ্যেই ধরা যাক। আমরা ঠিক চলে যাবো, কিচ্ছু ভাবনা কোরো না—অবশ্য কামাঞ্চেরা যদি কোনোরকম বেকায়দায় না ফেলতে পারে।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ইণ্ডিয়ান আতঙ্ক

আমরা উপনিবেশ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম ২৭শে অগাস্ট তারিখে। এর চেয়ে বেশী ছন্নছাড়া চেহারার ঘোড়সওয়ার দল উচ্চতর আর্কেনসাসের তীরে কখনো দেখা যায়নি। বসন্তে যে বড় আর চমৎকার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়েছিলাম, ফেরার পথে তাদের একটিও সঙ্গে নেই। তাদের স্থান আমরা পূরণ করেছিলাম প্রেয়ারির ঘোড়া দিয়ে, যারা অশ্বতরের মতো কষ্টসহিষ্ণু, আর তাদেরই মতো কুৎসিতও বটে। এই শেষোক্ত ঘৃণ্য জানোয়ারও আমাদের সঙ্গে কয়েকটা ছিল। তাদের শক্তি আর সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও তাদের ভেতর কয়েকটা কঠোর পরিশ্রমে আর খাদ্যের অপ্রাচুর্যের ফলে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ওদের একটিরও খুরে নাল পরানো ছিল না। তার ফলে ওদের পায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেকটি ঘোড়া আর অশ্বতরের গলা ঘিরে জড়ানো ছিল মহিষের চামড়ার পাকানো দড়ি, তাতে নিশ্চয়ই তাদের চেহারার বাহার খোলেনি। আমাদের জিন এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিও ক্ষয়ে আর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, অস্ত্রও হয়ে গিয়েছিল মরচে-ধরা আর ভোঁতা। সওয়ারদের পোশাক আর বাহনদের সাজ-সরঞ্জামের হাল হয়েছিল একই রকম, আর সারা দলের ভেতর সবচেয়ে দুরবস্থাপন্ন চেহারা ছিল আমার বন্ধুর এবং আমার।

শ-র গায়ে ছিল একটা পুরোনো লাল ফ্লানেলের শার্ট, সামনের দিকটা খুলে ঝুলে পড়েছে, বন্ধনী দিয়ে দেহের চারিদিকে ঘিরে বাঁধা ; আর আমার পরনে বন্য, পুরোনো হরিণ-চর্মের পোশাক।

এইভাবে, ভিখারীদের মতো সুখী আর নিরুদ্বেগ অবস্থায় আমরা দিনের পর দিন আর্কেনসাসের একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন তীর বেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। লাল-মাথা অনবরত জ্বালাতন করতে লাগল, কারণ তার অশ্বতরটিকে ধরা, তাকে জিন পরানো, অথবা অন্য কোনো কিছুই সে অন্যের সাহায্য ছাড়া করতে পারত না। আর রোজই তার একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিত, বাস্তব না কাল্পনিক বলা শক্ত। একমুহূর্তে সে বিমর্ষ আর হতাশ, পরমুহূর্তে সে উৎসাহে আর আনন্দে অধীর হয়ে উঠে সেই আনন্দ আর উৎসাহ প্রকাশ করবার চেষ্টা করত জোর হেসে, শিস দিয়ে আর গল্প বলে। আমাদের যখন আর কিছু করবার না থাকত, আমরা তখন তাকে ক্ষেপিয়ে মজা করতাম। সে যে নানাভাবে আমাদের জ্বালাতন করত, এভাবে আমরা তার শোধ তুলতাম। ওকে ঠাট্টা করলে, ও বরং খুশীই হতো, কারণ ওর ভেতরে ছিল তিনটি জিনিসের অদ্ভুত মিশ্রণ: দুর্বলতা, খামখেয়াল আর ভালোমানুষি। সে যখন তার মস্ত মহিষ-চর্মের তৈরী পোশাকটি—এটি কেল্লা থেকে এক সহৃদয় বন্ধুর দান—প'রে তার অশ্বতরটির পিঠে চড়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসত তখন সে একজন বড় শিল্পীর ছবি আঁকবার অতি সুন্দর বিষয় হয়ে পড়ত। এই অসাধারণ পোশাকটির ভেতর তার মতন দুটি লোককে প্রায় একসঙ্গে ঢেকে ফেলতে পারা যায়। কী কারণে জানি না, লাল-মাথা এই পোশাকটির ভেতরদিকটা সম্পূর্ণ উল্‌টে বাইরের দিক দিয়ে পরত, আর এ জামা কখনোই গা থেকে নামত না, আবহাওয়া যতই গরম থাকুক না কেন। পোশাকটা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গিয়েছিল, আর চামড়াটা এতদিনের পুরোনো যে, রোজই কোনো-না-কোনো অংশে একটু ফাটল ধরত। ঠিক এই পোশাকের ওপরে দেখা যেতো মস্ত একঝাঁক লাল রঙের কোঁকড়া চুল। সেই চুলের ওপর একধারে যেন চেহারায় একটু 'মিলিটারি' ভাব আনবার জন্যেই বেপরোয়া ভঙ্গিতে আল্‌তো করে বসানো একটা ছোট্ট টুপি। জিনের ওপর তার বসবার ভঙ্গিটিও তার চেহারা এবং সাজসরঞ্জামের চাইতে কম উল্লেখযোগ্য নয়। একটি ঠ্যাং সে চেপে রেখেছিল তার অশ্বতরের গায়ে, আর অন্য ঠ্যাংটি বাইরের দিকে সোজা করে ছড়িয়ে দিয়েছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে। তার পরনের প্যাণ্টে ছিল সামরিক পোশাকের মতো লাল-লাল ডোরা, আর সেটা ছিল তার বেশ একটু গর্বের বিষয়। প্যান্টের তলায় তার বুট-জোড়া পুরোপুরিই দেখা যেতো। তার কম্বলটা আলগাভাবে

গুটিয়ে মস্ত একটা বাণ্ডিল করে ঝুলানো ছিল জিনের পিছনে একটা দড়ির সাহায্যে। দিনে চার-পাঁচবার ওটা খুলে মাটিতে পড়ে যেতো। মিনিটে মিনিটে পড়ে যেতো তার পাইপ, তার ছুরি, তার চকমকি আর ইস্পাতখণ্ড, অথবা একটুকরো তামাক, আর সে মহা ব্যস্ত হয়ে বাকি সবার অসুবিধার সৃষ্টি করে সেটা তুলবার জন্য নেমে পড়ত। দলের বেশীর ভাগ লোকেরই মুখে লাগাম ছিল না, তারা বিরক্ত হয়ে যা-তা বলতে শুরু করত—কতক রীতিমতো গুরুগম্ভীর ভাবে, কতক ঠাট্টার ছলে। শেষকালে লাল-মাথা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলত জীবনে সুখ নেই, আর এ-ধরনের মানুষও সে জীবনে আর কখনো দেখেনি।

বেণ্ট-এর কেল্লা ছেড়ে আসবার ছু'-একদিন মাত্র পরে হেনরি শ্যাটিলন ঘোড়ায় চড়ে গেল শিকার করতে, সঙ্গে এলিসকে নিয়ে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম তারা পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে সৈন্যদলের তিনটি ঘোড়া নিয়ে। এগুলো যাত্রাপথে তাদের মালিকের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল অথবা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ওদের মধ্যে একটা একটু চলনসই-গোছের ছিল, কিন্তু বাকি ছুটো ক্ষয়ে ক্ষয়ে রোগা হয়ে গিয়েছিল আর নেকড়ের কামড়ে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। রোগা হলেও, আমরা ওদের ছুটিকে আমাদের সঙ্গে উপনিবেশে নিয়ে চললাম, আর বাকিটিকে আরাপাহোদের দিয়ে তার বিনিময়ে হেনরি তাদের কাছ থেকে চমৎকার একটা অশ্বতর নিয়ে নিল।

পরদিন ছুপুরবেলা যখন বিশ্রামের জন্য থামলাম, তখন বেশ লম্বা একসারি সাণ্টা-ফে-অভিমুখী ওয়াগন (মালবাহী গাড়ি) আমাদের পাশ দিয়ে সুন্দর মিছিলের মতো খুব আস্তে আস্তে যেতে লাগল। এগুলোর মালিক ছিল একজন ব্যবসায়ী, তার নাম ম্যাগোফিন। ম্যাগোফিনের ভাই আরো কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘাসের ওপর এসে বসল। তারা যে খবর দিল তা পেয়ে মনটা খুব খুশী হয়ে উঠল না। তারা বলল নীচেকার যাত্রাপথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ; তারা বহুবার দেখতে পেয়েছে ইণ্ডিয়ানরা রাত্রে তাঁবুর চারধারে যেন লুটের সন্ধানেই ঘুর-ঘুর করেছে ; আমাদের কয়েক সপ্তাহ আগে যে বড দলটি বেণ্ট-এর কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেটি আক্রান্ত হয়েছিল, আর সোয়ান নামে মাসাচুসেট্স্ থেকে আগত একটি লোক নিহত হয়েছিল। তার সঙ্গীরা তার দেহটিকে কবর দিয়েছিল, কিন্তু ম্যাগোফিন যখন তার কবরটা খুঁজে বার করল তার আগে ইণ্ডিয়ানরা দেহটাকে খুঁড়ে বার করে মাথার খুলির চামডা আর চুল কেটে তুলে নিয়ে গেছে আর নেকড়েরা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই খবরের পর যেন একটু সান্ত্বনা

দেবার জন্যই সে একটা ভালো খবরও দিল যে, আর কয়েকদিনের নিম্নমুখী যাত্রার পরই নীচের দিকে অনেক মহিষ পাওয়া যাবে।

পরদিন বিকেলে নদীর ধার দিয়ে অগ্রসর হতে হতে আমরা দূরদিগন্তে দেখতে পেলাম কতকগুলো ওয়াগনের সাদা উপরিভাগ। কয়েক ঘণ্টা পর গিয়ে তাদের ধরলাম, দেখলাম সেগুলো বলদ-টানা কতকগুলো জ্যাবড়া-জোবড়া ওয়াগন, সাণ্টা ফে-র ব্যবসায়ীদের ওয়াগনগুলোর মতো জাঁকালো নয়। ওয়াগনগুলো সৈন্যদের জন্য সরকারী রসদাদি বয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা কাছে যেতে ওয়াগনগুলো থামল, আর ওয়াগনের চালকেরা এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের অনেকেই বালক মাত্র, সদ্য লাঙল ছেড়ে এই কাজে যোগ দিয়েছে। যাত্রাপথের অবস্থা সম্বন্ধে এরা যা বলল তা সাণ্টা ফে-র লোকগুলো আমাদের যা যা বলেছিল সব-কিছুর সঙ্গে মিলে গেল। ইণ্ডিয়ানদের আড্ডা বলে অনুমিত জায়গার ওপর দিয়ে যাবার সময় তাদের প্রহরীরা প্রত্যেক রাত্রে বাস্তব অথবা কাল্পনিক ইণ্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে-ছুঁড়তে গেছে। তারা আরো বলল যে আমাদের আগে যে দলটি গেছে, সেই দলে কেণ্টাকি প্রদেশের এক যুবক ছিল, তার নাম ইউইং। একটা ইণ্ডিয়ানকে তাদের তাঁবুর আশেপাশে ঘুর-ঘুর করতে দেখে সে তাকে গুলী করেছিল। ওরা কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ দিল ফিরে যেতে, আর কেউ কেউ পরামর্শ দিল যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যেতে; কিন্তু ওদের সবাইকেই যেরকম ভীষণ উত্তেজিত আর উদ্বিগ্ন দেখলাম, অমন অবস্থায় ঠাণ্ডামাথায় পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই তাদের পরামর্শের ওপর বিশেষ জোর দিলাম না। এরপরে তারা যে খবরটি দিল, সে-খবরটাই স্পষ্ট আর কাজের খবর: নীচের নদীর ধারে মস্ত এক গ্রামে আরাপাহো ইণ্ডিয়ানরা তাঁবু ফেলেছে। এরা বলল এই আরাপাহোরা নাকি বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু ওরা ত্রিশজন ভ্রমণ করছিল কতকগুলো বলদ নিয়ে, ইণ্ডিয়ানদের কাছে যাদের কোনো দাম নেই, আর আমরা চলেছিলাম কয়েকজন মাত্র, আর আমাদের সঙ্গে ছিল অনেক ঘোড়া আর অশ্বতর, ইণ্ডিয়ানদের চোখে পরম লোভনীয়।

পরদিন বিকেলের প্রথমদিকে সম্মুখে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে এক জায়গায় দেখলাম করাতের দাঁতের মতো কি-যেন কতকগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দিগন্তরেখার ওপর। আমাদের আর আকাশের মাঝখানে সারি সারি দাঁড়িয়ে আরাপাহোদের তাঁবুগুলোকে ঐরকম অদ্ভুত দেখা যাচ্ছিল। আমরা যখন তাদের তাঁবুগুলোর মুখোমুখী এসে পড়লাম তখন সূর্য অস্ত যেতে আরো দু'-তিন ঘণ্টা বাকি। নদীর ওধারে কিছু দূরে একটি ঘাসে-ঢাকা মাঠের ওপর তাদের পুরো দু'শোটি তাঁবু

দাঁড়িয়ে ছিল, আর আর্কেনসাস নদীর দু'ধারে মাইলখানেক ধরে প্রায় দেড়হাজার ঘোড়া আর অশ্বতর চরে বেড়িয়ে প্রেয়ারির ঘাস খাচ্ছিল। সবগুলোকে একসঙ্গেই দেখতে পাচ্ছিলাম, কারণ এই বিরাট এলাকার কোথাও পাহাড়ের আড়াল ছিল না, দৃষ্টির গতি রোধ করবার জন্য একটি গাছ বা ঝোপও ছিল না।

মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দু'-একজন ইণ্ডিয়ান ঘোড়াগুলোর দিকে নজর রাখছিল ; দেখতে পেয়েই 'লাল-মাথা' ডেস্‌লরিয়ার্সকে মিনতি করে বলল গাড়ি থামিয়ে তাকে তার 'মিলিটারি' জামাটা বার করে দিতে। জামাটা আসতেই সে তার গা থেকে মহিষ-চর্মের পোশাকটা খুলে রেখে সামরিক সাজে সজ্জিত হলো, জিনের ওপর সামরিক ভঙ্গিতে বসল, টুপিটা বাঁ চোখের ওপরে বেপরোয়া ভঙ্গিতে নামিয়ে দিল, আর ব্যগ্রকণ্ঠে অনুরোধ জানাল আমরা কেউ যেন ওকে মাত্র আধঘণ্টার জন্য একটা বন্দুক বা পিস্তল ধার দিই। আমরা যখন জানতে চাইলাম তার এসব কাণ্ড-কারখানার মানে কী, লাল-মাথা বলল সে তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে সামরিক পোশাকে সজ্জিত কোনো সামরিক লোক দেখলেই ইণ্ডিয়ানদের মনের অবস্থাটা কিরকম হয়, এবং তার ধারণা এই আরাপাহোদের জানিয়ে দেওয়া ভালো যে আমাদের দলে একজন সৈন্য আছে।

এই আর্কেনসাস নদীর ধারে আরাপাহোদের মুখোমুখী পড়া—এদের নিজেদের পার্বত্য এলাকায় এদের মুখোমুখী পড়ার চাইতে অনেক আলাদা। এ-ছাড়া আরেকটি ব্যাপারেও আমাদের খুব সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে জেনারেল কিয়ার্নি এদের দেখেছিলেন এ-নদীর পার দিয়ে উজান-পথে তাঁর সেনা-বাহিনী নিয়ে আসতে আসতে। তখন তাঁর গতবছরের হুঁশিয়ারিটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে তিনি এদের শাসিয়েছিলেন, এরা আবার কখনো কোনো শ্বেতাঙ্গের কেশাগ্রও স্পর্শ করলে, তিনি তাদের গোটা জাতটাকেই নির্মূল করে ফেলবেন। ফলে তখনকার মতো তাদের মনোভাবটা আমাদের পক্ষে বেশ ভালোই ছিল, কারণ জেনারেলের শাসানির প্রভাবটা তখনো তাদের মনে তাজাই রয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা হলো আরাপাহো গ্রামটি আর তার অধিবাসীদের দেখে আসতে। এও আমরা ভাবলাম যে ওদের দিক থেকে আমরা কোনোরকম শত্রুতার ভাব বা মতলব আশঙ্কা করছি না, এমনি ভাব দেখিয়ে খোলাখুলি ওদের সঙ্গে মোলাকাত করাই হবে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো পন্থা। অতএব শ আর আমি হেনরি শ্যাটিলনকে সঙ্গে নিয়ে নদী পার হবার তোড়জোড় করলাম। আমাদের দলের বাকি সবাই ইতিমধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেল, যাতে রাত্রি

শুরু হবার আগেই এরা এই সন্দেহভাজন প্রতিবেশীদের থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে থাকতে পারে।

এইখানটায় এবং আরো কয়েকশো মাইল দূর নীচ পর্যন্ত আর্কেনসাস নদী শুধু নামেই মাত্র নদী, আসলে শুধু বালুর পর বালু, তার ওপর দিয়ে জলের কয়েকটি শীর্ণ ধারা, কোথাও বা একটু চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকগুলো জায়গায় শরৎকালে জল বালুর তলায় নেমে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঋতুতে, এখানে-সেখানে চোরাবালি ছড়িয়ে না থাকলে, এ নদী যে-কোনো জায়গায় হেঁটেই পার হওয়া যেতো অতি সহজেই, যদিও নদীর খাতটি অনেকসময় সিকি মাইল চওড়া। আমাদের ঘোড়াগুলো পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে জলের মধ্য দিয়ে পা টেনে-টেনে, কখনো বা শক্ত বালুর ওপর দিয়ে কদম-কদম পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলল। আমাদের ওপারে পৌছতে বেশী দেরি হলো না। ওপারে গিয়ে লম্বা ঘাস ঠেলে-ঠেলে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় অদূরে চোখে পড়ল কয়েকজন ইণ্ডিয়ান। আমরা এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওদের একজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আমরা কাছে যেতেই কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সাপের মতন চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। হেনরি ওদের নানারকম ইশারা করে বুঝিয়ে দিল আমরা কী চাই। ইণ্ডিয়ানটি তার চামড়ার পোশাকটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একটি কথাও না বলে ওদের গাঁয়ের ভেতর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আরাপাহোদের ভাষা এত কঠিন এবং উচ্চারণ এত কর্কশ যে, এ ভাষা কোনো শ্বেতাঙ্গের পক্ষে শেখা অসম্ভব বলেই বলা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ী ম্যাক্‌স্‌ওয়েল পর্যন্ত, এদের সঙ্গে যে এত বেশী মেলামেলা করেছে, বাধ্য হয়ে অদ্ভুত একরকমের ইশারার ভাষা ব্যবহার করে, যা প্রেয়ারির আদিম বাসিন্দারা সবাই অল্প-বিস্তর বুঝতে পারে। এই ইশারার ভাষায় হেনরি শ্যাটিলন বেশ ভালোরকম অভ্যস্ত।

গ্রামে গিয়ে আমরা দেখলাম অবিশ্বাস্যভাবে প্রচুর পরিমাণে মহিষের বাতিল মাংস মাটির ওপর স্তূপাকারে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। তাঁবুগুলো খাটানো হয়েছিল বৃত্তাকারে। শুধু পরিচ্ছন্নতা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে এদের তাঁবুগুলি ডাকোটাদের তাঁবুরই মতো। এদের দুটি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে আমরা এই আরাপাহো গ্রাম-শিবিরের বিরাট বৃত্তাকার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম, আর অমনি শত শত ইণ্ডিয়ান পুরুষ, স্ত্রীলোক আর শিশু চারদিক থেকে ঘর ছেড়ে ছুটে এলো আমাদের দেখতে। আর সেইসঙ্গে গ্রামের সবগুলো কুকুর একসঙ্গে বিশ্রীরকম

একরকম বীজ জন্মাত, ওট-এর মতো মিষ্টি আর পুষ্টিকর ; আমাদের ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলো চাবুক আর লাগাম সত্ত্বেও এগুলো খাবার লোভ সামলাতে পারত না। ইণ্ডিয়ান গ্রাম ছাড়িয়ে মাইলখানেক যাওয়ার পর পিছন ফিরে তাকালাম তরঙ্গিত ঘাসের সমুদ্রের দিকে। সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে; পশ্চিম আকাশ তারই বিদায়ের রঙে রঙীন, সমতলভূমির সীমান্তে আর সেই পটভূমিকার বুকে ফুটে উঠেছে আরাপাহো শিবিরের ঘন-সন্নিবিষ্ট তাঁবুগুলি।

নদীর তীরে পৌছে আমরা তীর বেয়ে আরো কিছু দূর গেলাম, তারপর বিপরীত তীরে ঝাপ্‌সা গোধূলির আলোয় চোখে পড়ল আমাদের ছোট্ট গাড়িটির সাদা আচ্ছাদন। সেখানে পৌছে দেখলাম ওখানে আমাদের আগে পৌছে গেছে অনেক ইণ্ডিয়ান। তাদের চার-পাঁচজন বসে ছিল মাটির ওপর এক সারিতে। তাদের দেখা যাচ্ছিল আধা-উপবাসী শকুনের মতো। লাল-মাথা তার সামরিক পোশাক পরে গাড়িটার ধারে আরেকটি ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মত্ত ছিল। তার হরেক রকমের ইশারা এই ইণ্ডিয়ানটা কিছুই বুঝতে পারছে না দেখে লাল-মাথা ইণ্ডিয়ানটাকে তার মনের কথা বোঝাবার জন্য ইংরাজি শব্দগুলোই খুব চেঁচিয়ে আর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে করে বার বার শোনাতে লাগল। ইণ্ডিয়ানটা পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল, এবং তার মুখের চেহারা প্রায় কাঠের পুতুলের মতোই অভিব্যক্তিহীন হলেও, একদৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ ইণ্ডিয়ান লোকটি তার এই 'মিলিটারি' সঙ্গীটিকে ঠিক বুঝতে পেরেছে আর মনে-মনে তাকে অবজ্ঞা করছে। দৃশ্যটিতে সুবুদ্ধির চাইতে হাস্যকর মূর্খতার পরিচয়ই বেশী। লাল-মাথাকে তার বক্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে বলা হলো। ধমক খেয়ে সে গাড়ির তলায় গিয়ে বসে রইল। শ্যাটিলন তার দিকে ঝুঁকে তার স্বভাবসিদ্ধ শান্তভাবে বলল একটি ইণ্ডিয়ান অমন দশটা মানুষকে হাসতে হাসতে একাই সাবাড় করে দিতে পারে।

আমাদের আগন্তুকরা একজন একজন করে উঠে গম্ভীরভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। অন্ধকার যত ঘনাতে লাগল, আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল বিষণ্ণ ধ্বনি-বৈচিত্র্যের অভিনন্দন। এ অঞ্চলে নেকড়েদের সংখ্যা অবিশ্বাস্যরকম বেশী ; এবং আরাপাহোদের শিবিরের চারধারে মরা জানোয়ারের দেহাবশেষ প্রভৃতি নানারকমের আবর্জনা এত বেশীসংখ্যক নেকড়েদের আকর্ষণ করেছিল যে আমাদের অনতিদূরেই কয়েকশো নেকড়ের সমবেত সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল। নদীর বুকে একটি দ্বীপ ছিল—বরং বালুর মাঝখানে মরূদ্যান বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়—প্রায়

বন্দুকের গুলীর পাল্লার ভেতর ; আর ওখানেই ছিল এই নেকড়েদের সবচেয়ে বড় আড্ডা। সূর্যাস্তের পর থেকে একটানা কয়েক ঘণ্টা ঐখান থেকে নীচু পর্দায় মড়া-কান্নার মতো এক বীভৎস অনৈক্যতান আর মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমাদের অগ্নিকুণ্ডের অল্প কিছু দূর দিয়েই প্রেয়ারির ওপর নেকড়েরা ছুটোছুটি করছে অথবা নদীর বালুর ওপর দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওদের দিক থেকে আমাদের কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা ছিল না, কারণ সারা প্রেয়ারি অঞ্চলের ভেতর এই নেকড়েরাই হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন কাপুরুষ।

প্রতিবেশী মানুষ-নেকড়েদের সম্পর্কে কিন্তু আমরা অতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলাম না। সে-রাত্রে আমরা মাটির ওপর চামড়ার পোশাক পেতে শোবার সময় টোটাভরা বন্দুক পাশে নিয়ে অথবা হাতের মুঠোয় ধরে শুলাম। ঘোড়াগুলিকেও আমরা আমাদের এত কাছাকাছি খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলাম যে একটা ঘোড়ার পা বার বার আমার গায়ের ওপর এসে পড়ছিল। কোনো একজনকে পাহারা দেবার জন্য রাখিনি বটে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন এবং সতর্ক রইলাম। আমি নিজে পর পর জেগে জেগে আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত কাটালাম। লাল-মাথা বিশ্রাম করছিল নদীতীরের কাছাকাছি। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি আধঘুমন্ত আধজাগ্রত অবস্থায় আমার খেয়ালে এলো লাল-মাথা তার জায়গা ছেড়ে এসে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িটার তলায় আশ্রয় নিল। এর অল্প পরেই আমি গাঢ় ঘুমে নিমগ্ন হলাম। হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি লাল-মাথা আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে, তার মুখটা ফ্যাকাসে আর চোখ-দুটো বড় বড়।

বললাম, "ব্যাপার কি ?"

লাল-মাথা বলল সে যখন নদীর ধারে শুয়ে ছিল তখন হঠাৎ একটা জিনিস দেখতে পেয়ে তার সন্দেহ হলো। তাই নিরাপদ হবার জন্য গাড়িটার তলায় ঢুকে পড়ে সে গাড়ির তলায় বসে বসে দেখেছিল সাদা পোশাকে গা জড়িয়ে দুটি ইণ্ডিয়ান নদীর তীরের ওপর চুপিসাড়ে উঠে এসে দুটি ঘোড়াকে ধরে নিয়ে চলে গেল। ওকে ভয়ে এমন বেসামাল দেখা গেল, আর ওর কাহিনীও এমন অসংলগ্নভাবে বলা যে, আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না, এবং দলের কাউকে অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত করতে চাইলাম না। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওর কথা সত্যও হতে পারে, এবং তা যদি হয়ে থাকে তাহলে যা করবার অবিলম্বে করা উচিত। লাল-মাথাকে বললাম ইণ্ডিয়ানরা কোন্ দিকে গেছে আমাকে দেখিয়ে দিতে ; তারপর আর কোনোরকম চিন্তা না করেই ঝোঁকের মাথায় বন্দুক নিয়ে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীতীর বেয়ে দু'-তিনশো

গজ এগিয়ে গেলাম কান খাড়া রেখে আর চিন্তিতভাবে দু'দিকে তাকাতে তাকাতে। ডান দিকে প্রেয়ারির বুকের ওপর ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না; নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা নেকড়ে এমন ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে চলেছে, যে ভঙ্গি নকল করা কোনো ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি তাঁবুতে ফিরে চললাম। কাছাকাছি গিয়েই দেখলাম তাঁবুর সবাই জেগে গেছে। শ আমাকে ডেকে বলল সে ঘোড়াগুলো গুনে দেখেছে, সবগুলো ঘোড়া ঠিক আছে। লাল-মাথাকে পরীক্ষা করা হলো সে ঠিক কী দেখেছিল সেইটে বুঝবার জন্য। সে হলফ করে তার সেই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করে গেল, জোর গলায় বলতে লাগল ইণ্ডিয়ানরা দুটো ঘোড়া নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে। শুনে জিম গার্নি বলল লাল-মাথার মাথা-খারাপ হয়ে গেছে। লাল-মাথা ভীষণ রেগে বলল, এ অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা। জিম তখন আপীল করল আমাদের কাছে। এমন একটি নরম ব্যাপারে রায় দিতে আমরা রাজি হলাম না, ফলে লাল-মাথা আর জিমের ভেতর ঝগড়াটা বেশ গরম হয়ে উঠল। শেষকালে লাল-মাথাকে ধমকে শুতে পাঠিয়ে দিলাম, আর বলে দিলাম আরাপাহোদের গোটা গ্রামটাকে এগিয়ে আসতে দেখলেও সে যেন আমাদের কাউকে আর বিরক্ত না করে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিকার

আমাদের সামনে বিস্তৃত এলাকায় এসময় ঝাঁকে ঝাঁকে মহিষ—তাই মহিষ-শিকারের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে হয়তো অবান্তর হবে না। মহিষ-শিকারে সাধারণতঃ দু'রকম পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে, যাদের বলা যায়: 'ধাবন' এবং 'অভিগমন'। প্রথম পদ্ধতিটিই (অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহিষের পিছু ধাওয়া করা) বেশী প্রচণ্ড আর দুঃসাহসিক, অবশ্য মহিষগুলো যদি হিংস্র মেজাজে থাকে—সাধারণতঃ মহিষগুলো যথেষ্ট শান্তস্বভাব। একজন অভ্যস্ত এবং দক্ষ শিকারী, ভালো ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে পারলে একবারের অভিযানেই পাঁচ-ছয়টা মহিষ মারতে পারে, শিকারের হট্টগোলে ঘোড়ার দৌড়ঝাঁপের ভেতরেই বার বার বন্দুকে নতুন গুলী ভরে। ছোট এক ঝাঁক মহিষকে আক্রমণ, বা একটা মহিষকে ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে এককভাবে ঘায়েল করা—এতে উত্তেজনা কম, বিপদের ঝুঁকিও কম। বস্তুতঃ এই জানোয়ারগুলি মাঝে মাঝে এমন বোকা আর এমন আল্‌সে হয়ে থাকে যে তাদের

মেরে তেমন মজা পাওয়া যায় না। ঘোড়াটা যদি সাহসী আর সুশিক্ষিত হয় তাহলে শিকারী লোকটি মহিষের গা ঘেঁষে ঘোড়া চালিয়ে মহিষের গায়ে হাতও দিতে পারে ; এতে তেমন কোনো বিপদাশঙ্কাও নেই, যতক্ষণ মহিষটার শক্তি আর দম বজায় থাকে। কিন্তু মহিষটা যখন হাঁফিয়ে পড়ে আর সহজে দৌড়তে পারে না, যখন তার জিভ লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে আর চোয়ালের দু'পাশ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে তখন মানে মানে একটু দূরত্ব বজায় রাখাই শিকারীর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ দুরবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে জানোয়ারটা যে-কোনো মুহূর্তে তাকে আক্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে ঠিক যে মুহূর্তে সে গুলীটি ছুঁড়বে। ঘোড়াটা তখন লাফিয়ে একপাশে সরে যায়, আর শিকারীর সেই সময়টা জিনের ওপর শক্ত হয়ে বসে থাকা দরকার, কারণ মাটিতে ছিটকে পড়ে গেলে শিকারীর আর রক্ষা নেই। আক্রমণ করে বিফল হলেই মহিষ আবার পালাতে শুরু করে, কিন্তু আবার যদি তাকে ঠিকমতো গুলী করা যায় তাহলে সে শীগ্‌গীরই থেমে পড়ে, কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর তার ভারী দেহটা টলতে টলতে প্রেয়ারির বুকে পড়ে যায়।

মহিষের পিছনে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে মহিষ-শিকারের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, আমার মনে হয়, ঘোড়া যখন জোর কদমে ছুটতে থাকে তখন বন্দুকে বা পিস্তলে গুলী ভরা। ইণ্ডিয়ানরা যে তীরধনুক ব্যবহার করে মহিষ-শিকারে, আগ্নেয়াস্ত্রের তুলনায় তার কতকগুলো সুবিধা আছে। এজন্য শ্বেতাঙ্গরাও শিকারে মাঝে মাঝে তীরধনুক ব্যবহার করে।

ঘোড়ায় চড়ে তাড়া করে মহিষ-শিকারের বিপদ যে শুধু আহত মহিষের ক্ষিপ্ত, বেপরোয়া আক্রমণ থেকেই, তা নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদ আসতে পারে শিকার-ক্ষেত্রের জমিটার দুরবস্থা থেকে। প্রেয়ারির অনেক জায়গাই মোলায়েম নয় বা পুরোপুরি সমতল নয় ; প্রায়ই জমির সমতা নষ্ট করেছে পাহাড়, গর্ত, খাদ ইত্যাদি। প্রেয়ারি অঞ্চলে চলাচলের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে জমির এখানে-সেখানে নেকড়ে, খটাশ, প্রেয়ারির কুকুর প্রভৃতি জংলী জানোয়ারের খোঁড়া গর্ত। শিকার তাড়িয়ে নেবার উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে শিকারী বিপদ লক্ষ্য না করে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় ; ঘোড়া পূর্ণবেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তার পা কোনো গর্তের মধ্যে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের হাড় ভেঙে যায় আর তার পিঠের সওয়ারটি সামনের দিকে সজোরে ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে হয়তো মারাই পড়ে। কিন্তু মহিষ-শিকারে যত বেশী দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে হয়, আসলে তত ঘটে না। শিকারের উত্তেজনায় শিকারী যেন মাতাল হয়ে ওঠে, কোনোরকম বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, ফলে সে

অনায়াসে এমন খানাখন্দ ঘোড়ায় চড়ে টপ্‌কে পেরিয়ে যায় যা বিনা নেশায়, স্বাভাবিক অবস্থায় টপ্‌কাতে গেলে সে নির্ঘাত পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মরত।

এবার দ্বিতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ 'অভিগমন' পদ্ধতির কথা বলি। এ হচ্ছে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি, কাজেই প্রথম পদ্ধতির তুলনায় এর অনেকগুলি সুবিধা আছে। এ পদ্ধতিতে ঘোড়াটাকে আহত করার অথবা নিজের জীবন বিপন্ন করার প্রয়োজন নেই; শিকারীকে ধীর, স্থির এবং সতর্ক থাকতে হবে : মহিষটির স্বভাব জানতে হবে, এ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের অবস্থান এবং হাওয়ার গতিবিধি জানতে হবে, এবং বন্দুক ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে। মহিষ এক অদ্ভুত প্রাণী; কখনো কখনো এরা এত নির্বোধ এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, একজন লোক মুক্ত প্রেয়ারিতে তাদের ভেতর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে, আর তাদের চোখের সামনেই তাদের কয়েকটাকে বন্দুকের গুলী চালিয়ে মেরে ফেলতে পারে, তখনও হয়তো বাকি মহিষগুলির মাথায় ঢুকবে না যে এবার পালানো দরকার। আবার অন্যসময় এরাই হবে এত লাজুক আর হুঁশিয়ার যে এদের কাছে যেতে হলে অসামান্য দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন হবে। আমার বিশ্বাস, ঘোড়ায় চড়ে মহিষ-শিকারে কিট কার্সন সর্বশ্রেষ্ঠ; পায়ে হেঁটে মহিষ-শিকারে হেনরি শ্যাটিলনের জুড়ি নেই।

সেই যে লাল-মাথা আমাদের তাঁবুকে চম্‌কে দিয়েছিল, তারপর সারারাত আর কোনোরকম গোলমাল ঘটেনি। আরাপাহোরা কোনোরকম ক্ষতি করবার চেষ্টা করেনি, অথবা চেষ্টা করে থাকলেও আমরা সর্বদা সতর্ক ছিলাম বলেই তাদের চেষ্টা সফল হতে পারেনি। পরের দিনটা ছিল কর্মব্যস্ততা আর উত্তেজনায় ভরা। যে লোকটা আমাদের তাঁবুর সামনের দিকে ছিল, সে বেলা দশটা নাগাদ আমাদের মনে পুলক জাগিয়ে চীৎকার করে উঠল—"মহিষ! মহিষ!" আর সত্যিই আমাদের ঠিক নীচে প্রেয়ারির ফাঁকা জায়গায় একদল মহিষ ঘাস খাচ্ছিল। দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, শ আর আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে পড়লাম তাদের ওপর। আমরা তাড়াতাড়ি করে কোনোরকমে আমাদের ভ্রমণের ঘোড়ায় চড়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু জোর চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা গিয়ে মহিষগুলোকে গিয়ে ধরে ফেললাম। শ একটা মহিষের পাশে গিয়ে তার দু'নলা বন্দুকের দুটো গুলীই একসঙ্গে চালাল মহিষটার দেহের ভেতর। ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে চলতে দেখলাম মহিষটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে বার বার আততায়ীর ওপর আক্রমণ করতে তেড়ে আসছে, আর আক্রমণ এড়িয়ে ঘোড়াটা সরে সরে যাচ্ছে বার বার। আমার মহিষ-তাড়ানো একটু বেশী সময় নিল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি জানোয়ারটাকে গিয়ে ধরলাম আর আমার

পিস্তলের গুলী চালিয়েই তাকে সাবাড় করলাম। সাফল্য-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে তার লেজ কেটে নিয়ে আমরা ফিরে গিয়ে আবার আমাদের দলে যোগ দিলাম, যে মুহূর্তে তাদের ছেড়ে এসেছিলাম তার মিনিট পনেরোর ভেতর। সেই ভোরে বার বার শোনা যেতে লাগল সেই আনন্দ-জাগানো চীৎকার: "মহিষ! মহিষ!" কয়েক মুহূর্ত পর-পরই নদীর তীরবর্তী প্রশস্ত মাঠের ওপর আমরা দেখতে লাগলাম ঝাঁকে ঝাঁকে মহিষ লোমশ মাথাগুলো তুলে তাদের দিকে ধাবমান ঘোড়সওয়ারদের দিকে নির্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তারপর এলোমেলো ছুট লাগাচ্ছে বাঁ-দিকে ক্রমশঃ উঁচু প্রেয়ারির দিকে। দুপুরবেলা আমাদের সামনে সমতলভূমি হাজার হাজার ছোট-বড় মদ্দা আর মাদী মহিষে ভরে গেল ; আমরা এগিয়ে যেতেই তারা সচল হয়ে উঠল। দেখলাম নদীর ওধারেও প্রেয়ারি অঞ্চল দূরদিগন্ত পর্যন্ত মহিষে মহিষে কালো হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্য দেখে পুলকে আমাদের সবার চিত্ত নৃত্য করে উঠল। দুপুরের বিশ্রামের জন্য আমরা নদীর ধারে একটা কুঞ্জবন বেছে নিলাম।

ডেস্‌লরিয়ার্স সেদিন দুপুরে আমাদের খেতে দিল হরিণের মাংস। সেদিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে শ বলল, "কাল খাবো মহিষের জিভ আর কুঁজের মাংস।" খাওয়ার পর আমরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল হেনরি শ্যাটিলনের চীৎকারে। দেখলাম সে তার লম্বা দেহটি নিয়ে সোজা হয়ে গাড়িটার চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে প্রেয়ারির দিকে তাকিয়ে। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম একটা মস্ত কালো জিনিস, মেঘের কালো ছায়ার মতো, দূরের সমতলভূমির ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর তারই পিছনে পিছনে ঐরকম আরকটি জিনিস, আয়তনে আগেরটির চাইতে ছোট, আরো জোরে ছুটতে ছুটতে ক্রমেই প্রথমটির নিকটতর হচ্ছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, আরাপাহো শিকারীরা একঝাঁক মহিষকে তাড়া করে চলেছিল। শ আর আমি আমাদের দুটো বাছাই ঘোড়াকে জিন পরিয়ে নিয়ে তাদের পিঠে চড়ে দ্রুত ছুটে গেলাম নদীর ওপারে। কিন্তু আমাদের বড় বেশী দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে শিকারীরা শিকারের ভিড়ে মিশে গিয়েছে, আর হত্যাকাণ্ডও প্রায় সমাপ্ত। আমরা মাঠে গিয়ে দেখি, এখানে-সেখানে কাছে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে অগুন্তি মৃতদেহ ; ঝাঁকের বাকি মহিষগুলি মহা আতঙ্কে চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে আর ইণ্ডিয়ানরা তখনও তাদের পিছনে ছুটছে। শিকারীদের অনেকেই অবশ্য দাঁড়িয়েই রইল, আর তাদেরই মধ্যে একজন ছিল আমাদের গতকালের পরিচিত সেই গ্রামের সর্দার। সে নেমে পড়েছিল একটা মহিষীর সামনে ; এটাকে সে পাঁচ-ছয়টি তীরে বিদ্ধ করেছিল। সর্দারের পিছনে-পিছনেই ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল তার

স্ত্রী ; এই স্ত্রীটি তাকে কোনো স্বেচ্ছাসৈনিকের কাছ থেকে কিনে-নেওয়া বা লুট-করা পাত্র থেকে পানীয় জল ঢেলে দিচ্ছিল। নদী পেরিয়ে ফিরে এসে আমরা আমাদের দলটিকে ধরলাম ; দলটি তার আগেই আবার যাত্রা শুরু করেছে।

এক মাইল গেছি কি না-গেছি, এমন সময় একটি মনোরম দৃশ্য দেখলাম। ডান দিকের নদীতীর থেকে বাঁ-দিকের ফুলে-ফুলে-ওঠা প্রেয়ারির ওপর, আর সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু মহিষ আর মহিষ। এই মস্ত ঝাঁকের একটি প্রান্ত আমাদের সিকি মাইলের মধ্যে। অনেক অংশে মহিষগুলো এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে ছিল যে দূর থেকে তাদের কালো পিঠগুলো একসঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন কালো সমতল বলেই মনে হচ্ছিল। অন্যত্র ওরা ছিল আরো বিচ্ছিন্ন। কোথাও কোথাও কতকগুলো মহিষ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল আর ধুলো উড়ছিল সেখান থেকে। মহিষে মহিষে লড়াইও হচ্ছিল দু'-এক জায়গায়। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের পরস্পরের আক্রমণ, শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি আর তাদের বিশ্রী গলার গুরু গর্জন। শ আমাদের বেশ খানিকটা আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল, তার সঙ্গে হেন্‌রি শ্যাটিলন। দেখলাম শ থেমে পড়ল, আর তার বন্দুকের ওপর থেকে চামড়ার আবরণটা টেনে সরিয়ে ফেলল। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখলে শুধু একটি কথাই ভাবা সম্ভব ; আমরা তাই ভাবলাম। সেদিন ভোরে শিকারে পিস্তল ব্যবহার করেছিলাম। এখন ইচ্ছা হলো বন্দুকের মাহাত্ম্য একটু পরখ করব। ডেস্‌লরিয়ার্সের একটা বন্দুক ছিল, আমি তাই ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলাম আমাদের গাড়িটির পাশে। গিয়ে দেখি সে গাড়ির সাদা আচ্ছাদনের তলায় বসে পাইপ কামড়াচ্ছে আর আনন্দের উত্তেজনায় হাসছে।

বললাম, "তোমার বন্দুকটা একটু ধার দেবে, ডেস্‌লরিয়ার্স ?"

"আজ্ঞে, দেবো বইকি।" বলে ডেস্‌লরিয়ার্স জোরে লাগাম টেনে অশ্বতরটিকে থামাল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল গাড়িটার ভেতরে ; পায়ের মোকাসিন দুটো ছাড়া ওর সব-কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই সে বন্দুকটা বার করে এনে দিল।

প্রশ্ন করলাম, "গুলী ভরা আছে তো ?"

সে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালো করে। বন্দুকটাও খুব ভালো। এ দিয়ে আপনি মহিষ ঘায়েল করতে পারবেন নিশ্চয়।"

আমি আমার বন্দুকটা তার হাতে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে শ-র কাছে চলে গেলাম।

শ বলল, "তৈরি ?"

আমি বললাম, "চলো।"

হেনরি বলল, "ঐ খাদে নেমে ঐ খাদের তলা দিয়ে দিয়ে চলো, আমরা একেবারে কাছে গিয়ে পড়ার আগে ওরা যেন আমাদের দেখে ফেলতে না পারে।"

এই খাদটা তেরছাভাবে চলে গেছে মহিষগুলোর দিকে। আমরা খাদের তলা বেয়ে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম, কিন্তু শেষটায় খাদটা বড় বেশী সরু হয়ে গেল। যখন দেখলাম খাদের আড়ালে আর লুকিয়ে থাকা যাচ্ছে না, তখন খাদ থেকে উঠে বেরিয়ে পড়ে মহিষ-দলের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটলাম। মহিষগুলো তখন বন্দুকের গুলীর পাল্লার ভেতরে। মহিষ-দলের এদিকের প্রান্তে ধূসর রঙের অনেক বুড়ো মহিষ ছড়িয়ে থেকে তাদের মহিষীদের পাহারা দিচ্ছিল। তারা ক্রোধ আর বিস্ময়-ভরা চোখে আমাদের দিকে তাকাল, আমাদের দিকে কয়েক গজ এগিয়ে এলো, তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দিকে পেছন ফিরে আমাদের কাছ থেকে পালাবার জন্যেই প্রথমে আস্তে, তারপর একটু বেগ বাড়িয়ে ছুট দিল। মুহূর্তের ভেতরে মহিষদের সমস্ত দলটাই হুঁশিয়ারি পেয়ে গেল। আমরা যে জায়গাটি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছিলাম, সেখান থেকে ওরা অন্যদিকে চলে যেতে লাগল, ফলে মহিষ-ঝাঁকের একদিকে একটা ফাঁক তৈরি হয়ে গেল। এই ফাঁকে আমরা ঢুকে পড়লাম, তখনো আমাদের ঘোড়াগুলির উত্তেজনা সামলাতে সামলাতে। প্রতিমুহূর্তে যেন গোলমালটা ঘন হয়ে উঠছিল। মহিষগুলো একসঙ্গে বড় বড় দলে আমাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে চলে যেতে চাইছিল। সামনে আর দু'পাশে দেখছিলাম শুধু কালো মহিষ আর কালো মহিষ, আর কানে শুনছিলাম দশ হাজার খুরের আঘাত। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা : অসংখ্য শক্তিশালী জানোয়ার তাদের শক্তি সম্বন্ধে অচেতন দুটি মাত্র দুর্বল অশ্বারোহীর ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাচ্ছে! এর পরও শান্ত থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

শ বলল, "তুমি ঐ বাঁ-দিকের ঝাঁকটা ধরো। আমি এই সামনের গুলোকে দেখছি।"

ঘোড়া ছুটিয়ে সে তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ; তাকে আর দেখতে পেলাম না। একটি বন্ধনীর সাহায্যে আমার হাতের কব্জির সঙ্গে বাঁধা ছিল একটি ভারী ওজনের ইণ্ডিয়ান চাবুক। সেটি আমি হাওয়ায় দুলিয়ে, তাই দিয়ে আমার বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার ঘোড়ার গায়ে আঘাত করলাম। ঘোড়াটা লম্বা পা ফেলে ফেলে মাটির গা ঘেঁষে তীরবেগে ছুটল। আমি আমার সামনে ধুলোর মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু জানতাম ঐ মেঘের আড়ালে রয়েছে শত শত

মহিষ। মনে হয় যেন চোখের পলকে আমি ঢুকে গেলাম; সেখানে ধুলোয় দম আট্‌কে আসতে লাগল আর পলায়মান জানোয়ারগুলোর খুরের খটাখট্‌ আওয়াজে কানে তালা লাগবার যোগাড়। কিন্তু তখন আমি শিকারের নেশায় মাতাল, মহিষের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবছি না। এই ধুলোর কুয়াশার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হলো একটি লম্বা কালো বস্তু। তারপর বুঝতে পারলাম একটি বস্তু নয়, ওটা একসারি মহিষ। পরমুহূর্তে ওদের এত কাছে গিয়ে পড়লাম যে বন্দুক দিয়েই ওদের স্পর্শ করতে পারতাম। হঠাৎ মহা বিস্ময়ে দেখলাম জানোয়ারগুলো খুরগুলো ওপরদিকে তুলে লেজগুলো শূন্যে দোলাতে দোলাতে যেন ধুলোর মেঘের মধ্য দিয়ে হঠাৎ আমার চোখের সামনে মাটির ভেতরে ডুবে গেল। সে-দৃশ্যটি এখনো জীবন্ত ছবির মতো আমার মনে জেগে রয়েছে। আমরা অজ্ঞাতসারে একটা খাদের ওপর এসে পড়েছিলাম। (তখন আমার ঠিক প্রস্থ আর গভীরতা অনুমান করবার মতো অবস্থা ছিল না, কিন্তু পরে ঐ জায়গায় যখন এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম খাদটা প্রায় বারো ফুট গভীর, আর তলায় এর দ্বিগুণ চওড়াও নয়।)

থেমে পড়তে পারলে অবশ্যই থেমে পড়তাম, কিন্তু তখন থেমে পড়া আর সম্ভব ছিল না। ঘোড়া-শুদ্ধ আমি খাদের তলায় পড়ে গেলাম আল্‌গা নরম বালুর ওপর। হঠাৎ ঝাঁকানির ঝোঁকে আমি ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়লাম, আর একটু হলেই ওর ঘাডের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মহিষগুলোর ভিড়ের ভেতর গিয়ে পড়তাম। ধুলোর কুয়াশায় দিশাহারা মহিষগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি করছিল। আমার ঘোড়াটা চট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়ে বেড়ালের মতো মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে উল্‌টো দিক দিয়ে খাদের ওপরে উঠতে লাগল। একবার ভয় হলো ঘোড়াটা পিছনদিকে পড়ে গিয়ে আমাকে পিষে ফেলবে, কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টায় সামলে নিয়ে খাদ ছাড়িয়ে মুক্ত প্রেয়ারির ওপর উঠে এলো। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম ধুলোয় ভরা খাদের কিনারার ওপর মাথা বাড়িয়েছে একটা মহিষ, সামনের দুটো পা দিয়ে যেন কিনারাটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

আমি তারপর মহিষের ঝাঁকের প্রায় ভিতরেই গিয়ে পড়লাম। তাদের তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে, আর আমি ওদের ভেতর শুধু মদ্দাই দেখতে পাচ্ছিলাম, মহিষী একটিও নয়। মদ্দা মহিষগুলো সবসময়ে দলের পিছনে থাকে মহিষীগুলোকে নিরাপদ রাখবার জন্য। তাদের মধ্য দিয়ে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওরা ছুটতে-ছুটতেই এক এক বার মাথা নীচু করে আমার ঘোড়াটাকে শিঙের খোঁচা মেরে আহত করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তাদের সামনের

দিকে দ্রুত ছোটার মুখে পাশের দিকে মাঝে মাঝে এই আক্রমণগুলিতে তেমন জোর ছিল না, তাছাড়া পলিন আমায় নিয়ে এত দ্রুত ছুটছিল যে মহিষগুলো গুঁতোতে এসে পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। ক্রমে ঝাঁকের ভেতর কতকগুলো মহিষী দৃষ্টিগোচর হলো। এদের ভেতর ঠিক আমার সামনের জানোয়ারটিকে আমার পছন্দ হলো, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তার পাশাপাশি চলে গেলাম। লাগাম নামিয়ে রেখে বন্দুকের মুখটা তার ঘাড়ের এক ফুটের মধ্যে নিয়ে গুলী চালালাম। মহিষীটা বিদ্যুদ্বেগে পলিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু পলিন ওর আক্রমণ এড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। আমি সেই হট্টগোলের ভেতর আহত জানোয়ারটার ওপর ঠিক নজর রাখতে পারলাম না। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল মহিষীটা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, দলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ছুটে আসতে পারেনি। তাই ঘোড়া থামালাম। মহিষের ভিড় তখন দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধুলো আর হট্টগোল মিলিয়ে গেল। প্রেয়ারির ওপর আমি লক্ষ্য করলাম সেই মহিষীটা একা কোনোরকমে ভারী শরীরটাকে বয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ছুটে চলছে, দলের অনেক পিছনে। অবিলম্বেই আমি আর আমার শিকার পাশাপাশি চললাম। আমার আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সব খালি। আমার গুলীর থলিতে ছিল শুধু রাইফেলের গুলী, পিস্তলের পক্ষে বেশী বড় অথচ আমার সঙ্গের বন্দুকটির পক্ষে বেশী ছোট। তবু সেই গুলীই বন্দুকে ভরলাম, কিন্তু গুলী চালাবার জন্য বন্দুক তুলতেই ছোট্ট গুলী বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল আর বারুদটা ফেটে একটু হাল্‌কা আওয়াজ করতে লাগল মাত্র। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে মহিষীটার আগে চলে গিয়ে ওকে ফেরাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে চোখ পাকিয়ে মাথা নীচু করে ভীষণভাবে আমার দিকে শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো। বার বার তাকে এভাবে আট্‌কাতে গেলাম, বার বার সে ঐ একই ভাবে তেড়ে আসতে লাগল, কিন্তু পলিন বার বার সেই আক্রমণ অনায়াসেই এড়াতে লাগল। শেষকালে মহিষীটা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার জিভটা লম্বা হয়ে ঝুলে রইল।

ঘোড়া ছুটিয়ে একটু দূরে চলে গিয়ে আমি নেমে পড়লাম, ভাবলাম বন্দুকে গাদবার জন্য কিছু ঘাস সংগ্রহ করব, তারপর বন্দুকে গুলী ভরব। আমি মাটিতে পা দিতে-না-দিতেই মহিষীটা আমার দিকে এমন ভীষণভাবে তেড়ে এলো যে আমি চট্ করে আবার পলিনের পিঠে উঠে বসলাম। কয়েক মিনিট বাদে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে গিয়ে ছুরি মেরে ওকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পলিন আরেকটু হলেই মহিষীটার শিঙের গুঁতোয় ঘায়েল

হতো। শেষকালে আমার হঠাৎ মনে পড়ল আমার প্যান্টের জোড়গুলো থেকে বেরিয়ে-থাকা আঁশগুলোর কথা। সেই আঁশ কতকগুলো ছিঁড়ে নিয়ে বন্দুকের নলের ভেতর গুঁজে দিলাম ছোট গুলীটাকে নলের ভেতর এঁটে রাখবার জন্য। তারপর আবার বন্দুকে গুলী ভরে আহত জানোয়ারটার হৃদ্‌যন্ত্র লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়ে জানোয়ারটার প্রাণহীন দেহ প্রেয়ারির বুকে লুটিয়ে পড়ল। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম যে-জানোয়ারটাকে মহিষী ভেবে এতক্ষণ ধরে শিকার করে হত্যা করলাম সেটা আসলে একটি বছরখানেক বয়সের বাচ্চা মহিষ। তার এত তেজের রহস্য এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি তখন বাচ্চাটার জিভটা কেটে নিয়ে আমার জিনের পিছনদিকে বেঁধে রেখে দিলাম। আমার এই যে ভুল হয়েছিল, অমন ধুলোর ঝড়ের ভেতর আর শিকারের ঐ বিষম হট্টগোলে আমার চাইতে অনেক বেশী অভিজ্ঞ চোখেরও অমন ভুল অনায়াসেই হতে পারত।

এরপরই প্রথম সুযোগ পেলাম বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আমার চারধারের দৃশ্য তাকিয়ে দেখবার। সামনের প্রেয়ারি কালো হয়ে গিয়েছিল পলায়মান মহিষের ভিড়ে, আর নদীর দু'ধারের নীচু সমতলভূমিগুলোতেও আসছিল সারি সারি অনেক মহিষ। আর্কেনসাস সেখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে। আমি ধীরে ধীরে সেইদিকে এগিয়ে চললাম। এর অনেকক্ষণ পরে বহুদূরে দেখতে পেলাম আমাদের গাড়িটার সাদা আচ্ছাদন আর তার সামনে পিছনে ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো ঘোড়-সওয়ার। ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে চিনতে পারলাম শ-র পরিচ্ছন্ন সুন্দর জামা, তার লাল ফ্লানেলের শার্টটি, যা দূর থেকেও পরিষ্কার চোখে পড়ে। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম শিকারে কিছু হলো কিনা। শ বলল, সে একটা মহিষীকে দুটি গুলীতে মারাত্মকভাবে আহত করেছিল। কিন্তু সেই বিকেলে আমরা কেউই শিকারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আর আমার মতোই শ-রও থলিতে বাড়তি গুলী ছিল না, তাই সে আহত মহিষীটাকে ছেড়ে দিয়েছিল হেনরি শ্যাটিলনের হাতে। তারপর হেনরি শ্যাটিলন মহিষীটাকে তার রাইফেল থেকে গুলী চালিয়ে খতম করে যতটা সম্ভব মাংস ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল।

আমরা নদীর কাছাকাছি তাঁবু ফেললাম। রাত্রিটা ছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকার রাতে শুয়ে শুয়ে আমরা শুনতে লাগলাম নেকড়েদের বিকট চীৎকার আর মহিষগুলোর গম্ভীর গর্জন; এই দু'রকমের আওয়াজ এক হয়ে শোনা যাচ্ছিল সুদূর তটে আছড়ে-পড়া সমুদ্রতরঙ্গের আওয়াজের মতো।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মহিষ-শিকারের শিবির

আমাদের শিবিরে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল জিম গার্নি আর নিষ্ক্রিয়তায় চ্যাম্পিয়ন ছিল এলিস। এদের পারস্পরিক বিরাগও ছিল দেখবার জিনিস। কোনো ভোরেই ঠেলে না তুললে এলিস উঠত না, কিন্তু জিম ভোর না হতেই নির্ঘাত উঠে পড়ত। আজকের ভোরেও যথারীতি আমাদের ঘুম ভাঙল তারই কণ্ঠস্বরে: "এবার উঠে পড়ো হে বোকচন্দর! পারো তো শুধু গিল্‌তে আর নাক ডাকাতে। বক্‌বক্‌ না করে বিছানা ছেড়ে উঠে এসো, নইলে তোমার বিছানা আমি টেনে বার করে দেবো।"

এই কথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জিম কতকগুলো অব্যয় লাগিয়ে তার কথাগুলোকে আরো জোরালো করে তুলল। এলিস ঘুম-জড়ানো চোখে নাকী স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল, লম্বা হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে বিশ্রী-রকম একটা হাই তুলল, আর সবশেষে লম্বা শরীর নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে ঘুরে দেখে নিল। ডেস্‌লরিয়ার্স শীগ্‌গীরই আগুন ধরাল; ঘোড়া আর অশ্বতরগুলো ছাড়া পেয়ে পাশের মাঠে ঘাস খেতে লাগল। আমরা যখন ভোরাই খানা খেতে বসলাম, প্রেয়ারির বুকে ভোরের আলো তখনো ঝাপ্‌সা। তারপর যখন সূর্য উঠল আমরা ঘোড়ায় চড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

মান্‌রো চেঁচিয়ে বলল, "একটা সাদা মহিষ!"

শ বলল, "ওকে আমার চাই-ই। ওর পিছনে ছুটে আমার ঘোড়াটা হাঁফিয়ে মরলেও।" বলে সে তার বন্দুকের খোলটা ডেস্‌লরিয়ার্সের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

হেনরি শ্যাটিলন চীৎকার করে বলতে লাগল, "থামুন, মিস্টার শ, থামুন। ঘোড়াটাকে মিছেই ছুটিয়ে মারবেন। ওটা সাদা মহিষ নয়, সাদা ষাঁড়।"

কিন্তু শ্যাটিলন চেঁচালে হবে কি, শ তখন শোনার বাইরে চলে গেছে। ষাঁড়টা, সম্ভবতঃ সরকারী ওয়াগনের সারিগুলোর ভেতর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে প'ড়ে, দাঁড়িয়ে ছিল সমতলভূমির একপ্রান্তে কতকগুলো নীচু পাহাড়ের তলায়। তারই কিছুদূরে একদল খাঁটি মহিষ চরে বেড়াচ্ছিল। শ কাছাকাছি যেতেই তারা ছুট

লাগাল আর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল ওপরের প্রেয়ারিতে চলে যাবে বলে। ওদের ভেতর একটি বিষম আতঙ্কে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে নিজেকে মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে ফেলল। পাহাড়গুলির পাদদেশে এক লম্বা ফালি ছিল গভীর জলা জমির। মহিষটা ঐ জলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায়ভাবে কাদায় ডুবে গেল। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে ঐখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মহিষটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, আর যতই সে কাদা ছাড়িয়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল ততই কাদায় ডুবে যেতে লাগল। আমরা ওর চেষ্টাকে আরো জোরদার করবার জন্য ওর পিছনে গিয়ে ওর লেজটাকে মোচড়াতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। পরিষ্কার বোঝা গেল ওর আর কোনো আশা নেই। শেষকালে সে যেন হতাশ হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। এলিস ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামল, আর তার বড় গর্বের ভারী বন্দুকটা বাগিয়ে মহিষটার বুকে গুলী চালিয়ে দিল; তারপর অলস ভঙ্গিতে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। তার মনে বোধ হয় তখন এই গর্ব যে সে সত্যিই একটা মহিষ মেরেছে। সেদিন সেই অপরাজেয় বন্দুকটি আমাদের সমগ্র যাত্রা-অভিযানে প্রথম ও শেষ রক্তপাত ঘটাল।

সেদিনকার ভোরবেলাটা ছিল বেশ উজ্জ্বল আর আনন্দময়। আবহাওয়াও এত পরিষ্কার যে, সুদূর দিগন্তেও হাল্‌কা নীল প্রেয়ারির সীমান্ত আকাশের বুকে যেন পরিষ্কার আঁকা দেখতে পাচ্ছিলাম। শ ছিল তখন শিকারের মেজাজে। সে আমাদের দলের আগে আগে চলল। শীগ্‌গীরই আমরা প্রেয়ারির এক সবুজ উঁচু অংশের ওপর দেখলাম একসারি মহিষ দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। শ তাদের পিছনে ছুটে এলো; তার লাল শার্টটা দূর থেকে ভালোই দেখাচ্ছিল। সে ক্রমেই পলায়মান জানোয়ার-গুলির আরো বেশী কাছে এসে পড়ছিল। তারপর সবচেয়ে আগের মহিষটি যখন উঁচু জায়গাটার মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়ে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন শ-কে দেখলাম একেবারে সবার পিছনের মহিষটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত। তার বন্দুকের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠল আর হাল্‌কা সাদা মেঘের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। দেখলাম মহিষটা শ-র দিকে ছুটে আসছে। তারপর উঁচু জমির আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা এগিয়ে চললাম, তারপর দুপুরের কাছাকাছি আর্কেনসাস নদীর ধারে থামলাম। তখনই দেখলাম শ নেমে আসছে ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে। তার ঘোড়াটা তখন শ্রান্ত, অবসন্নপ্রায়। শ তার জিনটা খুলে মাটির ওপর ছুঁড়ে রাখল। লক্ষ্য করলাম জিনের পিছনে দুটি মহিষের লেজ ঝুলছে। ঘোড়াগুলোকে

যখন মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন হেনরি মান্‌রোকে তার সঙ্গে আসতে ব'লে, তার বন্দুকটা নিয়ে ধীরভাবে হেঁটে চলে গেল। শ, লাল-মাথা আর আমি গাড়িটার ধারে বসে ডেস্‌লরিয়ার্সে'র পরিবেশিত খানা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। এ আলোচনা শেষ না হতেই দেখলাম নদীর তীর বেয়ে মান্‌রো হেঁটেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলল, হেনরি চারটি বেশ মোটাসোটা মহিষী মেরেছে, এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে মাংস বয়ে নিয়ে আসবার জন্য কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে যেতে। শ নিজের জন্য একটা ঘোড়া নিল, হেনরির জন্য আরেকটা, তারপর সে আর মান্‌রো একসঙ্গে তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে তারা তিনজনই ফিরে এলো, ঘোড়াগুলোর পিঠে মাংস বোঝাই। দুটি মহিষীর মাংস আমাদের জন্য রেখে বাকিগুলো দিয়ে দিলাম মান্‌রো আর তার সঙ্গীদের। ডেস্‌লরিয়ার্স ঘাসের ওপর বসল মাংসের স্তূপ নিয়ে, আর বেশ পরিশ্রম সহকারে মাংসগুলোকে লম্বা লম্বা ফালি করে কাটতে লাগল। এ ব্যাপারে তার দক্ষতা ছিল ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের মতো। রাতের অনেক আগে তাঁবুর চারধারে কাঁচা চামড়ার দড়ি টাঙানো হলো আর তাদেরই ওপর মাংসের ফালিগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হলো রোদে আর প্রেয়ারির খাঁটি হাওয়ায় শুকোবে বলে। আমাদের ক্যালিফর্নিয়া-কোম্পানিরা এ কাজে এতটা সফল হতে পারেনি, কিন্তু এ কাজটি তারা তাদের নিজেদের কায়দায় করে নিয়েছিল; তাদের তাঁবুও তাই আমাদের তাঁবুর মতোই মাংসে সুশোভিত রূপ ধারণ করল।

আমরা ঠিক করলাম এইখানেই থাকব যতদিন না সীমান্ত-যাত্রার পথের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট খাদ্য (অর্থাৎ শুকানো মাংস) সংগৃহীত না হয়। এই যাত্রার দূরত্ব যদি দ্বিগুণও হতো আর যাত্রীদলটাও দশগুণ বড়, তাহলেও হেনরি শ্যাটিলনের বন্দুক দু'দিনের ভেতর আমাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করে দিতে পারত। কিন্তু মাংসগুলো বয়ে নিয়ে যাবার মতো শুক্‌নো না হওয়া পর্যন্ত তো আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে এখানে, সুতরাং আমরা সেইভাবেই তাঁবু খাটালাম, আর কিছুদিনের মতো স্থায়ী শিবিরের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও যা করবার করলাম। ক্যালিফর্নিয়ার লোকদের আমাদের মতো তাঁবুর সরঞ্জাম ছিল না, কাজেই তাদের আগুনের চারদিকে তাদের মালপত্রগুলি সাজিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এবং ইতিমধ্যে নানা ভাবে নিজেদের চিত্তবিনোদন করে সময় কাটানো ছাড়া আমাদের কিছু করবারও ছিল না। আমাদের তাঁবুটা ছিল নদীর খুবই কাছে, অবশ্য যদি অমন ক্ষীণ স্রোতকে নদী নামে অভিহিত করা চলে। দু'পাশের বিরাট চ্যাপ্‌টা সমতলভূমিগুলো প্রায়

এই 'নদী'টির বালুশয্যারই সমতল, আর দু'দিকেই সমতলভূমির সীমান্তের পরেই নীচু, বৈচিত্র্যহীন পাহাড়শ্রেণী, 'নদী'টির সমান্তরাল। সমতলভূমি জুড়ে শুধু ঘাস আর ঘাস, বনের চিহ্নও নেই, শুধু নদীর ভেজা বালুর দুটি দ্বীপের ওপরকার কয়েকটি গাছ আর ছোট্ট ঝোপ ছাড়া। তবুও এ দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন এবং বিরক্তিকর মনে হতো না, বরং মাঝে মাঝে বেশ দুর্দান্ত এবং প্রাণবন্তই হয়ে উঠত ; কারণ দিনে দু'বার, সূর্যোদয়কালে আর দুপুরে, মহিষের ঝাঁক বেরিয়ে আসত পাহাড় থেকে নেমে নদীতে জল পান করতে। আমাদের যা-কিছু আমোদ হতো তাদের নিয়েই। বুড়ো মহিষ হচ্ছে কুৎসিতের চরম। ওর দিকে প্রথম দর্শনেই মন থেকে দয়া, মায়া, সহানুভূতি একেবারেই মুছে যায়। মহিষীগুলো স্বভাবতঃই মহিষদের চাইতে ছোট এবং শান্ত হয়। এই তাঁবুতে থাকার সময় আমরা নিজেরা মহিষীদের আক্রমণ করা ছেড়ে দিলাম ; আমাদের প্রয়োজনমতো তাদের হত্যা করার ভার দিয়ে রাখলাম হেনরি শ্যাটিলনকে। কিন্তু মহিষদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধঘোষণা চালুই রইল। তাদের সংখ্যা মহিষীদের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশী ; কাজেই হাজার হাজার মহিষ নিহত হলেও মহিষ-জাতটার তেমন কোনোরকম বিশেষ ক্ষতি হতো না। মহিষীদের চামড়াই শুধু ব্যবসায়ের নানা কাজে এবং তাঁবু-তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের ধ্বংস সেইজন্যই অনুপাতে বড় বেশী বলে মনে হয়।

আমাদের ঘোড়াগুলো হয়রান হয়ে উঠেছিল ; আমরা তাই পায়ে হেঁটে শিকার করতাম। খাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে যখন ধূমপান করতাম, কথাবার্তা বলতাম অথবা লাল-মাথার সঙ্গে তামাসা করতাম, তখন আমাদের মধ্যে একজন তাকিয়ে দেখত নদীর ওধারে কতকগুলো কালো জিনিস এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সে পাইপে একটি বিদায়ী টান মেরে, গাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা বন্দুকটি তুলে নিয়ে, বন্দুকের গুলীর থলে আর বারুদের চোঙ পিঠে ঝুলিয়ে, পায়ের মোকাসিন হাতে নিয়ে বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে নদীর ওপারে চলে যেতো। এ কাজটি বেশ সহজ, কারণ যদিও বালুগুলো প্রায় সিকি মাইল প্রশস্ত, জল কোথাও দু'ফুটের বেশী গভীর ছিল না। নদীর কিনারায় লম্বা ঘাস। হাত দিয়ে এই ঘাস সরিয়ে, এর ভেতর দিয়ে সতর্কভাবে তাকিয়ে শিকারী দেখতে পাবে মহিষের বিশাল কালো লোমশ পিঠটি এদিক-ওদিক দুলছে নদীতে আসতে আসতে। মহিষেরা জল পান করতে নদীতে আসে কতকগুলো নির্দিষ্ট পথে। এই পথের কোন্‌টি বেয়ে তার শিকারটি এগিয়ে আসছে সেটা একদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে শিকারী কী করে ? সেই পথটি যেখানে গিয়ে নদীতে মিশেছে, সেখান থেকে পনেরো-কুড়ি গজের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। এখানে

সে অতিশয় শান্তভাবে বসে থাকে বালুর ওপর। খুব মন দিয়ে কান পেতে শোনে ভারী, একঘেয়ে সেই মহিষের পদধ্বনি, যে আসে—আসে—আসে! একটা বিরাট মাথা বেরিয়ে আসে, শিংগুলিই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। তারপর মহিষটা নেমে যায় নদীর ভেতর। বালুর ওপর একটা ফাঁকা জায়গায় সে এসে দাঁড়ায়। তার সম্মুখ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদীর স্রোত। মহিষটি নদীর জলে মুখ নীচু করে তৃষ্ণা মেটায়। তার কণ্ঠনালী দিয়ে জল নেমে যাওয়ার আওয়াজও শুনতে পাওয়া যায়। তারপর সে মাথা তুলে পরম নিশ্চিন্ত মূর্খের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। শিকারী নিঃশব্দে তার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে গুলী চালাবার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে না। মহিষটা ধীরে ধীরে এগোতেই তার কাঁধের কাছে একটি মর্মস্থান অরক্ষিত হয়ে পড়ে। শিকারী তার বন্দুকের ঘোড়া টেনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুটবার আওয়াজ, আর মহিষ-দেহের সেই মর্মস্থানের ঠিক মাঝখানে একটি লাল চিহ্ন দেখা দেয়। মহিষটা একবার কেঁপে ওঠে। মহিষটি কেঁপে ওঠে ; তার মৃত্যু এসেছে, তবু সে চেষ্টা করে এগিয়ে চলতে, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু বালু বেয়ে কিছুদূর গিয়েই আবার সে পড়ে যায়। তারপর মৃত্যু।

ওৎ পেতে থাকা, আর ওরা নদীতে তৃষ্ণা মেটাতে এলেই ঘায়েল করা—মহিষ-শিকারের এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পন্থা।

এখানে আমাদের অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে হেনরি বিকেলে চলে গেল শিকারে। শ আর আমি তাঁবুতে রইলাম। তারপর নদীর অন্য দিক দিয়ে কতকগুলো মহিষ জলের দিকে আসছে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম তাদের শিকার করতে। তারা এত কাছে যে, কোনোরকম আড়ালে গা-ঢাকা দেবার আগেই তারা আমাদের দেখে ফেলল। গুলীর পাল্লার ভেতরে পড়বার আগেই তারা ডানদিকে নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে যেতে লাগল। আমি নদীর পাড়ে উঠে তাদের পিছনে ছুটলাম। তারা দ্রুত চলছিল ; আমি গুলী চালাবার পাল্লার ভেতরে তাদের পাবার আগেই তারা একবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। তার আগে আমি মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্য তারা থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের ওপর অদ্ভুত জিনিসটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার ঘুরে গিয়ে যেমন চলে যাচ্ছিল তেমনি চলে যেতে লাগল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে আবার ওদের পিছু নিয়ে ছুটলাম। আবার তারা ঘুরে দাঁড়াল, আবার আমি মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। তিন-চারবার এরকম করে অবশেষে আমি ওদের একশো গজের মধ্যে এসে পড়লাম। এরপর আবার যখন ওরা ঘুরে দাঁড়াল, আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম। ওদের মাঝখানে

যে মহিষটা ছিল, অতবড় মহিষ আমি আগে আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে ঠিক কাঁধের পিছনে গুলী মেরে ঘায়েল করলাম। ওর সঙ্গী দুটি পালিয়ে গেল। আহত মহিষটাও পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই শান্তভাবে এমনভাবে শুয়ে পড়ল যেমনভাবে শুয়ে ষাঁড়গুলো রোমন্থন করে। সতর্কভাবে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর নিষ্প্রভ জেলির মতো চোখ দুটি দেখে বুঝলাম ওর দেহে প্রাণ নেই।

শিকার যখন শুরু করেছিলাম তখন প্রেয়ারি ছিল প্রায় নির্জন ; বিরাট-সংখ্যক মহিষ হঠাৎ এসে এর ওপর ভিড় করেছিল। মুখ তুলে দেখলাম কিছু দূর থেকেই ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু মহিষের ভিড়। আমি পায়ে হেঁটে ঐদিকে গেলাম ; আমাকে আসতে দেখে ওরা মোটেই ভয় পেল না। দেখলাম ঐ দলটা প্রায় পুরোপুরি মহিষী আর বাচ্চা মহিষ দিয়ে গড়া। আমি কাছে যেতেই ওরা যেরকম ভীষণ হিংস্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, তাতে আর এগোতে ভরসা পেলাম না। মাটিতে বসে পড়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কখনো ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল, সবগুলো মাথা একদিকে তাকিয়ে ; তারপর যেন সবাই একসঙ্গে হঠাৎ খেয়ালে মৃদুগতিতে ছুটতে শুরু করল, তাদের শিং আর খুরগুলো একসঙ্গে খটাখট্ আওয়াজ করতে লাগল। হঠাৎ শুনতে শুরু করলাম কিছু দূরে পর-পর রাইফেলের গুলীর আওয়াজ,আর তার পরে-পরেই শ-র দোনলা বন্দুকের পরিচিত আওয়াজ। হেনরির রাইফেল যখনই চলত, তার পরেই মাংস বয়ে আনা দরকার হতো। আমি কাজে-কাজেই নদী পার হয়ে ফিরে গেলাম, তারপর তাঁবু থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে চলে গেলাম যেখানে শিকারীরা দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে প্রেয়ারির বুকে মহিষ দেখা যাচ্ছিল। যেগুলো বেঁচে ছিল সেগুলো মাঠ থেকে পশ্চাদপসরণ করেছিল, কিন্তু দশ-বারোটা মরা মহিষ এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। হেনরি ছুরি হাতে একটি মৃতা মহিষীর ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটির দেহ থেকে ভালো ভালো জায়গার মাংসগুলো কেটে কেটে নিচ্ছিল।

আমাকে ছেড়ে শ কিছু দূর হেঁটে চলে গিয়েছিল নদীর ধারে নীচের দিকে, আরেকটি মহিষের সন্ধানে। অবশেষে সে দেখল সমতলভূমিগুলো ছেয়ে গেছে মহিষে, আর একটু বাদেই শুনতে পেলো হেনরির রাইফেলের আওয়াজ। উঁচু পাড় বেয়ে উঠে সে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই অগ্রসর হলো। কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলো প্রেয়ারির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি, প্রায় মহিষ-বেষ্টিত হয়ে। হেনরিকে তখন তার স্বরূপে দেখা গেল। কেউ তাকে দেখছে সেদিকে তার খেয়াল নেই, সে তার লম্বা দেহটা সোজা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

এক হাত দেহের একধারে, অন্য হাত নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে তার রাইফেলের নলের মুখে। তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার চারধারের জানোয়ারগুলোর ওপর। মাঝে মাঝে এক-একটা মহিষী দেখে তার পছন্দ হচ্ছিল, আর সে রাইফেল চালিয়ে সেটাকে গুলী মেরে হত্যা করছিল। করেই আবার তেমনি আগেকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। মহিষগুলোর ভাবটা যেন হেনরিও ওদেরই একজন, ওকে তারা আলাদা করে খেয়াল করছিল না। পুরুষ মহিষগুলো নিজেদের ভেতর ঠেলাঠেলি করতে করতে মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছিল আর ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। এক এক দল মহিষ মাঝে মাঝে একটা মরা মহিষীকে ঘিরে তার ক্ষতস্থানগুলোর গন্ধ শুঁকছিল ; কখনো কখনো বা তারা এসে যে মহিষীগুলোর তখনো পতন ঘটেনি তাদের সে-জায়গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। কখনো কখনো কোনো বুড়ো মহিষ এসে হেনরির মুখের দিকে বোকার মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকছিল, কিন্তু হেনরিকে আক্রমণ করা কিংবা তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা কারও মনে হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ ধরে শ ঘাসের আড়ালেই শুয়ে রইল সবিস্ময়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে। তারপর সে খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে মৃদুস্বরে হেনরির সঙ্গে কথা বলল। হেনরি বলল, "উঠে এসো।" শ উঠে গেল, তবু মহিষগুলো ভয়ের কোনোরকম চিহ্ন দেখাল না ; তারা তাদের মৃত সঙ্গী-সঙ্গিনীদের চারদিকে ছড়িয়ে রইল। আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যতগুলো মহিষী মারা দরকার, ততগুলো মারা হয়ে গিয়েছিল হেনরির। একটি মৃতদেহের আড়ালে বসে শ পাঁচটা মহিষ গুলী করে মারার পর বাকিগুলো পালিয়ে গেল।

মহিষগুলো যে প্রায়ই এরকম নির্বোধ এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সেটা আরো অদ্ভুত মনে হয় এই কারণে যে, অন্যান্য সময়ে এদেরই আবার ভীষণ দুর্দান্ত এবং হুঁশিয়ার দেখা যায়। ওদের এইজাতীয় সমস্ত বিশেষত্বগুলিই হেনরির জানা ছিল ; পণ্ডিত পড়ুয়ারা যেমন যত্ন করে তাঁদের বই পড়েন, হেনরিও তেমনি যত্ন করে এদের স্বভাবচরিত্র আর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান অর্জন করেছিল, এবং এতে সে প্রচুর আনন্দ পেতো। মহিষগুলো ছিল একহিসেবে তার সঙ্গী ; সে বলত কাছাকাছি মহিষ থাকলে সে কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করত না। শিকার-দক্ষতার জন্য সে গর্ববোধ করত। এমনিতে সে ছিল আশ্চর্য বিনয়ী ; কিন্তু তার সরল, সহজ, অকপট স্বভাবের মধ্য দিয়ে তার এই বিশ্বাসটাই প্রকাশ পেতো যে শিকারের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তার নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে তার যে ধারণা ছিল, তা অন্যের ধারণার চাইতে উঁচু না হয়ে বরং একটু নীচুর দিকেই ছিল। শুধু

একবার মাত্র তার মুখে বিরক্তি-মিশ্রিত ঘৃণার ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সে হলো যখন তুটি স্বেচ্ছাসৈনিক জীবনে প্রথমবার মহিষ মেরেই তাকে উপদেশ দিতে গিয়েছিল কিভাবে মহিষ-শিকারে 'অগ্রসর' হতে হয়। হেনরি যেন সবসময় ভাবত মহিষের ওপর তার একরকম জন্মগত অধিকার, মহিষ যেন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এলোমেলো অকারণ হত্যা দেখলে সে ভীষণ চটে উঠত, আর তার মতে মহিষের বাচ্চা হত্যা করা একটি মহাপাপ।

হেনরি শ্যাটিলন আর লাল-মাথা ছিল সমবয়সী, অর্থাৎ ত্রিশের কাছাকাছি। সমতাটা শুধু বয়সেই ; হেনরি ছিল আয়তনে লাল-মাথার তুটির সমান, আর শক্তিতে ছ'টির। হেনরির মুখে অনেক ঝড-ঝাপ্টা-সওয়া কঠোরতার চেহারা, আর লাল-মাথার মুখ মাতালের মুখের মতো ফোলা-ফোলা। হেনরির মুখে শুধু ইণ্ডিয়ানদের আর মহিষের কথা, আর লাল-মাথার প্রিয় ছিল থিয়েটার আর খাওয়া-দাওয়ার গল্প। হেনরির জীবন ছিল তুঃখসহন আর সংযমের ; আর লাল-মাথার হেন খামখেয়াল ছিল না যা সে এতটুকু সুযোগ পেলেই চরিতার্থ করত না। তাছাড়া হেনরির মতো অমন নিস্পৃহ নিঃস্বার্থ মানুষ আমার চোখে আর একটিও পড়েনি ; আর লাল-মাথা এমনিতে দিব্বি ভালো স্বভাব আর ভালো মেজাজের মানুষ হলেও নিজের স্বার্থটুকু ছাডা আর কারো কথা ভাবত না। তবু কিন্তু তাকে হারাবার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না, সে আমাদের ভাঁড়ের কাজ করত, সে নইলে আমাদের শিবির প্রাণহীন, বিস্বাদ হয়ে যেতো। গত এক সপ্তাহ ধরে লোকটা আশ্চর্যরকম মুটিয়েছিল ; এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ ওর বুভুক্ষা ছিল রাক্ষুসে ধরনের, আর ভোর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত তার চলত খাওয়ার পর খাওয়া ; আদ্ধেক সময় দেখা যেতো সে নিজে একলা খাবার জন্যে কিছু খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। কফির পেয়ালায়ও সে চুমুক দিত দিনে আট-দশবার করে। এই সাতদিনের ভেতর তার বিষণ্ন মলিন মুখ হয়ে উঠেছিল হাসি-হাসি লাল মুখ ; কোটরগত চক্ষু যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছিল গল্‌দাচিংড়ির চোখের মতো ; এবং যে মানুষ সাতদিন আগেও ছিল হতাশায় বিষাদে বিমর্ষ, সে-মানুষ এই সাতদিনে বদ্‌লে গিয়ে আনন্দে যেন ফেটে পড়ছিল, সারাদিন তার গান গাওয়া, শিস দেওয়া, হাসি আর গল্প বলার যেন আর শেষ নেই। জিম গার্নিকে সে যমের মতো ভয় করতো, তাই সে যথাসম্ভব আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই থাকত। নীচু শ্রেণীর তুরন্ত জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল প্রচুর, তাই সে ছিল বহু বিচিত্র রঙ্গরস আর গালগল্পের ভাণ্ডার। তার বলা কাহিনীগুলো ছিল ভারি মজাদার, আর আমাদের হাসাবার জন্যে কাহিনীর ভেতর নিজেকে হাস্যাস্পদ

বানাতেও তার এতটুকু আপত্তি ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য লাল-মাথা বড় জ্বালাতন করত ; তার ছিল যখন-তখন খাবার চুরি করার অভ্যাস। বিদ্রূপকে সে পরোয়া করত না, সমস্ত দলের বিদ্রূপের ভয়েও এই স্বভাবটি সে ছাড়তে পারত না। মাঝে মাঝে অবশ্য বিদ্রূপের চাইতেও কড়া কিছু এজন্য তার কপালে জুটত ; তখন সে সাময়িকভাবে খানিকটা অনুতপ্ত ভাব দেখাত বটে, কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদেই আবার দেখা যেতো চুপিচুপি সে চলে গেছে গাড়ির পিছনদিকের বাক্সটির কাছে আর রাতের খানার জন্য ডেস্‌লরিয়ার্স যে খাবার আলাদা করে রেখে দিয়েছে তাই থেকে কিছু সরাচ্ছে। ধূমপানে ছিল তার বিশেষ আনন্দ ; কিন্তু তার নিজের তামাক ছিল না বলে তার দরকারমতো আমরাই তাকে এক এক বারে অল্প অল্প করে তামাক যোগাতাম। প্রথমে তাকে একসঙ্গে আধ পাউণ্ড দিয়েছিলাম ; কিন্তু এ পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সে তামাক তো হারালই, সেইসঙ্গে তামাক কাটবার জন্য যে ছুরি দিয়েছিলাম, সেটিও হারাল, আর মিনিট কয়েক পরেই আমাদের কাছে সেজন্য প্রচুর দুঃখ জানিয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আরো তামাক চাইল।

এ শিবিরে আমাদের দু'দিন থাকা হয়েছিল, এবং সংগৃহীত মাংসের কিছু কিছু প্রায় বয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ওপর ঝড় এলো। সূর্যাস্তের সময়ে সারা আকাশ কালির মতো কালো হয়ে উঠল, আর নদীর ধারে লম্বা ঘাসগুলো ঝড়ের প্রথম ঝাপ্‌টায় ওঠা-নামা করতে লাগল। মান্‌রো আর তার দুটি সহচর তাদের বন্দুকগুলো এনে আমাদের তাঁবুর আচ্ছাদনের তলায় নিরাপদ করে রেখে দিল। তাদের নিজেদের কোনো আশ্রয় ছিল না ; তারা ভালো কাঠ জড়ো করে এমন আগুন জ্বালাল যা বুঝি বা মুষলধারাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতো। মহিষ-চর্মের পোশাক গায়ে জড়িয়ে তারা এই আগুনের চারদিকে ঘিরে বসল যেন ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই। ডেস্‌লরিয়ার্স গাড়ির তলায় নিরাপদ আশ্রয় নিল। শ আর আমি হেনরি আর লাল-মাথাকে নিয়ে আমাদের ছোট তাঁবুতে ভিড় করে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু প্রথমে তাঁবুর ভেতর শুকানো মাংস স্তূপ করে রাখা হলো আর তার ওপর মহিষ-চর্মের পোশাক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। পোশাকগুলো খুঁটির সাহায্যে মাটির সঙ্গে আটকে দেওয়া হলো। রাত ন'টা নাগাদ ঝড় নেমে এলো ঘোর অন্ধকারে। শুরু হলো সারা প্রেয়ারির বুক জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি। আমাদের তাঁবু-আচ্ছাদন ভেদ করে বৃষ্টির ছাট আর কুয়াশা, ফলে ভেতরের সব কিছু ভিজে যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোয় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম পরস্পরকে, আর চারদিকের জনহীন ভূমি। ভাবনা হচ্ছিল আমাদের তাঁবুটার জন্য ; দু'-এক

ঘণ্টা ধরে তাঁবুটা বেশ শক্তভাবেই খাড়া রইল, অবশেষে ঝড়ের এক প্রচণ্ড ঝাপ্টায় তাঁবুর মাঝখানের খুঁটির মাথাটা ভেঙে গেল আর তাঁবুর আবরণ কিছু কিছু খসে আমাদের ওপর পড়ে গিয়ে আমাদের প্রায় দম-বন্ধ হবার যোগাড়। ভিজেও গেলাম বেশ কিছুটা। তাড়াতাড়ি আমাদের বন্দুকগুলো খাড়া করে বন্দুকের ডগা দিয়েই আবরণগুলোকে মাথার ওপর উঁচু করে রেখে, ভেজা কম্বল আর মহিষ-চর্মের পোশাকের তলায় আমরা সে-রাত্রে কয়েক ঘণ্টা কাটালাম; এই ক'টি ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ একটুও কমল না। অচিরেই আমাদের নীচে দু'-তিন ইঞ্চি জল জমে গেল। ফলে আমাদের অনেকক্ষণ ধরে বাধ্য হয়েই শীতল স্নান ভোগ করতে হলো। এসব সত্ত্বেও লাল-মাথার উৎসাহের কিছু কম্‌তি দেখা গেল না। তার হাসি, শিস-দেওয়া আর গান-গাওয়া ঝড়কে তুচ্ছ করেই অব্যাহত রইল। আমরা এতদিন ধরে তাকে যত উপহাস আর বিদ্রূপ করেছিলাম, তার শোধ সে যেন এক রাতে আমাদের দিয়ে দিল। আমরা যখন প্রাণপণে এই দুর্ভোগের কোনো একটা দার্শনিক সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিলাম, তখন সে আমাদের দুরবস্থায় মজা দেখে ঠাট্টা-তামাসা করছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষরাত্রে তিনটার কাছাকাছি মনে হলো এই দুঃসহ আশ্রয়ের চাইতে অন্ধকার রাতের ফাঁকা নিরাশ্রয়ও অনেক কম দুঃসহ হবে। এই ভেবে ভেজা ক্যান্‌ভাসের তলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন ঝড়ের প্রকোপ কমেছে, বৃষ্টিও পড়ছে একটু কম জোরে। ক্যালিফর্নিয়ার লোকদের আগুন তখনো জ্বলছে অন্ধকারের ভেতর। ওরা বসে ছিল ঐ আগুন ঘিরে; আমরা গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমরা একটু গরম কফি তৈরি করে খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিলাম। কিন্তু যখন দলের কয়েকজন আরেকটু কফি চাইল তখন টের পাওয়া গেল কফির পাত্রে যেটুকু বাড়তি কফি ছিল তার সবটাই লাল-মাথা সাবাড় করে রেখে দিয়েছে।

ভোরবেলা আমাদের মন আনন্দে ভরে মেঘমুক্ত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা প্রেয়ারি জুড়ে। আমাদের চেহারা তখন হয়ে রয়েছে অদ্ভুতরকম হাস্যকর, কারণ জলে ভিজে আমাদের ঠাণ্ডা হরিণের চামড়ার পোশাকগুলি আমাদের দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে গিয়েছিল। হাল্‌কা হাওয়ায় আর উষ্ণ রোদে আমাদের পোশাক শুকিয়ে গেল বটে, কিন্তু বিশ্রীরকম শক্ত কড়্‌কড়ে হয়ে রইল। তারপর সারাদিন প্রেয়ারিতে বিচরণ করে আর দু'-তিনটি মহিষ মারার কসরৎও পোশাকগুলির নমনীয়তা ফিরিয়ে আনবার পক্ষে যথেষ্ট হলো না।

হেনরি শ্যাটিলন ছাড়া দলে শিকারী ছিলাম আর দুজন মাত্র—শ আর আমি। মানরো সেদিন ভোরে একটা মহিষকে ঘোড়ায় চড়ে তাড়া করবার চেষ্টা করল, কিন্তু

তার ঘোড়াটা কিছুতেই মহিষ পর্যন্ত এগোতে রাজি হলো না। শ তার সঙ্গে গেল, আর তার ঘোড়াটা আরেকটু ভালো হওয়ায় সে মহিষ-দলের ভেতরে চলে যেতে পারল। তার চারদিকে শুধু মহিষী আর বাছুর মাত্র দেখে সে তার ঘোড়া থামাল। একটা বুড়ো মহিষ খোলা প্রেয়ারির ওপর দিয়ে পিছনদিক থেকে ছুটে এলো। শ সেদিকে ঘুরে গেল, তারপর মহিষটা যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেইসময় কাঁধের মধ্য দিয়ে গুলী চালিয়ে তাকে মেরে ফেলল।

মস্ত একঝাঁক বাজার্ড পাখি আমাদের তাঁবুর ঠিক তলায় একটি দ্বীপের ওপর কতকগুলো গাছের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। গতকাল সারাদিন ধরেই তাদের ভেতর একটা ঈগল পাখি দেখেছিলাম। দেখলাম আজও সে রয়েছে। লাল-মাথা বলল সে ঐ 'আমেরিকার পাখি'টাকে মারবে ; এই বলে সে ডেস্লরিয়ার্সের বন্দুকটা ধার করে নিয়ে চলল এই দেশপ্রীতিবিরোধী অভিযানে। লাল-মাথার প্রচেষ্টার ফলে ঈগলটির কিছুমাত্র ক্ষতি হলো না। হবে না যে, তা আমরা অবশ্য আগেই জানতাম। লাল-মাথা শীগ্‌গীরই ফিরে এসে বলল ঈগলটার কোনো পাত্তা মেলেনি, তাই সে তার বদলে একটা বাজার্ড পাখি মেরেছে। কথাটা সত্যি কিনা তার প্রমাণস্বরূপ পাখিটা দেখতে চাইলাম ; তখন লাল-মাথা বলল পাখিটা হয়তো পুরোপুরি মরেনি, তবে আহত নিশ্চয়ই হয়েছিল বলে মনে হয়, নইলে অমন সাত-তাড়াতাড়ি করে উড়ে পালাবে কেন ?

লাল-মাথা বলল, "বলেন তো, না-হয় ওর একটা পালক নিয়ে এসে দেখাতে পারি। গুলী মেরে ওর অনেকগুলো পালক খসিয়ে দিয়েছিলাম।"

ঠিক আমাদের তাঁবুর উল্‌টো দিকে আরেকটা দ্বীপ ছিল ঝোপে ঝোপে ভর্তি, আর তারই পিছনে ছিল একটি গভীর জলাশয় ; আর দু'-তিনটি জলস্রোতও অদূরে বয়ে চলেছিল বালুর ওপর দিয়ে। আমি এইখানে বিকেলবেলা স্নান করছিলাম, এমন সময় একটি সাদা নেক্‌ড়ে, সবচেয়ে বড় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের চাইতেও আয়তনে বড, দ্বীপের একটি কোণ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো, আর আমার একটি ঢিল-ছোঁড়ার মতো দূর দিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ে গেল। আমি তার লাল চোখ দুটি আর লম্বা নাকের পাশে খাড়া খাড়া লোমগুলি পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ও একটা কুৎসিত বদমায়েস, ওর লেজটা ঝাঁটার মতো, মাথাটা বড় আর চেহারা বিদ্‌ঘুটে। হাতের কাছে তখন বন্দুক নেই যে গুলী করব, ঢিল নেই যে ছুঁড়ে মারব ; আমি চিন্তা করছি কী ছুঁড়ে ওকে মারা যায়, এমন সময় আমাদের তাঁবুর দিক থেকে একটা বন্দুক-ছোঁড়ার আওয়াজ এলো, আর ঐ গুলী লেগে নেক্‌ড়েটার একটু দূরে খানিকটা বালু

উড়ে গেল। তাইতে ভয় পেয়ে নেকড়েটা আস্তে একটা লাফ দিয়ে তারপর এমন তীরবেগে ছুট লাগল যে, শীগ্‌গীরই তাকে দূরের বালুর বুকে একটা ছোট্ট ফুট্‌কির মতো মনে হতে লাগল।

ওপাশের প্রেয়ারিতে তখন অনেকগুলো মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে ছিল, সেগুলোই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নেকড়েদের আকর্ষণ করে আনছিল। যেখানে শ আর হেনরি একসঙ্গে শিকার করেছিল, সে-জায়গাটা তখন যেন নেকড়েদের প্রিয় বিচরণ-ভূমি, কারণ সেখানে তখন ডজনখানেক মৃত মহিষের দেহ রোদে শুকোচ্ছে। আমি প্রায়ই নদীর ধারে যেতাম নেকড়েদের খাওয়া দেখতে। নদীর পাড়ের তলায় শুয়ে শুয়ে তাদের সবাইকে একসঙ্গে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যেতো। নেক্‌ড়ে তিনরকমের : সাদা আর ধূসর নেকড়ে, দুই-ই বেশ আকারে বিরাট ; আর এই ছোট্ট প্রেয়ারির নেকড়ে, আয়তনে 'স্প্যানিয়েল' কুকুরের চাইতে বড় নয়। এগুলো একটি মৃতদেহ ঘিরে অনেকে মিলে চীৎকার আর লড়াই করে, কিন্তু এরা এমন চারদিকে নজর রাখে, তাদের সর্ব-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এত বেশী তীক্ষ্ণ, যে আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের এমন নিকট দূরত্বে আসতে পারিনি যেখান থেকে গুলী ছুঁড়লে ওদের ঘায়েল করা যাবে। আমি যখনই অমন নিকট সান্নিধ্যের চেষ্টা করতাম তখনই ওরা ছিট্‌কে পড়ে লম্বা ঘাসের আড়ালে আড়ালে পালিয়ে যেতো। এখানকার ওপরের আকাশে দেখলাম সর্বদাই বাজার্ড পাখি অথবা কালো শকুন উড়ছে, আর নেকড়েরা কোনো মরা জানোয়ারের দেহ ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এরা শূন্য থেকে নেমে এসে মৃতদেহটার ওপর এমন ঘন হয়ে পড়ছে যে ঐ মৃতদেহ লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেই এদের দু'-তিনটি একসঙ্গে ঘায়েল হবে। এই পাখিগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের তাঁবুর ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল মাঝে মাঝে, তাদের ছড়ানো প্রশস্ত কালো পাখাগুলি উজ্জ্বল আকাশের তলায় যেন স্বচ্ছ বলে মনে হতো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরা নেকড়ে আর এই পাখিদের ঝাঁক দেখতে লাগলাম, আর এই ভোজে মাঝে মাঝে দু'-তিনটি ঈগলও আসতে লাগল। আমি প্রায় তাঁবু থেকেই গুলী ছুঁড়ে একটা মহিষ মারলাম তাঁবুর অল্প দূরে। সে-রাত্রে খুব কাছে নেকড়েরা বিশ্রী চীৎকার শোনালো, আর পরদিন ভোরে দেখলাম মৃতদেহটাকে এই বীভৎস পেটুকের দল একেবারে ফাঁপা করে খেয়ে রেখে গেছে।

এখানকার শিবিরে চারদিন থাকার পর আমরা এটি ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমাদের নিজের ভাগে ছিল পাঁচশো পাউণ্ড শুকনো মাংস, আর ক্যালিফর্নিয়ার লোকগুলো তৈরি করেছিল আরো প্রায় তিনশো পাউণ্ড ; এসব

হয়েছিল আট-ন'টা মহিষীর দেহ থেকে বেছে বেছে ভালো ভালো অংশের মাংস নিয়ে। প্রত্যেকটি দেহ থেকে তাই অল্প অংশ নিয়ে বাকি অংশগুলো সব নেক্‌ড়েদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হতো। মালবাহী জানোয়ারগুলোর ওপর মাল চাপানো হলো, ঘোড়া-গুলোর পিঠে জিন পরানো হলো, অশ্বতরগুলোকে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। লাল-মাথা পর্যন্ত অবশেষে তৈরি হলো। আমরা আবার পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা মাইলখানেক এগিয়ে গেছি, এমন সময় হঠাৎ শ-র খেয়াল হলো একটা মূল্যবান শিকারের ছুরি পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁবুর ওখানেই ফেলে এসেছে ভেবে শ ওটার খোঁজে ফিরে গেল। দিনটা ছিল অন্ধকার, বিষণ্ণ। নদীর ধারে আগুনের ছাই থেকে ধোঁয়া উঠছিল তখনো; আর চারধারের ঘাস দলিত মথিত হয়েছিল মানুষের আর ঘোড়ার পায়ের তলায়, আর তাঁবুর নানা জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিল সেই ঘাসের ওপর। আমাদের বিদায় যেন পাখি আর পশুদের জড়ো হবার সঙ্কেত। কতক কতক নেক্‌ড়ে ঐ আগুনের শেষ ধোঁয়ার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করতে লাগল প্রেয়ারির ওপর। শ-কে ফিরতে দেখে ওরা চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে পালিয়ে গেল। মেঘের মতো শকুনের দল উড়ছিল আকাশে, আর আমাদের তাঁবু যেখানে ছিল তার কাছাকাছি মহিষের মৃতদেহটার ওপরে একগাদা শকুন ভিড় করেছিল। তারা ঝুঁটিওয়ালা মাথাগুলো লম্বা রোগা গলার ওপর উঁচিয়ে তুলে প্রশস্ত ডানাগুলো ঝাপ্‌টাচ্ছিল মহা দোটানায় পড়ে;—থাকতেও ভয়, অথচ এই বীভৎস ভোজ ছেড়ে যেতেও অনিচ্ছা।

অগ্নিকুণ্ডের আশেপাশে খুঁজতে গিয়ে শ দেখল নেক্‌ড়েরা বসে আছে পাহাড়ের ওপরে, কখন সে চলে যাবে সেই শুভক্ষণটির প্রতীক্ষায়। কিছুক্ষণ এখানে ওখানে ছুরিটার জন্য তন্ন তন্ন করে খোঁজ করে, তারপর ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে শ সেস্থান আবার নেক্‌ড়ে আর শকুনদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে চলে এলো।

ষড়বিংশ অধ্যায়

আর্কেনসাস-এর গতিপথে

১৮৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে উর্ধ্বতন আর্কেনসাস-এর বন্য এবং নির্জন তীরগুলি প্রথম দেখতে পেল সেনাবাহিনীর শোভাযাত্রা। জেনারেল কিয়ার্নি তাঁর সাণ্টা ফে অভিমুখে যাত্রাকালে সিমারনের পুরোনো পথের চাইতে এই পথটিই বেশী পছন্দ

করেছিলেন। আমরা যখন আর্কেনসাসে ছিলাম তার আগেই তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান অংশটি এখান দিয়ে চলে গিয়েছিল। প্রাইস-এর মিজুরি সেনাবাহিনী কিন্তু তখন এই দিকেই আসছিল, কারণ এই দলটি সীমান্ত থেকে রওনা হয়েছিল বাকি সৈন্যদের কিছু পরে। এই সময় এই বাহিনীর দু'-একটি ছোট ছোট দলের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা হতে লাগল। কোনো সামরিক অভিযানেই সৈন্যরা নিছক কর্তব্যপ্রেমের প্রেরণায় এমন করে যোগ দেয় না, যেমন দিয়েছিল এই মিজুরির যুবক স্বেচ্ছাসৈনিকদল। নিয়মানুবর্তিতা এবং আদেশপালন যদি সৈনিক হিসেবে উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়, তাহলে মিজুরিয়ানরা সৈনিক হিসেবে মোটেই ভালো ছিল না। কিন্তু তাদের কৃতিত্ব যখন সারা আমেরিকার অভিনন্দন লাভ করেছে, তখন তারা যে অনিয়মিত সৈনিক হিসেবে খুবই প্রশংসনীয় ছিল সে-কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তারা যুদ্ধবিদ্যার সবগুলো প্রচলিত পদ্ধতি এবং নজিরকে অগ্রাহ্য করেই বিস্ময়কর জয়লাভ করেছিল; তাদের বিজয়ের মূলে ছিল এই যোদ্ধাদের নিজস্ব কতকগুলো সামরিক গুণের যোগাযোগ। ডনিফান-এর বাহিনী নিউ মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে অভিযান করেছিল স্বেচ্ছাসৈনিকের মতো, কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের বেতনভুক্ সেনাদলের মতো নয়। জেনারেল টেলর যখন সাক্রামেন্টো এবং অন্যান্য স্থানে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান, কর্নেল ডনিফান তখন যে জবাব দেন তাতে সুন্দর ফুটে উঠেছে তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীর কর্মচারী এবং সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম ছিল।

কর্নেল বলেছিলেন, "কী কী কৌশলে লড়াইগুলো জেতা হয়েছিল বলতে পারব না। ছোকরারা বার বার আমাকে এসে বলত, অনুমতি দিন ঝাঁপিয়ে পড়ি। ভালো সুযোগ দেখলেই আমি অনুমতি দিতাম, আর ওরা তীরবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ত।"

পল্লী অঞ্চলের আইনজীবী এই ভদ্রলোক তাঁর দলের লোকদের ওপর হুকুম খাটাবার চাইতে তাঁদের শুভেচ্ছা অর্জন করে খুশি রাখার বিদ্যাটা বেশী ভালো জানতেন। তাঁর অধীনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভেতর অনেকেই চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং দল-পরিচালনায় তাঁর চাইতে যোগ্যতর ছিলেন।

সাক্রামেন্টোর যুদ্ধে তাঁর সীমান্তবাসী যোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল অনেক অসুবিধার ভেতর। মেক্সিকানরা আগে থেকেই তাদের সুবিধামতো অবস্থান বেছে নিয়েছিল। যে উপত্যকাটি তাদের নিজস্ব শহর চিহুয়াহুয়া পর্যন্ত চলে গেছে, সেই

উপত্যকা জুড়ে তারা সৈন্য সাজিয়েছিল ; তাদের রণবাহিনীর সম্মুখভাগটা তারা পরিখা কেটে এবং সারি সারি কামান সাজিয়ে সুরক্ষিত করেছিল। তাদের লোক-সংখ্যাও ছিল আক্রমণকারীদের পাঁচগুণ। আমেরিকানদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা ঈগল পাখি, তাদের সৈন্যদলে জাগল গভীর গুঞ্জন। শত্রুপক্ষের কামান-গর্জন শুরু হলো। আমেরিকানরা বহুক্ষণ সেই অগ্ন্যুদ্গারের সম্মুখীন রইল। কিন্তু যেইমাত্র এগিয়ে যাবার অনুমতিটি পাওয়া গেল, অমনি তারা উল্লাসে চীৎকার করতে করতে সামনের দিকে ছুটল। মাঝপথে তাদের একটি দলের কর্মচারী নির্দেশ দিল থেমে পড়তে, কিন্তু রণোন্মাদ সৈন্যেরা মানতে রাজি হলো না সেই নির্দেশ।

সাধারণ সৈন্যদের একজন চেঁচিয়ে বলল, "ভাই সব, এগিয়ে চলো!"—আর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানরা শত্রুদের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। চারশো মেক্সিকান সেইখানেই মারা পড়ল, বাকি সবাই পালাল ভীত ভেড়ার মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে। মেক্সিকানদের নিশান, কামান, জিনিসপত্র সব-কিছু এসে গেল আমেরিকানদের দখলে, সঙ্গে দড়ি-বোঝাই একটি ওয়াগন। আশাবাদী মেক্সিকানরা ঐ দড়িগুলো আগে থেকেই যোগাড় করে রেখে দিয়েছিল আমেরিকান যুদ্ধবন্দীদের বাঁধতে হবে বলে।

ডনিফান-এর এই বিজয়ী স্বেচ্ছাসৈনিকরা আগেই চলে গিয়েছিল প্রধান বাহিনীর সঙ্গে। কিন্তু প্রাইস-এর সৈনিকরাও—যাদের সঙ্গে আমাদের এখন দেখা হলো—ওদের এলাকারই লোক ; চরিত্র, আচরণ এবং চেহারাতেও ঠিক ওদেরই মতো। এক ভোরবেলায়, আমরা যখন একটি প্রশস্ত মাঠের ওপর নেমে আসছিলাম—দূরে দেখলাম একদল অশ্বারোহী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। জলের জন্য আমাদের যাত্রাপথ থেকে বেরিয়ে আধ মাইল দূরে নদীতীরে চলে যেতে হলো। এখানে আমরা রোদ থেকে আড়াল পাবার জন্য একটু চাঁদোয়ার মতো তৈরি করলাম আর তার তলার ছায়ায় মহিষ-চর্মের পোশাক বিছিয়ে তার ওপর বসে ধূমপান করতে লাগলাম।

শ বলল, "আচ্ছা আপদ হলো দেখছি! ঐ লোকগুলোকে দেখছো? একটু যে নিরালায় আরাম করবো তাও পারবো না।"

সত্যিই দেখলাম ঐ স্বেচ্ছাসৈনিকদের প্রায় আদ্ধেক ওদের যাত্রাপথ থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকেই চলে আসছে।

প্রথমে যে লোকটি কাছে এলো সে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই মাটির ওপর শুয়ে পড়ে আমাদের প্রশ্ন করল—"কেমন আছ?" বাকি আগন্তুকরাও এসে পড়ল,

আর জনা কুড়ি আমাদের ঘিরে জড়ো হলো। কতক শুয়ে পড়লো মাটির ওপর, কতক বসে রইল ঘোড়ার পিঠেই। এরা সবাই স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে সেণ্ট লুইস থেকে। এদের ভেতর কতকগুলো ছিল গুণ্ডা চেহারার আর কতকগুলোর চেহারায় ছিল লাম্পট্যের কালিমা মাখানো; কিন্তু মোটের ওপর ওদের সবাই অসাধারণ সুপুরুষ, সাধারণ সৈনিকদের মতো মোটেই নয়।

তাদের বুটগুলো হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ছিল বটে, কিন্তু তাদের অন্যান্য যা-কিছু সামরিক চিহ্ন তা তারা পরেছিল অসামরিক সাধারণ বেশের ওপরই। তলোয়ার আর খাপে ভরা পিস্তল ছাড়া তারা তাদের জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছিল স্প্রিংফীল্ডে তৈরী চমৎকার হাল্‌কা বন্দুক, যাতে গুলী ভরতে হয় পিছনদিক দিয়ে। তারা আমাদের দলটির স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে চাইল, জানতে চাইল এদিকে মহিষ-শিকারের সুযোগ-সুবিধার কথা, জানতে চাইল সাণ্টা ফে পর্যন্ত ভ্রমণ তাদের ঘোড়াগুলো সইতে পারবে কিনা। এপর্যন্ত তো ভালোই গেল, কিন্তু এর পর যারা এলো তাদের ধরনটা বিরক্তিকর।

পুরোনো টুপি মাথায় একটি লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কেমন আছ গো, অপরিচিতেরা? কোথা থেকে আসছ? যাওয়াই বা হচ্ছে কোথায়?" লোকটার পরনে সস্তা মোটা কাপড়ের তৈরী পোশাক। জ্বরে ভুগেই বোধকরি তার মুখটা মলিন, এবং তার লম্বা দেহটি বলবান আর পেশীবহুল হলেও তার সমগ্র চেহারায় কেমন একটা শ্রীহীন ভাব ছিল। তার পিছনে যারা এলো তারাও তারই ধরনের। এরা এসেছিল সীমান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে। তাদের গেঁয়োমির নানা পরিচয়ও পেতে বেশী দেরি হলো না। প্রথম দলের আগন্তুকদের আড়াল করে এসে এরা গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

একজন প্রশ্ন করল, "তুমিই কি দলের সর্দার?"

আরেকজন শুধাল, "এখানে তোমাদের কাজটা কি?"

তৃতীয়জন বলল, "দেশ কোথায় তোমাদের?"

চতুর্থজন অনুমান করল: "মনে হচ্ছে তোমরা ব্যবসাদার।"

সবচেয়ে সেরা প্রশ্ন করল পাঁচনম্বর লোকটি। সে আমার খুব কাছে এসে মৃদুস্বরে কানে কানে প্রশ্ন করল, "তোমার অংশীদারের নামটা কি হে?"

প্রত্যেকটি নতুন আগন্তুক একই প্রশ্ন করতে থাকলে কার মেজাজ ঠিক থাকে? আমাদের এই সামরিক অতিথিরা আমাদের অতিশয় সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে অচিরেই প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল আর মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বোধকরি শাপ-

শাপান্তই করতে লাগল। আমরা বসে বসে যখন ধূমপান করতে লাগলাম— বলা বাহুল্য, খুব খুশ-মেজাজে নয়—তখন লাল-মাথার মুখের কামাই ছিল না। সেও যে 'মিলিটারি' মানুষ এইটে সে কখনোই ভোলেনি। শেষকালে আমরা এই 'মিলিটারি' আগন্তুকদের সামনে আমাদের লাল-মাথাকেই এগিয়ে দিলাম, বললাম তুমিই আমাদের মুখপাত্রগিরি করো। শুনে লাল-মাথা তো মহা খুশী। আর আমরাও মহা খুশী হয়ে উঠলাম যখন দেখলাম লাল-মাথার মুখ থেকে এমন অজস্র ধারায় বচন বেরোচ্ছে যে আগন্তুকদের অধিকাংশ প্রশ্নবাণ এখন আমাদের বদলে লাল-মাথার ওপরই বর্ষিত হচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে দেখি একটা কামান টানতে টানতে চারটি ঘোড়া এসে হাজির, চালক বসে আছে একটি ঘোড়ার পিঠে। পূর্ববর্তী আগন্তুকদের মাথার ওপর দিয়ে আমাদের দেখবার জন্যেই বোধকরি ঘোড়ার পিঠে বসে ঘাড় উঁচু করে আমাদের দিকে তাকিয়ে চালকটি উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কী করা হয়?"

আগন্তুকদের মধ্যে ছিল একটি দলের ক্যাপ্টেন। সেও অন্যান্যদের মতো কৌতূহলী হয়েই এসেছিল। এই 'অন্যান্য'দের চেহারা যদি আমাকে ধাপ্পা দিয়ে না থাকে, তাহলে বলতে পারা যায় তাদের অনেকেই এই ক্যাপ্টেনের জায়গায় তার চাইতে ভালো ক্যাপ্টেন হতে পারত।

যাই হোক, এই ক্যাপ্টেন অলসভাবে তার ভূমিশয্যা থেকে উঠে বলল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো এবারে ফের রওনা হওয়া যাক।"

একটি লোক এক হাতে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে তন্দ্রা উপভোগের উপক্রম করছিল। সে বলল, "আমি এখন নড়ছিনে, যাই বলো-না কেন।"

লেফ্‌টেনাণ্ট বলল, "এত তাড়া কিসের, ক্যাপ্টেন?"

পরম বশম্বদ দলপতি তখন বললেন, "বেশ, তাহলে আরো কিছুক্ষণ দেরিই করা যাক।"

যাই হোক, শেষপর্যন্ত ওরা সবাই যেমন এসেছিল তেমনি চলেও গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ওরা চলে যাওয়াতে ডেস্‌লরিয়ার্সের চাইতে বেশী স্বস্তি বোধ হয় কেউ বোধ করেনি, কারণ আমাদের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। সে ঘাসের ওপর সাদা-রং-করা একটা মহিষ-চর্মের পোশাক পেতে তার চারদিকে টিনের থালা বাটি সাজিয়ে আমাদের খেতে ডাকল। এরকম ক্ষেত্রে লাল-মাথা বরাবর যা করে তাই করল।

সবার আগে সে গিয়ে খাবার জায়গায় বসে পড়ল। সে যখন স্টীমবোটের কেরানী ছিল তখনই সে ছোট-বড় সবার নামের আগেই সম্মানসূচক 'মিস্টার' শব্দটি লাগাতে শিখেছিল। তাই তার কাছে জিম গার্নি ছিল মিস্টার গার্নি, হেনরি ছিল মিস্টার হেনরি, এমনকি ডেস্‌লরিয়ার্সও তার জীবনে প্রথম 'মিস্টার ডেস্‌লরিয়ার্স' ডাকটি শুনল এই লাল-মাথার মুখেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাল-মাথার ওপর ডেস্‌লরিয়ার্সের ভীষণ বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমেনি। কারণ লাল-মাথা সব সময়ে রান্নার ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে ডেস্‌লরিয়ার্সকে ভারী জ্বালাতন করত। হাসি-খুশী আর অগ্নিশর্মা মেজাজের মাঝামাঝি কিছু ডেস্‌লরিয়ার্সের জানা ছিল না। লাল-মাথাকে সে মুখে কিছু বলত না, কিন্তু সব রাগ জমে থাকত তার ভেতরে ভেতরে।

লাল-মাথা খেতে বসেছিল ; এ তার শ্রেষ্ঠ আনন্দের মুহূর্ত। দক্ষিণহস্তের ব্যাপার শুরু করবে, তাই দক্ষিণ হস্তের আস্তিনটি গুটিয়ে নিয়েছে ভালো করে ; ছোট্ট ঠ্যাং দুটি সযত্নে গুটানো ; কফির পেয়ালাটা রয়েছে তার পাশে, হাতে ছুরি। ডেস্‌লরিয়ার্স বসে আছে তার উল্‌টো দিকে। আমরাও খেতে বসেছি আমাদের জায়গামতো।

"একি, ডেস্‌লরিয়ার্স ? পাতে রুটি তো যথেষ্ট দাওনি আমাদের।"

শুনে ডেস্‌লরিয়ার্স বিষম ক্ষেপে উঠল আর ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে এমন একগাদা অসংলগ্ন শব্দের তুফান ছুটিয়ে দিল যে লাল-মাথাও চম্‌কে উঠল। ডেস্‌লরিয়ার্স সম্ভবত এই নালিশই জানাতে চাইছিল যে, খাওয়ার সময় পরিবেশন করবার জন্য সে যে কেক রেখে দিয়েছিল তা থেকে বড বড় চারটি কেক লাল-মাথা চুরি করে খেয়ে নিয়েছে। এই হঠাৎ আক্রমণে হক্‌চকিয়ে গিয়ে চোখ বড় করে লাল-মাথা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরই তার মুখে কথা ফুটল। সে জোর গলায় বলল ডেস্‌লরিয়ার্সের এ অভিযোগ মিথ্যা ; সে ভেবেই পেলো না কখন কিভাবে সে মিস্টার ডেস্‌লরিয়ার্সের ক্রোধ বা বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে, যার ফলে তিনি তার সম্পর্কে এহেন অভদ্র-জনোচিত উক্তি করছেন। এভাবে এমন চেঁচামেচি শুরু হলো যে তার তলায় অন্য সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। লাল-মাথার বিশেষ সুবিধা ছিল সে ডেস্‌লরিয়ার্সের চাইতে ইংরাজি বেশী ভালো জানত। ডেস্‌লরিয়ার্স কিছুক্ষণ বাদে যখন দেখল তার রাগ প্রকাশের মতো ভাষা পাচ্ছে না, তখন লাফিয়ে উঠে গজর-গজর করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

পরদিন ভোরে আমরা দেখলাম একটা বুড়ো মহিষ তার মহিষী আর দুটো ছোট বাচ্চা নিয়ে প্রেয়ারির ওপর দিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে পিছনে আসছিল চার-

পাঁচটা সাদা নেকড়ে, চুপিসাড়ে লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে ; বাচ্চা দুটোর কোনো একটি একবার বাপ-মা'র কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেই তাকে ধরবে, এই আশায়। বুড়ো মহিষটাও সর্বদাই সতর্ক ছিল।

আমরা যখন আমাদের দুপুরের আশ্রয়স্থানের কাছাকাছি এলাম, তখন দেখলাম পাঁচ-ছ'টি মহিষ দাঁড়িয়ে আছে একটা উঁচু খাড়া পাড়ের ওপর। যেখানটায় আমরা বিশ্রাম-শিবির করব, ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে পৌছে ঘোড়া থেকে নেমে আমি ঘোড়াটাকে আল্‌গা ছেড়ে দিলাম। একটা উঁচু জায়গার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে গিয়ে আমি সেই পাড়ের তলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, তারপর তার খাড়াই বেয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম। আমার গজ পাঁচেক দূরে উঁচুদিকে মহিষগুলোর দিকে গুলী চালাতে যাবো, এমন সময় ওরা বন্দুকের নল নজর করেই ছুট লাগাল। আমিও উঁচুতে উঠে ওদের পিছনে ছুটলাম। মহিষগুলো ছড়িয়ে পড়ল, বেশীর ভাগই চলে গেল আমার দৃষ্টির বাইরে। শেষপর্যন্ত একটা মহিষ এবং একটি মহিষী রইল আমার নজরের আওতায়। কিছুক্ষণ খাদের কিনারা দিয়ে ছুটে তারপর তারা প্রশস্ত প্রেয়ারিতে প্রবেশ করল ; সেই প্রেয়ারিতে সবুজ নেই বললেই চলে, কারণ ছোট ছোট ঘাসগুলিও উজ্জ্বল রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝেই বুড়ো মহিষটা আমার দিকে তাকাতে লাগল ; যখনি সে তাকাতে লাগল, তখনই আমি মাটিতে পড়েই চুপচাপ শুয়ে থাকতে লাগলাম। এইভাবে মাইল দুয়েক তাদের পিছনে পিছনে গেলাম। তারপর সামনে অনেক মহিষের ডাক শুনতে পেলাম। তারপর দেখলাম শ'খানেক মহিষ সমতলভূমির একটা উঁচু জায়গার পিছন থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার সেই পলাতক মহিষ-দম্পতি এই ঝাঁকের দিকে চলে গেল। ভেবেছিলাম এই ঝাঁকের সঙ্গে এরা মিশে যাবে, কিন্তু তা মিশল না ; বরং ঝাঁকের মধ্য দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেল। আমি তখন ওদের পিছনে আর না ছুটে, ঐ ঝাঁকের অদূরে থেকে ওদের দিকে নজর রাখলাম। আমার উপস্থিতি তাদের মনে কোনো অস্বস্তির ভাব জাগাল না। তারা কিছু খাচ্ছিল না, কারণ খাবার কিছুই ছিল না। কিন্তু এ জায়গাটিকে তারা বেছে নিয়েছিল চমৎকার মাঠ হিসেবে। এদের কতকগুলো ধুলো উড়িয়ে মাটির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল ; কতকগুলি আওয়াজ করতে করতে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করছিল ; কতক নিশ্চল হয়ে বসেছিল।

কখনো কখনো একটা বুড়ো মহিষ এগিয়ে এসে আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকতো। তারপর সে ঘুরে খোঁচা মারত তার পাশের মহিষটিকে। তারপর সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতো খুরগুলি শূন্যে তুলে দিয়ে। এই তামাসা শেষ

হলে পর সে আবার ঝাঁকানি দিয়ে মাথা আর কাঁধ ওপরদিকে তুলে দিত আর সামনের দুটি থাবার ওপর ভর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত।

"তুমি এত কুৎসিত যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়" ভেবে আমি সবচেয়ে কুৎসিত মহিষটাকে লক্ষ্য করে গুলী চালালাম, এবং পর পর তিনটি মহিষকে গুলী করে মারলাম। বাকি মহিষগুলি এতে মোটেই চিন্তিত হয়েছে বলে মনে হলো না; তারা মাঝে মাঝে ডাক ছাড়তে লাগল, এ ওকে গুঁতোতে লাগল আর ধুলোতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। হেনরি শ্যাটিলন আমাদের সর্বদা হুঁশিয়ার করে দিত আহত মহিষের সামনে খুব ঠাণ্ডা থাকতে, কারণ তার সামনে নডাচড়া করলেই সে উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করতে পারে। আমি তাই চুপটি করে মাটির ওপর বসে রইলাম, আর বন্দুকে গুলী-ভরা আর গুলী-চালানোর কাজ যত কম নড়াচড়া করে সম্ভব তাই করতে লাগলাম। আমি যখন এইরকম করে চলেছি তখন একটি দর্শক এসে হাজির: একটি কৃষ্ণসার এসে হাজির আমার পঞ্চাশ গজের ভেতর। বড় বড় কালো চোখ দিয়ে সে আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমার সামনের ঐ লোমশ বিশ্রী জানোয়ারগুলির সামনে এই কৃষ্ণসারটিকে মনে হতে লাগল যেন একটি ডাকাতের আড্ডায় অথবা দাড়িওয়ালা জলদস্যুদের ডেরায় এক সুন্দরী যুবতী। মহিষগুলোকে যেন তুলনায় আরো কুৎসিত দেখাতে লাগল।

"এই নাও আরেকটা গুলী।" মনে মনে বলে আমি গুলী ছুঁড়বার জন্যে থলিতে একটা ক্যাপের জন্য হাতড়ালাম। দেখলাম একটিও ক্যাপ নেই। ক্যাপ-বিহনে আমার রাইফেলটার মূল্য তখন একটা লোহার ডাণ্ডার সমান মাত্র, তার বেশী নয়। আহত মহিষদের মধ্যে একটার তখনো পতন হয়নি। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম যে-কোনো মুহূর্তে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে যাবে। সে কিন্তু তখনো খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে কট্মটিয়ে তাকিয়ে। হেনরির উপদেশ অবহেলা করে আমি উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে গেলাম। অনেকগুলি মহিষ আমার দিকে ঘুরে তাকাল, কিন্তু আহত মহিষটি আমার দিকে তেড়ে এলো না। আমি একটি গভীর খাদের পাশে এসে পড়লাম, আপৎকালে যাতে আশ্রয় নিতে পারা যাবে। অতএব আমি ফিরে দাঁড়িয়ে মহিষগুলোর দিকে লক্ষ্য করে একটি ঢিল ছুঁড়লাম। মহিষগুলো তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না। ওরা কিছুতেই ভয় না পাওয়াতে আমি অপমানিত বোধ করলাম। তারপর টুপিটা দুলিয়ে, চীৎকার করে ওদের দিকে দৌড়ে যাবার ভান করলাম। মহিষগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে পালিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু ওদের মৃত এবং আহতের দল। তাঁবুর দিকে রওনা হবার সময় দেখলাম আহতদের ভেতর

সর্বশেষ যেটা বেঁচে ছিল সেটাও পড়ে মরে গেল। ফিরবার পথে আমার গতিবেগ বিশেষ দ্রুত হলো এই কারণে যে, মনে পড়ে গেল পনী ইণ্ডিয়ানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি নিরস্ত্র, অসহায়। তাঁবুতে যখন পৌছলাম তখন বৈকালিক যাত্রা-শুরুর ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ।

সেই সন্ধ্যায় আমরা নদীর অনতিদূরে তাঁবু ফেললাম। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি, আমরা যখন মাটির ওপর ঘুমিয়ে আছি, আমার ঠিক পরেই যে শুয়েছিল সে আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ছুঁয়ে হুঁশিয়ার করে দিল একেবারেই যেন নড়াচড়া না করি। আকাশে তখন লক্ষ তারার আলো। চোখ খুলে খুব আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম একটা মস্ত সাদা নেকড়ে আমাদের আগুনের ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে মাটির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। কম্বল থেকে হাত সরিয়ে আমি আমার রাইফেলের আবরণটা খসিয়ে নিলাম। এইটুকু নড়াচড়াতেই নেকড়েটা টের পেয়ে গেল আর লম্বা লম্বা লাফ মেরে পালিয়ে গেল। লাফিয়ে উঠে আমি পিছন থেকে তাকে গুলী করলাম, সে যখন গজ ত্রিশেক দূরে। বুলেটের বিষণ্ণ গুঞ্জন সেই রাত্রির নীরবতা ভেদ করে বহুদূর ভেসে গেল। তাঁবুর লোকেরা জেগে লাফিয়ে উঠল।

একজন বলল, "তুমি ওটাকে মেরে ফেলেছ।"

আমি বললাম, "না। মারতে পারিনি। ঐ তো ওটা নদীর ধার দিয়ে পালাচ্ছে।"

"তাহলে ওরা দুটো রয়েছে। দেখছনা একটা ঐ যে পড়ে আছে?"

আমরা কাছে গিয়ে দেখি ওটা মৃত সাদা নেকড়ে নয়, সাদা-রং-করা মহিষের মাথার খুলি। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলাম, এবং তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছিলাম প্রেয়ারি অঞ্চলের আইন-ভঙ্গ করে। দেশের কোনো বিপদসঙ্কুল অংশে তাঁবুতে ফেরার পর বন্দুক চালানো খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ, কারণ ঐ আওয়াজ ইণ্ডিয়ানদের কানে গিয়ে পৌছবে।

ভোরবেলা ঘোড়াগুলোকে জিন পরানো হলো। এখানকার আগুনে শেষ পাইপ ধরিয়ে নিলাম। দিনটির সৌন্দর্য আমাদের যেন নতুন জীবন দান করল। এমনকি এলিসও এর প্রভাব অনুভব করে মাঝে মাঝে দু'-একটা মন্তব্য করতে লাগল, আর জিম গার্নি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চাকরিতে সে জাহাজে জাহাজে কত ঘুরেছে, তার অনেক গল্প শোনালো। এ অঞ্চলে মহিষ প্রচুর, দেখতে পেলাম মস্ত একঝাঁক মহিষ আমাদের বাঁ-দিকের পাহাড়গুলোর গা বেয়ে উঠছে। শ বলল, "এ সুযোগ ছাড়া যায়

না।" আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম ঐদিকে। শ তার দোনলা বন্দুকের প্রত্যেকটি নলে একটি করে মহিষ মারল। আমি আরেকটা মহিষকে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়ে নিয়ে এসে মারলাম। রাইফেল-পিস্তলের ছোট্ট গুলীটা মহিষটার এত পিছনদিকে লাগল যে গুলীর ফলটা সঙ্গে সঙ্গে হলো না, মহিষটা যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে লাগল। তিন-চারবার আমি পিস্তলের বাকি গুলীটা ওর দিকে ছুঁড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু গুলী ছুটল না, কারণ পিস্তলের 'টাচ-হোল'টা আট্‌কে গিয়েছিল। ওটা খাপে রেখে দিয়ে আমি খালি পিস্তলটা বার করে তাতে গুলী ভরতে লাগলাম, তখনো মহিষটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে। এবার কিন্তু মহিষটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার মুখ থেকে ফেনা বেরোতে লাগল, জিভটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে পড়ল। পিস্তলে গুলী ভরতে পারার আগেই সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন পলায়ন অথবা মৃত্যু, এ দুয়ের মাঝামাঝি আর কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি পলায়নই শুরু করলাম, আর মহিষটা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আমার খুব কাছাকাছি পিছু ধাওয়া করল। পিস্তলটা শীগ্‌গীরই ঠিক হয়ে গেল, আমি পিছন ফিরে মহিষটাকে আমার মাত্র পাঁচ-ছয় গজ পিছনে দেখতে পেলাম। তখন গুলী-ছোঁড়া অকারণ হবে, কারণ পিস্তলের গুলী মহিষের শক্ত মাথার হাড়ে লাগলে চ্যাপ্‌টা হয়ে যায়। আমি বাঁ দিকে ঝুঁকে ঘোড়াটাকেও সেই দিকেই ঘুরিয়ে দিলাম চট্‌ করে। মহিষটা তার ভীষণ ওজন নিয়ে অন্ধের মতো তেড়ে আসছিল ; সে অত তাড়াতাড়ি তার গতির দিক বদ্‌লাতে পারল না। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম জানোয়ারটার ঘাড় আর কাঁধ আমার দিকে। আমি তেরছাভাবে তার মর্মস্থান লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। মহিষটা ছোটা বন্ধ করে শীঘ্রই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। একজন ইংরেজ পর্যটক বলেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে ; কিন্তু তা ভুল। মহিষ কখনো একটানা বেশিক্ষণ অনুসরণ করে না, আর যে ঘোড়াটা দু'-তিন মিনিট ধরে মহিষটাকে এড়িয়ে থাকতে পারে না, সেটা নিতান্তই বাজে ঘোড়া বলতে হবে।

এখন আমরা যে অঞ্চলে এসে পড়লাম সেখানে আমাদের সকলেরই নিরাপত্তার খাতিরে খুব হুঁশিয়ার থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা রাতে পাহারা রাখতে লাগলাম পালা করে ; প্রত্যেকে রাইফেল পাশে রেখে ঘুমোতে লাগলাম। একদিন ভোরে, কাছাকাছি বিরাট কামাঞ্চে শিবিরের চিহ্ন পেয়ে আমাদের পাহারা-ব্যবস্থা আরো সতর্ক হয়ে উঠল। আমাদের ভাগ্য ভালো, কামাঞ্চেরা সেই শিবির ছেড়ে গেছে হপ্তাখানেক আগে। পরদিন সন্ধ্যায় আরো সাম্প্রতিক অগ্নিকুণ্ডের ছাই দেখে চিন্তিত হলাম। অবশেষে 'কাশেজ' নামক বিপজ্জনক জায়গায় এসে হাজির হলাম।

জায়গাটার চেহারাও ভয়ানক—শুধু বালু আর পাহাড়, মাঝে মাঝে খাদ আর গুহা। এখানেই সোয়ান মরেছিল ইণ্ডিয়ানদের হাতে। দেখলাম তার কবর।

কয়েকদিন ধরে প্রাইস-এর সেনাবাহিনীদের কয়েকটি দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। মাঝে মাঝে তাদের তাঁবু থেকে ঘোড়া বেরিয়ে আসত। একদিন বিকেলে এরকম তিনটি দলছাড়া ঘোড়াকে নদীর ধারে শান্তভাবে বিচরণ করতে দেখলাম। জিম গার্নি খবর দিল সে এরকম আরো দেখেছে। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডা-ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এক ঘণ্টার ভেতর ধরে আনলাম নয়টি ঘোড়া। একটিতে জিন আর লাগাম দুই ছিল, পিস্তল ঝুলছিল জিনের সামনে, পাশেই ঝুলছিল একটা হাল্‌কা বন্দুক; পিছনদিকে একটা কম্বল গুটানো। ভোরে যখন আবার রওনা হলাম, তখন আমাদের মিছিলের চেহারাটা অনেক বেশী জাঁকালো। বিকেলের দিকে দিগন্তে দেখা দিল তিনজন ঘোড়সওয়ার। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ঐ ঘোড়াগুলোকে তাদের এবং তাদের দলের অন্যান্যদের বলে দাবি জানাল। ঘোড়াগুলো তাদের দিয়ে অবশ্যই দিলাম, কিন্তু তাতে এলিস আর জিম গার্নির খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

আমাদের নিজেদের ঘোড়াগুলি অবসন্ন হয়ে এসেছিল। ঠিক করলাম ওদের আধা দিনের বিশ্রাম দেবো। নদীতীরে ঘাসের ওপর একজায়গায় বিশ্রাম শুরু করলাম। আহার সেরে শ আর হেনরি শিকারে বেরিয়ে গেল। আমি গাড়িটার তলায় শুয়ে পড়তে লাগলাম। তাকিয়ে দেখলাম প্রেয়ারির ওপর মাইলখানেক দূরে একটা মহিষ একা বেড়াচ্ছে। রাইফেল নিয়ে পায়ে হেঁটে সেদিকে রওনা হলাম। কাছাকাছি গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ঘাসের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ওকে গুলী করবার মতন বাগে পাবো। মহিষটা রীতিমতো ঘাগী মহিষ। সেবারের মতো তার প্রণয় আর লড়াইয়ের পালা শেষ হয়ে গেছে, সে তখন নিরালায় একা বিশ্রাম করে নতুন শক্তি সংগ্রহ করছে। বেচারার শারীরিক অবস্থা বেশ শোচনীয়, একটু নড়াচড়া করলেই পাঁজরের হাড়গুলো দেখা যায়। ও যেন এক পুরোনো গুণ্ডা, রক্তারক্তি মারামারি করে করে বুড়িয়ে গেছে, আর এখন বিতৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে একা থাকছে। আমাকে দেখেই জানোয়ারটা কটমটিয়ে তাকাল। তারপর আবার পরম অবহেলায় ঘাস খেয়ে চলল। তারপরই হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একবার মনে হলো ছুট লাগাই, কিন্তু তা বিপজ্জনক। বসেই বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক করে রাখলাম ওর নাকের ওপর নরম জায়গাটির দিকে। সে আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই গুলী চালাবার উপক্রম করলাম, কিন্তু সে আর না

এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সম্পূর্ণ সম্মুখভাগটা দেখলাম জট-পাকানো শক্ত লোমে ভরা, শিংগুলো বহু লড়াইয়ের ফলে ভোঁতা আর ছিন্নভিন্ন, নাকে আর কপালে দু'-তিনটে বড় বড় ক্ষতচিহ্ন। তাতে তার চেহারাটা যেমন হাস্যকর, তেমনি বীভৎস করে তুলেছিল। সে বোধকরি পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল আমাকে। আমিও তাকে দেখতে দেখতে ভাবলাম: "বন্ধু, তুমি যদি আমাকে রেহাই দাও, আমিও তোমাকে রেহাই দেবো।" শেষকালে সে ধীরে ধীরে ঘুরে গেল, দেখলাম তার দেহের ধারগুলিতে কাদা লেগে আছে। লোভনীয় দৃশ্য। আমি আমার সদিচ্ছা আর সুবুদ্ধি ভুলে গিয়ে রাইফেলের গুলী চালালাম। মহিষটা কিছুদূর ছুটে গিয়েই, এমনকি পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা উঠেও, পড়ে মরে গেল। পাহাড়ে আরেকটা মহিষ মেরে আমি তাঁবুতে ফিরলাম।

১৪ই সেপ্টেম্বর একটা মস্ত 'সান্টা ফে' ক্যারাভান এলো। সমতলভূমি ঢেকে গেল তাদের সারি সারি সাদা-মাথাওয়ালা ওয়াগনে ওয়াগনে আর কালো গাড়িতে—যেগুলোতে এই ব্যবসায়ীরা ভ্রমণ করে আর ঘুমোয়। এ-ছাড়া অনেক ঘোড়া, অনেক অশ্বতর, অনেক ঘোড়সওয়ার, পায়ে-হাঁটা মানুষও অনেক। তারা আমাদের কাছেই এক মাঠে এসে থামল। ওদের পাশে আমাদের ছোট্ট গাড়ি আর ছোট্ট দলকে কী তুচ্ছই না দেখাতে লাগল! লাল-মাথা এগিয়ে গেল তাদের সঙ্গে দেখা করতে, কথা কইতে। ফিরে যখন এলো তখন তার এক হাতে আধা-ডজন বিস্কিট, অন্য হাতে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি। আমি প্রশ্ন করলাম, "এসব কোথায় পেলে?" সে বলল, "আমি এই ব্যবসাদারদের একজনকে চিনি। তাছাড়া ডাক্তার ডব্‌স্‌-ও রয়েছেন যে।" আমি বললাম, "ডাক্তার ডব্‌স্ কে?" লাল-মাথা বলল, "সেণ্ট লুইস শহরের একজন ডাক্তার।"

গত দু'দিন ধরে আমার পুরোনো রোগটি আবার দেখা দিয়েছিল, আমি যন্ত্রণা আর দুর্বলতা বোধ করছিলাম। আমার প্রশ্নে লাল-মাথা বলল ডাক্তার ডব্‌স্ প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার। তাকে ঠিক বিশ্বাস না করেও তবু এই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা ঠিক করলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি একটি ওয়াগনের তলায় ঘুমোচ্ছেন। চেহারা দেখে তো তাঁকে ভালো ডাক্তার বলে মোটেই মনে হলো না। অমন জীর্ণশীর্ণ চেহারা আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁর টুপিটা পড়ে গেছে, হল্‌দে চুলগুলো এলোমেলো, প্যাণ্ট হাঁটু পর্যন্ত বিশ্রী করে গুটানো, জামায় এখানে সেখানে ঘাসের টুকরো লেগে আছে।

একজন মেক্‌সিকান ছিল কাছেই। তাকে ইশারা করলাম ডাক্তারকে ঠেলে

জাগাতে। জেগেই ডাক্তারটি তড়াক করে উঠে বসে বিস্ময়ে তাকাতে লাগলেন চারদিকে। আমি সবিনয়ে বললাম তাঁর কাছে এসেছি কিঞ্চিৎ ডাক্তারী পরামর্শ নিতে।

ডাক্তার আমাকে একটু পরীক্ষা করেই গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার দেহে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, মশায়।"

আমি বললাম, "কী গণ্ডগোল?"

তিনি বললেন, "লিভারের গোলমাল। আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি আপনাকে।"

একটা ঢাকা ওয়াগন থেকে একটা বাক্স এনে তিনি তাই থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বার করে আমার হাতে দিলেন।

বললাম, "এটা কী?"

ডাক্তার বললেন, "ক্যালোমেল।"

সে-অবস্থায় আমি যে-কোনো দাওয়াই খেতে রাজি ছিলাম। পুরিয়ায় যেটুকু ছিল তাতে আমার কোনো ক্ষতি করবে বলে মনে হলো না; হয়তো উপকারও করতে পারে। তাই তাঁবুতে ফিরে সে-রাতে খাবারের বদলে ঐ ক্যালোমেল খেলাম।

ওদের শিবিরটা লক্ষ্য করবার মতো। ব্যবসায়ীরা সাবধান করে দিল আমরা যেন নদীর ধার দিয়ে প্রধান রাস্তা ধরে না যাই, অবশ্য পৈতৃক প্রাণটার ওপর যদি কিছু মায়া থাকে। নদীর গতিপথ এইখানে একটু বেঁকে গেছে, এবং আরেকটা ছোট পথ—'পাহাড়ী পথ' নামে পরিচিত—চলে গেছে ষাট মাইল লম্বা। আমরা চললাম এই পথটি ধরে। সাত-আট মাইল চলার পর একটি ছোট্ট নদীর ধারে এসে আমরা তাঁবু ফেললাম। আমাদের এই অবস্থানটা খুব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বা সামরিক দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচিত হয়নি। নদীর স্রোতটা ছিল খুব নীচু খাতে, দু'পাশে খাড়া, উঁচু পাড়। দুই উঁচু পাড়ের মধ্যবর্তী খাদের তলার ঘাসের ওপর ঘোড়াগুলোকে চরে খাবার জন্য বেঁধে রাখলাম, আর আমরা ঠিক তার ওপরে অনুর্বর প্রেয়ারির ওপর তাঁবু ফেললাম। অর্থাৎ আমাদের আক্রমণ করবার এবং আমাদের ঘোড়াগুলোকে চুরি করে নিয়ে যাবার বেশ ভালোরকম সুযোগ আমরাই করে রাখলাম। অন্ধকার হবার পর লাল-মাথা, হেনরির মুখোমুখী খেতে বসে হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কিতভাবে হেনরির ঘাড়ের ওপর দিয়ে নীরবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল একটা বিরাট কালো মূর্তি হেলে-দুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হেনরি কতক বিরক্ত হয়ে আর কিছুটা মজা উপভোগ করে লাফিয়ে উঠে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে

চেঁচিয়ে উঠল। দেখা গেল ভীষণ আগন্তুকটি একটি বুড়ো মহিষ; মূর্খ জানোয়ারটা সোজা আমাদের তাঁবুর ভেতরেই ঢুকছে। অনেক চেঁচামেচি করে আর টুপি ঝাঁকিয়ে ওকে প্রথমে থামানো, তারপরে তাড়ানো গেল।

আকাশে তখন উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালের ফলে কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। সন্ধ্যা যখন গভীর হয়ে এলো, তখন এমন ঝড়-বিদ্যুৎ শুরু হলো যে গাড়িটা সামনে রেখে ঝড়ের ঝাপ্‌টা না আট্‌কালে আমাদের তাঁবু উড়ে যেতো। অবশেষে ঝড়ের দাপট কমে গেল, রইল শুধু একটানা মৃদু বর্ষণ। সারারাত আমি জেগে রইলাম, মাথার ওপরের ক্যান্‌ভাসে বৃষ্টির টুপুর-টাপুর শুনতে শুনতে। ঐ ক্যান্‌ভাস চুইয়ে চুইয়ে যে জল পড়ছিল তাঁবুর ভেতর, তাতে যে আমাদের আরাম বাড়াচ্ছিল না, তা বোধ হয় বলা বাহুল্য। বারোটা নাগাদ শ অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে। মান্‌রোও হুঁশিয়ার ছিল। দু'ঘণ্টা বাদে শ নীরবে ভেতরে ফিরে এসে হেনরির গায়ে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে তাকে বলল বাইরে আসতে। আমি শুধালাম, "ব্যাপার কি?" শ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "বোধ হয় কতকগুলো ইণ্ডিয়ান। যাই হোক, চুপ করে শুয়ে থাকো। যদি লড়াই হয় তো ডাকব।"

সে আর হেনরি একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি আমার রাইফেলের আবরণ খুলে ফেলে রাইফেলে নতুন পার্কাশন ক্যাপ পরিয়ে নিলাম। তারপর ব্যথায় অস্থির অবস্থায় শুয়ে রইলাম। পাঁচ মিনিটের ভেতর শ ফিরে এলো। বলল, "সব ঠিক।" বলে ঘুমোতে গেল। তার জায়গায় এখন হেনরি পাহারা দিতে লাগল। ভোরবেলায় সে আমায় সব কথা খুলে বলল। মান্‌রো লক্ষ্য করেছিল কতকগুলো কালো বস্তু যেন আমাদের নীচেকার ঘোড়াগুলোর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মাটির ওপর উপুড় হয়ে সে আর শ বুকে হাঁটতে হাঁটতে উঁচু পাড়ের কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের মনে হলো ঐ কালো বস্তুগুলো নিশ্চয় কতকগুলো ইণ্ডিয়ান। শ তখন চুপচাপ চলে এসে হেনরিকে ডেকে নিয়ে গেল, আর তারা তিনজনে মিলে ভালো করে দেখতে লাগল। হেনরির চোখের দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। সে একটু নজর দিয়েই বুঝতে পারল ওগুলো ইণ্ডিয়ান নয়, কয়েকটা নেক্‌ড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাত্র।

এটা ভারি আশ্চর্য যে, তাঁবুর কাছাকাছি বাঁধা থাকলে ঘোড়ারা নেক্‌ড়েদের এই ধরনের কাছাকাছি ঘোরাফেরাতে ঘাবড়ায় না। যতদূর বোঝা যায়, নেক্‌ড়েগুলোর এক্ষেত্রে আর কোনো মতলব নেই, তাদের বাসনা শুধু ঘোড়াগুলো যে কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, সেই দড়ি কামড়ানো। আমাদের যাত্রাপথে অনেকবারই

লক্ষ্য করেছি আমার ঘোড়াটির কণ্ঠসংলগ্ন টানা দড়িটিতে এই নিশাচরদের দাঁতের চিহ্ন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

উপনিবেশ

পরের দিনটা ছিল বিষম গরম। আমরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে এগোলাম, পথে পেলাম না একটিও গাছ, একটিও ঝোপ অথবা একটি ফোঁটা জল। আমাদের চাইতে বেশী দুর্ভোগ হলো আমাদের ঘোড়া আর অশ্বতরগুলোর, কিন্তু সূর্যাস্ত এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কান খাড়া করে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। জল আর বেশীদূর নয়। আমরা একটি চওড়া অগভীর উপত্যকার উৎরাইতে এসে পড়লাম, যার তলায় ঝিক্‌মিক্ করছে একটি জলস্রোত, তার দুই তীরে পড়েছে অনেক তাঁবু, সবুজ মাঠে ঘাস খেতে খেতে চরে বেড়াচ্ছে শত শত চতুষ্পদ প্রাণী। আমাদের বিপরীত দিকের ঢল বেয়ে নেমে আসছে অনেক অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য, অনেক ওয়াগন, আর পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুর বিচিত্র মিছিল। এরা ছিল সরকারী বেতনভুক্ মর্মন সেনাবাহিনী আর মিজুরির স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর লোক। ক্যালিফর্নিয়ায় মর্মনদের বেতন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে; তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সঙ্গে তাদের পরিবার এবং অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে আসবার। এরা হয়তো চলেছিল ক্যালিফর্নিয়ায় একটি মর্মন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে। এই আধা সামরিক, আধা গোষ্ঠীপতি-শাসিত সমাজের মানুষগুলোর চেহারায়, হাবভাবে আর সাজ-সজ্জাতেই একটা কিছু ছিল যার বিশেষত্ব সহজেই চোখ পড়ে। আমরা এদের দেখে আনন্দের চাইতে বিস্ময়ই বেশী বোধ করলাম। শিবিরের জন্য ফাঁকা অনধিকৃত জায়গা পেতে আমাদের নদীর গতির উল্‌টো দিকে প্রায় সিকি মাইল পথ এগিয়ে যেতে হলো। সেখানে একঝাঁক মর্মন আর মিজুরিয়ান যেন আমাদের ছেঁকে ধরল। এই সম্পূর্ণ শিবিরের ভারপ্রাপ্ত, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী ভদ্রলোকও আমাদের তাঁবুতে দেখা করতে এসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেলেন।

ভোরবেলা চারদিক ছেয়ে গেল কুয়াশায়। আমরা খুব ভোরেই উঠি, কিন্তু আমরা উঠে তৈরি হবার আগেই দেখলাম এই শিবিরের কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে, জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার মধ্য

দিয়ে দেখতে পেলাম ওদের তাঁবুগুলো নামিয়ে ফেলা হচ্ছে, এখান থেকে বিদায় আসন্ন। মর্মনদের ঢাক আর ভেরী বেজে উঠেছে।

সেই সময় থেকে যাত্রার শেষপর্যন্ত আমরা প্রায় রোজই দেখতে লাগলাম লম্বা সারি-সারি সরকারী ওয়াগন সৈন্যদের জন্য রসদ বয়ে চলেছে মন্থর গতিতে সান্টা ফে অভিমুখে।

বিপদকে লাল-মাথার ছিল বিষম ভয়। কিন্তু এক সন্ধ্যায় সে এমন এক ভীষণ অ্যাডভেঞ্চার করে বসল যার জুড়ি দলের আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। 'পাহাড়ী পথ' ছাড়ার পরদিনই আমরা নদীর কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছিলাম। সূর্যাস্তের সময় আমরা দেখেছিলাম তিন মাইলের দূরে পথের পাশে একসারি ওয়াগন থেমেছে। আমরা তাদের দেখলেও—পরে জানতে পেরেছিলাম—ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। কয়েকদিন ধরেই এক ড্রাম হুইস্কির জন্য লাল-মাথা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সে তার 'জেম্‌স্' ঘোড়াটার (তার অশ্বতরটির বিনিময়ে সে একটি স্বেচ্ছাসৈনিকের কাছ থেকে এই ঘোড়াটি সংগ্রহ করেছিল) পিঠে চেপে, কাঁধে তার জলপাত্রটি ঝুলিয়ে নিয়ে হুইস্কির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা গেল, লাল-মাথা তবু ফেরে না। আমরা ভাবলাম সে হারিয়ে গেছে অথবা কোনো ইণ্ডিয়ানের হাতে খতম হয়েছে। তাঁবুর অন্যেরা যখন ঘুমে, আমি তখন পাহারায় দাঁড়িয়ে। গভীর রাতে অন্ধকার ভেদ করে একটি থরথর-কম্পিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো, তারপরই দেখলাম তাঁবুর দিকে আসছে সওয়ার লাল-মাথা আর তার ঘোড়া জেম্‌স্।

সে যে কাহিনী শোনালো তার সারমর্ম এই :

সে যখন তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তখন তার খেয়াল নেই রাত কত হয়েছে। সেই ওয়াগনের লোকগুলোর কাছে সে যখন গিয়ে পৌছল, তখন রীতিমতো ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। লোকগুলো তাদের আগুন ঘিরে বসে আছে, বন্দুকগুলো পাশে রেখে। লাল-মাথা ভাবল আচম্‌কা তাদের মাঝখানে গিয়ে না পড়ে, আগে একটু জানানি দিয়ে যাওয়া ভালো, নইলে ভুলে ওরা হঠাৎ কী করে বসবে কে বলতে পারে ? তাই কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে চীৎকার করে সে তাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাল।

যে ফল আশা করে লাল-মাথা এই প্রীতি-সম্ভাষণী হুঙ্কার ছেড়েছিল, ফল দাঁড়াল ঠিক তার উল্‌টো। মিশ্‌কালো অন্ধকার থেকে আসা এই বিকট চীৎকার শুনে ওরা ভাবল গোটা পনী জাতটাই চারদিক থেকে আক্রমণ করেছে। সবাই ভীষণ আতঙ্কে যে যার বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে গেল, কেউ মাটির ওপর শুয়ে পড়ল, কেউ বা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াল। ভীত-সন্ত্রস্ত লাল-মাথা দৃষ্টিগোচর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একসঙ্গে বিশটি বন্দুকের নল উদ্যত হলো তার দিকে।

দলের প্রধান ওয়াগন-চালকটি বলল, "ওরা আসতে শুরু করেছে। গুলী চালাও, মেরে ফেল ঐ লোকটাকে।"

প্রাণভয়ে ভীত লাল-মাথা বলল, "না না, গুলী চালিও না। আমি বন্ধু। আমি একজন আমেরিকান নাগরিক।"

ওয়াগনের ওধার থেকে কর্কশকণ্ঠে শোনা গেল: "বন্ধু? তাহলে ইণ্ডিয়ানদের মতো অমন চেল্লাবার মানেটা কী? বাপ্‌কা বেটা হও তো চলে এসো এদিকে।"

ওয়াগন-চালক বলল, "বন্দুকটা ওর দিকেই বাগিয়ে রাখ। লোকটা ওদের চর হতে পারে, বলা যায় না।"

বহু কষ্টে লাল-মাথা নিজের স্বরূপটি বুঝিয়ে তারপর ঐ মিজুরিয়ানদের তাঁবুতে ঠাঁই পেয়েছিল। হুইস্কি সে পায়নি, কিন্তু নিজেকে রুগ্ন, অশক্ত বলে পরিচয় দিয়ে হুইস্কির অভাবের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওদের কাছ থেকে পেয়েছিল কিছু চাল, বিস্কিট আর চিনি।

ভোরে প্রাতরাশের সময়ও লাল-মাথা এ কাহিনী আমাদের আরেকবার শোনালো। আমরা ঠিক বুঝলাম না কাহিনীর কতটা বিশ্বাস করব আর কতটা করব না। অনেক জেরা করেও ওর কাহিনীর ঠাস-বুনুনির ভেতর কোনো ফাঁক পেলাম না। ঐ ওয়াগনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে লাল-মাথার কাহিনী সমর্থিত হলো।

ওদের ভেতর একজন বলল, "মিজুরির সব টাকার বিনিময়েও আমি ঐ লোকটার মতো অবস্থার সম্মুখীন হতে রাজি হতাম না।"

দিন দুই বাদে আর একদল ওয়াগন-যাত্রীর সঙ্গে আমাদের আরেকরকম অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল। হেনরি আর আমি গিয়েছিলাম ঘোড়ায় চড়ে শিকারে। সেদিনের পর হয়তো আর মহিষের দেখা পাবো না ভেবেই অন্তত একটা মহিষ-শিকারের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম, কারণ আরো খাদ্য দরকার ছিল।

সারা ভোরবেলা চেষ্টা করেও একটি মহিষও মারতে পারলাম না। দুপুরে 'কাউ ক্রীক' নামক খাঁড়ির কাছে এসে দেখলাম খাঁড়ির ধারে মহিষের এক মস্ত ঝাঁক। 'কাউ ক্রীক' খাঁড়িটির দু'ধারে ঘন গাছের আড়াল, আর এই খাঁড়ির স্রোতটি বয়ে চলেছে গভীর খাদের অনেক তলা দিয়ে। আমরা একটি খাদের তলা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হলাম। মহিষদের কাছাকাছি পৌঁছে আমি ঘোড়াগুলোকে ধরলাম আর হেনরি হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হলো। গুলী চালাবার মতো কাছাকাছি জায়গায় বসে সে বন্দুক ঠিক করে পছন্দ করতে লাগল কোন্

মহিষটিকে গুলী করবে। একটি মোটা মহিষীর মৃত্যু অবধারিত মনে হলো। হঠাৎ ঝাঁড়ির তলার দিক থেকে উঠল একরাশ ধোঁয়া, আর পর পর অনেক বন্দুকের গুলীর আওয়াজ। এক কুড়ি মিজুরিয়ান গাছগুলোর ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটল মহিষগুলোকে তাডা করে। মহিষগুলো সব পালাল। এই লোকগুলো শিকারের মাত্র একশো গজের ভেতর লুকিয়ে ছিল। গুলী চালিয়ে শিকার ঘায়েল করবার এর চাইতে সুবিধা আর কী হতে পারে? তারা সবাই লক্ষ্যভেদে ওস্তাদ, আর সবাই একই সঙ্গে গুলী চালিয়েছিল। অথচ একটা মহিষও ঘায়েল হলো না। আসল ব্যাপারটা এই যে. এই মহিষদের জান এত কডা যে এদের ঘায়েল করতে হলে এদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান থাকা দরকার। প্রথম চেষ্টাতেই সফল হয়, এমন মহিষ-শিকারী খুব কম দেখা যায়। বিফল হয়ে মিজুরিয়ানরা ভারি দুঃখিত হয়েছিল, বিশেষ করে হেনরি যখন বলল তারা চুপচাপ থাকলে সে দশ মিনিটের ভেতর তাদের সবাইকে খাওয়াবার মতো মাংস যোগাড় করে দিতে পারত। আমাদের বন্ধুরা বেশী দূরে ছিল না। অনেকগুলো গুলীর আওয়াজ একসঙ্গে শুনে তারা ভেবেছিল ইণ্ডিয়ানরা আমাদের ওপর গুলী চালিয়েছে। শ চিন্তিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দেখল আমরা বেঁচেই আছি বহাল তবিয়তে।

'কাউ ক্রী'-কে এসে কিছু লোভনীয় নতুন জিনিস পেলাম—পাকা আঙুর আর কুল, যা ওখানে প্রচুর জন্মায়। আরেকটু দূরে 'লিট্‌ল্ আর্কেনসাস' নামক জায়গায় আমরা শেষ মহিষটি দেখলাম—একটি ছন্নছাড়া চেহারার বুড়ো মহিষ, বিষণ্ণভাবে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিজন প্রেয়ারির ওপর।

এই সময় থেকে প্রতিদিন যেন জায়গার চেহারা বদ্‌লাতে লাগল। আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম ঊষর মরু, অতি সামান্য রকমে মহিষের খাবার ছোট্ট ঘাসে ঢাকা। আর আমাদের সামনের সমতলভূমিগুলোতে যেন প্রকৃতি তার সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে, সে-গালিচার ওপর রং-বেরঙের ফুলের বাহার। মহিষের বদলে আমরা দেখতে লাগলাম প্রেয়ারির মুর্গী। পথ বেয়ে চলতে চলতে, পথের বাইরে না গিয়েই আমরা কয়েক ডজন মুর্গী সংগ্রহ করে নিলাম। তিন-চার দিনের ভেতরে দেখলাম কাউন্সিল গ্রোভের সবুজ বন, সবুজ মাঠ। অ্যাশ, ওক, এল্‌ম্, ম্যাপল্, হিকোরি প্রভৃতি প্রিয়নামা নয়নাভিরাম গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার আনন্দ—এও যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের বিচ্ছিন্ন দলের উল্লাস চীৎকার যেন বনের আবহাওয়াকে মুখর করে তুলল। আমরা আবার মুক্ত প্রেয়ারির প্রখর সূর্যালোকে পড়লাম। তখন সীমান্তের উপনিবেশ আর শ'খানেক মাইল মাত্র। তার মাঝখানে প্রেয়ারির পর

প্রেয়ারি, যাদের অপরূপ শোভা কবি আর ঔপন্যাসিকের কলমেই ফোটে ভালো। বিপদ আমরা পিছে ফেলে এসেছি। এ অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা—স্যাক, ফক্স্, ক্যান্সাস আর ওসাগে গোষ্ঠী—বিপজ্জনক নয়। আমরা পেয়ে এসেছি আশ্চর্য সৌভাগ্য। পাঁচ মাস ধরে ভ্রমণ করেছি অতি ক্ষুদ্র দল নিয়ে অতি বিপজ্জনক এলাকার মধ্য দিয়ে, কিন্তু আমাদের একটি জানোয়ারও চুরি যায়নি, আর খোয়া গেছে মাত্র একটি অশ্বতর, র‍্যাট্‌ল্ সাপের কামড় খেয়ে মরে। আমরা সীমান্তে ফিরে আসার তিন হপ্তা বাদেই পনী আর কামাঞ্চে ইণ্ডিয়ানরা আর্কেনসাসের পথে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেছিল—মানুষ-মারা, ঘোড়া-চুরি ইত্যাদি।

ডায়মণ্ড স্প্রিং, রক ক্রীক, এল্‌ডার গ্রোভ এবং আরো অনেক আশ্রয়-স্থান আমরা দ্রুতবেগে ছাড়িয়ে গেলাম। রক-ক্রীকে 'সরকারী রসদ ওয়াগন'-এর একটি দল দেখলাম, তার নেতা একজন একাত্তর বছর বয়সের বুড়ো। কোনো আমেরিকান শয়তান এই বুড়োকে জংলী এলাকায় বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, যখন তার নাতি-নাতনী সহ বাড়িতে বসে আনন্দ করবার কথা। আমার বিশ্বাস, বুড়ো আর বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। এ কথা যখন লিখছি তার আগেই হয়তো এই বৃদ্ধের মৃতদেহের অদূরে নেক্‌ড়েরা তাদের চাঁদিনী রাতের সংগীত শুনিয়েছে।

এর কিছু পরেই আমরা এসে পড়লাম লেভনওয়ার্থ কেল্লায় যাবার একটি ছোট রাস্তায়। লেভনওয়ার্থ সেখান থেকে একদিনের পথ। এইখানে লাল-মাথা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। সে যাবে কেল্লায়, তার মূল্যবান সামরিক কার্যাবলীর প্রাপ্য বেতন আনতে। সে আর তার ঘোড়া জেম্‌স্ আন্তরিকতার সঙ্গে বিদায়—আর সেই সঙ্গে কিছু খাবার—নিয়ে চলে গেল। এক বিষণ্ণ বাদল সন্ধ্যায় আমরা আমাদের শেষ তাঁবু ফেলবার জায়গায় এসে পৌঁছলাম।

ভোরবেলা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। গতদিন খুব বৃষ্টি হলেও সেই ভোরটা ছিল চমৎকার উজ্জ্বল। আমরা যাচ্ছিলাম আধা-সভ্য শাওয়ানো ইণ্ডিয়ানদের এলাকা দিয়ে। কোথাও কোথাও শস্যশ্যামল তৃণভূমি, কোথাও কৃষকদের কাঠের তৈরী সারি সারি বাড়ি। ভুট্টাগুলো গাছের ডগায় ডগায় দুলছিল—পাকা, শুক্‌নো, হল্‌দে। রবিন, ব্ল্যাক-বার্ড, আরো কত পাখি বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সব-কিছুই যেন বলে দিচ্ছিল আবার ফিরে আসছি সভ্যতার জগতে। মিজুরির প্রান্তিক অরণ্যগুলি এইবার দেখা দিল। আমরা যে পথে প্রবেশ করলাম, যাত্রা-শুরুর সময়ে গত বসন্তে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। তখন যে আপেল গাছগুলিতে ফুল দেখে গিয়েছিলাম, সেই ফুল এখন রাঙা ফলে পরিণত হয়েছে। আঙুরগাছে-গাছে

ঝুলে আছে থোকা-থোকা আঙুর। যাবার বেলায় দেখে গিয়েছিলাম প্রতিশ্রুতি, এসে দেখলাম পরিণতি।

প্রবেশ করলাম অরণ্যে, যেখানে চলেছে আলোছায়ার খেলা। গাছে গাছে কাঠবেরালীর প্রাণচঞ্চলতা। শ্রুতিমধুর ধ্বনি আর নয়নাভিরাম দৃশ্যের বিস্ময়কর প্রাচুর্য। দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল বিচিত্র আনন্দের অনুভূতিতে, কিন্তু তবু হৃদয় যেন এক এক বার হাহাকারও করে উঠতে লাগল সেই পিছে-ফেলে-আসা বিপদসঙ্কুল অরণ্যানীর কথা ভেবে।

অবশেষে আমরা গাছের ফাঁকে দেখলাম একটি শ্বেতাঙ্গ মানুষের বাড়ি। কিছুক্ষণ বাদে এলাম সেই কাঠের পুলে; পুলের ওপর দিয়ে পার হলেই ওয়েস্ট-পোর্ট। ওয়েস্ট-পোর্ট অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে, কিন্তু আমাদের চাইতে ছন্নছাড়া চেহারার কোনো দল বোধকরি কখনো দেখেনি। যাবার পথে দেখলাম সেই প্রিয়, পুরোনো আড্ডার জায়গা—বুন-এর মুদীখানা, ভোগেল-এর পানশালা। এখানে অনেকে আমাদের ঘোড়া আর সরঞ্জামাদি কিনতে এলো। এসব পাট চুকিয়ে আমরা একটা ওয়াগন ভাড়া করে চলে গেলাম ক্যান্‌সাস। এখানে অতিথি হলাম আমাদের পুরাতন বন্ধু কর্নেল চিক-এর ভবনে। তার গাড়ি-বারান্দার তলায় বসে আবার তাকালাম মিজুরি নদীর জলস্রোতের দিকে।

ডেস্‌লরিয়ার্স ভোরে এসে হাজির। নতুন টুপি আর নতুন কোট পরেছে, পরিষ্কার করে কামিয়ে এসেছে। তাকে যেন আর চেনাই যায় না—একেবারে নতুন মানুষ। অদূরেই তার ছোট্ট বাড়িটি, কাঠের গুঁড়ির তৈরী। তার গৃহ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সে তার বাড়িতে একটা নাচের উৎসব ঠিক করেছে, তাইতে সে 'কর্তা'দের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। আমরা সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমাদের আগ্রহ আরেকটু বাড়িয়ে দেবার জন্য ডেস্‌লরিয়ার্স জানিয়ে দিল নাচের সঙ্গে বেহালা বাজাবে আতোয়াঁ লাজিউনেস। আমরা বললাম নিশ্চয় যাবো, কিন্তু লেভনওয়ার্থ কেল্লা থেকে একটা স্টীমবোট এসে পৌঁছানোতে আমাদের আর সেই নাচের নিমন্ত্রণে যাওয়া হলো না। আমাদের স্টীমবোটে তুলে দিতে এলো ডেস্‌লরিয়ার্স। বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে বলে গেল আবার যদি কখনো রকি পর্বতের দিকে যাত্রা করি, তাকে যেন স্মরণ করতে না ভুলি। সে নিশ্চয়ই যাবে। এবং সত্যিই যে যাবে, এইটে প্রমাণ করবার জন্য সে এই কথাগুলো বলল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর একগাল হেসে। স্টীমবোটটা যখন একটা বাঁকে ঘুরে গেল তখনও তীরে দাঁড়িয়ে টুপি নাড়ছে ডেস্‌লরিয়ার্স। মান্‌রো আর জিম গার্নির কাছ

থেকে বিদায় নিয়েছিলাম ওয়েস্ট-পোর্টেই। হেনরি শ্যাটিলন আমাদের সঙ্গে স্টীমবোটে চলেছিল।

সেণ্ট লুইসে পৌছতে লাগল আট দিন। এর ভেতর প্রায় আড়াই দিন আমরা ছিলাম এক বালুচরে আটকে। যাবার পথে দেখেছিলাম 'আমেলিয়া' জাহাজে ফিরে চলেছে ভূতপূর্ব স্বেচ্ছাসৈনিকেরা হৈ-হল্লা করতে করতে। অবশেষে এক সন্ধ্যায় সেণ্ট লুইস পৌছলাম। প্লাণ্টার্স-হাউসে গিয়ে আমাদের বাক্স-পেঁট্রার খোঁজ করলাম। দেখলাম সেগুলো গুদামের একেবারে দূরের এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে। পরদিন ভোরবেলা দরজী-দোকানের যাদুতে আমরা একে অন্যকে চিনতে পারি না, এমনি অবস্থা হলো।

আমরা চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় বিদায় নিতে প্লাণ্টার্স-হাউসে এলো হেনরি শ্যাটিলন। সেণ্ট লুইসের রাস্তায় তাকে দেখে কার সাধ্য বুঝবে সে রকি-পর্বত-এলাকা থেকে সদ্য-ফেরা একজন শিকারী? গাঢ় রঙের অতি সরল অথচ অতি মনোরম, সুরুচিসম্মত বেশে তার লম্বা সুগঠিত সুন্দর দেহটি চমৎকার মানিয়েছে। বহু ঝড-ঝাপ্টা গেছে তার ওপর দিয়ে, কিন্তু কিছুই তার মুখের সৌন্দর্যকে ম্লান করতে পারেনি। এই অভিযানে সে যেভাবে অসীম উৎসাহে আর একান্ত বিশ্বস্তভাবে আমাদের সেবা করেছে, তা প্রশংসার অতীত। আমরা গভীর বেদনার সঙ্গে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এই বিদায়ে তারও অন্তর যে ব্যথিত হয়েছিল তা তার মুখের ভাব দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। শ তাকে ওয়েস্ট-পোর্টে একটা ঘোড়া দিয়েছিল। আমার চমৎকার রাইফেলটি, যেটি ব্যবহার করতে পেলে তার আনন্দের সীমা থাকত না, এখন তারই হাতে রয়েছে। হয়তো এই মুহূর্তে সেই রাইফেলেরই গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রকি পাহাড়ের বুকে।

পরদিন ভোরে আমরা শহর ত্যাগ করলাম; তারপর একপক্ষকাল রেলগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, আর স্টীমবোটে ভ্রমণের অন্তে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

—